978 984 90705 8 0
849 070580

Bangabandhur Shaat M
Since 1987
* 4 3 8 3 1 0 3 *
Tk. 750.00

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ
ইতিহাস ও তত্ত্ব
সম্পাদনা
আবদুল ওয়াহাব



বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ
ইতিহাস ও তত্ত্ব
সম্পাদনা • আবদুল ওয়াহাব

মাওলা ব্রাদার্স



বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ
ইতিহাস ও তত্ত্ব

গবেষণা, সংকলন ও সম্পাদনা
ড. আবদুল ওয়াহাব

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২০
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 90705 8 0

BANGABANDHUR SHAAT MARCHER BHASHON: ITIHASH O TATTO (Bangabandhu's speech of March 7: history & theory) Researched, Compiled and Edited by Dr. Abdul Wahab. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Seven Hundred and Fifty only.

উৎসর্গ

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব—

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় সহধর্মিণী
ও আমৃত্যু জীবনসঙ্গী, বঙ্গবন্ধুর সকল
কর্ম ও কৃতির অন্যতম মহান প্রণোদক—
এই সংগ্রামী সহযোদ্ধার স্মরণে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তাঁর স্মৃতি আমাদের মননে চিরজাগ্রত থাক।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১৩
সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ

প্রসঙ্গ কথা ১৯
আবদুল ওয়াহাব

ভূমিকা
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ফোকলোর ও মানবতার জয়গান ২৩
আবদুল ওয়াহাব

প্রথম অধ্যায় : রাজনীতি

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ : কিছু স্মৃতি ৯১
শেখ হাসিনা

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ৯৩
সরদার ফজলুল করিম

পেছন ফিরে ৭ মার্চ ১০১
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

৭ মার্চ : বাঙালির স্বরূপে উদ্ভাসের দিন ১০৫
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ১১০
মযহারুল ইসলাম

৭ মার্চের মহাকাব্য : তার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১১৪
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

অসহযোগ আন্দোলন ও সাতই মার্চের ভাষণ ১১৯
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ১২২
হাসনাত আবদুল হাই

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য ১২৮
হারুন-অর-রশিদ

সেই কবি, সেই কবিতা ১৩৩
আতিউর রহমান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ১৩৮
মনিরুল ইসলাম

৭ মার্চ ১৯৭১ : জাতি নির্মাণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধু ১৪২
খুরশীদা বেগম

নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর হওয়ার প্রেরণা ১৫০
তোফায়েল আহমেদ

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ১৫৫
এম সাইদুর রহমান খান

শেখ সাহেব ও ৭ মার্চের ভাষণ ১৬০
নির্মল সেন

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইতিহাস

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও গণতান্ত্রিক চেতনা ১৬৫
কামাল উদ্দিন হোসেন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের নেপথ্যে ১৭১
কামাল হোসেন

সেই দিন, সেই ভাষণে! সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা ১৭৪
এ বি এম মুসা

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও বঙ্গবন্ধু ১৭৯
কে এম সোবহান

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ১৮২
এম এ ওয়াজেদ মিয়া

বঙ্গবন্ধু, ৭ মার্চ এবং সেই সময় ১৮৭
রবিউল হুসাইন

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং আমাদের উপলব্ধির তারতম্য ১৯৩
সন্তোষ গুপ্ত

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ও সিরাজদ্দৌলা ২০০
হাশেম খান

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ছাত্র ইউনিয়ন ২০৪
নূরুল ইসলাম নাহিদ

সেই ৭ মার্চ ২০৯
মুনতাসীর মামুন

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ২১৬
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

কালোত্তীর্ণ ভাষণটি বাঙালি জাতির অনন্ত প্রেরণা ২২০
আবুল মোমেন

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাসের এক মহাকাব্য ২২৮
কে বি এম মফিজুর রহমান খান

৭ মার্চ, আরেক 'মনুম্যান্ট' ২৩১
হারুণ হাবীব

সেই আর্তনাদের ইতিহাস ২৩৭
সৈয়দ শামসুল হক

৭ মার্চের কবিতা ২৪১
মহাদেব সাহা

৭ মার্চ '৭১ ও বঙ্গবন্ধু ২৪৪
ম. হামিদ

৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন ২৪৯
এ কে এম শাহনাওয়াজ

তৃতীয় অধ্যায় : যোগাযোগবিজ্ঞান

যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : ৭ মার্চের ভাষণ ... ২৫৫
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

চতুর্থ অধ্যায় : নৃতত্ত্ব ও জাতীয়তা

একটি ভাষণের বিনির্মাণ : নির্দেশ থেকে দেশ ২৬৩
খোন্দকার আশরাফ হোসেন

পঞ্চম অধ্যায় : তুলনামূলক আলোচনা

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠত্ব : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ২৭৫
জালাল ফিরোজ

ষষ্ঠ অধ্যায় : ফোকলোর বা লোকজ উপাদান

৭ মার্চের ভাষণ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৩০৩
আবদুল খালেক

জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণ : একটি অনুপুঙ্খ পাঠ ৩০৮
শামসুজ্জামান খান

আর দাবায়ে রাখবার পারবা না ৩১৮
সেলিনা হোসেন

৭ মার্চ : অবিনাশী কথামালার জন্মদিন ৩২২
যতীন সরকার

সর্বকালের সেরা বাঙালি বঙ্গবন্ধু ও ৭ মার্চের ভাষণ ৩২৭
মুহম্মদ আবদুল জলিল

৭ মার্চের ভাষণের লোকায়তিক মাত্রা ৩৩৫
মফিদুল হক

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিল ৩৪০
আবুল আহসান চৌধুরী

যে ভাষণে বাংলাদেশ ৩৪৮
গাজী আজিজুর রহমান

বাংলার লোকদর্শন : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের লোকউপাদান ৩৫৬
আবদুল ওয়াহাব

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে লোকজ বৈশিষ্ট্য ৩৮৬
আবুল হাসান চৌধুরী

৭ মার্চের ভাষণে লোকউপাদান : অন্বিষ্ট সেমিনারের অভিজ্ঞতা ৩৯০
জাহারাবী রিপন

সপ্তম অধ্যায় : ভাষাবিজ্ঞান

ভাষার জাদু : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ৩৯৭
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

৭ মার্চের ভাষণ : ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিবেচনার ভূমিকা ৪০৩
সেলু বাসিত

অষ্টম অধ্যায় : সামরিক

৭ মার্চের ভাষণের সামরিক তাৎপর্য ৪২৫
এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার

নবম অধ্যায় : সমাজতত্ত্ব

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন ৪৩৩
আবদুল ওয়াহাব

দশম অধ্যায় : অর্থনীতি

৭ মার্চের ভাষণ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য ৪৯১
মুহম্মদ মাহবুব আলী

বিবিধ

৭ মার্চের ভাষণ : প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য পর্যালোচনা ৫০১
মামুন সিদ্দিকী

পরিশিষ্ট
ক. স্বায়ত্তশাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ছয়দফা দাবিনামা জুন, ১৯৬৬ ৫১৯
খ. স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, পল্টন ময়দান, ঢাকা, ৩ জুন ১৯৭১ ৫২১
গ. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা, ৭ মার্চ, ১৯৭১ ৫২৪

লেখক পরিচিতি ৫২৮

গ্রন্থপঞ্জি ৫৩২

আলোকচিত্র ৫৩৭

নির্ঘণ্ট ৫৪৫

মুখবন্ধ

বাঙালি হাজার বছরের সমৃদ্ধ জাতি। বাঙালি জাতির রয়েছে সমৃদ্ধশালী ভৌগোলিক অঞ্চল। বাঙালি সংস্কৃতি সমন্বয়ধর্মী, গণমুখী, উদার, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিকতাবোধে রঞ্জিত। বাংলার মাটিতেই জন্মেছেন চৈতন্য-লালন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখ বিখ্যাত সমাজবাদী লেখক, কবি-সাহিত্যিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার এবং দেশীয় স্বার্থান্বেষী মহলের কূটচালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক একটি অবাস্তব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত পূর্ব বাংলার মানুষ স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করে। অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত ক্রমশ তীব্রতর হয়। প্রথমেই আঘাত করে বাংলা ভাষার উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে তারা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। এরই প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয় ভাষা শহিদদের রক্তে। এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটে। সৃষ্টি হয় এক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয় চেতনার। এই জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিলো অসামান্য। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন–এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়। যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। তদনুসারে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাঙালি জাতির জনক বলে অভিহিত করা যায়। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই মুক্তিযুদ্ধের ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মধ্যে এমন কতগুলি দিক আছে যা বাঙালিকে বহির্বিশ্বে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলার মানুষ ধর্মের বাহ্যিক আচার-বিচারের চেয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীতে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই এদেশে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা কখনও জনমনে দানা বাঁধতে পারেনি। উনিশ শতকের মরমি সাধক ফকির লালন শাহ্-এর একটি গানে এই উদার মনোভাব চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে ॥

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, মৌলবাদী রক্ষণশীল মোল্লাদের তুলনায় উদারমনা সুফি-দরবেশ, পির-ফকির, আউল-বাউলদের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর হয়েছে। এসব মরমি সাধক তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাবলির জন্য সকল শ্রেণি এবং সম্প্রদায়ের জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে তাঁরা যে ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন সেটা ছিল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ তথা পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য। যেটা বাঙালির মন ও মানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়েছে, সেটি সংঘাত বা বিরোধের ধারা নয়। সেটি হলো বিভিন্ন মতবাদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও সমন্বয়ের ধারা।

উনিশ শ' একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সর্বকালের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলেই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধ আকস্মিকভাবে ঘটেনি। বাঙালির আত্মপরিচয় সম্পর্কে দীর্ঘ আত্মানুসন্ধান, আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনকল্পে সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ একথা ভেবে বিস্মিত হই যে, এই ভূখণ্ড যেটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথমে 'পূর্ববাংলা' এবং পরে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিলো, সেটিকে ১৯৬৯ সালে 'বাংলাদেশ' নামে ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করার দুর্দমনীয় সাহস

দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এদেশের রাজনীতিকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আবর্ত থেকে উদ্ধার করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় প্রবাহিত করার পেছনেও বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অনন্য। মুসলিম লীগকে আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগকে আওয়ামী লীগে রূপান্তর বঙ্গবন্ধুর একক কৃতিত্ব। এদেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর রাজনৈতিক জীবন ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার ধারক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছিলো। বস্তুত এ সময় আমাদের এই অঞ্চলের সর্বস্তরে বাঙালিদের মাধ্যমে অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিলো, যেটা শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ বিগত স্বদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সে আন্দোলন ছিল খণ্ডিত। এর সীমাবদ্ধতা ছিলো এই যে, তখনকার মুসলমান সমাজের বৃহত্তম অংশ নানা কারণে এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। গত কয়েক দশকে এ অঞ্চলের বাঙালি মানস চেতনায় যে অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেমের স্ফূরণ ঘটেছিলো, সেই অনুভূতি ছিলো একটা সামগ্রিক অনুভূতি; যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেটা সম্ভব হয়েছিল।

স্বদেশী যুগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বর্তমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, সেকালের স্বদেশী আমলের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেননি। তাঁদের জাতীয়তাবাদ ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তাঁরা ব্রিটিশ শাসিত ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু আমাদের সময়কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালিরা স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ব্যতীত এ অর্জন সম্ভব হতো না। তিনি সুকৌশলে ধাপে ধাপে আমাদের স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার মধ্যে স্বাধীনতার পূর্বাভাস ছিলো। ১৯৬৯-৭০ এর গণঅভ্যুত্থানে বাঙালির প্রচ্ছন্ন স্বাধীনতার স্পৃহা পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলার জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশবাশীকে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। রক্ত যখন দিয়েছি তখন রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে-এর চেয়ে বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার আহ্বান আর কী হতে পারতো সে সময়? বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ তো তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধ ছিলো দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক তথ্য যে, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে বহুমাত্রিক গবেষণার সূচনা করেছেন আমার স্নেহভাজন ছাত্র গবেষক ড. আবদুল ওয়াহাব। বর্তমান সংকলন তাঁর দীর্ঘদিনের চিন্তার ও পরিশ্রমের ফসল। ইতিমধ্যে তিনি ফোকলোর ও লালন গবেষক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ফোকলোর নিয়ে তার রয়েছে উচ্চতর (পিএইচ.ডি.) ডিগ্রি। তিনি বাঙালি সংস্কৃতির সমন্বয়বাদী, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার গ্রন্থি উন্মোচনে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতির হাজার বছর লালিত ঐতিহ্যিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং চিত্তবৃত্তি ও জৈব-বৈশিষ্ট্যের নানা দিককে উদ্ভাসিত করেছিল। ড. ওয়াহাব তাঁর গবেষণায় এতদ্‌বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো বাংলার অবিসংবাদী রাজনৈতিক রূপকারের জীবনদর্শনের আলোচনা যখন ফোকলোরের বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন পাঠকের নিকট তার স্বাদ অভাবিতপূর্ব। ওয়াহাবের লেখা পাঠে বিষয়টি সহজেই বোধগম্য।

আবদুল ওয়াহাব রচিত *বাংলার লোকদর্শন : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের লোকউপাদান অনুসন্ধান*, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : একটি সমাজতাত্ত্বি অধ্যয়ন এবং *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ফোকলোর ও মানবতার জয়গান* শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ ভাষণটির বহুমাত্রিক গবেষণার দ্বার উন্মোচনে সহায়তা করবে। তাঁর গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য বাঙালি জাতিসত্তা ও বাঙালি সংস্কৃতির মানবিক উপাদানের অর্ন্তনিহিত শক্তির অনুসন্ধান এবং তার জয়গান ঘোষণা। তাঁর আরাধ্য চিন্তা হলো অদূরভবিষ্যতে বাঙালি সমাজ হবে হিংসা-দ্বেষমুক্ত, সাম্যমূলক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিকভাবে অনুসরণীয় উদারনৈতিক মানবিক সমাজ। যে উপাদানগুলি বাঙালি সংস্কৃতিতে হাজার বছর ধরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ড. ওয়াহাব তার গবেষণায় বাংলার লোকায়ত জীবন দর্শনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের মৌল প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের মিল অনুসন্ধানে সদাব্যাপৃত। অধিকন্তু এ গ্রন্থে পরিবেশিত অন্য প্রবন্ধসমূহ থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে বঙ্গবন্ধুর লোকজীবন সম্পৃক্তি ও মানবিকতার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক স্বীয় বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় বাংলার লোকদর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক পট-পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বহু দ্বার উন্মোচিত হবে। গবেষক ওয়াহাব ফোকলোর উপাদান : লোকগীতি, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন থেকে

উদাহরণ নিয়ে জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বজনীন মানবিক চেতনার ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মানবিক চেতনাবোধের সাযুজ্য খুঁজেছেন। লোককবির চিরন্তন উচ্চারণ :

নানা বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ।
জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।।

উদ্ধৃতির মাধ্যমে ওয়াহাব বলতে চান পৃথিবীর বহুবিচিত্র মানুষের রক্ত-মজ্জায় কোনো পাথক্য নেই, মানুষ অবিভাজ্য এক জাতি, তার জন্মের উৎস এক। বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়, বাঙালি সংস্কৃতির গুণকীর্তন ও মানবিকতার জয়গান সম্বলিত এ গ্রন্থে মুদ্রিত বিশ্লেষণধর্মী ভূমিকাটি বাংলাদেশসহ সমগ্র বাংলাভাষাঞ্চলের মানুষের জন্য বিশেষ মূল্যবান। তিনি লোকধর্মের মানবীয় বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানব মহিমারও জয়গান ঘোষণা করেছেন।

৫৭ জন চিন্তক-প্রাবন্ধিক-গবেষকের লেখার সম্মিলনে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর এই বিশাল গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা বাঙালি জাতির জন্য সত্যি গৌরবের। এই শ্রমসাধ্য কাজের জন্য আবদুল ওয়াহাবকে সাধুবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ডিসেম্বর ২০১৩ **সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ**

প্রসঙ্গকথা

আর ক'দিন পরেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ৪২তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হবে। আমরা জাতি হিসেবে এই ৪২টি বছরে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। অনেক বিপর্যয়ও গেছে, ক্ষতিও হয়েছে অনেক। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমরা তাদের বিচার এবং বিচারের রায় কার্যকর করতে দেখেছি। এখন এই ২০১৩ সালে দেখছি যারা স্বাধীনতার চরম বিপক্ষ শক্তি স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সংগঠিত তাদের অপকর্মের অর্থাৎ তাদের মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া। আবার আশা জাগানিয়া গান ধরেছেন, দেখছি ঢাকার মধ্যস্থলে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের গণজাগরণ। একেবারে নতুন এ অধ্যায়, একেবারে অভিনব, বিস্ময়কর—শিশু-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণি ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, ঘৃণায় ধিক্কার দিচ্ছে। তারা মুহুর্মুহ জয়বাংলা বলে ধ্বনি দিচ্ছে। এটা সুস্পষ্টভাবে বাঙালিত্বের তথা বাঙালি জাতিসত্তার বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি সংস্কৃতির অনন্য-মহিমা, মানবিকতাপূর্ণ শক্তিমত্তা ও সাহসের পরিচয় তারা প্রকাশ করছে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো; যেন কোনো শক্তিই তাদের বাধা হতে পারে না, ঠিক যেমনটি দেখা দিয়েছিল ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণের প্রাক্কালে। ১৯৭১ আর ২০১৩-এর যেন ঘটেছে অনন্য মেলবন্ধন। সেদিন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার আহ্বান রেখেছিলেন, সেই সাধনা, সেই সংগ্রাম বাঙালি জীবনপণ করে করেছে, আজও করছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী ভিত প্রয়োজনসিদ্ধ ভৌগোলিক অঞ্চল, বিভিন্ন জাতিসত্তাগত সংস্কৃতির বিবিধতার মর্ম, ব্যাকরণ সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা, মানবিকতা ও সমন্বয়বাদী বাঙালি সংস্কৃতি, মহামনীষী লালন, রবীন্দ্রনাথ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নজরুল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মানবিকতায়পূর্ণ অনন্যবৈশিষ্ট্যরঞ্জিত বাংলার লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোর । এই ভিত নড়ানো সাধ্যাতীত। একদিন

শাহবাগের প্রজন্ম চত্বর বা গণজাগরণ মঞ্চ হয়তো থাকবে না, কিন্তু '৭১ সালের পর জয়বাংলা শ্লোগান আবার আকাশ কাঁপিয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলো তাঁর রেশ চলবে প্রজন্মান্তর। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রবহমান। একাত্তরের বিজয়ের মত অদূরভবিষ্যতে এ ফসলও আমাদের ঘরে উঠবে এ কথা হলফ করে বলা চলে।

৭ মার্চের ভাষণটির বহুমাত্রিক অধ্যয়ন নিয়ে এই সংকলনটি আমরা সাজিয়েছি। ৫৭ জন পণ্ডিত-লেখক-গবেষক এই প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। এই সমগ্র রচনার উপর *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ফোকলোর ও মানবতার জয়গান* শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছি—সে আলোচনায় এ গ্রন্থে সংকলিত প্রায় অধিকাংশ লেখাই স্থান পেয়েছে। এই মূল্যায়নটি করেছি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি মতো, পাঠকের বিবেচনায় এটা আরো নানা আঙ্গিকে হতে পারে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন লোকধর্মসিক্ত, মানবিকতার উপাদানে সমৃদ্ধ উদারনৈতিক রাষ্ট্রনেতা। আমরা যে বিশ্বের সব থেকে সমৃদ্ধ জাতি, আমাদের সংস্কৃতি যে মানবিকতায় কানায় কানায় পূর্ণ এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটিও যে মানবিকতার আকর সেই কথাটি আমি বর্তমান গবেষণায় বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৮-এ *'বাংলার লোকদর্শন : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে লোকউপাদান অনুসন্ধান'* শীর্ষক মূল প্রবন্ধটি আমি উপস্থাপন করেছিলাম বাংলা একাডেমীর আলোচনা অনুষ্ঠানে। কিঞ্চিত পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে প্রবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে উপস্থাপন করি ২০১০ সালের ৭ ডিসেম্বর। আজকের সংকলনটি এরই ধারাবাহিক ভাবনা-চিন্তার ফসল। জাতির কাছে নিবেদন এই ভাষণটি নিয়ে যেন আরো বেশি ভাবনা-চিন্তা করি এবং অবিলম্বে আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা শুরু করি। কেননা ৭ মার্চের ভাষণটি আমাদের স্বাধীনতার মূল সনদ। এই গুরুদায়িত্বটি পালন করতে পারে বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার গঠন করতে পারেন নতুন কোনো গবেষণা সেল।

সংকলনটি উৎসর্গ করেছি পরমপ্রিয় বঙ্গমাতা, বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু জীবনসঙ্গী ও প্রিয়তম সহধর্মিনী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে, যিনি আমাদের হৃদয়ে চির-অমর, চির-ভাস্বর। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংগ্রামের ইতিহাসে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ইতিহাসের ধারাকে সফলতার পথে এগিয়ে নেয়। তিনি ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন বছর বয়সে মামাত ভাই শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পড়াশুনার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক কারণে তা সম্ভব হয়নি। তিনি পরবর্তীকালে প্রচুর পড়াশুনা করেন এবং মনেপ্রাণে একজন আদর্শ বাঙালি নারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, শান্ত, অসীম ধৈর্যশীল ও সাহসী। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে

সন্তানদের গড়ে তোলেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে পাশে থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করেন। ১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয়দফা দাবি পেশ করলে বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ হন। এই ক্রান্তিকালে শেখ ফজিলাতুন্নেছা শক্ত হাতে দলের হাল ধরেন। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাবকে জীবননাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে তিনি আজন্ম বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের প্রতি অকৃত্রিম সমর্থন দান করেন। যিনি বাংলার মানুষকে জীবনের সবটুকু ভালোবাসা উজার করে দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুর মতোই যিনি জীবন দিয়ে তার প্রমাণ রেখে গেছেন। এই প্রাণপ্রিয় মায়ের কাছে আমরা গভীরভাবে ঋণী। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। কামনা করি তাঁর স্মৃতি চিরজাগ্রত থাক।

পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করতে সহযোগিতা দিয়েছেন আমার স্ত্রী জেবুন নাহার। তিনি সংসার গড়ার ক্ষেত্রে যেমন নিপুণ কারিগর তেমনি আমার গবেষণা কাজেও পরম সহযোগী। তিনি একটি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। ছেলে আবু মোহাম্মদ জুবেরি জ্যোতি, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল (Civil Engineer) বিভাগের প্রভাষক, মেয়ে নুজহাত জাহান জয়িতা শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। ওরাও আমাকে প্রভূত পরিমাণ সহযোগিতা করেছে এ বইটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে।

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা— এম. মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে। আরো স্মরণ করি স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী ত্রিশ লক্ষ মার্নুষ ও সম্ভ্রম হারানো তিন লক্ষ মা-বোনকে।

স্মরণ করি পরম শ্রদ্ধেয় পিতা এম. আজিজুল হক সরকারকে—যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সমবয়সী ও বঙ্গবন্ধু অন্তঃপ্রাণ। ৮০/৯০ বছর বয়সেও যিনি মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন (প্রয়াত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)। যাঁর অন্তর ছিল লোকসাহিত্যের বিচিত্র উপাদানে ভরপুর। হাজার রকমের লোকগল্প, লোকগীতি, শাস্ত্র-কিচ্ছা তাঁর জানা ছিল, লালন ও পাগলা কানাই-এর শতাধিক গান তাঁর মুখস্ত ছিল। স্মরণ করি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি থানার তারাইল গ্রাম নিবাসী বীরমুক্তিযোদ্ধা শ্বশুর মহাশয় এম. আকমল শরীফকে। যিনি বঙ্গবন্ধুর থেকে বয়সে দু'বছরের ছোট ছিলেন (প্রয়াত ৩০ জুন ২০১১)। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ছোটভাই-বড়ভাই।

বইটির মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এ.এফ.সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ। তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বন্ধুপ্রতিম ড. সেলু বাসিত, ড. জালাল ফিরোজ, অনুজপ্রতিম ড. কুতুব আজাদ, সাইমন

জাকারিয়া, পিয়াস মজিদ ও মামুন সিদ্দিকীকে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আশরাফুল আলম মিলন ও তাহমিনা আক্তার সাথীকে প্রুফ সংশোধনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ চলছে। আগ্রহী গবেষকগণকে লেখা দেয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে, যদি পাঠকগণ এ বই পাঠে উপকৃত হন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আমরা অদূরভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম স্বপ্ন সাম্যমূলক, দারিদ্র্যমুক্ত সুখি-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ব এই প্রত্যয় রাখছি। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি চিরদিন অম্লান থাক।

ড. আবদুল ওয়াহাব

ডিসেম্বর ২০১৩

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ফোকলোর ও মানবতার জয়গান

আবদুল ওয়াহাব

পটভূমি

> ‘একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।
>
> **(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)**[১]

বঙ্গবন্ধুর লেখা দিনলিপির পাতা থেকে এই উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে। যেটি লেখা ছিল ইংরেজি ভাষায়। আমরা বর্তমান গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তাদর্শ নিয়ে যা বলতে চাই বা লিখতে চাই, উদ্ধৃত অংশটি তার সারকথা বলে গণ্য হতে পারে। সেটা বিচারের ভার পাঠকের।

বাংলার ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ একটি মোহনীয় ঐতিহাসিক দিন। বাংলার মানুষ হাজার বছর ধরে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল কাঙ্ক্ষিত এই দিনটির জন্য। তবে এই মহান দিনটি হঠাৎ করে আসেনি বা কোনো দৈব ঘটনায়ও গজিয়ে উঠেনি। পরোক্ষে এর প্রস্তুতি চলছিল সহস্র বছর ধরে। আর প্রত্যক্ষভাবে এর প্রস্তুতি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার স্বৈরশাসনকাল ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১, ২৪ বছর। এই ২৪ বছর ধরে বাঙালি সংগ্রাম করছিল তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের জন্য। সংগ্রামে নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি

১৯২০ সালে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সচ্ছল স্বনামধন্য কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২] প্রাথমিক শিক্ষা শুরু গ্রামীণ পাঠশালায়; গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪২), কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই. এ এবং বি.এ পাশ করেন। তিনি ছাত্র অবস্থায়ই জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। পরিচিত হন জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতার সঙ্গে। তিনি ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর (১৯৪৭ সাল) কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে ল'ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়। কিন্তু কারাগার বা কোনো ভয় ভীতিই তাঁকে দমাতে পারেনি। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৫৩ সালে। ১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এই ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। একই বছর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন (১মার্চ)। ১৯৬৮ সালে তাঁকে প্রধান আসামি করে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সূচনা করে পাকিস্তানি সামরিক সরকার (১৯শে জুন)। গণ-অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক বিজয় অর্জন করে। ৩০০ আসনের মধ্যে তাঁর দল ১৬০টি আসন লাভ করে। দলের নেতা হিসেবে তাঁরই সরকার গঠনের কথা। সামরিক সরকার তাঁকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। প্রতিবাদে ৩ মার্চ ১৯৭১ থেকে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

বঙ্গবন্ধু উপাধিটি তাঁর অর্জিত। নেতৃত্বের ঐন্দ্রজালিক (কারিশমা) গুণ, কর্মনিষ্ঠা, সততা-সাহসিকতা, দেশপ্রেম এবং বাঙালির প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা ও মমতাবোধের স্বীকৃতিতে তিনি বঙ্গবন্ধু অভিধাটি প্রাপ্ত হন। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করে। এই সভায় অন্যূন দশলক্ষ জনতার উপস্থিতিতে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভি. পি এবং ঐ সভার সভাপতি তোফায়েল আহমদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই প্রতীকী ঘোষণা একটি সংগ্রামী ও সাহসী জীবনের প্রতি দেশবাসীর স্বীকৃতি।

সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে টুঙ্গিপাড়ার ঐ সাহসী যুবক শেখ মুজিবুর রহমান পরিণত হন বাঙালির অবিসংবাদী জাতীয় নেতায়। তাঁর মূল হাতিয়ার ছিল জনগণের ভালোবাসা এবং বাংলার লোকসংস্কৃতিজাত আত্মবিশ্বাস, এটা তিনি অর্জন করেছিলেন বাংলার কৃষক, তাঁর উদারনৈতিক পরিবার,

সমন্বয়বাদী সমাজ এবং বাউল-জারি-সারি গানের আবহ থেকে। মানবতাবাদেপূর্ণ বাংলার অনন্যবৈশিষ্ট্যরঞ্জিত ফোকলোরের দর্শন তাঁর মনের গহিনে সর্বদা গাঁথা ছিল। তাই ২৪ বছর ধরে তাঁর নেতৃত্বে বাংলার আপামর জনসাধারণ ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোত্র নির্বিশেষে এক কাতারে শামিল হয়েছিল।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির বিচ্ছিন্ন হবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেকথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন; আর এও বুঝেছিলেন যে, সে পথে এগোতে হবে ধীরে ধীরে, তার আগে স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ১৯৭১-এর ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স মাঠ যেন জনসমুদ্র। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়ছে। বাতাসে উড়ছে অসংখ্য পতাকা, বাংলার মানচিত্র আঁকা লাল সবুজের পতাকা, শ্লোগানের সঙ্গে আকাশের দিকে উত্থিত হচ্ছে বাঙালির লোক-সংগ্রামের প্রতীক অসংখ্য বাঁশের লাঠি। মঞ্চে মাইক থেকে শ্লোগান দেয়া হচ্ছে : জয় বাংলা, আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম, আমার দেশ তোমার দেশ-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, গণপরিষদ না রাজপথ—রাজপথ রাজপথ, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ঘরে ঘরে দুর্গ গড় বাংলাদেশ স্বাধীন কর। বিকেল ৩.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন। বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। আরো বলেন : 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'।

এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর 'ভবিষ্যতের বাঙালী' (১৯৪৩) গ্রন্থে বলেছিলেন, 'বাঙালী ভবিষ্যতের পূর্ণতর রাজনীতির জন্য প্রতীক্ষা করছে, ... বাঙালি এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন—ভগীরথের মত এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন।' মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে স্বপ্নদ্রষ্টা এস. ওয়াজেদ আলির সেই স্বপ্ন পূর্ণ করেছেন।

আমরা এই গ্রন্থে বাংলার সেই সাহসী সন্তান অবিসংবাদী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শন নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেছি। আমাদের গবেষণার মূল বিষয় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ১৯ মিনিটের সেই অনন্য ঐতিহাসিক ভাষণ।

১

বঙ্গবন্ধু ছিলেন গভীরভাবে লোকধর্মসিক্ত। গভীর সঙ্কটকালেও তিনি মানবিক। তার প্রমাণ ৭ মার্চের ভাষণের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। কোনো লোকগোষ্ঠীর ফোকলোরজাত চিন্তাই লোকধর্মের উৎস। ফোকলোর, মানবতাবাদ, লোকধর্ম ও বঙ্গবন্ধু এই চারটি প্রত্যয় বা প্রপঞ্চকে আমরা এক কাতারে দাঁড় করিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। প্রথমে সদ্য প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে বিধৃত তাঁর মানববিকতার অঙ্গিকার ও মনোভঙ্গি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

আত্মজীবনীটি পাঠ করলে দেখা যায় এটা মানবিকতার উপাদানে ভরপুর। এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার কথা এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার অঙ্গিকার। তিনি রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শতবার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি পাকিস্তানের নেতা-কর্মীদের সঙ্গেও আন্তরিক সহমর্মিতা নিয়ে কাজ করেছেন যাতে তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং অনেকেই ধীরে ধীরে তাঁর মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বস্তুত তাঁর রাজনীতি করার মূল লক্ষ বাংলার দুঃখী মানুষের মুক্তি। এই আত্মজীবনীতে যে সময়কালের (১৯৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত) বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে জীবনের কী দুঃসহ ঝুঁকি নিয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিরন্তর সমান সততার সঙ্গে সামনের কাতারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ঐটুকু জীবনেই রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি অর্জন করেছেন পর্বত প্রমাণ অভিজ্ঞতা। ফোকলোরে একটি কথা আছে 'কাটার মুখ অঙ্কুরেই চেনা যায়'। তিনি যে বঙ্গবন্ধু হবেন, পরাধীন-দুঃখী বাঙালির মুক্তির ত্রাতা হবেন, জাতির পিতা হবেন তা ঐ ক'বছরের রাজনীতি চর্চা থেকে বোঝা যায় বই কি। এ গ্রন্থে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় খুলনা ও বরিশালে মৌসুমী ধানকাটার দিনমজুর 'দাওয়াল' ও 'জিন্নাহ ফান্ড' নামের সরকারি ফান্ড বিষয়ে : 'ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লোক, খুলনা ও বরিশালে ধান কাটার মরশুমে দল বেঁধে দিনমজুর 'দাওয়াল' হিসেবে যেত। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত। পরিবর্তে একটা অংশ পেত। এদের 'দাওয়াল' বল হত। এই দাওয়ালদের দুরাবস্থার একটি ঘটনার কথা তিনি নিটোলভাবে, আন্তরিক সহানুভূতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি অক্লান্তভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

জিন্নাহ ফান্ডে টাকা জমানোর ব্যাপারে জনসাধারণের উপর এক মহকুমা অফিসারের জুলুমের তথ্যচিত্র তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন : 'চারিদিকে জোরজুলুম শুরু হয়েছে। চৌকিদার দফাদার নেমে পড়েছে। কারও কারও বদনা, থালা, ঘটিবাটি কেড়ে আনা হচ্ছে। এক ত্রাসের রাজত্ব।' বাংলার গরীব-দুঃখী, মানুষের উপর সরকারি প্রশাসনের অত্যাচারের এমন চিত্র; যার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন জীবনকে বাজি রেখে।[৩] শেখ হাসিনা এ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

> 'দেশের জন্য মানুষের জন্য, একজন মানুষ কীভাবে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন, জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে পারেন তা জানা যায়। জীবনের সুখ-স্বস্তি, আরাম, আয়েশ, মোহ, ধনদৌলত সবকিছু ত্যাগ করার এক মহান ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু সাধারণ গরিব দুঃখী মানুষের কল্যাণ চেয়ে কীভাবে তিনি নিজের সব চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়েছেন তা একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যাবে'।[৪]

এটা ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতিজাত উদারতা থেকেই সম্ভব। এবার ফোকলোর বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। ফোকলোর সর্বমানবিক একটি প্রত্যয়। ফোকলোরের মর্মমূলে আছে সামষ্টিকতা ও মঙ্গলচিন্তা। সামষ্টিক চিন্তা থেকে ফোকলোরের উপাদান গঠিত হয়। অর্থাৎ লোকসাধারণের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও

মানবিক সংবেদনশীলতার প্রকাশ ফোকলোর। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এ সত্য ফোকলোরের মর্মবাণীরূপে স্বীকৃত। ফোকলোরের সব উপাদানই মানবতাবাদী সত্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে।[৫] আমাদের এক কবি বলেছেন : নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ। জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত॥

প্রকৃতপক্ষে ফোকলোর হলো মানুষের সামাজিক জীবন, ধ্যান-ধারণা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাস, বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, ঘর-গৃহস্থালি, সর্বোপরি মানুষের সামগ্রিক জীবনযাপন ও জীবন-সংগ্রামের ক্রমাগত মানবিক সংবেদনশীলতার বাঙ্ময় প্রকাশ। ফোকলোরের দুই রূপ, বস্তুগত ও অবস্তুগত। বস্তুগত উপাদান হলো লোকশিল্পকলা, আর অবস্তুগত উপাদান লোকসাহিত্য। ফোকলোরের চেতনা ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিকতাবাদী। পৃথিবীর সব মানুষ কীভাবে মিলেমিশে চলতে পারে, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-দ্বেষ থেকে কীভাবে মানুষ মুক্ত হতে পারে, ধর্মীয় বিভেদ থেকে মানুষ কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে—ফোকলোর এই পথের অনুসন্ধানী। উদার জ্ঞানতত্ত্ব ও মানবিকতার জয়গানের মাধ্যমে বাংলার কবি-সাহিত্যিক-সন্তগণ ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় মানবতার পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন, গান বেঁধেছেন, গেয়েছেন :

১. শুন হে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥ (চণ্ডীদাস)
২. আল্লা-এ বুলিছে 'মক্রি যে দেশে যে ভাষ
সে দেশে সে ভাষে কৈলু রসুল প্রকাশ ॥ (সৈয়দ সুলতান)
৩. য়াল্লা (আল্লাহ)-খোদা-গোঁসাই/সকল জান (তাঁর) নাম
সর্বগুণে নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম (আবদুল হাকিম)
৪. যার যার ধর্ম সেই করে তোমার বলা অকারণ (লালন)
৫. একটি গুরু জগৎ জোড়া, এক পিতার ছেলে মোরা
যার যেটি ভজনের ধারা আপত্তি কি আছে তার? (রমেশ শীল)
৬. আল্লা হরি ভজন, পূজন এ সকল মানুষের সৃজন (লালন)
৭. যত মত তত পথ (শ্রীরামকৃষ্ণ)
৮. শাস্ত্র-ধর্ম-তীর্থ সার, সকলি মানুষের তৈয়ার
জানিলে অমণি তাহার, অন্ধঠুলি যায় খুলে" (দদ্দু শাহ)
৯. হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি,
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি। (রবীন্দ্রনাথ)
১০. মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। (রবীন্দ্রনাথ)
১১. মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো (নজরুল)

এসব কাব্য-বাণীতে স্পষ্টতই সমন্বয়ধর্মী মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে যা ধর্মীয় কলহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখলাম লালনের কাছে মানুষের জাত-ধর্ম সম্পূর্ণতই অস্বীকৃত। মহিয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত বলেন, আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের

আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর প্রেরিত কিনা তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেনা। আমরা যতদূর জানি তিনি রক্ষণশীল, সম্ভ্রান মুসলিম গার্হস্থ্য পরিবারের সন্তান। যাদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু-ফারসি। সেই পরিবারের মেয়েদের বাংলা-ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ। এই রক্ষণশীল ও ধার্মিকতার আবহে বড় হয়ে কি করে পরম ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে পেরেছেন সেটা গবেষকদের প্রশ্ন। কিন্তু না আমরা যদি বাঙালি সংস্কৃতি থেকে পাঠ নেই তাহলে এই ভ্রম অবশ্যই কেটে যাবে। আমরা ইতিপূর্বে লালনের বাণী উদ্ধৃতি করেছি। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ, সমাজচিন্তক ও সংস্কারকের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ১৯৭২ সালে রচিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গটিও এখানে উল্লেখ করতে পারি। এটা একটা বিপ্লবের ফসল বটে; কিন্তু তা বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছর লালিত চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। রোকেয়া 'ঈদ সম্মিলন' প্রবন্ধে যখন বলেন, 'এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিনে হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দূরাশা? সমদয় বাঙালি একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি?' এটা বাঙারির চিরন্তন ভাবনা। নানাবরণ-গাভিরে ভাই একইবরণ দুধ, জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত'—এই চিরন্তন বাণীর মতো, জগতের সকল মানুষ যেমন এক উৎসজাত, তেমনি অবশ্যই সকল বাঙালি এক। 'হিন্দু মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি', ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯), এই বাণী কেবল যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শাণিত করেছে তা নয়, এ বাণী বাঙালি সংস্কৃতির উদারতা ও পরমত-সহিষ্ণুতা শতভাগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হাজার বছর ধরে শাসিত বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান রাজাদের রাজনৈতিক আদর্শ বহুক্ষেত্রে ফোকলোরের উপাদানে সমৃদ্ধ। এসব শাসনামল নিয়ে অনুপুঙ্খ গবেষণা করলে একটি অভিন্ন মানবিক সংস্কৃতির সন্ধান মিলবে। আমরা জানি, বাংলার প্রায় তিন হাজার বছরের শাসনামলের শাসকদের মধ্যে নানাভাবে অহিংসা, মানবপ্রেম ও মানবতাবাদের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। এসব মানবিক উপাদান যুগিয়েছে নানা প্রকার নৃজাতির সম্মিলন-সংশ্লেষ, নদীমাতৃকতা, সর্বোপরি বাংলার ভূগোল ও জলবায়ু।

ফোকলোরের উপাদানসমূহ সর্বদাই একটা নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার পথ ধরে উদ্‌গত হয়। একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ধরে তার আঙ্গিক গড়ে ওঠে ও ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয়।[৬] কাল থেকে কালান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে জীবনসংগ্রাম তথা সামাজিক অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে নিরন্তর ফোকলোরের উপাদান সুগঠিত হয় ও বিস্তার লাভ করে।

ভ্লাদিমির জে প্রপ বলেছেন, ক্রিয়াশীলতাই (Function) ফোকলোরের মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি। সি. লেভি-স্ট্রস নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পুরাকাহিনির মোটিভের স্বরূপ

উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, আমরা সচরাচর যে ধারণা করে থাকি আদিম মানুষেরা বোকা ছিল, আসলে তা সঠিক নয়, বরং তারা যথেষ্ট সচেতন ও প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিল। তারা যেসব পুরাকাহিনি বা মিথের সৃষ্টি করেছে এসব পুরাকাহিনি বা মিথের বর্ণনার মধ্য দিয়ে সর্বদাই একটা সত্যকেই আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে।

বিশ্বখ্যাত মিথতাত্ত্বিক যুক্তরাষ্ট্রের জোসেফ ক্যাম্পবেল (১৯০৬-১৯৮৭) বলতে চান মিথ চর্চার উদ্দেশ্য হলো মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল এবং সামঞ্জস্য আবিষ্কার করা। তাঁর মতে মিথ মানুষের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে। স্বার্থহীনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করা বীরের কাজ। ক্যাম্পবেল বলেন বীর চরিত্রের সৃষ্টিতে অনুকূল সমকালীন প্রতিবেশ আবশ্যক। যন্ত্র-সভ্যতার যুগে বীরের জন্ম হচ্ছে না বলে তিনি আক্ষেপ করেন। ম্যাকসিম গোর্কিও ১৯৩৫ সালে এক সাহিত্য সম্মেলন এই আক্ষেপ করেছিলেন। এশিয়া, ইউরোপের পুরাণে কথিত বীর একিউলিস, হেক্টর, প্রমিথিউস, হারকিউলিস, কর্ণ, ভীম, অর্জুন, লক্ষ্মণ, রবিনহুড, সোহরাব-রুস্তম এ সব অকুতভয় বীরের কাহিনী নিঃসন্দেহে ব্যক্তি-মানুষকে তথা সমাজমনকে প্রেরণা যোগায়। জেনে রাখা আবশ্যক যে এসব উপাদান ফোক থেকে সংকলিত। আমরা ক্যাম্পবেল, গোর্কি প্রমুখের সঙ্গে কিঞ্চিৎ দ্বিমত পোষণ করে বলি; এসব পৌরাণিক বীরের প্রতি-তুলনায় বলা সঙ্গত যে একালেও বীড়ের জন্ম হচ্ছে—লেনিন, মাও সেতুং, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, চেগুয়েভারা, মহাত্মা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, নেলসন্স ম্যান্ডেলা প্রমুখ তার উদাহরণ। হাজার বছর পরে এরাই একদিন লোকবীরের মর্যাদায় ভূষিত হবেন—সে কথা হলফ করে বলা চলে। হাজার বছর পরে তাঁরা হবেন মিথ।

জোসেফ ক্যাম্পবেল বলতে চান যে, বিশ্বের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর পুরাণ কাহিনির মূল সত্য বৈশাদৃশ্য নয়, মিল। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নোয়াম চমস্কি ১৯৫৫ সালে জেনারেটিভ গ্রামার বা প্রজননশীল ব্যাকরণের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব ভাষার কাঠামোগত সাদৃশ্য দেখে বলেন যে, বিশ্বের সব ভাষার ব্যাকরণই এক; সব ভাষার কাঠামোতেই এক আশ্চর্য ঐক্য রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতির অধিকাংশ উপাদানে আঙ্গিক গঠনগত দিক থেকে ভাষা-কাঠামোর মতোই আন্তর্জাতিকতা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ লোককাহিনির মোটিভ, ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে, রূপতত্ত্ব ও আঙ্গিকগত দিক থেকে পৃথিবীর সব দেশের সব কাহিনি প্রায় একই চরিত্রের অধিকারী। এটা প্রমাণের জন্য কয়েকটি প্রবাদের কথা উল্লেখ করা হলো :

১. মৌনং সম্মতি লক্ষণম অর্থাৎ মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ
ইংরেজিতে ঠিক একই বাক্যগত কাঠামোতে পাই—'Silence gives consent'.

আমাদের যতদূর জানা সংস্কৃত প্রবাদটি ইংরেজি প্রবাদ থেকে আসে নি, আবার ইংরেজি প্রবাদটিও সংস্কৃত থেকে অভিবাসন করে নি। অথচ বাক্যের কাঠামোগত

ও মর্মার্থের দিক থেকে দুটি প্রবাদ একই ঐকতান প্রকাশ করছে। তাহলে কথাটি এই দাঁড়িয়েছে যে, লোকসংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে আঙ্গিকতা ও গঠনশৈলী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনুরূপ আর একটি বাংলা ও ইংরেজি প্রবাদের উল্লেখ করা যায় :

২. খালি পাতিল বাজে বেশি[৭]
Little pitchers have big sound.

একটি খনার বচন ও ইংরেজি প্রবাদেও আমরা একই দ্যোতনা লক্ষ করি :

৩. যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, April showers bring may Flowers.

৪. বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে এটি প্রবাদ প্রচলিত আছে তা হলো :
নিত্তি গাসে মুড়া খাও, তিন মাথাওয়ালার কাছে বুদ্ধি নাও—

একই কথার আংশিক পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই আমেরিকার একটি বিমান সংস্থা PANAM-এর বিজ্ঞাপনে, যেখানে লেখা আছে, 'you can't liseant the experience'. কি অদ্ভুত সাদৃশ্য এই দুই কথনে, হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুটি ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সংস্কৃতিতে একই কথা, একই সুর, একই বাণী। তবে বাংলা প্রবাদটির দু'টি অংশ। তিন মাথা বলতে বোঝানো হয়েছে অনেক প্রবীণ, অনেক বৃদ্ধ, অনেক অভিজ্ঞ। মৃতপথযাত্রী পিতা, সন্তানদের এই উপদেশ দিয়ে যান। কিন্তু প্রথম অংশের অর্থ বুঝে তারা যখন বড় বড় রুই-কাতলা কিনে প্রতিদিন মাথা ভক্ষণ করছে; তখন তারা অল্প দিনেই নিঃসহ হতে শুরু করে। তখন তিন মাথাওয়ালার কাছে গেলে তিনি পরামর্শ দেন ছোট্ট মাছ খেতে যা অল্প দামে পাওয়া যায় এবং প্রতি গ্রাসেই মুড়ো খাওয়া হয়।

আমরা পরস্পর প্রায় একই অর্থবোধক আরো কয়েকটি বাংলা ও বিদেশি প্রবাদের উদাহরণ দিতে পারি :

১. বাংলা প্রবাদ : কানা খোঁড়া একগুণ বাড়া,
দিনেমার প্রবাদ : ক্ষুদে কুকুর, শিং ছাড়া গরু আর বাউনে মানুষ, ইহারা প্রায় অহংকারী।

২. বাংলা প্রবাদ : যত গর্জে তত বর্ষে না।
ওলন্দাজি প্রবাদ : গর্জনকারী বিড়াল অত্যল্প ইন্দুর ধরে।

৩. বাংলা প্রবাদ : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
ইতালি প্রবাদ : শত্রু পালালে সকলেই সাহসী।[৮]

৪. বাংলা প্রবাদ : বোবার শত্রু নাই।
পর্তুগিজ প্রবাদ : মুখাবরোধ করাতেই নির্বিরোধে আছি।

এরকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

সমাজ অভিজ্ঞতার জারক রসে জারিত প্রতিটি প্রবাদ। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে প্রবাদের উৎপত্তি। যার প্রকাশ স্বল্পতম বাক্যে। তাই প্রবাদকে আমরা সমাজ জীবনের দর্পণ বলতে পারি।

বিশ্বের হাজার রকমের লোককথা বিশ্লেষণ করেও আমরা জানতে পারি কীভাবে একদেশের লোককথার সঙ্গে অন্যদেশের লোককথার মর্মবস্তু প্রায়ই এক। সুদূর অতীতকালের ইতিহাস অনুসন্ধান করেও সেই দুই দেশের মধ্যে কোনো সম্পর্কের ইতিবৃত্ত জানা যায় না, তবুও লোককথাগুলোর মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল দেখতে পাওয়া যায়। অনেক গবেষণার পর সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত এসেছেন যে, লোককথার মাইগ্রেশন অবশ্যই হয়েছে—যেমন আফ্রিকার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ মাইগ্রেশন ছাড়া ব্যাপক অর্থে লোককথার যে সাদৃশ্য দেখা যায় তা লোকসমাজে তাদের জীবনসংগ্রামের নির্যাস হিসেবে নিরপেক্ষভাবেই গড়ে উঠে। অর্থাৎ জীবনসংগ্রামের ধরন পৃথিবীর প্রায় সব ভৌগোলিক অঞ্চলেই এক ও অভিন্ন, আর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষারই ফল ঐ সব লোককথা।[৯]

আমরা পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের উদ্ভাবিত একটি লোককথা 'কার ফসল কে ঘরে তোলে', নিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারি। আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যেও লোককথাটি প্রচলিত। গল্পটির সারকথা এ রকম : কাঠবেড়াল পরিশ্রমি-কর্মঠ এক গরিব কৃষক। সে এক ফালি জমিতে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু সে আলপথ তৈরি করনি। ফসল পেকে উঠেছে। তা দেখে চতুর মাকড়সা একদিন সেই ফসল কাটছে। কাঠবেড়াল তা দেখে বলছে, অনেক শ্রম দিয়ে এ ফসল আমি ফলিয়েছি। মাকড়সা চোখ রাঙিয়ে বলছে, মিথ্যে কথা, তুমি যদি ফসল ফলাবে তোমার আলপথ কোথায়? ইতিমধ্যে মাকড়সা আলপথ তৈরি করেছে। কাঠবেড়াল তখন সর্দার পশুদের স্মরণাপন্ন হয়েছে। আলপথ তৈরি না করার জন্য বিচারে সে হেরে গেছে। মাকড়সা যখন ফসল কেটে সারি বেঁধে ঘরে তুলছিল ঐসময় এসেছে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ফলে ফসল পথে ফেলেই তারা গাছের কোঠরে ঢুকে পড়েছে। বৃষ্টি থামলে মাকড়সারা যখন ফসল নিতে আসে তখন দেখে বিরাট বাজপাখি সব ফসল আগলে রেখেছে। মাকড়সা বাজপাখির কাছে ফসলে তার ব্যক্তিমালিকানা দাবি করলে বাজপাখি বলছে, 'কে কবে শুনেছে নিজের জমির ফসল কেউ পথে ফেলে রেখে যায়? বাজপাখি সমস্ত ফসল একত্র করে ডানা মেলে আকাশে উড়াল দিয়েছে। গল্পের মর্মকথা : কার ফসল কে ঘরে তোলে।

এ গল্পে সমাজের একটি নির্মম সত্য রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে গ্রামে, পাড়া-মহল্লায় কিছু মধ্যশ্রেণির লোক থাকে যারা সমাজের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, পেশিশক্তি কিংবা কৌশলে কূটচালে পরের শ্রমে ভাগ বসায়। এটা বিশ্বের সর্বত্র প্রায় একই দৃশ্য। যে কৃষক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ফসল ফলায়, সে ফসল তার ঘরে উঠে না। কাঠবেড়াল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলিয়েছে সে হয়েছে বঞ্চিত। এভাবেই বিশ্বজুড়ে দুর্বলের কাছ থেকে সবলেরা সম্পদ লুট করে। বিশ্বের প্রতিটি সমাজের এই চিত্র। যুগে যুগে

লোককবিরা এভাবে রূপকের আড়ালে জীবন সংগ্রামের নির্মম কাহিনী বাণীবদ্ধ করেছেন।

আমরা এ বিষয়ে বাংলার একটি বিখ্যাত লোকগীতি যেটা ভাওয়াইয়া গান নামে খ্যাত 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' এর উদাহরণ দিতে পারি। বিষয় : ফান্দি, চকোয়া পাখি, ধরলা নদী এবং বগা-বগী। এ গানে কবির বেদনাময় অনুভূতির প্রকাশ চিত্তাকর্ষক। বগা-বগী, পুটি মাছ, ফাঁন্দি এ সবই যেন কেবল প্রতীকমাত্র। বাংলার বঞ্চিত, শোষিত কৃষক গানটি গাইত হৃদয় নিংরানো দরদ দিয়ে; কারণ এ গানের বক্তব্যে রয়েছে তাদের দুঃখের-বেদনার-বঞ্চনার কথা। লোককবি বগা-বগীকে প্রতীক হিসেবে নিয়ে এ গানে নিজের জীবন চিত্রই তুলে ধরেছেন। সামন্ত সমাজের শোষণের নির্মম কাহিনিকে কবি বাণীবদ্ধ করেছেন। শোষণের এ চিত্র-চরিত্র বিশ্বজনীন। সারা বিশ্বের হাজারো লোকগীতিতে এ দৃশ্য অবলোকন করা যায়।

অতি চালকীর গলায় দঁড়ি এবং অহংকারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। বাংলার দু'টি লোকগল্প কাক ও চড়ুই পাখি এবং রাজা বনাম টুনটুনি পাখি গল্প দু'টির মর্মমূলে শ্রেণিদ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। একদা কাক ও চড়ুই এর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। কাক ধূর্ত আর চড়ুই সাদা সিধে, সরল মনের, আকার আকৃতিতেও ছোট। কাকের বাসনা কি করে চড়ুইয়ের মাংস খাওয়া যায়। একদিন কাকের প্রস্তাব মতো তাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়; যার শর্ত গৃহস্থ্যের উঠোনে শুকাতে দেয়া মরিচ ও শস্যদানার কাক খাবে মরিচ আর চড়ুই খাবে শস্যদানা, যে আগে শেষ করবে সে বিজয়ী হবে এবং বিজয়ী বন্ধু অপর বন্ধুর বুকের মাংস খাবে। কাক একটা খায় আর দশটা এদিক সেদিক ছড়িয়ে দেয়, চড়ুই হেরে যায়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কাক চড়ুইয়ের বুকের মাংস খেতে চায়। চড়ুইয়ের প্রাণ যায় আর কি! সে বলে বন্ধু তোমার কথা ঠিক আছে; তবে তোমার ঠোঁট তো খুব নোংরা, ওটা ধুয়ে এসো। কাক তখন নদীর কাছে যায় ঠোঁট ধুতে, নদী বলে তুমি ঘটি নিয়ে এসো, যায় মাটির কাছে, যায় মহিষের কাছে, যায় কামারের কাছে, সবশেষে কামার পাঠায় আগুন আনতে, কাক গৃর্হস্থ্য বাড়ি গিয়ে আগুন চাইলে, সে বাড়ির বউ একটুকরো আগুন তুলে কাকের পিঠে দেয়, কাক উড়াল দিলে সে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়। সরল মনের চড়ুই বেঁচে রইল, মাত্রাতিরিক্ত চালাকি এবং লোভের কারণে কাকের করুণ পরিণতি ঘটলো।

অপরদিকে অহংকার ও বিদ্বেষের দরুন ক্ষুদ্র টুনটুনি পাখির সঙ্গে বিরোধ করে রাজার নাক কাটা গেল। টুনটুনি কোনোভাবে এক টাকা কুড়িয়ে পেয়েছে সে রাজাকে খ্যাপানোর জন্য বলছে, 'রাজার আছে যত টাকা, আমার আছে তত টাকা।' রাজা দেখছে হতেই পারে না এবং টুনটুনি তা বলতেও পারে না। সুতরাং রাজা পাইক পেয়দাদের হুকুম দিয়েছে জাল বিছিয়ে যে করেই হোক টুনটুনিকে ধরা চাই। রাজাদেশ পালিত হলো। কিন্তু রাজার সাত রাণীর এর হাতে থেকে ওর

হাত করতে করতে সে বারবার পালিয়ে যায়। অবশেষে রাজা বলছে ওকে কাঁচাই চিবিয়ে খাবো! যেই রাজা মুখে দিতে গেছে অমনি ফুরুত করে উড়ে গেছে; পাহারারত পেয়াদা তরবারি দিয়ে কোপ মেরেছে, তাতে রাজার নাক কেটে গেছে। সেই থেকে এ গল্প, নাক কাটা রাজা আর টুনটুনি পাখি। কবি সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথাই এ গল্পে ব্যক্ত করেছেন। রাজাকে বাস্তবে শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়, তাই গল্পকার গল্পচ্ছলে টুনটুনি পাখির কাছে রাজাকে হারিয়ে তার মনের বাসনা পূরণ করেছে। এ ধরনের হাজার ও লোকগল্প পৃথিবীতে রয়েছে।

লেভি স্ট্রসের বর্ণিত ফোকলোরের ক্রিয়াশীলতার আলোকে কাক ও চড়ুইয়ের গল্পটি ব্যাখ্যা করা যায়। চড়ুই কর্তৃক কাকের ঠোঁট ধোয়ার শর্ত আপাত সমাধান' কাক তা গ্রহণ করায় 'আপাতফল'। গৃহস্থ্যবধূর কাজ আর কাকের পরিণতি ঘটনার সমাপ্তি। চড়ুই সমাজে নির্যাতিত শ্রেণির প্রতিনিধি, গৃহস্থ্যও একই শ্রেণিভুক্ত। কাক এ গল্পে শোষক শ্রেণিভুক্ত, কাকের মনোভঙ্গি স্বৈরাচারী, হিংসাত্মক, লোভী। রুরুশ পণ্ডিত ওয়াই এম সকোলভ (y.m. Sokolov) বলেন, Folklore has been continues to be a reflection and a weapon of class enflict : ফোকলোরের চেতনা শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিফলন ও হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অন্যভাবে বলা যায়, শ্রেণি সংঘাতের কথা ফোকলোরে প্রতিফলিত হয়। কাকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষুদ্র পাখি চড়ুইয়ের বিজয়ের মধ্যে শোষিত শ্রেণির বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাক্ত হয়েছে।

ফোকলোর সম্পর্কে পলিজেনেসিস (polygenesis) মতবাদে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর দেশে দেশে একই সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যুগে যুগে একই ধরনের ফোকলোরের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে।

সুইডেনের ফোকলোরবিদ কার্ল উইলহেলম ভন সিডো ১৯৪৮ সালে এ মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, ফোকলোরের উপাদান এক দেশ থেকে আর এক দেশে মুখে মুখেই ভ্রমণ করছে।

কিন্তু থিউডোর বেনফের ১৮৫৯ সালে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেন, ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেসব লোককাহিনি আছে তার সবই এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। কাল ক্রোন ১৮৮৬ সালে বেনফের উপর্যুক্ত মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। তিনি দেখান যে, পঞ্চতন্ত্রের ভালুক ও নেকড়ে বাঘের গল্পের অনুরূপ গল্প ইউরোপে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো মতই সমর্থন পেয়েছে। ফোকলোরের মধ্যে যে বিচিত্র রকমের উপস্থাপনা পদ্ধতি বিদ্যমান, তা একটি সমাজকে গভীরভাবে জানার সুযোগ প্রদান করে। একটি সমাজকে জানার অর্থ বিশ্ব সমাজকে জানার সুযোগ এনে দেয়। প্রসঙ্গত গ্রামীণ বিচারকার্যে টাকা ধার-শোধ বা দেনা-পাওনা বিষয়ে ব্যবহৃত একটি প্রবাদের উল্লেখ এখানে করা চলে। বহু লোকের উপস্থিতিতে গ্রামীণ বিচারকার্য শুরু হয়েছে। একজন মাতব্বর বলে উঠছেন, 'আরে বাবা টাকার ব্যাপার যেখানে আছে

সেখানেই গোলমাল'। এখানে মাতব্বর তার অজান্তেই একটি প্রবাদ উচ্চারণ করেছেন, 'অর্থই অনর্থের মূল'-এর ইংরেজি প্রবাদটি হচ্ছে—'Money is the root of all evils.'

ফোকলোর যে ক্রমাগত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করছে, তার মূল কারণ ফোকলোরের কার্যশীলতা (functionatity)। এক অঞ্চলের বা এক দেশের লোকমানসের মধ্যে ফোকলোরের যেসব উপাদান দানা বেঁধে উঠে ঠিক একই সময় অন্যান্য দেশের বা অঞ্চলের লোকমানসের মানসভুবনেও প্রায় একই উপাদান দানা বেঁধে উঠে। কেবল ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে প্রাচীন সভ্যতা এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের সভ্যতার লোকমানসে কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে থাকে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, অভিবাসন ইত্যাদি কারণে যুগপৎ সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে অচিরেই এই তারতম্য ঘুঁচে যায়।

বাংলাদেশ ও ভারতে সর্বব্যাপ্ত রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা হোসেন-বধ কাহিনী। বাংলার লোকগীতি থেকে এ রকম হাজার হাজার প্রমাণ উদ্ধার করা যায়। আমরা আগেই বলেছি, রামায়ণ ঐতিহ্য শুধু উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা পরিবাহিত হয়েছে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও। 'রাম' দিয়ে নাম দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপ্রধানের নাম ছিল 'রামোস', যা রাম থেকে এসেছে। শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ-উৎসব ঈদ উৎসবের মতো উদ্‌যাপিত হয়।

অনুরূপভাবে বাউল গানের উৎসস্থল তৎকালীন নদীয়া জেলা এবং অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া হলেও তার প্রভাব সমগ্র বাংলাদেশ, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে এমনকি বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

মানবতাবাদের ও মানবহিতৈষণার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা থেকে ফোকলোরের সমস্ত উপাদান গড়ে ওঠে। অনেক সময়ই দেখা যায় ধর্মকে ধারণ করেও ফোকলোর অসাম্প্রদায়িক, কেননা মানুষের প্রতি স্নেহ-মমতা-দয়া-প্রেম-প্রীতি-সহানুভূতি সর্বোপরি মানুষকে ভালোবাসা ফোকলোরের উপজীব্য। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রণোদনা ফোকলোরকে সমৃদ্ধ করে; ফোকলোরের উপাদানকে উজ্জীবিত করে সমাজকে মাঙ্গলিক লক্ষে চালিত করে।

লোকসমাজ থেকে উত্থিত মানবতাবাদে সিক্ত লোকধর্ম সম্পর্কেও এক্ষেত্রে আলোকপাত করা যায়। ফোকলোরে অন্তর্নিহিত মানবতাবাদী চেতনার প্রতিফলন বা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে জগতের সকল লোকধর্মের সৃষ্টি। লোকধর্মের মর্মকথা হচ্ছে উদারতা এবং সমন্বয়। কাউকে সে আটকায় না, বাঁধা দেয় না—তার কাছে মানুষ মাত্রই স্বাধীন ও মুক্ত, স্নেহময় ও মমতাময় এবং শ্রদ্ধাভাজন—কোনো প্রকার অন্যায় বা পীড়নের স্থান সেখানে নেই। তার প্রেমের বিতরণ মানুষ নির্বিশেষে।

সে সর্বদাই মুক্তহস্ত। লোকধর্মে নিহিত থাকে স্বচ্ছ মানবতাবোধ, প্রেম-মৈত্রী-সম্প্রীতি-ভালোবাসা-শ্রদ্ধাবোধ, লাঞ্ছিত-বঞ্চিতের প্রতি সমবেদনা, সমাজ-অভিজ্ঞতাজাত সত্যকে মেনে নেওয়ার আহ্বান, অন্যায়ের প্রতি ধিক্কার ও প্রতিবাদ, সর্বোপরি লোকহিতার্থে আত্মনিয়োগের আহ্বান। স্বার্থপরতা বা কোনো প্রকার হিংসা-দ্বেষের স্থান লোকধর্মে নেই; বরং সকল প্রকার হিংসা-দ্বেষ বিরোধী এক প্রতিবাদী শক্তিই লোকধর্মের উৎপত্তির উৎস—যার উদ্ভব ও বিকাশ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক লৌকিক ফসল হিসেবে।

লোকধর্ম গড়ে ওঠার উৎসমূলে প্রেরণা-সঞ্চারী শক্তি হচ্ছে বঞ্চিত-নিগৃহীত-নিপীড়িত-নির্যাতিত-অবহেলিত মানুষ। লোকধর্মের বাসনা-কামনা সর্বজনীন মানবতাবাদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করা।[১০] লোকধর্মে সর্বদা ক্রিয়াশীল সর্বপ্রাণবাদী ভাবনা। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলোর আবডালে গড়ে ওঠা ধর্মতন্ত্রের পীড়ন থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে লোকধর্ম অঙ্কুরিত হয়। আর এর উপাদান যোগায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মতে নিহিত মানবতাবাদী চেতনার সঙ্গে লোকমানসের বাসনা। অর্থাৎ লোকধর্মের প্রাণবীজ থাকে লোকায়ত সমাজে।[১১]

'লালন কি জাত সংসারে' এ প্রশ্নের সাথে ফোকলোর একাত্ম। ফোকলোরে মানুষ কে কোন্ জাত, তার প্রতি কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং জাতের প্রশ্নকে সেও লালনের মতোই অবান্তর ঘোষণা করে। ফোকলোর দর্শনে মানুষ সবাই সমান—সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, ইরোপয়েড-মঙ্গোলয়ে, নডর্ডিক-অস্ট্রিক, বাঙালি-জার্মানি, আফ্রিকান-ইউরোপিয়ান, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-জৈন-শিখ, ধনি-দরিদ্রের কোনো ভেদাভেদ নেই। বাউল দর্শনের ন্যায় তার কাছে 'মানুষ সত্য'।

২

ভারত এবং বাংলার লোকধর্মসিক্ত কয়েকজন রাজনৈতিক রূপকারকেও আমরা ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতিজাত উদার মানবতাবাদে উজ্জীবিত হতে দেখি। অবশ্য এই যাত্রা শুরু হয় গৌতম বুদ্ধ, শীল ভদ্র, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্ক, কবীর-নানক-চৈতন্য-লালন প্রমুখ সন্তের উদার মানবতাবাদী চিন্তার প্রসারণের সূত্র ধরে। আকবর-দারাশিকো'র ধর্মচিন্তায় ভারতের গুরুবাদ-ভক্তিবাদ-প্রেমবাদ ও সুফিবাদী উদার মানবতাবাদের সংমিশ্রণে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার যে আবহ সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ শতক অবধি গড়িয়ে আসে। বোধ করি, এর শিকড়ের গতিপথ আরো গভীরে। চিরাচরিতভাবে আচরিত ভারতের ভক্তিবাদ, অহিংস জৈনবাদ-বৌদ্ধবাদ, চার্বাক বা লোকায়ত মতের নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদ, ইসলামের সুফিবাদের মানবপ্রেম এসব রাজনৈতিক রূপকারকে শক্তি-সাহস-প্রেরণা ও প্রণোদনা দিয়েছিল। উদার মানবতাবাদে সিক্ত ভারত ও বাংলার এসব রাজনৈতিক রূপকারের মধ্যে আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি—মহাত্মা গান্ধী,

মওলানা আবুল কালাম আজাদ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।[১২] তাঁরা সবাই লোকমানসসিক্ত উদারতা থেকেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। তিনি জীবনব্যাপী মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখার বিষয়ে ছিলেন অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি অপরিমেয় বিশ্বাস ও ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। মানবহিতৈষণা ছিল যাঁদের জীবনব্রত; সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এ এক মাঙ্গলিক উপাদান। এই মনীষীদ্বয়ের পাঠশালা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় তাঁদের এ জীবন দর্শন লোকায়ত তথা লোকধর্মজাত। তাঁরা মানবতাবাদী, সর্বোপরি মানুষের প্রতি তাঁরা ছিলেন গভীরভাবে প্রত্যয়শীল।

বাংলায় বহুকাল ধরে বহু রকম নৃ-গোষ্ঠীর ও নানা মত-পথ-সম্প্রদায়ের আগমন এবং এখানকার ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত কারণে বাংলার লোকধর্ম অধিক মাত্রায় মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। লালন, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষ বসু, বঙ্গবন্ধু, নজরুল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক রূপকার দু'হাত ভরে লোকসংস্কৃতিজাত উদারতাকে আত্মস্থ করেছিলেন। তাই তাঁরা অহিংসা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র-সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীনকারী, মানবতার ঝাণ্ডাধারী—তাঁদের সফলতার কারণ লোকসংস্কৃতি তথা ফোকলোর।

বাংলার লোকসংস্কৃতির উদার ও সমন্বয়বাদী প্রবণতার প্রভাবে মধ্যযুগে হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলাম—এ তিন ধর্মেরই সহজ রূপের অর্থাৎ বঙ্গীয় রূপের সৃষ্টি হয়। এভাবে বাংলায় বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফিবাদ ও বাউল মত প্রভাব বিস্তার করে—এর ফলে বাংলায় জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানবপ্রেমের এক বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়। বাংলায় ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসারতার কারণ হিসেবে বৌদ্ধসহ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যে অমানবিক জাতিভেদের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছিল একথা বলা যায়।[১৩]

ফোকলোর সবসময় মৌখিক ঐতিহ্য থেকে বিচিত্রভাবে লিখিত ঐতিহ্যে প্রবেশ করে; আবার লিখিত ঐতিহ্য থেকে মৌখিক ঐতিহ্যে ফিরে যায়—এভাবে ফোকলোর চক্রাকারে সমাজকে সমৃদ্ধ করে; সমাজকে সর্বদাই ইতিবাচক ও মাঙ্গলিকতার দিকে টানে। ফোকলোর যেহেতু মানবতাবাদের নিশানধারী, তাই ফোকলোরের উপাদান যতবেশি মহাকাব্যে প্রবেশ করেছে, মহাকাব্যের মূল শক্তি ততবেশি মানবতাবাদে সিক্ত হয়েছে। তাই দেখা যায়, যুদ্ধ-বিদ্রোহ যতই ঘটুক না কেন মহাকাব্যগুলোর সমাপ্তিতে শেষ পর্যন্ত খল চরিত্রের পরাজয় ঘটেছে, এবং মূল মানবতাবাদী চরিত্র জয়ী হয়েছে। একথা শুধু মহাকাব্য ও মহাকাব্য প্রভাবিত ফোকলোর সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়; বিশ্বের দেশে দেশে যুগে যুগে যেসব

লোককাহিনী, মিথ বা পুরাকাহিনী সৃষ্টি হয়েছে সেখানেও আমরা মূলত তিন শক্তি দেখতে পাই। নায়ক, মধ্যস্থতাকারী এবং খল। আর সবখানেই খলের করুণ পরাজয়।

পুরাকাহিনীগুলোর মূল ভিত্তি সত্যাশ্রয়ী। লেভি স্ট্রস বলেছেন যে, মিথগুলো মূলত মানবতাবাদী সত্যকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মিথগুলো যেন প্রাচীন মানুষের ভাষা, সে বলতে চায় যে, মানুষের কল্যাণমুখী আদর্শ সবচেয়ে বড়ো কথা। ভ্লাদিমির প্রপও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, প্রতিটি লোককাহিনীতেই খলত্ব ভালোত্বের নিকট পরাজিত হয়েছে। ভারতীয় লোককাহিনী *কথাসরিৎসাগর* এবং *পঞ্চতন্ত্র* থেকে আজ এ সত্য প্রমাণিত।[১৪]

৩

বাংলার লোকদর্শনের সার কথা সার্বজনীন মানবপ্রেম। আর এই লোকদর্শনের এক স্মারক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার লোকদর্শনের উপাদান প্রধানত বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু-মুসলিম ধর্মের স্থানীয় ভাবনা ও রূপে এবং সেইসঙ্গে শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, চৈতন্য, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্গবন্ধু প্রমুখের জীবন ভাবনায়। একদিকে বজ্রযান, সহযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, ন্যায়বাদ, নব্যস্মৃতি, ব্রাহ্মণ-সুফি-বৈষ্ণব-বাউল-মতবাদ অন্যদিকে মীনানাথ, গোরক্ষনাথ, শরীয়তউল্লাহ, দুদু মিয়া, তীতুমীর, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মানবেন্দ্র, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাসানী, মুজিব, অমর্ত্য সেন প্রমুখের চিন্তা-চেতনা-কর্মে বাঙালির লোকদর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর এর সবখানিই প্রভাবিত করেছে বাংলার লোকসংস্কৃতি তথা ফোকলোর। এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জীবন চেতনা, সমাজ চেতনা তথা রাজনৈতিক দর্শন ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। বঙ্গবন্ধু এই লোকসংস্কৃতির কোলে, বাউল-জারি-সারি-ভাটিয়ালির আবহে বড়ো হয়েছেন এবং মনপ্রাণ ভরে লোকসংস্কৃতিজাত উদারতায় এবং মানবিকতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং হৃদয়ের মণিকোঠায় সাজিয়েছেন দেশপ্রেমের ডালি।

বাংলাদেশ এবং এই দেশের স্বাধীনতা এ দুটি প্রত্যয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা আজন্ম। বাঙালি সংস্কৃতির বড়ো বৈশিষ্ট্য তারা সমন্বয়বাদী, সাম্যমুখী, ইহলোকবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, তারা অপরের দুঃখে কাতর, অতিথিপরায়ণ, অসম সাহসী, তারা আজন্ম সংগ্রাম করেছে বন্যা-খরা-মহামারী, পাহাড়ি অজগর, বনের বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে, যারা বাঁশের লাঠি নিয়ে স্বাধীনতা আনতে চেয়েছে, নিজ ভূমি রক্ষা করতে যারা বহু জীবন উৎসর্গ করেছে। বাঙালি প্রধানত কৃষক, উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বাঙালি কৃষকের; বাণিজ্যেও তার খ্যাতি মন্দ নয়; বহু লোকগল্পে সাধু সওদাগর, বাণিজ্যের জন্য নৌবহর তথা প্রসারিত বাণিজ্যের খবর আছে। আমরা উদাহরণ হিসেবে কিংবদন্তিতুল্য বেনে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার কথা বলতে পারি। লোকসংস্কৃতিতে উজ্জীবিত এসব তথ্য মিথ্যে নয়। বীরত্বের খবর তো ভুরিভুরি।

বাঙালি বীর সিধু-কানু ভ্রাতৃদ্বয়, রংপুরের কৃষকনেতা নূরলউদ্দিন, ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহের নায়ক করম শাহ, টিপু পাগলা, তীতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, যতীন দাস, প্রীতিলতার মতো অকুতোভয় বীরের বা দেশপ্রেমিকের বংশধর। এই বাঙালিরই এক দীপ্তমান-সাহসী সন্তান বঙ্গবন্ধু। গোপালগঞ্জের অজপল্লি টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালে এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। বাংলার কৃষক শব্দটি কিন্তু উদ্দীপ্তময়। বহু ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাতের ফসল এই বাংলার কৃষক। বাংলার কৃষক পরিশ্রমী-সাহসী ও সংগ্রামশীল। বহু জীবন-মরণ সংগ্রামের তারা সাহসী যোদ্ধা। তারা বড়ো বড়ো কৃষক বিদ্রোহের নায়ক, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, গারো-হাজং বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহের তারা নায়ক। তারা জীবন দিয়েছে কিন্তু মান দেয় নি।

বাংলার লোকদর্শনের মৌল লক্ষণ ইহলৌকিকতাবাদী যা ধর্মনিরপেক্ষতার নামান্তর। বাঙালি জীবনবাদী, পারলৌকিক চিন্তার চেয়ে তাঁর লৌকিক চিন্তাই প্রধান। বাংলার লোকদর্শনের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষবাদী। 'যা নেই দেহভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে', বাংলার দেহতাত্ত্বিক সাধন-ভজনের এটা মূল কথা। দেহ ভিন্ন আত্মা নেই, চৈতন্য-স্মৃতি-বোধ-বুদ্ধি কিছুই নেই। বাঙালি দেহাত্ববাদী বলেই বাঙালি সংস্কৃতির মূল লক্ষণ ধর্মনিরপেক্ষ ও অহিংস। আর এই অহিংসার ভিত্তিই হচ্ছে বাংলার কৃষি। কৃষি সংস্কৃতি সবসময় অহিংস ও ধর্মনিরপেক্ষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য', এই কাব্যবাণী অহিংসা ও পরমতসহিষ্ণুতা থেকে উৎসারিত। এই সংস্কৃতির আবহে বড়ো হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন লোকধর্মসিক্ত পরম মানবতাবাদী রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংগঠক। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন অপরিসীম মানবীয় গুণে গুণান্বিত। বিশেষ করে ব্যক্তিত্বে ও নেতৃত্বে তাঁর ছিল ঐন্দ্রজালিক শক্তি। ভৌগোলিক সীমা-কাল-ভাষা, ঐ কালের সমাজ কাঠামো অর্থাৎ জীবনযাপনের অবস্থা থেকে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় সেই অবস্থা থেকে মুক্তির দিক নির্দেশনা দেন নেতা। নেতা তাঁর কর্মপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলটি গড়ে ওঠে নেতার ব্যক্তিত্বের গুণে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ নামক রাজনৈতিক দলটিকে হাজার দিনের সাধনায় গড়ে তোলেন এবং মূল লক্ষ্য স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হন। জীবনকে বাজি রেখে তিনি এই লক্ষ্যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হন। তিনি বাংলার আমজনতার কাছে মুক্তিযুদ্ধের মরণপণ দিনগুলোতে ছিলেন মহান মিথ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ছায়ার মতো, প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার হাতিয়ারের সঙ্গে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদস্পন্দনে, তাই তো তাঁরা দেখেছেন কচুর পাতায়, পদ্মপাতায় বঙ্গবন্ধুর ছবি; যেখানে *জয়বাংলা* শব্দটি স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। বাঙালির মানসপটে আঁকা ছিল এই

হাজার বছরের মানুষটির ছবি, তারা যেখানে যায়, যেদিকে তাকায়—হাটে-বাটে-ঘাটে-মাঠে-রন্ধনশালায় সর্বত্র বঙ্গবন্ধুকে দেখে। বঙ্গবন্ধু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলার জন্য আজন্ম সংগ্রাম করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ফোকলোরের ভাষায় এটাই মিথ। এ মিথ দিনকে দিন আরো পল্লবিত হবে এবং কালক্রমে এই মিথ সমগ্র বিশ্বের দুঃখী-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির ত্রাতা হিসেবে বিরাট মহীরুহতে পরিণত হবে। একটা সত্যকে ঘিরেই মিথের সৃষ্টি, সেই সত্যটা কি? সত্যটা হচ্ছে কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের জনসাধারণের মঙ্গল-শুভ অর্থাৎ মানবতার একটি আকর সত্য প্রতিটি মিথের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে রাষ্ট্রনায়ক ও লোকনায়ক। তিনি বাংলার প্রমিথিউস। গ্রিক পুরানের লোকনায়ক বীর প্রমিথিউস ছিলেন অসাধারণ মানবপ্রেমিক। সর্ববিদ্যা-পারদর্শী মানবপ্রেমিক এই দেবতা আর্ত-উৎপীড়িতের আহ্বানে সাড়া দিতে ছিলেন সর্বদা প্রস্তুত। তাই দেবতা জিউসের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মানুষকে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। এতে জিউস নিজ জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য প্রমিথিউসের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে। লোহার শিকলে তার হাত-পা এমনভাবে পাহাড়ের সঙ্গে বাঁধে যেন সে একটুও নড়তে না পারে। প্রতিদিন জিউসের ভয়ঙ্কর ঈগল নিষ্ঠুর থাবায় খুবলে খুবলে খাচ্ছে হৃদপিণ্ড। কিন্তু প্রমিথিউস একবারও গোঙ্গায় নি, একবারও জিউসের কাছে করুণা ভিক্ষা করে নি, মানুষের জন্য আগুন এনে দিয়ে ভুল করেছে এমন অনুতাপ এক মুহূর্তের জন্যও করে নি। কেননা সে জানে যে, মানুষের জন্য আগুন এনে দিয়ে যে উপকার করেছে, যেজন্য মানুষ একদিন তাকে মুক্ত করবেই এবং করেছিলও তাই। মানবপুত্র বীর হারকিউলিস একদিন জিউসের ঈগলকে বধ করে প্রমিথিউসকে মুক্ত করে।[১৫]

মানুষের কাছে আগুন এনে দেবার জন্য প্রমিথিউস যে মরণপণ ঝুঁকি নিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দিতে ছিলেন সেই রকম কৃতসংকল্প। তাঁর আজন্ম সাধনা বাঙালিকে স্বাধীন দেখতে চান, সাবলম্বী করতে চান। প্রমিথিউসও মানুষের হাতে আগুন তুলে দিয়ে মানুষকে সাবলম্বী করতে চান, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চান, মানুষকে সুখী করতে চান। এজন্য প্রমিথিউস যেমন ব্রত নিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুও তেমনি ব্রত নিয়েছিলেন বাঙালির দুঃখ-কষ্ট দূর করার। সে জন্য বাঙালির হাতেও তিনি স্বাধীনতার আগুন তুলে দিতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। 'হয় মন্ত্রের সাধন, না হয় শরীর পতন'। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্র বাঙালির স্বাধীনতা, জান্তা সরকারের রক্তচক্ষু, পরতে পরতে জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে তিনি ধাপে ধাপে এগুচ্ছেন, তিনি পিছপা হবেন না, লক্ষ্যে তাঁর পৌছাতেই হবে—তাই তো ৭ মার্চ ১৯৭১-এ উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এ ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির অমর লোকগাঁথা তাই এটাকে আমরা লোকগীতিও বলতে

পারি : কারণ এটাতে ছিল আঞ্চলিক ধ্বনি-সুর এবং এর কথা সকল বাঙালির প্রাণে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল।[১৬]

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যখন কারাগারে বন্দি করে রাখে, তাঁর বিরুদ্ধে বিচারের নামে যখন প্রহসন চলে, এক মুহূর্তের জন্যও তিনি অনুতপ্ত হন নি, অনুশোচনা করেন নি, সামরিক জান্তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন নি। কেননা তিনি জীবনের চেয়েও তাঁর দেশকে, দেশের মানুষকে বেশি ভালোবাসতেন। তাই নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। প্রমিথিউস যেমন জানতেন তার মুক্তি একদিন ঘটবেই তেমনি বঙ্গবন্ধুরও এরকম আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তাঁকে কেউ মারবে না বা মারতে পারবে না। তাই মানবপ্রেমিক লোকদেবতা প্রমিথিউস আর লোকনায়ক বঙ্গবন্ধু দুনিয়ার সমগ্র মানুষের কাছে মিথ—একটি সমাজ সত্যকে তারা ধারণ করে স্থান করে নিয়েছেন মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়। এ কারণেই তাঁরা মিথ।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলার লোকদর্শন প্রপঞ্চদ্বয়ের একটি অপরটির পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাল্য-কৈশোরকালে বাংলার শত সমস্যাক্লিষ্ট কৃষক, খাজনাদায়গ্রস্ত কৃষক, দুঃখজর্জর আধপেটা খাওয়া শ্রমিক, একদিন-দুদিন না খেয়ে থাকা অনশনক্লিষ্ট-হতদরিদ্র মানুষদের দেখেছেন নিজ চোখে; এটা দেখে দেখে তাঁর অন্তরে গেঁথেছে তাদের মুক্তির প্রেরণা। ঐ বাল্য-কৈশোরেই শুনেছেন, মানুষের প্রতি উদারতন্ত্রী বাউল-ভাটিয়ালি-জারি-সারি গানের মধুর সুর বাণী—এটা তাঁর প্রাণ-মনকে আবেগাপ্লুত করেছে। আর ছিল তাঁর উদারনৈতিক পারিবারিক আবহ—এই আবহ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র মনের গহিনে তৈরি করতে তাঁকে প্রণোদনা দিয়েছে। তাই বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক মানে তাঁর ভাই, নিরন্ন-দুঃখক্লিষ্ট সব মানুষ তাঁর ভাই। সব মানুষকেই তিনি ভালোবাসতে শিখেন সেই বাল্য-কৈশোরেই। বিশেষ করে বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। আর এ কারণেই বাংলার মানুষের কাছে তিনি সর্বজনমান্য-সর্বজনগণ্য-সর্বজনশ্রদ্ধেয়; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার কাছে। বঙ্গবন্ধুর প্রধান গুণ ছিল সাহস, সারল্য ও কোমলতা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম, বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার অঙ্গীকার তাঁর মনের মধ্যে সর্বদাই গাঁথা ছিল। এসব ক্ষেত্রে নিজের জীবনের প্রতি মায়া ছিল তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। জীবনকে তিনি বাজি রেখে কর্তব্যকর্মে অগ্রসর হতে কোনো প্রকার দ্বিধা করতেন না। এ প্রসঙ্গে সমাজবাদী-চিন্তক সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন :

> ফরিদপুরের কৃষকের সন্তান শেখ মুজিবের এই একটা গুণ ছিল যে, সে জানের পরোয়া করত না। এই গুণটা আমাদের ক'জনার থাকে? মরতে হবে, তবু আমরা মৃত্যু ভয় করি। কিন্তু শেখ মুজিব জন্মগতভাবেই বোধ হয় একটু একরোখা ছিলেন, গোঁয়ার ছিলেন। কৃষকের সন্তানের সারল্য থেকে তিনি হয়ত এই বোধটি পেয়েছিলেন। মরছি তো আমরা হরহামেশায়, প্রতি মুহূর্তে। তবে আর মৃত্যুর ভয় কি? এমন বোধ থেকেই ৭ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ মানুষের জামায়েতে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্'।[১৭]

আমরা আগেই বলেছি বাংলায় তথা এই বঙ্গ-বদ্বীপে বহু প্রকার নৃ-গোষ্ঠী ও নানান মত-পথের মানুষের আগমনে এবং এখানকার ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত কারণে বাংলার লোকধর্ম মানবিকতার দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যরঞ্জিত। লোকধর্মের এই উদার আবহ থেকে বঙ্গবন্ধু দু'হাত ভরে আবাল্য লোকসংস্কৃতিজাত উদারতাকে আত্মস্থ করেন এবং নিজেকে পরিণত করেন অহিংসা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র-সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীনকারী, মানবতার ঝাণ্ডাধারী। তাই ধর্মনিরক্ষেতা কিংবা অসাম্প্রদায়িক মানবতার কথা কিংবা ফোকলোর আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন লোকসংস্কৃতিজাত উদার মানবতাবাদে উজ্জীবিত এবং মহৎ প্রাণের অধিকারী। ঐকান্তিক ত্যাগ ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বের তৃণমূল মানুষের অবিসংবাদী নেতায়। সুফিয়া কামাল এক নিবন্ধে বলেন :

> মুজিবের ত্যাগের সীমা নেই। তাঁর নিষ্ঠার কোনো পরিসীমা নেই। দেশকে যে সে কতখানি ভালোবাসতো তার পরিমাপ কোথাও নেই। মানুষের জন্য মমত্ববোধ, আত্মার একটা টান ছিল। আজকের দিনে তাঁর মতো একটি মানুষ সারাবিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। পলায়নি মনোবৃত্তি ছিল না, মুজিবের। যেখানে সংকট, যেখানে সংগ্রাম-সংঘাত দেখেছে সে এসে আগে দাঁড়িয়েছে। মরণকে ভয় করে নি। তাঁর পেছনে লক্ষ জনতা মুজিব ভাই বলে লাফিয়ে পড়েই না, এই দেশকে স্বাধীন করেছে। বাঙালি আমাকে মারবে না, এই প্রবল বিশ্বাস ছিল বাঙালির ওপর। সেই বাঙালির হাতে মুজিব হত্যা হয়েছে। বাঙালি জাতির সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে আমি জানি না। মুজিবকে আমি অন্তর দিয়ে এখনও উপলব্ধি করি।[১৮]

বঙ্গবন্ধু ছিলেন লোকধর্মসিক্ত জীবনমুখী চিন্তা-আদর্শের প্রতীক। তিনি কিংবদন্তির লোকনায়ক। অত্যাচারিত-নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির ত্রাতা। বাংলার প্রমিথিউস।

মধ্যযুগে লিখিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখজর্জর জীবনের চিত্র আর বাল্য-কৈশোরে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ করা গ্রাম বাংলার নিরন্ন মানুষের চিত্র আমরা মনে করি একই রকম ভীতিকর ও চিন্তা উদ্রেককারী। জীবন উপলব্ধি থেকেই নজরুল বলেছিলেন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান'। বাল্য-কৈশোরের দুঃখ ছিল নজরুলের জীবন সাথী; তাই তাঁর ঐ মহান উপলব্ধি। আবারো বলি গ্রাম বাংলার নিরন্ন কৃষক-শ্রমিকের হাড়জর্জর কঙ্কালসার দেহ যা ছিল দৃশ্যমান—কবি নজরুলের মতই বঙ্গবন্ধু প্রায়শই এ চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। সুকান্তের 'রানার' ও 'হে মহাজীবন' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা পাঠে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে নিরন্ন

কৃষক-শ্রমিকের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে কবির কতটা আত্মিকতা ঘটেছিল। ক্ষুধার্থের বেদনা কত গভীর হলে তাঁর কাছে 'পূর্ণিমার চাঁদ'ও ঝলসানো রুটি বলে অনুমিত হয়।

সমাজ কাঠামো ভাঙার অঙ্গীকারের কথা বিবেচনায় নিলে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ রাজনৈতিক রূপকারের চেয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গণচেতনার নেতা হিসেবে প্রথম সারিতে স্থান দিতে হয়। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা আরো বেশি বস্তুতান্ত্রিক। বঙ্গবন্ধু ছিলেন আরো বেশি প্রত্যক্ষবাদী ও লক্ষ্যাভিসারী। তাই তিনি কেবল বাংলার নয়, বিশ্বের দরিদ্র জনতার হৃদয়কে ছুঁয়েছিলেন।

ফোকলোর জাত-ধর্ম, ধনী-গরিব ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য-ভেদ-বিভেদ ঘুঁচিয়ে কেবল মানুষের কথা বলে। লোককবি পাগলা কানাই-এর ভাষায় :

'শত রঙের দেখিরে গাভি এক রঙের দুধগো দেখি
তবে কেন ত্রিজগতে মানবিচ করতেছি
এক মায়ের দুধ গো আমরা মায়ে-বেটায় খেতেছি।

আর এক কবি বলেন :

'এক কৃষ্ণ জগৎময়, কৃষ্ণ বীণা গতি নাই
যেমন মোহাম্মদকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে দয়াময়'।

ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য ফোকলোরের ভাষায়—ভঙ্গিমায়-প্রাণ-ঐশ্বর্যে। একটি প্রবাদ আছে, 'আপন আচারি ধর্ম অন্যেরে শিখাও'—এ ধর্ম যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, এ যে লোকধর্ম বা মানবধর্ম তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আবার যখন বলা হয়, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, এটা বোঝা যুক্তিগ্রাহ্য যে এ ধর্মও কোনো বিশেষ ধর্ম নয়, এ ধর্ম সার্বজনীন ধর্ম, মানবধর্ম, যা সব মানুষেরই কাঙ্ক্ষিত।

ফোকলোরের মধ্যে সর্বমানবের সমন্বয়ের একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ফোকলোরের চেতনার মধ্য দিয়ে সূচিত হয় সমন্বয়ের ধারা। মানুষ যে দেশে, যে পরিবেশে, যে সংস্কৃতিতে বাস করুক না কেন বা যে ভাষাতেই কথা বলুক আসলে সব মানুষ যে এক উৎসজাত ফোকলোরের উপাদানের মধ্যে তার সন্ধান মেলে।

মৌলবাদ-কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মান্ধবিরোধী ভাবনা ফোকলোরের বিচিত্র রকমের উপাদান সৃষ্টিতে প্রণোদনা দিয়েছে। আমরা জানি বাংলার মানুষ অপেক্ষাকৃত বেশি সংকর; পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত এ কারণেই বাংলার সংস্কৃতি উর্বর, মিলনধর্মী ও সমন্বয়ধর্মী। বহু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এ সংস্কৃতি উর্বর হয়ে উঠেছে। বাংলার শত প্রকৃতির লোকগীতির দিকে দৃষ্টি দিলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা লোকগীতির বিষয় বৈচিত্র্যে রামায়ণ, মহাভারত, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম যেমন ব্যাপক তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মুসলিম ঐতিহ্য। বাংলার ফোকলোরে পুরাণ-কোরআনে সম্মিলন ঘটেছে। বাংলার জনপ্রিয় জারি গান ও যাত্রাপালায় আরব-মধ্যপ্রাচ্য ও

মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে রাম-গীতা ও কৃষ্ণ-রাধার প্রসঙ্গ সমন্বিত হয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যে। একটি জারি গানে আমরা পাই :

রাম লক্ষ্মণ গ্যাছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে
সেই রকম না গ্যাছে রে দুনো ভাই মদিনা শহর ছেড়ে
ভাই ভাই বলে কানছের হোসেন
আর কি প্রাণের ভাই আছে।[১৯]

এই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায় মিলিতভাবে সত্য দেবতার উদ্ভব ঘটায়। এর আনুষ্ঠানিক নাম সত্যনারায়ণ বা পিরনারায়ণ। তাদের এই পরিকল্পনার কারণ সমাজের সংকট নিরসন ও সমাজে সর্বদা সদ্‌ভাব বজায় রাখা। লোকসংস্কৃতির কাছে বিষ্ণু আর বিস্‌মিল্লার কোনো বিরোধ নেই। তাই তারা বলেন :

মক্কার রহিম আমি অযোধ্যার রাম
ফকির হয়ে ভ্রমি আমি তোমার কারণ
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ।

সত্যনারায়ণের শিষ্য দেবতা হচ্ছে : কালু রায়, কালু গাজি—কুমিরের দেবতা; দক্ষিণরায়, বড়খাগাজি—বাঘের দেবতা আর বসন্ত রোগের দেবতা—শীতলা দেবী।

এখানে রাম-লক্ষ্মণ, হাসান-হোসেন ও অযোধ্যা-মদিনার মিলনের প্রয়াস লক্ষণীয়। আমাদের লোকনাটকে এই মিলনের চিত্রটি আরো প্রাণবন্ত। ফোকলোর সব ধর্ম-সম্প্রদায় থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং সব ধর্ম সম্প্রদায়কে সমন্বিত করে মানবতাবাদকে মোহনীয় করে তোলে। সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয় যদি হয় ধর্মের মূলমন্ত্র, তাহলে ফোকলোর সেই মহামন্ত্রকে আত্মস্থ করে তাকে সৃষ্টি মাধুর্যে মহিমান্বিত করে তোলে। ফোকলোর সর্বদাই মানবতাবাদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করে। মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সত্য ও ন্যায়ের জয় ঘোষণা করে।

অপশক্তি, পেশিশক্তি, দূরভিসন্ধি, অন্যায়, অবিচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে ফোকলোর সোচ্চার। লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষের উর্ধ্বে ফোকলোর। প্রবাদ আছে—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। অথবা পাপ বাপকেও ছাড়ে না—এটা ফোকলোরের সিদ্ধান্ত। আমরা এখানে কাক ও চড়ুই পাখি কিংবা কথিত বনের রাজা শক্তিশালী সিংহ বনাম ছোট খরগোশ বা সিংহ বনাম ইঁদুরের কাহিনি স্মরণ করতে পারি। চড়ুইয়ের বুকের নরম মাংসের লোভে কাক তার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে; শেষ পর্যন্ত লোভের কারণে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাকে। শক্তিশালী সিংহ পরাজিত হয় ছোট খরগোশের কাছে, সিংহের জীবন বাঁচায় ছোট ইঁদুর। ফোকলোরের দর্শনে সর্বকালেই মানবতাবাদ ও ন্যায়নীতির আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা দেখি শক্তিমত্তের প্রতীক সিংহ ছোটো খরগোশের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়, ছোটো ইঁদুরের সাহায্যে সিংহ অনিবার্য মৃত্যুর হাত

থেকে রক্ষা পায়। রাজা পরাজয় বরণ করে ছোট্ট পাখি টুনটুনির কাছে। তার মানে জগতে যে ক্ষুদ্র, দরিদ্র, নিঃস্ব জনসাধারণ রাজা কিংবা জমিদারের কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের প্রতীক; বড়োদের জন্য তাদেরও সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, সমাজ জীবনে এ এক চিরন্তন সত্য।

ফোকলোর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকেই বড়ো করে দেখে। সব ধর্ম থেকেই উপাদান সংগ্রহ করতে ফোকলোরের কোনো রূপ সংশয় বা সংকোচ নেই। ফোকলোরের বিকাশ এবং পরিবৃত্তি এমন একটি জগতে স্থিত হয়েছে যেখানে সব ধর্মের মানুষ এক হয়ে মানবতাবাদকেই বড়ো করে তুলেছে। ফোকলোরের দর্শনে কোনো প্রকার কূপমণ্ডূকতা বা ধোঁয়াশা-কুয়াশা, অন্ধত্ব, ঠুলি-ঠুসি, মন্ত্রের-তন্ত্রের অবহেলা-অবজ্ঞার স্থান নেই। আবারো বলি ফোকলোরে 'মানুষ সত্য' বড়ো কথা। নজরুলের ন্যায় ফোকলোরও বলে 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'। ফোকলোর অপরাধীকে ক্ষমা করে মানবীয় দৃষ্টিতে। ফোকলোর ক্ষমাশীল। ক্ষমাশীলতা ফোকলোরের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফোকলোর মানুষকে ভালোবাসা ও সমাজকে ক্ষমাশীল হওয়ার প্ররোচনা-প্রণোদনা দান করে; লাঞ্ছিত-বঞ্চিতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং সবার দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে বিবেচনা করার জন্য সকল মানুষকে এবং সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কিঞ্চিৎ হিংসা-দ্বেষ, লোভ পরশ্রীকাতর হলেও তার মনোবাঞ্ছা সত্যাশ্রয়ী। মিথ্যার ও অসত্যের পরাজয় এবং সত্যের জয়ই তার কাম্য। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় যদি সব ধর্মের মূলমন্ত্র হয় তাহলে ফোকলোর সেই মহামন্ত্রকে আয়ত্ত করে তাকে সৃষ্টি মাধুর্যে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং তুলছে। মানুষের এবং সমাজের কল্যাণ কামনা ফোকলোরের আদর্শ। মানুষের দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনা, শোষণ, নির্যাতন ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণের মূলমন্ত্র যোগায় ফোকলোর। ফোকলোরের চেতনা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে, মৌলবাদকে সে ধিক্কার দেয়। ফোকলোর জয়গান করে মানুষের, মানবতাবাদের। ফোকলোরের চিরন্তন বাসনা জগতে একদিন ভেদাভেদহীন, সমমর্যাদাশীল সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই-হবে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ বা ৬০০ বছর আগে গ্রিকে-চীনে-বাংলায় প্রোটাগোরাস-কনফুসিয়াস-গৌতমবুদ্ধ যে মানবতাবাদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলেন তার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল ইটালিতে চৌদ্দ শতকে। বেশি পিছনে না গিয়ে আমরা পেত্রার্ক-এর কথা স্মরণ করতে পারি। ইটালিতে তাঁর জন্ম ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ৭০ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে রেনেসাঁর এই জনকের মধ্যে উচ্চ ধারণা ছিল। আর এটা তিনি পেয়েছিলেন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে—ঐতিহ্য থেকে। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। বিশেষত ক্লাসিক সংস্কৃতি এবং প্রচলিত ধর্ম ধারণার মধ্যে তিনি কোনো বিরোধ দেখেন নি। এই উদার মনোভঙ্গির কারণে তিনি আধুনিক রেনেসাঁর জনক।[২০] চৌদ্দ শতকের বাঙালি কবি

চণ্ডিদাস ঘোষণা করেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। বিশ শতকে নজরুল গান ধরলেন সাম্যের, 'গাহি সাম্যের গান—মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান', তিনি আরো স্পষ্ট করে বললেন, মানুষই গ্রন্থ এনেছে, গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।

বাঙলার বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের মূলকথা ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। লালন বললেন, 'কলি যুগে মানুষ অবতার' এবং 'মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার'। তিনি আরো বললেন, সত্য ও সুপথে চললে মানুষের দর্শন পাওয়া যাবে। মনুষ্যত্ব গুণই সত্য ও সুন্দরের সমাহার। মানুষের দর্শন পাওয়া অর্থ মনুষ্যত্বগুণ অর্জন করা। সত্য ও সুন্দরের দর্শন বঙ্গবন্ধুর জীবন চেতনা। তিনি সমাজ থেকে তাঁর পরিবার থেকে এই মনুষ্যত্বগুণ অর্জন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এই অভিধাটি আজ মানবতাবাদের প্রতীক হিসেবে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তমান। মানুষ নির্বিশেষে তাঁর কাছে সবাই ছিল আপন। এটা ফোকলোরেরই শিক্ষা। তিনি বলেছেন, আমরা যে যে পরিবারের, যে সম্প্রদায়েরই হই না কেন, সেটা তার পরিবারের বা সংঘের ব্যাপার, এর বাইরে আমরা সবাই ভাই ভাই। ভাই শব্দটি তাঁর কাছে ছিল মধুর বচনের ন্যায়। আর দরদ ছিল তার দুঃখী মানুষের প্রতি, দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের প্রতি—কৃষকের প্রতি, শ্রমিকের প্রতি, যারা পেট ভরে ভাত খেতে পারে নি, যারা অসুস্থতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারেনি অর্থের অভাবে। তিনি যে গোলা থেকে গরিবদের ধান বিলিয়ে দিয়েছেন, শীতার্ত বৃদ্ধকে গায়ের চাদর খুলে দিয়েছেন তা আমরা তাঁর জীবন কাহিনি থেকে জানতে পারি। কৃষকের সম্মান হিসেবে এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তার চারধারের লোকসংস্কৃতি থেকে তথা ফোকলোর থেকে। আমরা তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ, পাকিস্তানি জান্তার কারাগার থেকে ফিরে আসার পর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এর ভাষণ; ৮ অক্টোবর ১৯৭২-এ পিজি হাসপাতালের ভাষণ থেকে কয়েকটি শব্দ ও বাক্যের উদ্ধৃতি নিতে পারি :

১. ভাইয়েরা আমার, ২. আমার ভাই, ৩. দুঃখী মানুষ, ৪. আজকের বাংলাদেশের দুঃখী মানুষ ঔষধ পায় না, ৫. এদেশের দুঃখী মানুষের ট্যাক্সের টাকা থেকে, ৬. যেখানেই যান দেখবেন সব বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের পয়সায় গড়া, ৭. আর দুঃখী মানুষ আসলেই যেন তাকে রাস্তায় বের করে দেন, ৮. গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, ৯. তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, ১০. এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, ১১. আর আমার ভাইদের বলছি, ১২. আমি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের বলি, ১৩. আমি আমার সাত কোটি দুঃখী বাঙালির পক্ষ থেকে, ১৪. ক্ষমা করো আমার ভাইয়েরা। এখানে আমার ভাই শব্দটির ব্যবহার পাচ্ছি ৬ বার এবং দুঃখী শব্দটির ব্যবহার পাচ্ছি ৮ বার। এখানে বঙ্গবন্ধুর মননের মানবিক সংবেদনশীলতার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়। বাংলার মানুষ, আমার মানুষ, আমার ভাই শব্দগুলোর

বারংবার ব্যবহার তাঁর সর্বমানবিক গুণের প্রগাঢ়তার পরিচয় দেয়। ভাই শব্দটির ব্যবহার ছিল ভীষণভাবে আন্তরিক। মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা থেকেই এই আন্তরিক উচ্চারণ। বঙ্গবন্ধু ছিলেন লোকদর্শনসিক্ত প্রগাঢ় মানবতাবাদী এবং বিশ্ব লোকধর্মের স্মারক।

ফোকলোর, মানবতাবাদ, লোকধর্ম ও বঙ্গবন্ধু—এই ৪টি প্রত্যয়ই মানবিকতার আকর। বঙ্গবন্ধু আজ বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের আত্মার স্পন্দন; তাই বঙ্গবন্ধু মিথ।

৪

আমরা ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের উপর পণ্ডিতজনদের লেখা ৫০টি প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থভুক্ত করেছি। সম্পাদিত এ বইটি ৭ মার্চের ভাষণের বহুমাত্রিক অধ্যয়ন ও ব্যাখার সমাহার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, গণমানুষের শোষণমুক্তির স্বপ্নচারী, সংগ্রামী-সাহসী মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বাঙালির পায়ের শিকল ভাঙার এক সুললিত গল্প শুনিয়েছিলেন। সে গল্পের আঙ্গিক বা কাঠামোটি গড়া ছিল বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের উপাদান দিয়ে। বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে জোর দিয়েছিলেন উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসকচক্রের ২৩ বছরের শাসন ও শোষণের উপর। পাকিস্তানের এই ২৩ বছরের শাসনকালকে শাসন না বলে বলা চলে অপশাসন। তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য ছিল প্রায় ত্রিশ বছরের। সেই অভিজ্ঞতার আলোকছটা এ ভাষণের পরতে পরতে শিকড় গাড়া। বাঙালির ভালোবাসার কাছে তাঁর নিজের জীবন ছিল তুচ্ছ। বাঙালির মুক্তির জন্য স্বীয় জীবনদানেও তিনি সর্বদা বীরের মতো প্রস্তুত ছিলেন। তাই শত ভয়ভীতি সত্ত্বেও ৭ মার্চ পরম সাহসী যোদ্ধার মতো বীরবেশে মঞ্চে উঠে দাঁড়ান এবং বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন লালিত স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

যখন এ ভূমিকাটি রচিত হচ্ছে তখন ঢাকার শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে গণজাগরণ মঞ্চে নতুন প্রজন্মের (১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম) গগণবিদারি/দুনিয়া কাঁপানো আন্দোলনের ১১তম দিন (০৫.০২.২০১৩-১৫.০২.২০১৩)। ৭ মার্চের ৪৩তম বছর পূর্তির আর মাত্র ২৩ দিন বাকি। বাঙালি সংস্কৃতির শক্তিমত্তা এবং সেই শক্তিমত্তায় সুগঠিত জাতিসত্তা যে কত গভীর শক্তিময় তা আমাদের উপলব্ধিতে ছিল অতিব সংগোপনে—একবার তার প্রকাশ ঘটলো ১৯৭১-এর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমানের আহ্বানে—যখন বাঙালি তার বুকের তাজা রক্ত, মা-বোনের সম্ভ্রম ঢেলে দিতে দ্বিধান্বিত হয়নি—সেই বাঙালিই এবার আবার আরো ভয়ঙ্করভাবে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। প্রথমে শাহবাগে, গণজাগরণ মঞ্চে যা 'প্রজন্ম চত্বর'

২০১৩ নামে খ্যাত হলো এবং পরে সারাদেশব্যাপী তা বিস্তার লাভ করল। তারুণ্যের জোয়ারে এখন দেশ ভাসছে। এখন যা চলছে তা অভূতপূর্ব, যা কল্পনার জগতও ছাড়িয়ে। আমাদের সংস্কৃতির শিকড় কত গভীরে, কতটা তলদেশস্পর্শী, কতটা শক্তিময়, মহামহীম—শত্রুকুলকে তা আঙ্গুল স্পর্শ করে দেখিয়ে দিচ্ছে। তারুণ্যের এই প্রচণ্ড-প্রবল উচ্ছ্বাস আমরা যারা একাত্তরের সাক্ষী এবং মুক্তিযোদ্ধা, আর যারা একাত্তর দেখেন নি এই দুই প্রজন্মকে বিস্ময়করভাবে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছে। জাতির মননে এমন এক প্রণোদনা জাগিয়ে তুলেছে এ প্রজন্মের তরুণেরা যা দেখে আমরা যারা বাঙালি সংস্কৃতির শক্তিমত্তায় পরম আত্মবিশ্বাসী তারা পর্যন্ত হতবাক হয়ে যাচ্ছি। তবে এ কথা বলতেই হবে যে, যে জাতি জন্ম দিয়েছে ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭১ তার যে আর জয় ছাড়া পরাজয় বরণের কোনো সুযোগ বা ফাঁক-ফোকড় নেই। তাই শতকরা নিরানব্বইভাগ মানুষ এক বাক্যে বলছে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু'। 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। এইখানে, এইদেশে একাত্তরের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী আর কোনো মানুষের বা দলের স্থান নাই।

এ গ্রন্থে লিখেছেন ৫৭ জন লেখক-গবেষক-পণ্ডিত। আমরা লেখাগুলো ১০টি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি। অধ্যায়গুলো হচ্ছে : ১. রাজনীতি, ২. ইতিহাস, ৩. যোগাযোগ বিজ্ঞান, ৪. নৃতত্ত্ব ও জাতীয়তা, ৫. তুলনামূলক আলোচনা, ৬. ফোকলোর বা লোকজ উপাদান, ৭. ভাষাবিজ্ঞান, ৮. সমরনীতি, ৯. সমাজতত্ত্ব ও ১০. অর্থনীতি।

এ ছাড়া বিবিধ হিসেবে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে। যার শিরোনাম *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য পর্যালোচনা*!

এই পর্যায়ে এ গ্রন্থে মুদ্রিত অধ্যায়ের ক্রম অনুসারে কতিপয় প্রবন্ধের উপর আলোচনা করতে চাই।

রাজনীতি

এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ১৫টি প্রবন্ধ। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য সীমাহীন। একটি ভাষণ একটি জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণ করেছে। বাঙালি-জাতিরাষ্ট্র গঠনের পশ্চাতে ভাষণটি প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে নয়মাসব্যাপী যুদ্ধকালীন সময়ে। এই ভাষণটি আজো আমাদের স্বাধীন সার্বভৌমভাবে বেঁচে থাকার, অন্যায়কে অন্যায় বলার, মানুষকে ভালোবাসার প্রণোদনা দিয়ে চলেছে। নয়মাসব্যাপী আমরা যে মুক্তিযুদ্ধ করেছি তার অন্যতম প্রেরণা সঞ্চারী উপাদান ছিল বঙ্গবন্ধুর এই ৭ মার্চের ভাষণে। বঙ্গবন্ধুর নাম বলে, জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা জীবন বলি দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। কি বক্তব্য ছিল সেই ভাষণে, বাঙালির প্রাণের-হৃদয়ের কি ভাষায় সাজানো ছিল সেই ভাষণ। ১৬ জন

রাজনীতিক-পণ্ডিত-গবেষক-পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবী এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার *ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ : কিছু স্মৃতি* শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি এ সংকলনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই স্মৃতিকথাটুকু বাংলার রাজনীতির ক্রান্তিকালের দলিল; এ লেখায় ৭ মার্চের ভাষণের প্রাক্কালের ঐতিহাসিক পটভূমি বিধৃত হয়েছে। সীমাহীন ভয়ভীতি ও বিপদের এমনকি প্রাণনাশের শতভাগ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ৭ মার্চে ভাষণ দিতে যাবার পূর্বমুহূর্তে তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ তথা পরিবারের অন্য সদস্যদের সহযোগিতার মনোভঙ্গিটি কেমন ছিল শেখ হাসিনা তা একজন দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় সাবলিল ভাষায়, নিটোলভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। ওই দিন কত মানুষ, কত মত, কত কাগজ, কত পরামর্শ। আব্বা সবই ধৈর্য্যসহকারে শুনেছেন। সব কাগজই গ্রহণ করেছেন। সারাটা দিন এভাবেই কেটেছে। যখন জনসভায় যাওয়ার সময় হলো তার কিছুক্ষণ পূর্বে আব্বা কাপড় পরে তৈরি হবেন। মা আব্বাকে ঘরে নিয়ে এলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আব্বাকে বললেন, ১৫ মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকার জন্য। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে মাথাটা টিপে দিচ্ছিলাম। মা বেতের মোড়াটা টেনে আব্বার কাছে বসলেন। হাতে পানদান, ধীরে ধীরে পান বানাচ্ছেন আর কথা বলছেন। যে কোনো বড় সভায় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে মা আব্বাকে কিছুক্ষণ একদম নিরিবিলি রাখতেন। সেদিন আব্বার একটু সর্দি ছিল। আমি গলায় কপালে ভিক্স মালিশ করে দিলাম। কাঁথাটা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকলেন।
> আমার মা আব্বাকে বললেন, সমগ্র দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ভাগ্য আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি আজ একটা কথা মনে রাখবে, সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে তুমি তাই বলবে। অনেকে অনেক কথা বলতে বলেছে। তোমার কথার ওপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত, তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে সেটাই ঠিক হবে। দেশের মানুষ তোমাকে ভালোবাসে, ভরসা করে।

শেখ হাসিনা এই প্রবন্ধে তাঁর মা ও বাবাকে নিয়ে সেই ক্রান্তিকালের যে স্মৃতিচারণ করেছেন, সেটি হয়ে উঠেছে বাংলার রাজনীতির ইতিহাসের এক অমিয় দলিল। আমরা আশা করি পাঠক বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারবেন।

এই লেখা থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব যে কতটুকু ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক তা পরিমাপ করতে পারি। ভাষণ দিতে যাওয়ার পূর্বের রূপকল্প-চিত্রকল্প ও বস্তুপরিচয় যেমন 'প্রায় প্রতিদিন মিটিং, সংবাদ সম্মেলন, ধানমণ্ডির ৩২ নং সড়ক, প্রিয়তমা বধূ-পত্নি শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে ১৫ মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকার নির্দেশ, বেতের মোড়া, পানদান,

কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক মাথা টিপে দেয়া, ভিক্স মালিশ করা। সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে তুমি তাই বলবে। ... তুমি যা বলবে সেটাই ঠিক হবে।' এই ক্রান্তিকালে এ পরিবারের সবার যেখানে দুঃশ্চিন্তায় নিমজ্জিত থাকার কথা, কিন্তু তা না হয়ে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ উল্টো—মা মেয়ে মিলে বঙ্গবন্ধুর মননে শক্তি ও সাহস জুগিয়ে যে পরিবেশ রচনা করে দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে এতে করে শতভাগ উদীপ্ত ও উজ্জীবিত হয়েছিলেন। শেখ হাসিনার লেখা থেকে ইতিহাসের এই কালটুকুর পরিচয় আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে জানতে পারলাম। বিশেষ করে মননশীল, উদ্দীপনাময় নাটকীয় পরিবেশ তৈরি যা মা ও মেয়ে মিলে রচনা করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুর মানসভুবনকে উদ্দীপ্ত-অনুপ্রাণিত করেছিল। নাটকীয়তা বলতে বুঝাচ্ছি যে, মাথা টিপে দেয়া, কপালে ভিক্স মালিশ করা, পানদান হাতে মোড়া নিয়ে ঘাটের পাশে বসা, আদর-স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা নিয়ে আলাপ-মতবিনিময় করা, ভবিষ্যতে কি করতে হবে তার নির্দেশ-উপদেশ দেয়া এভাবে একটি সুন্দর-মনোরম-মধুময় পরিবেশ তৈরি করা যা কার্যকরণভিত্তিক। অতঃপর বঙ্গবন্ধু স্বীয় পরিবার কর্তৃক উজ্জীবিত হয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হন।

সভা মঞ্চে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর খানিকটা বিলম্ব হয়েছিল; এ ইঙ্গিত আমরা অন্যদের লেখা থেকেও জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু তার সঠিক কারণ শেখ হাসিনার লেখা থেকে জানতে পারলাম।

বাংলার বিজ্ঞাননিষ্ঠ সমাজ চিন্তার স্মারক সরদার ফজলুল করিম ছিলেন ৭ মার্চের ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি *এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম* শীর্ষক নিবন্ধটি রচনা করেছেন অত্যন্ত দরদ ও নিষ্ঠা দিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শী হওয়াতে তাঁর লেখায় তৎকালের পরিবেশের বর্ণনার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। এ ছাড়া তিনি ক্যাসেটটিও বার বার বাজিয়ে শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : ক্যাসেটটি ছাড়লেই আমি যে কেবল তুলনাহীন সেই দরাজ কণ্ঠের আওয়াজ শুনি : ভাইএরা আমার মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো'—তাই নয়। আমার চোখের সামনে সমগ্র দৃশ্যপটটি ভেসে ওঠে। রেসকোর্সের বিরাট মাঠ। লোক আসতে শুরু করেছে দশটা না বাজতে। শেখ সাহেব বক্তৃতা দিবেন বোধ হয় আড়াইটায়। আমি থাকি তখন মতিঝিল কলোনিতে। চাকরি করি বাংলা একাডেমী।' এই বস্তুভিত্তিক নিটোল বর্ণনায় সমগ্র পরিবেশটা পাঠকের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

সরদার ফজলুল করিম নিবন্ধটি রচনা করেছেন ৭ মার্চের ভাষণের তেরো বছর পর। যখন এ দেশের রাজনীতির মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধুকে যেনতেনভাবে বাদ দেবার মহড়া চলছে। যে নেতা এই বাংলার মানুষকে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ঐক্যবদ্ধ করেছিল। প্রাণপন প্রচেষ্টা চলছে ইতিহাস থেকে

তাকেই বাদ দেবার। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সফল সমাপ্তিতে সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তিনি লিখিছেন :

> '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের সফল সমাপ্তিতে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ। এ কথা বাংলাদেশের যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য। এবং সকলেরই প্রতিযোগিতা, এই স্বাধীনতাযুদ্ধে তার অবদানই যে বিরাট, এ কথা প্রমাণ করতে। এবং এ কথাও স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ কোনো একটি দল বা গ্রুপের ছিল না।'৭১ সালের সংগ্রাম যথার্থই জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল এবং সেই সংগ্রামের অনস্বীকার্য নেতা শেখ মুজিব দলীয় নেতার অধিক হয়ে জাতীয় নেতার চরিত্র ধারণ করেছিলেন। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মধ্য পরিমাণ বিত্তের কৃষকের সংসারের একটি তরুণ জন্ম থেকে বা রাতারাতি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হয়নি। '৭১ সালে শেখ মুজিব যথার্থই বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন বলেই 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি তাঁর স্বআরোপিত উপাধি নয়। এ আখ্যা ছিল একটি সংগ্রামী জীবনের প্রতি দেশবাসীর সস্নেহ উপাধি। আর সে কারণেই বাংলাদেশের জীবনে আজকের দিনের বড় প্রশ্ন, সেই অবিসংবাদী জাতীয় নেতার নাম-নিশানা আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে কেন? সরকার প্রধান তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের এত যে স্মরণ প্রচেষ্টা, দিবস পালন, বক্তৃতা ও বিবৃতি দান, তাতে বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমানের যত নেতার নাম উচ্চারিত হোক না কেন, শেখ মুজিবের নাম অনুচ্চারিত।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে কী বলবেন এ নিয়ে বিদেশের সব রাষ্ট্রপ্রশাসন, গণমাধ্যম, সাংবাদিকসহ দেশের সব মানুষের আগ্রহ-উৎকণ্ঠা ছিল সর্বব্যাপী। বিশেষ করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার রাইফেল তাক করেছিল মঞ্চের দিকে, আর জঙ্গি বিমান সগর্জনে উড়ছিল হাজার জনতার মাথার উপর দিয়ে। তথাপি রেসকোর্স মাঠের দিকে মানুষের ঢল! তিনি লিখেছেন : 'পাকিস্তানি জঙ্গিবিমানগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে যখন আসা-যাওয়া করছিল এবং সে বিমান থেকে যে কোনো মুহূর্তে যে মৃত্যুর বাণ আমার বুকে এসে বিঁধতে পারে, সে কথা জেনেও আমার পা একটুও কাঁপছিল না। আমি ছুটে পালাতে চেষ্টা করিনি।' এটি কেবল সরদার ফজলুল করিমের মনোভঙ্গি নয়, এই মনোভঙ্গি রেসকোর্সে আগত সমগ্র জনতারও।

'৭১-এর ৭ মার্চকে সচোখে দেখাকে তিনি একজন বাঙালির জন্য সৌভাগ্য বলে মনে করেন। তবে এই দেখা হতে হবে সচেতনভাবে দেখা। অর্থাৎ মানুষকে তার জীবন প্রবাহের যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে ধরে রাখতে হবে, যেন পরবর্তীকালের মানুষ পূর্বকালের ঘটনা, ক্রিয়া-কর্ম প্রত্যক্ষের মতো বোধ করতে পারে। কারণ অতীতের মধ্য দিয়েই বর্তমানের সৃষ্টি—তা নাহলে মানুষ হবে শেকড়হীন-উদ্দেশ্যহীন। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন : 'অন্যদেশে প্রত্যেক যুগের সন্তানই তাদের অতীত সব মহৎ যুগকেই প্রত্যক্ষ করে এবং করে বলেই যে কোনো যুগের মহৎকে সে নিজের বর্তমান বলে বুকে আঁকড়ে ধরে আর জীবনদান করে তাকে রক্ষা করার সংগ্রামে। আর তাই কোনো মহৎই তার কাছে অতীত নয়। সব মহৎই তার কাছে বর্তমান। কেবল আমাদের বাংলাদেশেই অতীত মানে

বিস্মৃত, বিলুপ্তকাল এবং বর্তমান মানে অতীতকে অস্বীকারকারী এক যাযাবর।' তিনি বাঙালির এ ধরনের ইতিহাস বিস্মৃতির কঠোর সমালোচক। 'বঙ্গবন্ধু অভিধাটি নিয়েও তিন কথা বলেছেন, 'শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছিলেন নিজের ঘোষণায় নয়, সংগ্রামী জনতার সস্নেহ এবং সকৃতজ্ঞ ইচ্ছার প্রকাশে।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি লিখিত না অলিখিত, তিনি নিজে লিখেছেন, নাকি কেউ লিখে দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছেন সপ্রশংস ভাষায় : 'শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণটি কি কেউ লিখে দিয়েছেন, তাঁর সাথী, অনুসারী, কবি, সাহিত্যিক কেউ? না, কেউ লিখে দেয়নি। এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শেখ মুজিবের এই আরেক বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, আর দোষ বলি। লিখিত বক্তৃতা তিনি কোনোদিন পাঠ করেননি। লিখিত বক্তৃতা পাঠে তাঁর আড়ষ্টতা আসত।

শেখ মুজিব তাঁর সমগ্র জীবনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তৃতা করেছেন। কখনো অপর কারো লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেননি। তাঁর সকল ভাষণে তাই স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ, কথার অগোছালো ভাব, হয়তো পুনরাবৃত্তি, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্বিতায় ভাস্বর। এমন তেজ লিখিত ভাষণে কখনো আসতে পারে না। শেখ মুজিবের ভাষণ যেমন লিখিত হতো না, তেমনি তাঁর প্রদত্ত ভাষণকেও লেখা যেত না। তাঁর ভাষণ তাঁর মুখ থেকেই শোনা যেত আর সেই সাক্ষাৎ শোনাতেই তার যা কিছু তাৎপর্য প্রকাশিত হতো। তাই ৭ মার্চের ভাষণ লিখিত আকারে যখন আমরা পাঠ করতে যাই, তখন তাতে তাৎপর্যময় কথা আমরা পাই, কিন্তু শেখ মুজিবকে পাই নে।

'স্বাধীনতা' এবং মুক্তি শব্দ দু'টোর অর্থের দ্যোতনা ও তাৎপর্য তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ৭ মার্চের ভাষণের শেষবাক্য : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' বাক্যটি 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলেই শেষ করা যেত। কিন্তু তা না করে অধিকতর তাৎপর্যবহ শব্দ 'মুক্তি' ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি পরিণত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির বঞ্চিত-শোষিত মানুষের নেতায়। সরদার ফজলুল করিমের ভাষায় :

> শেখ মুজিব কতখানি ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, তা আমি জানিনে। কিন্তু সংগ্রামী মুজিব অচেতনভাবে হলেও অনুভব করেছিলেন, 'স্বাধীনতা'র চাইতে ব্যাপকতর তাৎপর্যের শব্দ 'মুক্তি'। স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করে যায় মুক্তি। স্বাধীনতার যদি ভৌগোলিক সীমা-চৌহদ্দি থাকে, মুক্তি অতিক্রম করে যায় সকল সীমাকে : মুক্তি বঞ্চনা থেকে, মুক্তি বৈষম্য থেকে, মুক্তি শোষণ থেকে, মুক্তি সংকীর্ণতা থেকে, কূপমণ্ডূকতা থেকে, মুক্তি সকল দীনতা থেকে। মানুষের জীবনে এর চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কি হতে পারে। সেই মহৎ স্বপ্নই উচ্চারিত হয়েছিল সেদিনকার সংগ্রামী মানুষের নিশানবরদার শেখ মুজিবের কণ্ঠে। স্বাধীনতার সংগ্রামের শুরু এবং শেষ আছে। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের শুরু অবশ্য আছে : বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষের ক্রমবর্ধমান চেতনার মধ্য দিয়ে তার শুরু। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের শেষ নেই। ক্রমমুক্তির মধ্য দিয়েই অধিকতর মুক্তিপানে মুক্তি সংগ্রামের অনিবার অগ্রগমন।

সরদার ফজলুল করিম এই নিবন্ধটি পাঠ করে আমরা বিস্মিত, অভিভূত ও মুগ্ধ হই। তাঁর এই বিশ্লেষণ ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে করেছে দ্যুতিমান। এ ভাষণকে তিনি কালজয়ী অভিধা দিয়েছেন। এ ভাষণের গুরুত্ব মর্যাদা-সম্মান-মূল্য কেবল বাংলাদেশের মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়—এ ভাষণ সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কালান্তরব্যাপী মুক্তির দিশারী। সেদিনের সেই রেসকোর্স ময়দান, বঙ্গবন্ধু এবং জনতা সব মিলে এক ইতিহাস। মুক্তিকামী জনতা, রেসকোর্স মাঠ এবং বঙ্গবন্ধু একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু সেদিন যা বলেছিলেন, তা কেবল সেদিনেরই তার বলা সম্ভব। ঐ মঞ্চ, ঐ জমায়েত এবং ঐ মাঠ—এ সবই সম্ভব করে তুলেছিল ঐ ভাষণ দেবার জন্য। ঐ সময়টা ছিল বাঙালির আজন্মকালের ইতিহাসে মাহেন্দ্রক্ষণ তার পরেও না, আগেও না, আর কখনি নয়। সরদার ফজলুল ৭ মার্চের ভাষণের স্থান-কাল-পরিবেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

> 'কিন্তু কেবলই কি যোশের ব্যাপার ছিল সেদিন এই ভাষণে; যোশের কথা তো যে কোনো সময়ে যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু সেদিন শেখ মুজিব যা বলেছিলেন, তা তাঁর পক্ষে সেদিনই মাত্র বলা সম্ভব ছিল, আর সে ভাষণের তাৎপর্য আজ কেবল তার শব্দের পুনর্বাজনার মাধ্যমে ধরা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন লাখো মানুষের জমায়েতভরা সেদিনের সেই রেসকোর্স, তার মধ্যে স্থাপিত সেই মঞ্চ, শেখ মুজিব এলেন একটু বিলম্বে, তিনি উঠলেন মঞ্চে, চারদিকে তিনি দৃষ্টি ফেললেন, দেখলেন লোকে-লোকারণ্য, শুনলেন আকাশে জঙ্গি বিমানের গর্জন এবং সেই গর্জনকেও অতিক্রম করে উঠছে উদ্বেল লাখো মানুষের সংগ্রামী আওয়াজ। দেখছেন লোক তখনো আসছে আর আসছে। আর এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে শেখ মুজিব বদলে যেতে লাগলেন নিজের অজান্তে। এমনি হয়। জনতার মধ্যে জন এমনিভাবে বদলায়। জনতার বাইরে জন তথা ব্যক্তির এক রূপ : ক্ষুদ্র, শঙ্কিত, সীমিত। জনতার অংশ হিসেবে জনতার মধ্যে তার অপর এক রূপ : তেজে কম্পমান, শক্তিতে দুর্বার আর সম্ভাবনায় অসীম'।

মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে লক্ষ জনতার কাতারে সরদার ফজলুল করিম ভাষণরত বঙ্গবন্ধুকে এবং সমাবেত জনতাকে এক নজর দেখার জন্য রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা ও বিবেচনাবোধ থেকে তিনি উপর্যুক্ত নিবন্ধটি রচনা করেন। তিনি নেতা, নেতৃত্ব, প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা-পারঙ্গমতা সবকিছুতেই বঙ্গবন্ধুকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। দীর্ঘদিনের মরণপণ সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন। হাজার বছরের বঞ্চনা-শোষণ-নির্যাতনের করাল গ্রাস থেকে বাঙালিকে মুক্তির মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেন। ১৯৪৮-১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর ২১ দফা ও যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের বিজয়, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের ১১ দফা এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সবকিছুর মূলে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব। ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতাকামী বাঙালির বীরগাঁথা, সংগ্রামের দলিল অর্থাৎ এক অনন্য

লিটারেচার—যাকে আমরা কবিতা, গদ্য কবিতা বা লোকগাঁথা বলতে পারি। এ সাহিত্যের ভাগিদার কেবল বাঙালি নয় সমগ্র বিশ্বের নিপিড়িত নির্যাতিত সংগ্রামশীল মানুষ। তাই বঙ্গবন্ধু একজন বিশ্বজনীন নেতা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লেখেছেন *পেছন ফিরে ৭ মার্চ*। তিনি লেখেন, '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের আহূত জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বঙ্গবন্ধু। এভাবে প্রচার হয়েছিল।... বঙ্গবন্ধু এই বক্তৃতায় একই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার করেছেন ও দেশবাসীকে বলেছেন প্রস্তুত থাকতে। এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তির কথায় কাজ হবে না। অস্ত্রের ভাষাতেই যা বলার বলতে হবে। তিনি জনতার প্রতিরোধের শক্তিতে আস্থা রেখেছেন। এবং চূড়ান্ত জয়ের প্রশ্নে কোনো অস্পষ্টতা রাখেন নি।' অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বলে গণ্য করা যায় বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, ৭ মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত প্রত্যয়নকে চেতনায় ধারণ করে বাঙালি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে লড়েছে ও জয়ী হয়েছে।

তাঁর এ মতের সঙ্গে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করি। কারণ বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই বলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' অর্থটা কী দাঁড়াচ্ছে? বাংলার প্রতিটা ঘরই হবে দুর্গ এবং লাঠি-সোটা, দা-কাচি, যুতি-কুচি, ফালা-বল্লম, খুন্তি-পাচন, ঝাটা-শাপটা, লাঙ্গল-কোদাল, শাবল-ট্যাটা, বন্দুক-রাইফেল যা কিছুই থাক না কেন তাই নিয়ে শত্রুকে রুখতে হবে, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে হবে যে কোনোভাবে, যে কোনো মূল্যে—এই আহ্বান তিনি জাতির কাছে রাখলেন। তার আগেই তিনি জাতিকে যুদ্ধের জন্য, আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় শিষ্য-সহযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন :

> '৭ মার্চ এলেই মনে পড়ে ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নয়ন জুড়ানো স্বাধীনতার অমর মহাকাব্য পাঠের দৃশ্য। অমন দৃষ্টপট আর জাতির জীবনে আসেনি। আর কখনোই আসবে না অমন গৌরবময় সোনালি দিন।... বঙ্গবন্ধু সেদিন নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র বীরের জাতিতে পরিণত করেন। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে ছুটে আসা ১০ লাখেরও বেশি জনতা ছিল প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দেয়ার একেকজন দূত। সেদিন স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার উন্মাদনা ছড়িয়েছিলেন। সেই উন্মাদনা গোটা জাতির রক্তে ছড়িয়ে ছিল।'

অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু গোটা জাতিকে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ করে তুলেছিলেন। বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ৬ দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট অতি দ্রুত চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। নির্বাচনী ফল বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের মুখোমুখি নিয়ে এসে দাঁড় করায়। এমন ফলাফলের জন্য শাসকগোষ্ঠী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পাকিস্তান এমনিতেই ছিল সামরিক আমলাতন্ত্রের অধীনে। নির্বাচনের এই ফল দেখে সেই চক্র প্রমাদ গোনে এবং শুরু করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এ বিষয়ে সদাসতর্ক। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৭ মার্চের ভাষণের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু এই ৭ মার্চের ভাষণে তিনি কী বলবেন এ নিয়ে শাসককূল বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। এটা অনেকটাই বোঝা যাচ্ছিল যে, এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি শাসকচক্র কী করতে পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ দিন দিনই ফুঁসে উঠছে, এমনি ক্রান্তিকালে ৭ মার্চ এগিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে তিনি যেন বহির্বিশ্বে চিহ্নিত না হন সেদিকে তিনি ছিলেন সদাসতর্ক। এ বিষয়টি অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

হাসনাত আবদুল হাই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে বলেছেন, 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা'। তিনি এ মতের পক্ষে বিস্তৃত আলোচনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধু দুই বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, এক. দেশবাসী এবং দুই. পাকিস্তানের বর্বর সামরিক জান্তা। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি কোনো প্রকার দ্ব্যার্থবোধক অবস্থান গ্রহণ করেন নি। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল তাতে বাঙালির স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। ছাত্র সমাজ চেয়েছিল ৭ মার্চেই স্বাধীনতার ঘোষণা ও যুদ্ধ শুরুর নির্দেশ। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের স্বাধীনতনার ঘোষণা দিয়েছেন আবার যুদ্ধ শুরুর জন্য দেশবাসীকে সশস্ত্রভাবে প্রস্তুত হতে বলেছেন, 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'। হাসনাত আবদুল হাই লিখেছেন :

> 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটিকে ঐতিহাসিক বক্তৃতা বলা হলে যথেষ্ট হবে না। সেই বক্তৃতা পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা। ভাষার শক্তিতে, আবেগের স্ফূরণে এবং বক্তব্যের শাণিত ক্ষুরধারে ৭ মার্চের বক্তৃতা ছিল অসাধারণ এবং অদ্বিতীয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো রাজনীতিবিদ বা গণনায়ক কখনো এমন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে, তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় এবং সময়োপযোগী করে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার উদাহরণ নেই। বঙ্গবন্ধু ভালো বক্তা ছিলেন এবং সব সময়ই বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু ৭ মার্চের বক্তৃতা শুধু তার নিজের অতীত সব বক্তৃতা নয়, আরো অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নেতার বক্তৃতাকে অতিক্রম করে গেছে। তুলনায় কাছে আসতে পারে এমন কোনো বক্তৃতার কথাও মনে করা যায় না, এতই বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী ছিল তার সেই বক্তৃতা। তার সামনে উপস্থিত ছিল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাসহ লাখো জনতা। বক্তৃতা শুনে কেবল তারাই অনুপ্রাণিত, উদ্দীপ্ত এবং সংকল্পবদ্ধ হয়নি; যারা রেডিওতে শুনেছে, অযুত, কোটি সেই সব শ্রোতাও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতো একইভাবে আবেগে, উচ্ছ্বাসে এবং অকুতোভয়ে উদ্বেলিত হয়েছে। বক্তৃতার প্রতিটি কথা স্পর্শ করেছে হৃদয়ের তন্ত্রী এবং একই সঙ্গে মনন ও প্রাজ্ঞতার যৌক্তিক মানদণ্ড। সেই বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলতে হয়েছে, আবার একই সঙ্গে নিময়তান্ত্রিক উপায়ে জনগণের দাবি ও অধিকার মেনে নেওয়ার জন্য শাসকদের শেষ সুযোগ দিয়ে আহ্বান করা হয়েছে। বিপরীত দুই শক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য এমন মোক্ষম বক্তব্য উপস্থাপন এক অভাবনীয় কৃতিত্ব।... যদি স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে না নেওয়া হয় এবং বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ শাসনের সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধ যে অনিবার্য, এ ঘোষণাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার বক্তব্যে। জনগণকে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন তিনি স্পষ্ট ভাষায়। তিনি তাদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছেন, যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।'

ইতিহাস

এ অধ্যায়ে ১৮টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলো লিখেছেন প্রথিতযশা আইনজীবী, সাংবাদিক, কলামিস্ট, ইতিহাসবিদ, স্থপতি ও পণ্ডিতগণ। প্রথমে আমরা বিবেচনায় নিতে পারি বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের লেখা 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও গণতান্ত্রিক চেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। তিনি পূর্বাপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন। এটি অত্যন্ত সুললিত ও পরিমার্জিত ভাষায় লেখা। তিনি বঙ্গবন্ধুকে 'ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক কারিশম্যাটিক নেতা বলেছেন; যেখানে জনগণ নেতার সঙ্গে আর নেতা জনগণের সঙ্গে এক'। তিনি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এ প্রবন্ধে ছয়দফা আন্দোলনের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে কখনই নিরঙ্কুশভাবে জনগণের হাতে ক্ষমতা আসেনি। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতার অধিকারী হল তখন শুরু হল পাকিস্তানি শাসকচক্রের টালবাহানা। রাষ্ট্র তখন একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে চলে যাচ্ছে; কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সে দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন চলছে। এ অবস্থায় ৭ মার্চ রাজনৈতিক আকাশে টালমাটাল অবস্থা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। তবু বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে কেন সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না তার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন কামাল উদ্দিন হোসেন :

> 'এই ৭ মার্চে শেখ মুজিব অনেকের অনুরোধ, অনেকের প্রত্যাশা, আমাদের মত অনেকের রেডিয়োর কাছে আগ্রহে অপেক্ষা সত্ত্বেও সরাসরি কেনো স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তখন হতাশ হলেও পরে একটা গণতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ পেয়েছি তা বলতে হয়। এই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শেখ

মুজিবের নেতৃত্বে সেই ছয় দফার ডাক থেকে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গণআন্দোলন করে এসেছে। কোনো সশস্ত্র গণবিপ্লবের পথ ধরেনি। সশস্ত্র বিপ্লব আর ৭ মার্চের গণসম্মেলন এক নয়। তার ওপর এই সম্মেলনের নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জননেতা, জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী দখলদার বা অকুপেশন বাহিনী হলেও হানাদার বাহিনী হয়নি, হতে পারে শেষ পর্যন্ত হয়ও, কিন্তু তা ৭ মার্চে নয়, তখনও শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত ছিল, ইয়াহিয়া গণপরিষদের অধিবেশন ডাক দিলেই চুকে যায়। তিনিও দায়মুক্ত। শেখ মুজিব দায়বদ্ধ। গণপরিষদ যা নির্ধারণ করবে তাই হবে গণতান্ত্রিকভাবে বিধিসম্মত। সেই দিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে, ইয়াহিয়া বলতে পারতেন আওয়ামী লীগ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শেখ মুজিব সেই প্রচণ্ড উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে সংযত থেকে প্রজ্ঞার সঙ্গে গোটা পরিস্থিতিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ রাখলেন। জনগণও মেনে নেয়। নজিরবিহীন ঐতিহাসিক সার্বিক গণঅসহযোগ আন্দোলন সূচনা করলেন, সম্পূর্ণ অচল করে দিলেন, ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা পাক বাহিনী কান্টনমেন্টে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। সারা দেশে হাইকোর্টের বিচারকবৃন্দ, সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্টেট ব্যাংকের অধিকর্তাগণ থেকে নিম্নতম জনসাধারণ শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বেচ্ছায় পরিচালিত হতে থাকল। সত্যিই এক গণাতান্ত্রিক গণবিপ্লব, গৌরবময় বিপ্লব সূচিত হলো।'

৭ মার্চের ভাষণে উচ্চারিত ভাই, বাংলা, বাঙালি শব্দগুলো নিয়ে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান বলেন নি, পূর্ববাংলা বলেন নি, বলেছেন বাংলা। বলেছেন হিন্দু-মুসলমান যারা আছে তারা আমাদের ভাই। যা দ্বিজাতিতত্ত্বের সৃষ্ট পাকিস্তানের চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এই সম্বোধন করে বাঙালি জাতীয়তার নবজাগরণ ঘটালেন। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র হবে বাংলাদেশ। তাঁর স্বপ্নে এটা তিনি দৃঢ়ভাবে লালন করেছেন এবং সেটা কার্যকরও করেছেন। সর্বশেষে কামাল উদ্দিন হোসেন ৭ মার্চের ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী সরদার ফজলুল করিমের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধের একটি চিত্তাকর্ষক অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে চাই :

> কিন্তু কেবলই কি যোশের ব্যাপার ছিল। সেদিন এই ভাষণে যোশের কথা তো যে কোন সময়ে যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু সেদিন শেখ মুজিব যা বলেছিলেন, তা তার পক্ষে সেদিনই মাত্র বলা সম্ভব ছিল, আর সে ভাষণের তাৎপর্য আজ কেবলমাত্র তার শব্দের পুনর্ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ধরা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন লাখো মানুষের জমায়েত ভরা সেদিনের সেই রেসকোর্স, তার মধ্যে স্থাপিত সেই মঞ্চ। শেখ মুজিব এলেন একটু বিলম্বে, তিনি উঠলেন মঞ্চে, চারদিকে দৃষ্টি ফেরালেন, দেখলেন লোকে লোকারণ্য, শুনলেন আকাশে জঙ্গী বিমানের গর্জন এবং সেই গর্জনকেও অতিক্রম করে উঠছে উদ্বেল লাখো মানুষের সংগ্রামী আওয়াজ। দেখলেন, লোক তখনো আসছে আর আসছে। আর এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে মুজিব বদলে যেতে লাগলেন নিজের অজান্তে। এমনি হয়। জনতার মধ্যে জন এমনিভাবে বদলায়। জনতার বাইরে জন তথা ব্যক্তির এক রূপ, ক্ষুদ্র, শঙ্কিত, সীমিত। জনতার অংশ হিসাবে জনতার মধ্যে তার অপর এক রূপ তেজে কম্পমান, শক্তিতে দুর্বার আর সম্ভাবনায় অসীম। এক জাতির উদয়।

এরপর আমরা উল্লেখ করছি সাংবাদিক-কলামিস্ট এ বি এম মুসার লেখা 'সেই দিন সেই ভাষণে' শীর্ষক প্রবন্ধের কথা। তিনি বঙ্গবন্ধুর অন্যসব ভাষণ থেকে ৭ মার্চের ভাষণের পার্থক্য নিরূপণ করে বলেছেন, 'এ ধরনের একটি ভাষণ একজন জীবনে একবারই দিয়ে থাকেন। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে কি বলবেন এ নিয়ে দেশে তো বটেই বিদেশেও বিতর্কের ঝড় উঠেছিল; যা কোনো ভাষণের পূর্বে ঘটে নি।

কে এম সোবহান 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও বঙ্গবন্ধু' নামক প্রবন্ধে যুক্তির অবতারণা করেছেন এই বলে যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়—কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ইতিহাস বিকৃতির সূচনা করেন জিয়াউর রহমান। বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতি আগ্রাসনকারীদের কবল থেকে মুক্তির জন্য ১৯৪৮-৫২ থেকে যে মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটে তা অস্বীকার করা হয়। এখান থেকেই ইতিহাস বিকৃতির পালা। তবে এই অন্ধকার গলির মধ্যে জাতিকে ঠেলে দিয়ে যে মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহ্য মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে জাতি অচিরেই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। কাজেই তার সেই কার্যক্রম আর বেশিদূর এগুতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৭ মার্চের ভাষণের দর্শনই বাংলাদেশে কার্যকরভাবে এগিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ পরবর্তী কার্যপ্রণালী চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতার আহ্বান হিসেবে কার্যকর হয়। কে এম সোবহান বলেন :

> '৭ মার্চে রেসকোর্সের ময়দানে দশ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা দিলেন, আর বাংলাদেশের জন্যে বাঙালি জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। তার বক্তৃতা রেসকোর্স ময়দান থেকে রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক সরাসরি প্রচারের কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার তা করতে দেননি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে ৮ মার্চ থেকে কী করতে হবে এবং হবে না তার নির্দেশ দিলেন এবং বাংলার মানুষকে, পূর্বপাকিস্তান সরকারকে কী করতে হবে তাও বললেন। তিনি বললেন, কোনো ট্যাক্স আদায় করা চলবে না। বাংলাদেশের সমস্ত সরকারি বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতসমূহ হরতাল চালিয়ে যাবে। এভাবে তিনি ১০টি করণীয় কর্তব্য জানালেন। সর্বশেষে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর আগে তিনি জনগণকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন।'

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ মিয়ার *বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ* শীর্ষক লেখাটি স্মৃতিচারণমূলক। এটি সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁর প্রণীত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* নামক বই থেকে। স্মৃতিচারণমূলক হলেও এই লেখাটি আজ ইতিহাসের দলিল হিসেবে স্বীকৃত

হওয়ার যোগ্য। ভাষণ দিতে যাবার আগমুহূর্তে পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর এ লেখায়। ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি থেকে ৭ মার্চের ঘটনা প্রবাহের এক জীবন্তচিত্র আঁকেন। তিনি লেখন :

> '৭ মার্চ সকালে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আওয়ামী লীগের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভরে যায়। উপস্থিত সবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশে পরিণত করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমেদ ও ড. কামাল হোসেন সাহেবদের সঙ্গে লাইব্রেরি রুমে দ্বার রুদ্ধ করে আলাপে বসেন। সুদীর্ঘ আলোচনার পর লাইব্রেরি কক্ষ থেকে বসার ঘরে অপেক্ষারত আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং ঐদিন বিকেল সাড়ে চার ঘটিকায় রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিব্য সভায় দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করে একটি চার দফার ঘোষণা দেয়া হবে। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তৎমর্মে জনাব কামরুজ্জামান, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ড. কামাল হোসেনকে নির্দেশ দিয়ে গোসল ও দুপুরের আহারের জন্য বাড়ির ওপর তলায় চলে যান। আহার শেষে বঙ্গবন্ধু যখন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে সময় এক ফাঁকে এসে ড. কামাল হোসেন তাঁকে প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখিয়ে নেন। ততক্ষণে আওয়ামী লীগের অপর পাঁচ নেতা নিজ নিজ বাসায় দুপুরের আহারের জন্য চলে গিয়েছিলেন। ড. কামাল হোসেন উপরোল্লিখিত ঘোষণাপত্রটি টাইপ করিয়ে নেয়ার জন্য নীচে চলে গেলে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন আমি যেন ঐ ঘোষণাপত্রটির টাইপড্ (চূড়ান্ত) কপিটি সেটির অনুমোদিত মূল খসড়াটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। ঘোষণাপত্রের খসড়াটি বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহকারী মোহাম্মদ হানিফকে টাইপ করার নির্দেশ দিয়ে ড. কামাল হোসেন আহারের জন্য তাঁর বাসায় চলে যান।'

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্বমুহূর্তে প্রচারের জন্য চার দফার একটি ঘোষণাপত্র নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত করেন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি পূর্ণসমর্থন জ্ঞাপন করে এই ঘোষণাপত্রটি প্রস্তুত করা হয়। উক্ত ইশতেহারে ইয়াহিয়া খানের নিকট দাবি করা হয় :

১. সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
২. ১লা মার্চ হতে আন্দোলনে যে সমস্ত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে তদন্ত করে সে ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।
৩. সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।
৪. অবিলম্বে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের বিকেলে যে ভাষণ প্রদান করবেন, এ ভাষণে তিনি কি বলবেন এ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের অন্তহীন কৌতূহল-উৎকণ্ঠা। এ নিয়ে

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা-শাসকচক্রেরও ঘুম হারাম হবার অবস্থা, বঙ্গবন্ধু কি বলবেন, কি বলতে পারেন! বিদেশি সাংবাদিকরা, রাষ্ট্রদূতরা অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা-আশঙ্কার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছেন, কি জানি কি হয়। বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ফেলেন তাহলে পরিস্থিতি কি হব, কতটা ভয়াবহ হতে পারে, কি পরিমাণ রক্তপাত হতে পারে, এই ভাবনা সেদিন বিশ্বব্যাপী। এম. এ ওয়াজেদ মিয়া এই অবস্থার নিটোল বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

> 'সেদিন রেসকোর্স ময়দানে নৌকা আকৃতির সভামঞ্চটি স্থাপন করা হয়েছিলো বর্তমান শিশুপার্কের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। হাসিনার অনুরোধে আমি বহু কষ্টে সভামঞ্চের কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে যাই। বঙ্গবন্ধু তখনো সভামঞ্চে এসে পৌঁছাননি। এর প্রায় পনের মিনিট পর বঙ্গবন্ধু সদলবলে সেখানে পৌঁছান এবং মঞ্চে উঠে সবাইকে অভিবাদন জানান। হাসিনা আমাকে বলে, "বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখেছে, আব্বার আজকের সম্পূর্ণ বক্তৃতা রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।" সে আমাকে গাড়ির রেডিও অন করতে বলে। রেডিওতে তখন বারবার এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিলো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেডিও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। যা হোক, বঙ্গবন্ধু প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করেন এবং শেষ প্রান্তে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ... এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা লাঠিসোটা ঠোকাঠুকি করে বিজয় উল্লাসে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা শ্লোগান দিলে উপস্থিত জনতা জয় বাংলা শ্লোগান তুলে প্রত্যুত্তর দেন। বঙ্গবন্ধু আবার জয় বাংলা বললে জনতা জয় বাংলা ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। খোদা হাফেজ বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। সভা শেষে আমি হাসিনা ও শ্যালিকাদের নিয়ে একই রাস্তায় ৩২ নম্বরে ফিরে আসি। বঙ্গবন্ধু প্রায় আধ ঘণ্টা পর বহু লোকজনসহ বাসায় ফিরে আসেন।'

তাঁর লেখাটি পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতার এক চকপ্রদ বর্ণনা। যেন আমরা ইতিহাসের সেই কালপর্বটি চিত্রকরের অঙ্কিত ছবির মত দেখতে পারি। সবদিক থেকে লেখাটি যে বিশেষ মূল্যবান তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্থপতি রবিউল হুসাইন তাঁর *বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ও সেই সময়* শীর্ষক প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের জনসভা থেকে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি কৌশলগত কারণেই। তিনি যদি ৭ মার্চে বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘোষণা দিতেন তাহলে ঐ ময়দানেই রক্তের বন্যা বয়ে যেতে পারত এবং বঙ্গবন্ধুকে সন্ত্রাসবাদী বা দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করার সুবর্ণ সুযোগ পাকিস্তানি জান্তার ঘটতো। তিনি উদাহরণ হিসেবে বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপর নির্বিচারে গুলি ও বোমাবর্ষণের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'এছাড়া এদেশ হচ্ছে সমতল ভূমি, বনজঙ্গল বা পাহাড়-পর্বত ঘেরা নয় যে দীর্ঘদিনের জন্যে গেরিলাযুদ্ধ করে সুবিধা পাওয়া যেতো। এ সমস্ত কারণে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি এমনই এক নিজগুণে ভাস্বর এবং উজ্জ্বল যে যুদ্ধ শুরুর পর তিনি সহজেই চিন ও আমেরিকার সমর্থন ছাড়াই আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তিনি যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার কট্টর অনুসারী ছিলেন, এ কারণে তার পক্ষে এইরূপ সুদূরপ্রসারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়া সম্ভবপর হয়েছিল। সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্গবন্ধুর মতো অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো জননেতা এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দান করেননি। এইজন্যে তাঁকে আন্তর্জাতিকভাবে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এবং এই জন্যে তাঁকে বাঙালি জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়, যার নীতি ও কৌশলে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সূর্য এই পোড়া ও অবহেলিত দেশে যুগযুগ পর উদিত হয়।'

ইতিহাসের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন *সেই ৭ মার্চ* নামক প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সব থেকে কঠিন সমস্যায় নিপতিত হয়েছিলেন ১৯৭১-এর মার্চে। একদিকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু অন্যদিকে স্বাধীনতাপাগল উন্মত্ত বাঙালি। বাঙালির এই উত্তেজনা-উন্মত্ততার উদ্‌গাতাও স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। বিপদের আশঙ্কা দেখে কতক নেতা ইতোমধ্যে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়েছে; কতক নেতা আসফালন করছে কিসের স্বাধীনতা! পাকিস্তানি মেলেটারি একটা ডলা দিলেই সব ফতে। কতক আবার প্রমাদ গুণছে ফরিদপুরের এই সাহসী লোকটা বাঙালিকে যেভাবে স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ করে তুলেছে তা যে সহজেই চুকে যাবে তা হয়তো নয়; কাজে কাজেই ছলা-কলার আশ্রয় নিতেই হবে; সে যতই না অমানবিক ও অনৈতিক হোক না কেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সম্মুখে কঠিন পরীক্ষা, যেন সাপও মারতে হবে লাঠিও ভাঙবে না। ৭ মার্চে তিনি ভাষণে কি বলবেন, সে বিষয়ে অনেকে অনেক পরামর্শ দিলেন, এটা বলতে হবে, ওটা বলতে হবে, এটা বলা যাবে, ওটা বলা যাবে না। সব শেষে দায়িত্বটা বর্তালো নেতারই কাঁধে, অর্থাৎ যার ব্যথা তার ঘাড়ে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ড. কামাল হোসেনের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, '৭ মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে, ছাত্রসমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং রাজনীতি-সচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।' এই মহাবিপদসংকুল মুহূর্তেও কিন্তু নেতাকে সঠিক সিদ্ধান্তই নিতে হবে। এবং তিনি নিয়েছিলেনও তাই—যা ছিল শতভাগ নির্ভুল। মুনতাসীর মামুন লিখেছেন :

'সুতরাং দল ও দলীয় নেতা শেখ মুজিবের ওপর দায়িত্ব এসে পড়েছিল এমন কিছু না বলা, যা পাকিস্তানি পক্ষকে তখনই অজুহাত দেবে অপ্রস্তুত জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। আবার একই সঙ্গে চাঙ্গা রাখতে হবে আন্দোলন ও জনগণকে। এ

ভারসাম্য বজায় রাখা নিতান্ত সহজ ছিল না। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে তখনও তাঁকে কাজ করতে হচ্ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে যেখানে তাঁর অবস্থান ছিল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এখন আমাদের কাছে ব্যাপারটি যত সহজ মনে হচ্ছে তখন নিশ্চয় তা ছিল না। এছাড়া ছিল তরুণ বিশেষ করে ছাত্রদের প্রবল চাপ। তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ফেলেছেন। আন্দোলনে তারাই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। তাদের বিরূপ করা সম্ভব ছিল না।'

আবুল মোমেন তাঁর 'কালোত্তীর্ণ ভাষণটি বাঙালি জাতির অনন্ত প্রেরণা' শীর্ষক প্রবন্ধে ভাষণটিকে এক মহান শিল্পকর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন যেকোনো বাঙালিকে ভাষণটি আলোড়িত-আলোকিত করবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি বলেন : বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণটি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে অনির্বাণ শিখার মত। এর আলো আজও আমাদের পথ দেখায়। চল্লিশ বছরের ব্যবধানেও এটি আজও তাজা, প্রাসঙ্গিক এবং একইভাবে উদ্দীপনাময়। হ্যাঁ যৌক্তিক কথাই তিনি বলেছেন, এ ভাষণ আজও প্রাসঙ্গিক ও উদ্দীপনাময়। ক্যাসেটটি অন করলে যে দরাজকণ্ঠ ভেসে আসে, তা শ্রবণ করে সব বাঙালিই উদ্বেলিত-উত্তেজিত আশান্বিত এবং উৎফুল্ল হয়ে উঠে'।

মোমেন একদিকে বলেছেন শিল্পকর্ম। শিল্পকর্ম বিষয়টি কি? একটি ভাষণ শিল্পকর্ম হিসেবে তখনই পরিগণিত হবে যখন ভাষাভঙ্গি, উচ্চারণ, উপস্থাপন পদ্ধতি নিখুঁত এবং সুচারু হয়। এ ভাষণ উল্লেখিত সব ক্ষেত্রেই সফল; তাই এ ভাষণটিকে একটা শিল্পকর্ম অবশ্যই বলতে পারি। তিনি লিখেছেন :

এই শিল্পকর্মে কী আছে তার খোঁজ নেওয়া যাক। ভাষণটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক তারে বাঁধা ছিল, যেন বজ্রকণ্ঠের লক্ষ্যভেদী শব্দায়ুধ প্রতিপক্ষের সব বাধা ছিন্নভিন্ন করে জাতিকে স্বাধীনতার ঘাটে পৌঁছে দেবেই। এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাগ্মিতার জাদুতে—বক্তব্যে সমালোচনা, অভিযোগ, ক্ষোভের প্রকাশ তো ছিলই, কিন্তু তাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও চূড়ান্ত ঘোষণার গুরুত্ব চাপা পড়ে নি। বক্তৃতা মূল অভীষ্ট সাধনে ভুল হয় নি। উপস্থিত বক্তৃতা হওয়া সত্ত্বেও শব্দের হাতড়ানো, লাগসই শব্দ অভাবে যতি কিংবা যথার্থ বয়ানের ব্যর্থতায় বক্তব্য অস্পষ্ট বা জটিল হওয়ার মত কোন অঘটন ছাড়াই টানা বলে গেছেন তিনি। ঠিক যেন চয়িত শব্দফুলের মালা গাঁথলেন এক মহাকবি। মাঝে মাঝে লোকজ শব্দের ব্যবহার—যেমন দাবায়ে রাখতে পারবা না—বক্তৃতাটিকে দিয়েছে দেশজ সৌরভ, এবং মুজিব-ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা। আর যখন আবেগের তোড়ে ধাবমান বেপরোয়া বাক্যকে অর্থের শাসনে সামলে নিতে হয়েছে তাও এই বাগশিল্পীর প্রতিভার ছোঁয়ায় মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। বক্তা যেমন তেমনি শ্রোতাও খেই হারায় নি কখনও, উভয়েরই মস্তিষ্ক ও হৃদয় একই প্রেরণায় যুগপৎ সক্রিয় থেকেছে সারাক্ষণ।

মুক্তি পাগল বাঙালি। একটি ভূখণ্ড তার চাই-ই। এই সাধ তাঁর আজন্মকালের। বঙ্গবন্ধু জাতির সেই সাধের গন্ধ মনে-প্রাণে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

একটি ভাষণের কথামালা একটি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিল জীবন যুদ্ধে ঝাপিয়ে পরতে। এ ভাষণই বাংলার সব মানুষকে জয় বাংলার সৈনিকে রূপান্তর করেছিল। এ ভাষণ জাতিকে স্বাধীনতার মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহানায়ক আর এ ভাষণই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার অফুরন্ত উৎস। আবুল মোমেন লিখেছেন :

> এই ভাষণ ঘরকুনো নিতান্ত ছাপোষা বাঙালিকে রূপান্তরিত করেছিল বীরের জাতিতে। সর্বোচ্চ ত্যাগে অকুণ্ঠিত চিত্তে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিয়েছে। এই ভাষণের পরে কারও মনের সামান্য দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল, স্বভাবত বিভক্ত, কলহপ্রিয় মানুষগুলো সব ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পেল এ থেকে। এই ঐক্য কোন সীমা মানে নি, জাত মানে নি—সকল বাংলা ভাষাভাষিকে এক করে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবন, সংসার, পরিবার, নিজেদের নৈমিত্তিক কাজগুলো বড্ড ছোট অকিঞ্চিৎকর মনে হতে থাকল। এই একটি ভাষণ সবার অন্তরের রুদ্ধ কপাটগুলো খুলে দিয়ে সকল ক্ষুদ্র ভাবনা দূর করে তাদের নিয়ে এল জাতীয় জীবনের ঘটমান ইতিহাসের মহা-রণাঙ্গণে। হঠাৎ করে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ভুলে সবাই বড় হয়ে উঠল, মহৎ কাজের প্রেরণায় সবাই উজ্জীবিত।

যোগাযোগ বিজ্ঞান

যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী। এ বিষয়ে লেখাটি একক এবং অনন্য। তিনি বিষয়বস্তু নিরিখে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। আকারে ছোট হলেও এটি একটি গবেষণাপত্র হিসেবে স্বীকৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> 'আজ থেকে আটত্রিশ বৎসর পূর্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়ম-কানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণে।'

৭ মার্চ ১৯৭১ আমাদের হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্রান্তিকাল। তখন সমগ্র বাংলাদেশ ফুঁসে উঠেছে। সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। রেসকোর্স ময়দান সেদিন বিশাল জনসমুদ্র। নেতার কঠিন পরীক্ষার সময় তথাপি তার মানবিকতার গুণের কোনো ঘাটতি নেই। তিনি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উল্লেখ করে বলেন, 'তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কর না।' এইখানে তিনি সব বাঙালিকে আপন করে নিয়েছেন; যে কোনো কাউকে গুলি করা বলতে তিনি বলেছেন, আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কর না। এতে করে তার সঙ্গে জনগণের আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছে। আরেফিন সিদ্দিকী লিখেছেন :

> 'সার্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপনের—(posing a challenge) সর্বজনবিদিত একটি পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষপর্যায়ে এসে যখন বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শালাহ"—তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগবিদ্যার শিল্পকুশল প্রণালীতে পরম দক্ষতায় কীভাবে শ্রোতাদের বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন।'

যোগাযোগ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আরেফিন সিদ্দিকীর প্রবন্ধটি আগামী দিনের গবেষকদের প্রভূত পরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি করবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

নৃতত্ত্ব ও জাতীয়তা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন *একটি ভাষণের বিনির্মাণ : নির্দেশ থেকে দেশ* নামক প্রবন্ধে, বাঙালির আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর লোকদর্শনজাত চিন্তা, ভাষণের নাটকীয় প্রকাশভঙ্গি ও লোকভাষার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি খুব যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই বলেছেন :

> 'যে-কোনো জনগোষ্ঠীই স্বয়ংক্রিয় স্বাভাবিকতায় জাতি হিসেবে পরিগণিত হয় না। লক্ষ-লক্ষ কিংবা কোটি-কোটি মানুষের সমাহারই অবলীলায় জাতি গড়ে তোলে না। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে পরম্পরাক্রমে যারা বসবাসরত, একই রকম সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মিক-মানসিক সংহতির প্রেষণায় যারা যূথবদ্ধ এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রন্থিমান দেখার মানসসংগঠন যাদের মধ্যে সঞ্জাত ও ক্রমবিকশিত, তারাই সম্ভবত একসময় জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়।'

বঙ্গবন্ধু ভাষণের সূচনাতেই তাঁর প্রাণপ্রিয় জনগণকে পরিপূর্ণভাবে আস্থায় নিয়েছেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।' একথা বলে জনগণকে তিনি বর্তমান সংকটের স্বরূপটি বোঝালেন সংক্ষেপে, কিন্তু খুব প্রাঞ্জলভাবে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে এসেম্বলির নির্ধারিত তারিখ তিনি মেনে নিয়েছিলেন, প্রস্তুত ছিলেন সবার সাথে আলোচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্য। বললেন, কী করে ভূট্টো সাহেবের গোয়ার্তুমিতে ভেস্তে গেল সব। পরিষদের অধিবেশনের তারিখ বাতিল করা হলো এবং দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে; বললেন কীভাবে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল, কীভাবে নেতার নির্দেশে পালিত হলো হরতাল, শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন।

আমরা সবচেয়ে বিস্মিত হই এ ভাষণের নাটকীয়তায়। ভাষণটি বঙ্গবন্ধুর মনের মণিকোঠায় সাজানো একটি ঐতিহাসিক নাটক। নাটকের চিত্রকল্পটি

অভিনব। শেষ পর্যন্ত এই ভাষণে একটি জাতির সৃষ্টি। এ নাটকের অভিনেতা একজনই। জনগণকে প্রশ্ন করছেন, দর্শক-শ্রোতাকে স্নেহ করছেন, কাছে টানছেন, আশঙ্কার কথা বলছেন। স্বাধীনতা আমাদের কাছে সোনার হরিণ, কিন্তু তা পাওয়া কষ্টসাধ্য। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবাসীকে বলেছিলেন, রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেব; কেননা তিনি জানতেন স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে। আর স্বাধীনতা চেয়ে পাওয়ার জন্য স্বাধীন ভারতের মাটিতে বিশেষ করে পাঞ্জাব সীমান্তে ১৯৪৭ সালের ১৬.১৭.১৮ আগস্ট এই তিন দিনে দশ লক্ষ মানুষকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছিল ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার কারণে। স্বার্থানেষী মহল ও তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভাবকদের উসকানিতে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ (হিন্দু, শিখ ও মুসলমান) না বুঝে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল। মানুষ মানুষকে দিন দুপুর গলা কেটে, বুকে ছুরি বসিয়ে, আছাড় মেরে নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞে মেতেছিল। সেই মর্মন্তত দৃশ্য আজো আমাদের শিহরিত করে। নেতাজির মত অনুযায়ী এই প্রাণবিসর্জন যদি ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য দিতে পারতো তাহলে ভারতে বিভাজন এভাবে হতো না—যার খেশারত আমাদের কাল থেকে কালান্তরব্যাপী দিতে হবে, জানি না আমরা আর কখনই আগের ভারত ফিরে পাব কিনা?

বঙ্গবন্ধু জানতেন আমাদের রক্ত দিতে হবে, এ জন্য তিনি নিজের বুকের রক্ত আগে ভাগেই বরাদ্দ দিয়ে রেখেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় জনগণকে। খোন্দকার আশরাফ হোসেন লিখেছেন :

> 'ভাষণের এই পর্যায়ে দেখি বঙ্গবন্ধু আবার আরেকটি বেদনার্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করছেন, তাঁর কণ্ঠে হাহাকার করে উঠছে বাংলার নদী-ঘাট-মাঠ, বঞ্চিত মানুষের পাঁজরা ও কপাল : "কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি।" আবার ইতিহাসের পুনশ্চারণ গভীর বেদনার সাথে; আয়রনিসঞ্জাত পরিস্থিতির কারুণ্য তখন ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে আহত জাতিসত্তার হৃৎপিণ্ড থেকে : 'আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান। রাস্তা-ঘাট যা যা আছে সব কিছু বন্ধ করে দেয়ার আহ্বান—এসব নির্দেশ তাঁর প্রিয় জনগণকে দিলেন। সামরিক সদস্যদের বললেন, তোমরা আমার ভাই। কি সমীহ, কি আদরের, স্নেহের কথা। এটা বলার কারণ এই যে, তাঁর প্রিয় দেশবাসীর বুকে যেন তারা আর গুলি না করে। তাঁর প্রাণের মধ্যে আশঙ্কা, গুলিতো তারা করবেই, তারা তো হুকুমের দাসমাত্র। তবুও তাঁর প্রাণ নিংরানো আহ্বান। এখন শেষ কথা—তার প্রিয় দেশবাসীর প্রতি; সব

বলা শেষ, বুকভরা শঙ্কা বাংলার সব মানুষ যেন তার মা, দাদি-চাচি, সব যেন তাঁর ভাই-বোন। ভাষণ শেষে তিনি আর ঘরে ফিরতে পারবেন কিনা! বলছেন, 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো—এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ ভাষণের লোকজ উপাদানের বিষয়ে অধ্যাপক হোসেন লিখেছেন :

> 'আমার নিজের ধারণা, সম্পূর্ণ ভাষণটিতেই পাওয়া যাবে লোকজ ভাষাভঙ্গির ছোঁয়া, যা বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের লোকজীবনসম্পৃক্তি এবং তৃণমূল মানুষের মুখের ও মনের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা থেকে সঞ্জাত। ভাষণটি যে পূর্বলিখিত নয়, এমনকি তাঁর হাতেও কোনো নোটসম্বলিত চিরকুট ধৃত দেখি না, অথচ অবলীলায়, ধীরোদাত্ত স্বরক্ষেপণে তিনি উচ্চারণ করে গেলেন তাঁর ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আদেশ-নির্দেশনা, এবং সেই মুহূর্তে সমগ্র জাতি কান পেতে রয়েছিল যা শোনার সেই স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইঙ্গিতপূর্ণ ঘোষণা। 'শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আর টি সি-তে মুজিবুর রহমান যোগ দিতে পারে না', 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই", "আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা', "তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল"; "আমি যদি যদি হুকুম দেবার না পারি"—ইত্যাকার উচ্চারণগুলিতে গ্রামীণ ও লোকজ প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়।'

তুলনামূলক আলোচনা

জালাল ফিরোজ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন পৃথিবীর অন্য সব শ্রেষ্ঠ ভাষণের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। এভাবে তুলনামূলক পদ্ধতিতে এর আগে আর কোনো সমালোচকই এত বিস্তৃত ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। তাঁরা কেবল অন্যান্য ভাষণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেদিক থেকে ড. জালালের প্রবন্ধটি নতুন এক গুরুত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে; যেটি আরো আগেই হবার কথা ছিল। আশার কথা এই যে, এ গবেষণাটি পাঠের পর হয়তো অনেকেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উপর নতুন করে তুলনামূলক আলোচনার সূচনা করবেন।

জালাল সূচনা করেছেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩১ সালে গ্রিক রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসের ভাষণ দিয়ে। তারপর এসেছেন খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে দেয়া গ্রিক লোক দার্শনিক সক্রেটিসের ভাষণে। সক্রেটিসের ভাষণটি ছিল আদালতে বিচারকদের সামনে দেয়া তাঁর জবানবন্দিমূলক। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আনা অভিযোগ তিনি খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। আমরা বলতেই পারি এটা কোনো ভাষণ নয়। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব কালের দেয়া আরো দুটো ভাষণের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—গ্রিক বাগ্মী ডিমোস্থিনিসের দেয়া খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ সালের ভাষণ। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর বিদায় হজের

ভাষণ, মুসলিম জাহানে এ ভাষণটি আজো অনুসরণীয় হয়ে আছে ভাষণে বিধৃত সর্বজনীন মানবতাবাদী চেতনার কারণে। ড. জালাল সর্বশেষে ৭ মার্চের ভাষণের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছেন অপর ৪টি ভাষণ। যেমন :

১. গেটিসবার্গ এড্রেস—১৮৬৩
২. উই শ্যাল ফাইট অন দি বিচেস—১৯৪০
৩. এ ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি—১৯৪৭
৪. আই হ্যাভ এ ড্রিম—১৯৬৩ (মার্টন লুথার কিং)

ড. জালাল ৫টি ভাষণের চমৎকার একটি সারণী প্রস্তুত করেছেন। এতে রয়েছে শব্দ সংখ্যা, শ্রোতার সংখ্যা এবং ব্যয়িত সময়। এভাবে এর আগে কোনো সমালোচকই আলোচনা সূত্রবদ্ধ করেন নি। সভাস্থলে উপস্থিত জনসংখ্যা, ভাষণের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক গুরুত্ব নিয়ে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণই বিশ্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ।

৭ মার্চের ভাষণস্থলে প্রায় ১০ লাখ মানুষ, যাঁরা ছিলেন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর উপর চরম বিক্ষুব্ধ, কিন্তু তাঁরা আবার নেতার নির্দেশের প্রতি ছিলো আপাদমস্তক 'সুসংঘবদ্ধ, শান্ত ও ঐক্যবদ্ধ'। ভাষণ শেষে তারা স্ব স্ব গন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করেন মনের গহীন কোণে উজ্জ্বল আশার প্রদীপ জ্বেলে, তারা ফিরে যান শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এবং এক কঠিন সংগ্রামের সংকল্প বুকে ধারণ করে। জালাল বলতে চেয়েছেন, এই বিশাল বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের সুশৃঙ্খলিত প্রস্থান বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ভাষণের সম্মোহিত ও জাদুকরি প্রভাবেরই ফল। আমরা জানি বঙ্গবন্ধুর ছিল ঐন্দ্রজালিক গুণ। জনতাকে সেই কার্শিমাগুণে সম্মোহিত করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই বিক্ষুব্ধ জনতাও সুশৃঙ্খলিতভাবে এক বুক উত্তেজনা নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। আমরা তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে ড. জালালের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই :

> ভাষণ প্রদানের সময় বক্তার রাজনৈতিক/রাষ্ট্রীয় অবস্থান, ক্ষমতা-কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর কর্তৃত্ব, জনসভা/অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা, শ্রোতার সঙ্গে বক্তার সম্মোহনী-সম্পর্ক, ভাষণের যোগাযোগ-সক্ষমতা, বিষয় ও উপস্থাপনা স্টাইলের মৌলিকত্ব, বক্তব্যের স্পষ্ট ও ইঙ্গিতময় প্রকাশ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ভাষণের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং বক্তব্যের চিরকালীন ও সর্বজনীন আবেদন সবমিলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অন্য সকল ভাষণের চেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সকল বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এই ভাষণের অন্য একটি দিক হলো ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি এবং ঐ দিন ঐ ভাষণ উচ্চারণের অপরিহার্যতা। গেটিসবার্গে লিংকন মূল বক্তা ছিলেন না, তিনি অসুস্থ ছিলেন, ওখানে না-গেলেও পারতেন বা গেলেও ভাষণ না-দিলে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নষ্ট হতো কিন্তু অনুষ্ঠান চলত। মার্টিন লুথার কিং আরও অনেক বক্তার একজন ছিলেন। চার্চিল বা নেহেরুর জায়গায় অন্য কোনো নেতা ভাষণ দিতে পারতেন। কিন্তু ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ছিলেন একমাত্র ও অনিবার্য বক্তা। বঙ্গবন্ধুর জন্যই লাখ লাখ মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর কথা শুনেই জনসমুদ্র ফিরে এসেছিল এবং তাঁর নির্দেশেই জনতা ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত শোনার জন্যই বিশ্ববাসী অপেক্ষা করছিল। একটা বিশাল জনসভায় একজন জননন্দিত নেতার উপস্থিতির এ-রকম অনিবার্যতাও ইতিহাসে বিরল। ৭ মার্চের ভাষণের উপর বিস্তৃত গবেষণা ও বিশ্লেষণে এর বহুমাত্রিক বিশিষ্টতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

জালালের আর একটি মন্তব্য আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তিনি বলেছেন, আজও পর্যন্ত ৭ মার্চের ভাষণের কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেখা যাচ্ছে না। এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর কোনো তালিকায়ও ভাষণটির অবস্থান লক্ষ করা যাচ্ছে না, তার কারণ এ ভাষণ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো আলোচনা সমালোচনা বা বিশ্লেষণ নেই। এ কাজটি বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং পণ্ডিতজনদের দায়িত্বে যাতে শীঘ্র শুরু হয় আমরা সেই আহ্বান রাখতে পারি।

ফোকলোর বা লোকজ উপাদান

লোক শব্দের অর্থ সাধারণভাবে মনুষ্য, জন বা ব্যক্তি। লোক ইংরেজি ফোক শব্দের প্রতিশব্দ। লোকদর্শন বা লোকায়ত দর্শন বলতে ইহজগতভিত্তিক দর্শনকে বোঝায়। যে-মানুষ কোনো কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষা অর্জন করে নি, যে ঘরোয়া পরিবেশে সামাজিক প্রতিবেশ থেকে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ আহরণ/অর্জন করেছে সে-ই লোক। আবার সাধারণ অর্থে আমরা সবাই লোক; অর্থাৎ লোক শব্দটি একটি সর্বজনীন এবং সামষ্টিক ঐকবোধক। তাহলে লোকায়ত দর্শন বলতে আমরা কোনো লোকগোষ্ঠীর সার্বজনীন আদর্শিক রূপকে বুঝবো। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গভীরতা আবিষ্কারের জন্য আমরা লোকায়তিক ভাবনার আশ্রয় নিয়েছি। লোকজীবন সঞ্জাত যে দর্শন ও শিল্প প্রকাশের পরিচয় আমরা পাই তাকেই বলা হয় লোকায়ত দর্শন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে লোকদর্শনজাত চেতনার সন্ধান পাই—যেখানে গোষ্ঠীজীবনের মাঙ্গলিকতা বিধৃত। এই গোষ্ঠী চেতনাই ব্যাপক অর্থে সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বঙ্গবন্ধু ঐ ক্রান্তিকালেও তাঁর ভাষণে বিধৃত মানবিকতা গোষ্ঠীজীবনকে ছাড়িয়ে হয়েছে বিশ্বজনীন। কয়েকজন পণ্ডিত এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ পর্বে আমরা মোট ১১টি প্রবন্ধ পেয়েছি। এর মধ্যে একটি লেখা পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে পঠিত এ সংক্রান্ত একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার ভাষ্য। এখন আমরা এগুলোরই সারকথা বলতে চাই।

অধ্যাপক আবদুল খালেকের (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য) লেখার শিরোনাম, '৭ মার্চের ভাষণ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবিচ্ছিন্ন'। তিনি বলেন,

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসব্যাপী ৭ মার্চের ভাষণ ছিল প্রণোদনার মূল হাতিয়ার। এ ভাষণ না থাকলে বাংলাদেশ অদৌ অর্জিত হত কিনা সে বিষয়েও তিনি সন্দিহান। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের কাছে যুদ্ধশ্লোগান। এ ভাষণের লোকায়ত দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি লিখেছেন :

> '৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় যে উপস্থিতি, হিসেব করলে দেখা যাবে নব্বই ভাগ মানুষ গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া কৃষক, মজুর, শ্রমিক, কামার, কুমার, মাঝি-মাল্লা প্রমুখ। বক্তৃতাটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে বোধগম্য করার লক্ষ্যে তিনি ব্যাপক আঞ্চলিক তথা লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক ভাষায় আপনি এবং তুমি একই সাথে ব্যবহারে কোনো বাধা নেই। উদাহরণ—"ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে, কোন্ দিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাও কইয়া যাও রে।" বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উল্লেখ আছে : "বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব—এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্।" এখানে একদিকে যেমন তিনি ভাষা ব্যবহারে লোকরীতি ব্যবহার করেছেন, অপর দিকে 'ইনশাআল্লাহ্' শব্দের ব্যবহার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মনিরপেক্ষতার বলিষ্ঠ প্রকাশ।'

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান 'জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণ : একটি অনুপুঙ্খ পাঠ' শীর্ষক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ভাষণটির নানা দিক নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে বাঙালির সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি এবং জাতিতাত্ত্বিক দিক নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন, 'জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত কৃষকেরই আন্দোলন'। কাজেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কৃষকের সমস্যা এবং তার মুখের ভাষা বাংলা ভাষার প্রাধান্য পায়। কালক্রমে এই মাতৃভাষার অধিকার আদায় করতেই প্রশ্ন উঠে স্বায়ত্তশাসনের ও স্বাধীনতার। বঙ্গবন্ধু যে লোকজীবনসিক্ত ছিলেন এবং মানবিকতার উপাদান লোকজীবন থেকে নিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> 'বাংলাদেশের মানুষের একটা স্বকীয় সত্তা ও নিজস্ব চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য আছে। লৌকিক ভাষা-ভঙ্গি ও বাকপ্রতিমায় তাঁর চমৎকার ও লাগসই প্রকাশ ঘটে। এই বিশিষ্ট সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চারিত্র্যিক দার্ঢ্য, বিদ্রোহের মানসিকতা এবং কোনো অবস্থাতেই মাথা নত না করা। বাংলার পৌরাণিক চরিত্র চাঁদ সওদাগর, সাহিত্যের চরিত্র হানিফ গাজী ও তোরাপ কাব্যস্রষ্টা কবি নজরুল এবং মানবিক ও রাজনৈতিক চরিত্র শেখ মুজিবে আমরা এই বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় পাই। বাঙালি চরিত্রের এই বিশিষ্টরূপের স্পর্শ পেয়ে ৭ই মার্চের ভাষণে যুক্ত হয়েছে অনন্য বৈভব। বঙ্গবন্ধু তাঁর আপসহীনতা ও চারিত্র্যিক দার্ঢ্যের পরিচয় মুদ্রিত করেছেন লৌকিক ভাবভঙ্গির বিশিষ্ট বুলির সংযোজন। প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত এইসব মণিমুক্তসদৃশ কিছু শব্দ বাঙালির ব্যবহারিক জীবন থেকে নেয়া। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর শিকড়সম্পৃক্ত বুলিসমৃদ্ধ এ রকম একটি লাইন লেখা হলো : 'সাড়ে ৭ কোটি মানুষেরে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

অধ্যাপক যতীন সরকার লিখেছেন, *৭ মার্চ : অবিনাশী কথামালার জন্মদিন* নামক নিবন্ধ। জাতিতাত্ত্বিক ও লোকতাত্ত্বিক বিবেচনায় একটি উৎকৃষ্টমানের লেখা। এটি সাবলীল ভাষায় লেখা যা এক নিঃশ্বাসে শেষ করার মত। হাজার বছর ধরে এদেশের লোকসাধারণ স্বাধীকার থেকে বঞ্চিত; ভিতরে ভিতরে তারা হাহুতাশ করে মরছে কিন্তু মুক্তির পথ খুঁজে পায়নি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সেই মুক্তির দিশারি হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি স্বাধীনতার বিরোধিতাকারীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ৭ মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যা উচ্চারিত হয়েছে তা মোটেই কথার কথা নয়, এটা জাতির হৃদয়-নিংড়ানো কাজের কথা। তিনি লিখেছেন :

> 'তবে একাত্তরের বঙ্গজনদের মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেয়ার লক্ষ্যে শত্রুর পদলেহী কুকুরের মতো আচরণ করেছিল যেসব জাতিদ্রোহী কুলাঙ্গার, তারা ৭ মার্চের কবিতাটির মর্মবাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারণ ওই জ্ঞানপাপীরা তো পারজিত হয়েছিল এই কবিতাটির অসীম শক্তিতে শক্তিমান মুক্তিসংগ্রামীদের হাতেই। তাই পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে জ্ঞানপাপীরা আজ তাদের সব আক্রোশ ঢেলে দিচ্ছে ওই কবিতা ও তার কবির ওপর।'

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল জলিল সর্বকালের সেরা বাঙালি ও ৭ মার্চের ভাষণ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা উজ্জীবনে বঙ্গবন্ধু অত্যুজ্জ্বল সাফল্যের তোরণে উপনীত হতে সক্ষম হন এমনটি অতীতের সহস্রাধিক বছরে আর কোনো বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বাঙালির জাতিতাত্ত্বিক দিকটির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে অতি সতর্কতার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি পরিহার করেন। একটি ভাষণ কীভাবে একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে, কীভাবে স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তর করতে পারে; তা ঐ ভাষণ যথার্থ উপলব্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। বিশেষ কথা এই যে, আমরা গবেষণা করে, অনেক পরীক্ষা করে যা উদ্ধার করতে চেষ্টা করছি ভাষণ স্থলে উপস্থিত জনতা এবং দেশের লোকসাধারণ কিন্তু ঠিক ঐ ভাষণের মর্মকথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই। অধ্যাপক জলিল লিখেছেন :

> 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষণটির গভীরতা ছিল মহাসমুদ্রের মতো, ভাবাবেগের দিক থেকে গীতিকবিতাসদৃশ। যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, এ ভাষণ ছিল বাংলার জাতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকবে ততোদিন অম্লান থাকবে ৭ মার্চের ভাষণ। ভাষণটি বিশ্লেষণ করলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অনেক মূল্যবান দিকের পরিচয় ভাস্বর হয়ে ওঠে। সমগ্র ভাষণে তিনি দেশ ও জাতি বোঝাতে 'বাংলাদেশ' দু'বার 'বাংলা' ন'বার 'পূর্ববাংলা' দু'বার আর বাঙালি জাতিবাচক শব্দটি পাঁচবার ব্যবহার করেছিলেন। ভাষণের শেষ বাক্যটি ছিল দু'টো শব্দের 'জয় বাংলা'। শেষোক্ত শব্দ দু'টো দিয়ে তিনি বাংলাদেশের জয়, বাংলা

ভাষার জয়, বাঙালি জাতির জয় বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি দেশ ও জাতিবাচক শব্দগুলো কিরূপ প্রাণাবেগ ও ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন কতিপয় বাক্যের দৃষ্টান্ত থেকে তা অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন : নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।'

অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর প্রবন্ধের শিরোনাম *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিল*। এ প্রবন্ধে তিনি বাঙালির হাজার বছরের শৌর্য-বীর্যের ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। এবং এই বাঙালি যে মুক্তির উন্মাদনায় বহুবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এবং শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে—সে পরিচয় বর্ণনা করেছেন। বহুকাল থেকে বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তাঁর সে স্বপ্ন কখনও পূরণ হয়নি। তিনি লিখেছেন :

'বহু যুগ পরে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, নির্ভীকতা, অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা, জাতির প্রাণস্পন্দনকে অনুভব করার শক্তি, অনন্য দেশপ্রেম—এসব কিছুই তাঁকে বাঙালির জাতীয় জীবনে মহানায়কে পরিণত করেছে। কোনো জাতি যেমন তিল তিল করে গড়ে তোলে তাঁর জাতীয় মহাকাব্য, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমনই একজন রাজনীতির মহাকবি যিনি তাঁর মেধা-শ্রম-প্রজ্ঞা-সাহস দিয়ে বহু মনীষীর—বহু মানুষের বহুকালের আকাঙ্ক্ষার রূপ দিয়েছেন—বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে।'

আমরা অধ্যাপক আবুল আহসানের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলতে চাই, সেদিন সমগ্র জাতি বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়েছিলেন। বাংলা আর বাঙালির ভাগ্য যেন নির্ভর করছিল একজন মানুষের বক্তব্যের উপর। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অহিংস ও গণতন্ত্রপন্থি। তাই শান্তির পথে প্রথমে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবেই তিনি সামরিক জান্তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু মানবিকতা এবং উদারতা দেখিয়ে এও বলেন অন্যরা সংখ্যায় কম হলেও এমন কি একজন হলেও তিনি যদি ন্যায্য কথা বলেন তার কথা আমরা মেনে নেব। তিনি বলেন, 'আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি'। কিন্তু তাঁর সব আদেশ নির্দেশই শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করে চলে সামরিক জান্তা। আবুল আহসান আরো লিখেছেন :

'যতো দিন এগুচ্ছিল, বঙ্গবন্ধু ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছিলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিয়ে রাখলেন : 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তাঁর নিজের জীবন যে-কোনো মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারে, এমন আশঙ্কায় তিনি—'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি'—এই কথা বলে জনগণের কাছে তাঁর নির্দেশ জারি করেছিলেন। শত্রুপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে

বলেছিলেন : 'আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।' যে-জাতি রক্ত দিতে জানে, সে-জাতির উত্থান কেউ কখনো রোধ করতে পারে না—এ-সত্য বঙ্গবন্ধু জেনেছিলেন ইতিহাসের আলোকে—নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।'

এর পর রয়েছে গাজী আজিজুর রহমান লিখিত *যে ভাষণে বাংলাদেশ* শীর্ষক প্রবন্ধটি। এ প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ। তাঁর বর্ণনায় কাব্যিকতা আছে; কিন্তু এ সত্ত্বেও এটি গভীরভাবে বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রবন্ধ। তিনি লিখেছেন :

'সেদিনের ১৯ মিনিটের বিকেলটা ছিল শুধু তাঁর। সেদিন আর কোনো দৃশ্য ছিল না তাঁর দৃশ্য ছাড়া। সেদিন আর কারো কণ্ঠস্বর ছিল না তাঁর কণ্ঠস্বর ছাড়া। সেদিন একটি মাত্র নদী কলস্বরিত ছিল বাঙলায়। সেদিন তিনিই ছিলেন বাঙলার দিনমণি-অংশুমালী। সেদিন সবাই দেখলো এক অ্যালবাট্রস পাখিকে, এক প্রমিথুয়ুসকে, এক হারকিউলিসকে—দেখল স্পার্টাকাসরূপী এক অবিসংবাদিত ত্রাতাকে। তিনি আর কেউ নন টুঙ্গিপাড়ার রাখাল ছেলে শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির বিস্ময়। তিনি অব্যয়, তিনি অক্ষয়।'

বাঙালি হাজার বছর পথ পাড়ি দিচ্ছে—সে পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর; কিন্তু সে দমে যায় নি, মাথা নত করে নি। নীহাররঞ্জন রায় বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির জাতিসত্তার উপাদানকে তুলনা করেছেন বেতস ঝাড়ের সঙ্গে, বেতস ঝাড় যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝায় কিঞ্চিৎ নুইয়ে পড়ে, মনে হয় যে সে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে না; কিন্তু না পরক্ষণেই সে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাঙালি সংস্কৃতিও তাই কখনো কখনো একটু-আধটু মাথা নুইয়ে আগ্রাসনকারীকে সুযোগ করে দেয়; কিন্তু খানিক পরেই সে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এটা চলছে হাজার বছর ধরে; কিন্তু তাই বলে কি এর শেষ নেই; আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই শেষ বাঁশিটি বাজানোর জন্যই ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দশলক্ষ বাঙালির সম্মুখে বীরের ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন এবং শুনালেন সেই লক্ষপ্রাণের আকাঙ্ক্ষার শব্দগুচ্ছ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এতোদিন যা বলেছি বলেছি, এবার আর না, আর কোনো অনুরোধ-উপরোধ না; চাই আমার স্বাধীনতা, চাই আমার একান্ত নিজস্ব একটি পতাকা। এই মহাকাব্যিক শব্দগুচ্ছটি উচ্চারণের জন্য আমাকে অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে, অনেক দুঃখ, জেল-জুলুম, অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। 'এতকাল আমাদের তীর ছিল, তরী ছিল, দাঁড়ি ছিল, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো কোনো বলিষ্ঠ হালী ছিল না বলে আমরা অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছতে পারি নি, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে পারিনি।' গাজী আজিজুর রহমানের বক্তব্য এতকাল পর আমাদের এক শক্ত মাঝি হাল ধরেছে, আর আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। ৭ মার্চের ভাষণ সেই মাঝিরই কণ্ঠনিসৃত বাণী। তিনি লিখেছেন :

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলো শুধু আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ আদর্শ প্রচার আর জ্ঞান প্রচারের সমষ্টি নয়। ভাষণের যে কত রং-রূপ আছে, চিত্র আছে, কাব্যিকতা আছে—আছে উদ্যোগ, উৎসাহ, সাহিত্য-দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য হৃদয়স্থ অভিযান

সে গ্যাটিসবার্গ এড্রেস, নেভার সো মেনি, আই হ্যাভ এ ড্রিম বা এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তেমন উজ্জ্বলতর নিদর্শনের ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সেই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় এর ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী ও গতিশীল, বাক্যে আছে কাব্যিকতা ও সরলতা, প্রতিটি প্যারায় আছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, চে গুয়েভারার মতো ডাক দিয়ে যাই-এর আহ্বান, আছে জনসম্পৃক্ততা, অটল বিশ্বাস, লোকদর্শন, স্বদেশ প্রেম, নিঃস্বার্থতা, নাটকীয়তা এবং আবেগকম্পিত বজ্রকণ্ঠের নিনাদনা। ভাষণের প্রতিটি স্তরে আছে আশা আর উত্তেজনা, স্বপ্ন আর সম্ভাবনা, আর্তনাদ আর আত্মত্যাগের মহিমা, গণসংগ্রামের দ্যোতনা এবং মুক্তির গান—এ দিক দিয়ে মান বিচারে ভাষণটি মার্টিন লুথার কিং-এর 'I have a dream'-এর সাথেই কিছুটা তুলনীয়। ভাষণে অনেকগুলো সুরের সম্মিলন আছে—হুমকির সুর, আদেশের সুর, সমঝোতার সুর, বেদনার সুর, আকাঙ্ক্ষার সুর, প্রত্যাখ্যানের সুর, প্রতিশোধের সুর, আত্মত্যাগের সুর, সবশেষে মুক্তির সুরে উজালা "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

গাজী আজিজুর রহমান বঙ্গবন্ধুর ভাষণটির মধ্যে লোকজ উপাদানের অনুসন্ধান করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিকড় সন্ধানি নেতা। লোকসমাজ থেকে তিনি দু'হাত ভরে সংগ্রহ করেছেন লোকদর্শনজাত মানবিকতার উপাদান। মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার উপাদান তিনি লাভ করেছেন এই সোনার বাংলার বাউল-জারি-সারি-ভাটিয়ালি গানের উদারতায় এবং তিনি এই উদারতা আত্মস্থ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজিজুর রহমান লেখেন, 'বঙ্গবন্ধু যে শিকড়ের মানুষ ছিলেন, কাদা-মাটি থেকে উঠে আসা মানুষ ছিলেন, জাতীয় ও তৃণমূলের নেতা ছিলেন ভাষণে বার বার dialect বা উপভাষা ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন তিনি ঢাকার শুধু নন টুঙ্গিপাড়ার ছেলেও। যেমন : ভায়েরা, দেবার চাই, জীবনের তরে, দিবার নাও পারি, দাবায়ে রাখতে পারবা না কিম্বা তোলো, থাকো, মনে রাখবা ইত্যাদি আহ্বান, দাবি ও হুকুমের মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর অন্তর নিংড়ানো আঞ্চলিকতার টান—যা তাকে দান করেছে লোকনায়কের অভিধা।'

গাজী আজিজুর রহমানের লেখাটি নিজে পাঠ না করলে এর সম্পূর্ণ আস্বাদ কখনই পাওয়া যাবে না। অত্যন্ত বিশ্লেষণী ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তিনি এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন, আমি সব পাঠককেই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য। ৭ মার্চই যে বাঙালির স্বাধীনতার জন্মদিন সে কথা তিনি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন :

> 'মাত্র ১৯ মিনিটের একটা ভাষণে ৭ কোটি বাঙালির মনের মণিকোঠায় ছবি হয়ে গেলেন শেখ মুজিব। গড়ে উঠলো দুর্বার ঐক্য, গড়ে উঠলো সংগ্রামী চেতনা, তৈরি হলো জীবন উৎসর্গের প্রেরণা। যেন সেই থেকেই সাত কোটি বাঙালি মানে শেখ মুজিব, ৭ কোটি বাঙালি মানে দেশপ্রেমের আদর্শ সৈনিক। সেই থেকে বাঙালির সব পথ স্বাধীনতার দিকে প্রবাহিত। সেই থেকে বাঙালির সত্যিকার ইতিহাসের জন্ম। ৭ মার্চ তাই বাঙালির স্বাধীনতার জন্মদিন।'

নিবন্ধকারের লেখার শিরোনাম 'বাংলার লোকদর্শন : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের লোকউপাদান অনুসন্ধান'। লেখাটির একটি খসড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলার আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলাম। পরে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা কেন্দ্রের ৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। মূল প্রবন্ধটি পাঠের পর আলোচনা করেন নির্ধারিত আলোচকদ্বয় ড. কাজী নূরুল ইসলাম ও ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং দর্শক-স্রোতার পক্ষ থেকেও অনেকে আলোচনা করেন। পত্র-পত্রিকায়ও এ বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে বিদগ্ধ শ্রোতা জাহারাবী রিপন '*৭ মার্চের ভাষণে লোকউপাদান* : অন্বিষ্ট সেমিনারের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক একটি নিবন্ধ রচনা করেন এবং এটি দৈনিক ইত্তেফাকে ৪ মার্চ ২০১১ তারিখে সচিত্র মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থে সেই প্রবন্ধটিও পরিবেশন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নির্মলেন্দ গুণ তাঁকে কবি সম্বোধন করে কবিতা রচনা করেছেন। হ্যাঁ তিনি রাজনীতির কবি তো বটেই, তিনি রাজনীতির প্রকৌশলীও। সে কথা আলোচনা হবে অন্যত্র। এখানে আমার বলার কথা এই যে, প্রায় পাঁচ হাজার বছরে গড়ে ওঠা জাতি—যার রয়েছে জাতিগঠন উপযোগী স্বীকৃত ভূগোল, ব্যাকরণসমৃদ্ধ সুসংগঠিত ভাষা, মানবিকতায় উজ্জ্বল সংস্কৃতি—সে জাতির স্পর্ধিত ও সাহসী সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯৭১-এর ৭ মার্চে ঢাকার রেসকোর্সে প্রায় দশ লক্ষ জনতার সম্মুখে যে বক্তব্যটি রাখলেন, সেটি তাদের প্রাণে শিহরণ জাগালো। জনতার প্রাণের যে আকুতি ছিল তা তিনি কানায় কানায় পূর্ণ করলেন। তাই এই ভাষণটিকে আমি লোকগীতির অভিধা দিতে চাইছি। লোকগীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক সুর, আঞ্চলিক ধ্বনি ও স্বতঃস্ফূর্ততা। লোকগীতিতে থাকবে ঐ লোকসমাজের দুঃখ-কষ্ট-ঘাম, রক্ত ঝরার ইতিহাস, সর্বোপরি জীবনসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। অর্থ-কাম-যশ প্রাপ্তি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা; কিন্তু লোকগীতি প্রণেতা এ সবের উর্ধ্বে, সে নির্মোহ, লোভশূন্য, সে সমাজের কথা বলে, যূথবদ্ধ মানুষের কথা বলে, সে জীবনযুদ্ধের কথা বলে, দুঃখী মানুষের কথা বলে, সে নিজেকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে দেখে না, সর্বদাই তার থাকে সবার মঙ্গলচিন্তা, তার চারপাশের মানুষেরা কীভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও তাঁর স্বীয় জীবন এই সবগুলো গুণের সমাহার। এখন পাঠকরাই বিচার করবেন তাঁকে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে লোকগীতি প্রণেতা বলা যাবে কিনা এবং ঐ ভাষণকে লোকগীতি বলা যাবে কিনা।

এর পরের লেখাটি জাহারাবী রিপনের। তাঁর লেখার শিরোনাম, *৭ মার্চের ভাষণে লোকউপাদান : অন্বিষ্ট সেমিনারের অভিজ্ঞতা*। এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধটি

অত্যন্ত দরুদ দিয়ে লেখা। তাঁর ভাষা শ্রুতিগ্রাহ্য ও উন্নত সাহিত্যের। আমরা নিবন্ধকারের লেখা এখানে খানিকটা পাঠ করতে পারি :

> সঞ্চালক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করলেন সেমিনার। প্রবন্ধকার ড. আবদুল ওয়াহাব পাঠ করে আমন্ত্রিক শ্রোতাদের মূল প্রবন্ধ শোনালেন। অতঃপর মূল প্রবন্ধের উপরে আলোচনা-পর্ব। প্রথমে আলোচনা করলেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। সন্দেহ নেই, তিনি একজন প্রমিত বক্তা ও গবেষক। অধ্যাপক ঘোষ লোকগীতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মার্চের ভাষণের তুলনামূলক আলোচনাকে একটা আবিষ্কার হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, লোকগীতির চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রবন্ধকার এ ভাষণের মিল খুঁজে পেয়েছেন, এ চিন্তাটি আমি বল অভিনব। আমি বলব আবদুল ওয়াহাব এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদগাতা। আমি প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানাই এই বিজয়ের মাসে বঙ্গবন্ধুর মার্চের ভাষণের উপর এ ধরনের গবেষণামূলক লেখা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য। অতঃপর আলোচনা করতে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম। তিনি বলেন—বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি গবেষণা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে অভিনব বিধায় নতুন অনেক বিষয়ে চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়। এজন্য প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ। নির্ধারিত দুই বক্তার আলোচনান্তে সেমিনারে উপস্থিত আরো কেউ কেউ আলোচনায় অংশ নেন। তাঁরাও প্রবন্ধকারকে এই অভিনব প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সকলের আলোচনাতেই বাঙালির ঐতিহ্য-চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্বের অনুভব আবারও অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেদিন আমার তো তাই মনে হয়েছে।'

এই প্রবন্ধের খসড়াটি যখন বাংলা একাডেমি অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০০৮-এ উপস্থাপন করেছিলাম তখন শুভানুধ্যায়ী অনেকেই বলেছিলেন যে ৭ মার্চের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখাটি নতুন দিক উন্মোচন করবে। যত দিন যাচ্ছে তার পূর্ণ আভাস পাঠক-দর্শকদের কাছে আমরা পাচ্ছি। জাহারাবী রিপন শ্রোতা-দর্শকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে প্রায় একই কথা বলতে চেয়েছেন। জাহারাবী রিপন লিখেছেন :

> 'অভ্যাগত অতিথি ও আলোচকবৃন্দেরও মানসিক অনুভূতি দৃশ্যমান এরকম বলে মনে হলো। বিশেষ করে, আলোচক অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় নিজ জীবনাভিজ্ঞতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা আবেগে অহংকারে স্মরণ করলেন সেদিন। সরবে নীরবে সবাকার মধ্যে তখন জন্ম নিয়েছে ৭ মার্চের অনিবার্য আহবান ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। সেমিনার কক্ষে সন্ধ্যার আঁধার ঘনায়ে স্মৃতি বিস্মৃতি লাখো মানুষের আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রমহানির বেদনা বহে আনে।'

ভাষাবিজ্ঞান

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী। তখন তিনি টকবগে যুবক ও তুখর ছাত্র। জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের প্ররোচনায় একেবারে সামনের কাতারে বসে ভাষণটি শোনার এবং

পরিবেশটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে জাতিও তাঁর কাছ থেকে *ভাষার জাদু : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ* শীর্ষক একটি সুলিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ উপহার পেয়েছে। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল, কর্মনিষ্ঠ, মনোযোগী পাঠক ও সাহিত্যপ্রবণ মানুষ। এ প্রবন্ধে তার স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। সেদিন এর সঙ্গে যুক্ত ছিল একজন বিদেশি সাংবাদিকের কৌতূহল ও নিষ্ঠা। এ ভাষণের তাৎক্ষণিক ইংরেজি অনুবাদ তাঁর জরুরি; তিনি বিশ্বের দরবারে এ ভাষণের মর্মকথা জানাতে চান, কাজেই কোনো বিলম্ব নয়। আর তাই তিনি যোগার করেছেন যথার্থ এক ব্যক্তিত্বকে। সৈয়দ মনজুরুলের লেখাটির সূচনা এরকম :

> মাঠে সেদিন কত মানুষ ছিল, কেউ বলতে পারবে না। হয়তো দশ লাখ। হয়তো আট। কিন্তু মনে আছে ভাষণ শুরুর আধাঘণ্টা আগে যখন বিদেশি সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে বেরোই, মনে হল সারা বাংলাদেশ ভেঙ্গে পড়েছে রেসকোর্স মাঠে। সাংবাদিকদের জন্য মঞ্চের সামনে জায়গা ছিল। সাংবাদিক হাত ধরে আমাকে টেনে সেখানে নিয়ে গেলেন। আমি আমার কপালকে ধন্যবাদ দিলাম। এত সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পাব, ভাবতেও পারিনি। বঙ্গবন্ধুকে বেশ চিন্তিত মনে হয়েছিল। বক্তৃতা শুরুর আগে দু'একবার হাত দিয়ে মাথার চুল সমান করলেন; আকাশে একটা হেলিকাপ্টার উড়ছিল। সেদিকে একবার তাকালেন। তারপর সামনে মানুষের দিকে গভীর দৃষ্টি ফেললেন। মনে হল তাঁর চিন্তা সরে গিয়ে মুখে একটা প্রসন্ন ভাব যেন এল। তিনি লেকটার্নের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন।

অধ্যাপক মনজুরুল ইসলাম ভাষণটিকে বাঙালি জাতির একটা মুখবন্ধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যে ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছিল বাঙালি জাতির সাহস-সংকল্প-প্রত্যয়-সততা-সৌজন্যবোধ। সেই জাদুময় ভাষণ; যা মানুষ নিঃশব্দে শুনছিল, আর সর্বপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে সকল বাঙালিকে পরিণত করছিল এক একজন সাহসী যোদ্ধায়।

তাঁর এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি নিয়ে আমাদের কৌতূহল ঐ বিদেশি সাংবাদিককে নিয়ে। ভাষণটি শুনতে শুনতে সৈয়দ মঞ্জুরুল যখন অনুবাদ করে শুনাচ্ছিলে; এক পর্যায়ে সাংবাদিক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন :

> 'আমি বরং ভাষণটা শুনি, তুমি যদি পারো, মনে রাখার চেষ্টা কর, পরে আমাকে অনুবাদ করে শুনিও' যেন মামা বাড়ির আবদার। প্রবন্ধকার লিখছেন : 'তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি প্রতিটি বাক্য বুঝছেন, যেন বঙ্গবন্ধু বাংলাতে নয়, ইংরেজিতে ভাষণটা দিচ্ছেন।
>
> এবং আশ্চর্য, শুনতে শুনতে ভাষণটা আমার মাথায় একটা জায়গা করে নিল। বিকেলে চারুকলায় সাংবাদিককে যখন মূল বিষয়গুলি অনুবাদ করে দিচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম, আমার গলাতেও যেন আলাদা একটা জোর এসেছে, যেন ভাষণটা আমাকে আলাদা শক্তি জোগাচ্ছে। সাংবাদিক বললেন, কী ছিল শেখ সাহেবের ভাষণে?
>
> আমি কিছু বলার আগে তিনি নিজেই বললেন, 'নিশ্চয় জাদু। ইট ওয়াজ সিম্পলি ম্যাজিকাল,' তিনি বললেন।

আঞ্চলিক পরিভাষা, বাংলা ভাষাকে সাজিয়ে, সকলের বোধগোম্য করে বাক্য প্রয়োগ সবমিলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণটি বঙ্গবন্ধু কি আগেই কোনো খসড়া তৈরি করেছিলেন কিনা এ প্রশ্ন আমাদের হতেই পারে। কিন্তু না, গবেষকগণ এ প্রশ্নের সোজা সাপটা উত্তর দিয়েছেন 'না'। বিখ্যাত দার্শনিক ও সমাজ গবেষক সরদার ফজলুল করিম বলেছেন বঙ্গবন্ধু কোনো লিখিত বক্তৃতা দেয়া পছন্দই করতেন না। সৈয়দ মঞ্জুরুল লিখেছেন :

> অথচ তাঁর ভাষণের অনেক জায়গায় বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে খুব সাজিয়ে ব্যবহার করেছেন—'২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস', অথবা 'বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস,' অথবা 'তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণটির মুদ্রিত রূপটি আমাদের এরকম একটা ভাবনার কাছে নিয়ে যায়—তিনি কি আগে লিখেছিলেন ভাষণটির একটি খসড়া? তা না হলে এত সুন্দর কী করে হয় তাঁর বাংলা? এত সুঠাম বাক্যে কীভাবে তিনি সাজান তাঁর কথাগুলি?

ভাষণটির সাহিত্যমূল নিয়ে অনেক গবেষক অনেক কথা বলেছেন। অনেকে বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি, রাজনীতির প্রকৌশলী বলেও আখ্যায়িত করেছেন। প্রবন্ধকার ভাষণটিকে বাংলা ভাষার প্রাণবন্ত ব্যবহারের একটা দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যা শহর এবং গ্রামের আমজনতা অতি সহজেই বুঝতে পারে। ৭ মার্চে যারা রেসকোর্সে উপস্থিত থেকে শুনেছেন তাঁরা সবাই যেমন বুঝেছেন, তেমনি পরবর্তীতে বেতারে বা মাইকে রেকোর্ডিং শুনেও সবাই বুঝেছেন। তাই প্রবন্ধকার ভাষণটাকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

> বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে কেউ কেউ একটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাই বটে। কবিরা যদি যথাস্থানে তথাশব্দ ব্যবহারে পারদর্শী হন, তাহলে বঙ্গবন্ধুও তো কবি। এই ভাষণটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই নির্বিকল্প, প্রতিটি শব্দই তাৎপর্যমণ্ডিত। বক্তৃতার শেষে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধনিতার সংগ্রাম' একটি দু'পঙ্‌ক্তির কবিতাই বটে।

মুক্তি এবং স্বাধীনতা শব্দ দুটির তাৎপর্য প্রবন্ধকার চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বাধীনতা যতটা রাজনৈতিক-ভৌগোলিক, মুক্তি শব্দটি তার চেয়েও গুরুত্ববহ-এর সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি-সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব। জনতা সেদিন দুটোরই ব্যাখ্যা দাবি করেছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর সুলিখিত বক্তব্যে জনতাকে তা জানিয়ে দিলেন। সেদিন এ ভাষণের প্রতিটি বাক্য জনতাকে আন্দোলিত-উদ্বেলিত করেছিল। তিনি প্রবন্ধটি শেষ করেছেন নির্বিশেষ একটি বক্তব্য দিয়ে। যেমন :

> আঞ্চলিক শব্দ মিশিয়ে যে বাঙলা তিনি সেদিন ব্যবহার করেছিলেন, তাতে ইতিহাসের, লোকসংস্কৃতি আর জনজীবনের গভীরের দোলা অনুভব করা যাচ্ছিল। আজও যখন ভাষণটি শুনি, চোখ বন্ধ করলে বঙ্গবন্ধুর তেজদীপ্ত চেহারাটা মনে ভেসে আসে। তাঁর কথাগুলি পরিষ্কার শুনতে চাই, আর অনেক দিন আগের সেই অপরাহ্নে ফিরে যাই।
>
> বিদেশি সাংবাদিক তার হোটেলে ফিরে যাবার আগে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ভাষণের পর কী হতে পারে। তিনি এক মুহূর্ত ভেবে বলেছিলেন, 'গেট রেডি'।

এ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত '৭ মার্চের ভাষণ : ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিবেচনার ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন সেলু বাসিত। লেখাটি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক। লেখক ৭ মার্চের ভাষণের ভাষাতাত্ত্বিক দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। সমাজে সর্বদাই ছিল দুই বিরুদ্ধবাদী মানসিকতার প্রভাব। একদল ছিল সমগ্রভাবে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে; আর এক পক্ষ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাসিক্ত মতকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এই দুই বিরুদ্ধবাদীদের একত্র করে, ঐক্যবদ্ধ করে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই ভূমিকা ঐতিহাসিক। বঙ্গবন্ধু একাত্তরে বাঙালি নেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিপতি :

> 'তিনিই আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক বিকাশের ধারায় পূর্ব পুরুষদের মৌলিক মানবিক দিকসমূহ চিহ্নিত করেই বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর করেছেন আমাদের। আমরা বিকশিত জাতি চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছি আজকের স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্যের সূচনা একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে সূচিত হলো।'

আমরা একথা আগে একবার উল্লেখ করেছি যে, বাঙালির লোকদর্শনের মানবিকতার প্রস্ফুটন বা ফলপ্রসূ প্রভাব লক্ষ করা যায় বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠে। মানবদরদী এই লোকনায়কের একটা পরিচ্ছন্ন মানবিক চিন্তার বিকাশ ফুটে উঠেছে এ বইটিতে। এটি একটি স্মৃতিকথা; কিন্তু মূলত তাঁর রাজনীতি চর্চার ইতিকথাও বইটি। কিন্তু কি প্রাণবন্ত ও নিটল বর্ণনা, সরল ও সহজভাবে বাংলার আকাশের রাজনীতির ক্ষেত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর প্রসঙ্গটি সেলু বাসিত এ প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন :

> 'বঙ্গবন্ধুর 'আত্মজীবনী' যদি আমরা আত্মস্থ করি তাহলে দেখা যায় শৈশব এবং কৈশোরের চুম্বকবৎ অনুভবে সঞ্চারিত হয়েছে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক ব্যাপ্ত দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, মন্বন্তর, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষার যূথবদ্ধ, সুপারস্ট্রাকচারেল সমাজ এবং চিন্তন প্রক্রিয়া। ক্ষত-বিক্ষত এ-সমাজ বাস্তবতার অভিজ্ঞতা আর বলদীপ্ত তারুণ্যের প্রতিবাদ-উজ্জীবিত সময়কালের পটভূমিতে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিশুদ্ধি ঘটেছে সূর্যসম্মত এক জীবন অন্বেষার দিকে। এ জীবন ভাবনায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বস্তুলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিমন্ডল হল তাঁর জীবন, জীবনায়তনের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠে উপলব্ধি করা যায় কাল সচেতন, ঐতিহাসিক বোধ আর পারিপার্শ্বিক চাঞ্চল্যে (Environmental sequence) প্রবল অস্তিত্ব ও সত্তা সচেতন ভাবনায় তাঁর জীবন সংগ্রামকে অনুরণিত করেছেন। তাঁর বিপন্ন মনুষ্যত্বের সামনে সংবেদন লাভ করা

যায়, পূর্ণাঙ্গ মানবিক এবং সেমেটিক সচেতন জীবন-উপলব্ধির বাঙালির আত্মপর—আছে বিপর্যস্ত মানবাত্মার স্বীকরণকৃত উদ্বেলতা। উদ্বেলতায় বেগবান তটিনীর সমুদ্র সঙ্গমের মত লক্ষ্যাভিসারী মাটির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের জীবন মন্থনের উত্তাপ, অখণ্ড বিশ্বলোকের মানবিক মোহনায় মিলনের উদ্বেলতা।'

সেলু বাসিত ভাষা কাঠামোর ব্যাখ্যা, ঐ ভাষণের ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব, বাংলা ধ্বনি পুনঃসংগঠন, শব্দের পৌনঃপুনিকতার বিবরণ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ভাষণে উচ্চারিত বর্ণ সংখ্যা, মূলধ্বনি ও অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংলা বাক্য বিন্যাসে দু'অক্ষর এবং তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ রয়েছে। আবার আত্মীকরণজাত বিদেশি শব্দ বাংলার চেয়েও লোকভাষা প্রয়োগে বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বেগবান করেছে এবং অনন্যতা দিয়েছে। সেলু বাসিত এগুলো উদাহরণসহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন :

'বাংলা বাক্য বিন্যাসে দু'অক্ষর এর শব্দ (Disyllabic/Bisyllabic word) যেমন রয়েছে তেমনি তিন অক্ষর বিশিষ্ট (Tri-syllabic words) শব্দও রয়েছে। ধ্বনিমাত্রিক এ-বিশিষ্টতা শব্দে গঠন প্রক্রিয়ায় দ্বি-শব্দ, ত্রি-শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ ভাব ব্যঞ্জক বাক্য প্রণালী বিদ্যমান ভাষা প্রকাশে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাবপ্রকাশ বাক্য-বিন্যাসে এ-ভাষা সংগঠন প্রয়োগ করেছেন।'

সেলু বাসিত এ ভাষণে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যতগুলো দিক আছে এবং যে যে কারণে ভাষণটি জনতার কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও শ্রুতিগ্রাহ্য হয়েছে তার সবগুলোই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এ লেখায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি গবেষণায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

সামরিক

এ অধ্যায়ে এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার (মেজর জে. অব.) লিখেছেন ৭ *মার্চের ভাষণের সামরিক তাৎপর্য* শীর্ষক প্রবন্ধ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সামরিক দিকটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি ভাষণটি যুদ্ধ প্রস্তুতিমূলক। আমরা পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস জানি, যে দেশে এই ২৩ বছরের অধিকাংশ সময়ই রাষ্ট্রযন্ত্র চালিয়েছে সামরিক জান্তা, যা ছিল পাকিস্তানের জন্য অভিশাপ। গণতান্ত্রিক নিয়মে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সাধারণ নির্বাচনে ভোটযুদ্ধে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কিছুতেই বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছে না। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং আওয়ামী লীগের উপর চালাচ্ছে নির্যাতন, ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে হত্যা ও ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন ৭ মার্চে তিনি পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী চলছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন।

৩ মার্চে পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ অন্যান্য ঘোষণার মধ্যে স্বাধীনতার কর্মসূচিও ঘোষণা করেছেন। তার আগে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের সামনে বটতলায় ছাত্রলীগ কর্তৃক স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়েছে। দেশের গান, আয়তন, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে। ৩ মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পঠিত হয়েছে। ঐ সম্মেলনে মুর্হুমুহ শ্লোগান উঠেছে—বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়, মুক্তিবাহিনী গঠন কর, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। সুতরাং যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে দেশ জুড়ে। সামরিক জান্তা যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা ছাড়বে না তা প্রায় সুস্পষ্ট। তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে ৭ মার্চের ভাষণে সামরিক বিবেচনা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে সামরিক দিক থেকে যা বলেছেন :

১. সামরিক আইন মার্শাল ল' তুলে নিতে হবে
২. সামরিক বাহিনীর সকল সদস্যকে ব্যারাকে ফেরত পাঠাতে হবে
৩. যেসব ভাইদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা হত্যা করেছে তার তদন্ত করতে হবে
৪. যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং
৫. ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে।

যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা এবং ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা এই নির্দেশের পর আর স্বাধীনতা ঘোষণার কি অবশিষ্ট থাকে?

একজন রাষ্ট্রনায়কের দূরদৃষ্টির উপর নির্ভর করে কোনো দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আলেখ্য ছিল অসাধারণ, ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং সেইভাবে তিনি মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে যুদ্ধ করে এবং রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা আনতে হবে। তাই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ এই ভাষণে গেরিলাযুদ্ধসহ আত্মরক্ষার সব কিছুই তিনি বিবৃত করেছিলেন। মোহাম্মদ আলী শিকদার '৭ মার্চের ভাষণের সামরিক তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

গতকাল ছিল ৭ মার্চ। বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম মাইলফলক তৈরি হয়েছিল একাত্তরের ৭ মার্চে ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ওই দিন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় ১০ লাখ জনতার উপস্থিতিতে মাত্র সাড়ে ১৮ মিনিটের একটি অলিখিত ভাষণে ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের সীমাহীন শোষণ ও নির্যাতনের একটি প্রখর চিত্র তুলে ধরে সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও সামরিক দর্শনের পরিপূর্ণ এক রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন। যাতে নেতার অনুপস্থিতিতে তার প্রদত্ত দর্শনই জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। ঠিক তা-ই ঘটেছিল। নেতার অনুপস্থিতে কাতারে কাতারে মানুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে মাত্র ৯ মাসের মাথায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলে। যার উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল। সে জন্যই ৭ মার্চের ভাষণটির গুরুত্ব সব

ভৌগোলিক গণ্ডির সীমানা অতিক্রম করে এখন সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জন্য এক অনন্য দর্শনে পরিণত হয়েছে। ফলে এটি এখন চিরঞ্জীব ও চির ভাস্বর।

বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও লোকধর্মসিক্ত মানবিকতা দিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার চিন্তাকে আমরা তিনটি ভাগে বিভাজন করতে পারি :

১. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ-উত্তরকালীন বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা,
২. ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সমর কৌশল এবং
৩. স্বাধীনতা-উত্তর দেশের ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য প্রতিরক্ষাবিষয়ক চিন্তা।

কিন্তু সবকিছুর মূল কথা হলো স্বাধীনতা কীভাবে অর্জন করা সম্ভব। আমরা আগেই বলেছি এই স্বাধীনতার জন্য যে বাঙালির বুকের রক্ত দিতে হবে এটা তাঁর দূরদৃষ্টিতে বহু আগেই ধরা পড়েছিল। আর একারণেই তিনি ছয় দফা কর্মসূচিতে বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের উপর। যাতে করে বাঙালি যুব সমাজের একটা অংশ পাকিস্তানের নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোকে অনুসরণ করেই সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হবে—এবং ভবিষ্যতে তারাই হবে বাংলাদেশ গণমুক্তি সেনার নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থল। মোহাম্মদ আলী শিকদার ৭ মার্চের ভাষণে শেষাংশে সামরিক নির্দেশনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

এক. 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'
দুই. 'জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা-যা আছে সবকিছু তোমরা বন্ধ করে দিবে'
তিন. 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব
চার. 'শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে'
পাঁচ. 'বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়'
ছয়. 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক'

দীর্ঘ মেয়াদি গেরিলাযুদ্ধের জন্য মাও সে তুংয়ের খ্যাতনামা ম্যাক্সিম হলো, 'শত্রু যখন ক্লান্ত হয়ে পিছু হঠবে ও নিজেদের সঙ্কুচিত করবে তখন তাকে ধাওয়া কর এবং আঘাত কর। আর শত্রু যখন এগুবে তখন পথে অসংখ্য ছোট ছোট বাধা সৃষ্টি কর এবং নিজেরা চলে যাও নিরাপদ স্থানে'। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা ও যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ ছিল মাও সেতুংয়ের উপরোক্ত সফল গেরিলাযুদ্ধের কৌশলের প্রতিফলন। এ নির্দেশের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই বাঙালি জনগোষ্ঠীকে যুদ্ধে শামিল হতে বলেছিলেন। এই সূত্রের সফল

প্রয়োগ যত বেশি হবে, ততই গেরিলাবাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি গুণিতক হারে বাড়তে থাকবে। ফলে আক্রমণকারী বা দখলদারদের ভেতরে ভীতির সঞ্চার হবে, তারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে ক্যাম্প ও বাংকারের মধ্যে। আর তখন শত্রুর পরাজয় হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী এটা কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা সর্বত্রই ক্যাম্প ও বাংকারভিত্তিক হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক কনভেনশনাল বা প্রচলিত এবং নন-কনভেনশনাল বা অপ্রচলিত, উভয় যুদ্ধেই Denial Plan কার্যকরী করা যুদ্ধের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পরিকল্পনার মূল কথা হলো—নিজেদের কোনো সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা শত্রু যেন ব্যবহার করতে না পারে। রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু বন্ধ করা এবং ভাতে মারব ও পানিতে মারব নির্দেশনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমর কৌশল Denial Plan বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।'

নয় মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা দেখেছি দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলার খুব বড় কোনো অবনতি ঘটেনি। এটা একটা বিরল ঘটনা। মুক্তিযোদ্ধাদের নৈতিক মনোবল ছিল দৃঢ় এবং সেই সঙ্গে লোকসমাজের মনের গহীনে লুকিয়ে ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সেই সব কথা 'শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে' 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়'—এইসব মানবিকতাপূর্ণ নির্দেশ। মোহাম্মদ আলী শিকদার লিখেছেন :

> 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র বাঙালি জাতিকে বিশেষত সেনাবাহিনী, পুলিশ, তৎকালীন ইপিআর এবং আনসার বাহিনীর সদস্যদের এমনভাবে উদ্বেলিত করেছিল, তারা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যার কাছে যে অস্ত্র ছিল তা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের মিলন ও সমন্বয় ঘটতে তেমন সময় লাগেনি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকে অবলম্বন করে এবং বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ফ্রন্ট এবং সশস্ত্র ফ্রন্ট এভাবে একই মোহনায় মিলিত হয়ে অগ্রসর হয়েছিল। যুদ্ধের সময় পুরো ৯ মাস জুড়ে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মনে সব সময় প্রেরণা ও অদম্য সাহস জুগিয়েছে ৭ মার্চের ভাষণের মর্মবাণী। ৯ মাসব্যাপী মুজিবের কণ্ঠস্বর ছিল সাড়ে ৭ কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর।'

অর্থনীতি

একটি দেশের অর্থনীতি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের বিষম ফল পূর্ববাংলার মানুষকে ভোগ করতে হয় সেই সূচনাকাল থেকেই। নতুন এক উপনিবেশবাদের কবলে পড়ে এই বাংলা।

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র দিনের পর দিন নানা কূটকৌশলে শোষণের জাল বিস্তার করে চলে। আর এই শোষণের ও বঞ্চনার বিরুদ্ধেই বঙ্গবন্ধু জীবনপন সংগ্রাম শুরু করেন। ইতোপূর্বে বহু ভাষণ ও বক্তৃতায় তিনি এই শোষণের চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরেন। এবং পাকিস্তানি শাসকচক্রকে নানাভাবে অনুরোধ-উপরোধ করেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই শাসকচক্র কর্ণপাত করে না। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবিনামা পেশ করেন। এই ছয় দফার একটি দফার প্রধান শর্ত ছিল পূর্ব বাংলা থেকে এক পয়সাও পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না—এজন্য পাকিস্তানের দুই অংশে দুইটি রিজার্ভ ফান্ড গঠনেরও প্রস্তাব দেন তিনি।

৭ মার্চের ভাষণ যখন দেন তখন বাংলার আকাশে কালো মেঘ ছায়া বিস্তার করেছে, বলা চলে বাংলার মহাসংকটকাল, স্বাধীনতা দোরগোড়ায়; কিন্তু আবার বহুদূর। লেশমাত্র ভুল করা চলবে না। সমস্ত দায় দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর কাঁধে এসে চেপেছে। তাঁকেও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা হত্যা করতে পারে, গ্রেপ্তার করতে পারে, গুম করতে পারে! বঙ্গবন্ধুর চিন্তা কেবল আজকের বা ৭ মার্চের নয়—ভবিষ্যতে জাতি কীভাবে তার নিজের পায়ে দাঁড়াবে, ধনে বলে বলিয়ান হবে। অর্থাৎ ৭ মার্চের ভাষণটি যদিও রাজনৈতিক তবু এটি একটি দেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি এতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। '৭ মার্চের ভাষণ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য' শীষক নিবন্ধে ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী লিখেছেন :

> 'বস্তুত রাজনীতিবিদরাই সাধারণত অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আর তা তারা দেন সে অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টির ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে—এর সাথে যুক্ত থাকে ঐ অঞ্চলের সামষ্টিক চাহিদা ও সামষ্টিক সরবরাহের বিষয়টি। পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসনামলে এদেশের মানুষের ভোগ প্রবণতা এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হ্রাস পেয়েছিল। জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। পাটকে সোনালী আঁশ বলা হলেও রপ্তানিলব্ধ আয় এদেশে না এসে পশ্চিম পাকিস্তানেই থেকে যেত। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তৎকালীন সময়ের হিসাবে এদেশ থেকে ৩১১২ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে গিয়েছিল বলে এদেশের অর্থনীতিবিদরা হিসাব কষে বের করেছিলেন।'

বাঙালির মুক্তির সুস্পষ্ট নিশানা ছিল ছয় দফায়। বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা ব্যাখ্যা করে লোকসাধারণকে বোঝাচ্ছিলেন, তখন দেখা গেল সব সচেতন বাঙালি ধীরে ধীরে ছয় দফা আন্দোলনের পতাকাতলে একত্রিত হচ্ছেন।[২১] পূর্ববাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও সম্পদ পাচারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে একটার পর একটা সুরম্য শহর-বন্দর গড়ে ওঠা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মরু-অঞ্চল কৃষিযোগ্য করার জন্য একটার পর একটা বাঁধ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাকার তথ্য বঙ্গবন্ধু দিনের পর দিন ব্যাখ্যা করেন। সরকারি চাকরি, সেনাবাহিনীসহ সব ক্ষেত্রে বাঙালিকে

দমিয়ে রাখা, ভাষার উপর আঘাত, সংস্কৃতির সচ্ছন্দ গতি রুদ্ধ করাসহ সব ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেই বঙ্গবন্ধু জাতিকে সতর্ক করেন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই স্বায়ত্তশাসনের দাবির পেছনে ছিল এক দফা *স্বাধীনতা*। এ কাজটি যুগপৎ আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ সমান্ত রালভাবে এগিয়ে নিচ্ছিল। ছাত্রলীগের মধ্যে একটি অংশ অথবা বলা চলে প্রধান অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তি, প্রাগ্রসর—তাদের মূল লক্ষ্য স্বাধীনতা এবং এটি পরিচালিত হতো বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশ মতো—এটা ছিল অত্যন্ত গোপন কার্যক্রম।[২২]

ছয় দফার প্রধান এবং বাহ্যিক দিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। আওয়ামী লীগ গোড়া থেকেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে আসছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দৃশ্যমানতা এই দাবি আরো বস্তুভীতি পায়। বঙ্গবন্ধু দেশের বিভিন্ন জেলায় বক্তৃতা করে প্রত্যেক দফার ব্যাখ্যা দেন। ছয় দফা সাধারণের বোধগম্য করার জন্য বঙ্গবন্ধুর দেয়া বক্তব্যের ৩, ৪ ও ৫ নং দফার ব্যাখ্যা থেকে খানিকটা আলোচনা করতে পারি। ৩ নং দফার মূল বিষয়টি হচ্ছে মুদ্রা ব্যবস্থা : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন এবং দুই অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র্য দু'টি স্টেট ব্যাংক রাখার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির বিশ্বের বৃহৎ ও শক্তিশালি রাষ্ট্রেরও আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে। সোভিয়েত ইউনিয়নেও কেন্দ্রে কোনো অর্থমন্ত্রী বা অর্থদপ্তর নেই। ৪নং দফার শর্ত তো আরো পরিষ্কার। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য ও আদায়ের দায়িত্ব থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। এখান থেকে প্রয়োজন মত এবং আনুপাতিকভাবে সেই অর্থ ফেডারেল সরকার ব্যয় করবে। ৫নং দফার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন :

১. এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে,
৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে,
৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে,
৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

১৮ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস কি বলে :

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতোই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে :

ক. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা বলা হইতেছে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব-পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

গ. পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিত পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রপ্তানি করে আমদানি করে সাধারণ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইন্‌ফ্লেকশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশি মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতেক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।[২৩]

আমরা যদি ছয় দফার দিকে একবার গভীরভাবে নজর দেই তাহলে দেখবো সত্যিই বঙালির মুক্তির সনদ এই ছয় দফা। অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার কবল থেকে বঙ্গবন্ধু কীভাবে দফাগুলোতে মুক্তির ইঙ্গিত করেছেন ৩—৫ নং দফা পাঠ করে তা জানতে পারি :

৩. ক) দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা দুই অঞ্চলে প্রবর্তন করা যেতে পারে; অথবা

খ) গোটা দেশের জন্য একটি মুদ্রা রাখা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধে শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে। পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ রাখতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে;

৪. ফেডারেশনের ইউনিটগুলির হাতে করারোপ ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। ফেডারেল কেন্দ্রের হাতে এ রকম কোনো ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেন্দ্র তার নিজ ব্যয় চাহিদা মেটানোর জন্য প্রদেশগুলির করের একটা অংশ পাবে। প্রদেশের সকল করের ওপর একটা নির্ধারিত হারে লেভি থেকে একটা সর্বমোট সুসংহত তহবিল গড়ে উঠবে;

৫. ক) দেশের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের জন্য দুইটি পৃথক বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার হিসাব থাকবে;

খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে;

গ) ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন দুই অঞ্চল কর্তৃক সমান হারে অথবা নির্ধারণযোগ্য অনুপাতে দুই অঞ্চল কর্তৃক মেটানো হবে;

ঘ) দেশজ পণ্য দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে শুল্কমুক্তভাবে অবাধে চলাচল করবে;

ঙ) শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাবলে ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলি বিদেশে বাণিজ্য মিশন খুলতে ও বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।[২৪]

আমরা কি দেখতে পেলাম। যেভাবে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক বাঙালিকে শোষণ করছিল তা থেকে বাঁচার সবগুলো পদ্ধতিই বঙ্গবন্ধু এই দফাগুলোতে বিবৃত করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে যে শোষণের জাল পাকিস্তান সরকার বিস্তার করেছে তার মূলে কুঠারাঘাত করেন বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমে। ৭ মার্চ চূড়ান্ত পর্যায়—অচিরেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে ঘোষিত হতে যাচ্ছে—সেই স্বাধীনতারই একটি স্বরচিত কবিতা তিনি পাঠ করছেন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে। মঞ্চেই তিনি সেটা রচনা ও পরিবেশন করেছেন। মাহবুব আলী আরো লিখেছেন :

> বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তাঁর কাছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত এদেশের মানুষরাই ছিলেন সব কিছুর উর্ধ্বে। তিনি বিজয়ীর বেশে কথা বলেছেন—অহিংসার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন অসাম্প্রদায়িকতার কথা। আর অসম্প্রদায়িকতা মানে কিন্তু ধর্মহীনতা নয়। বরং যার যার ধর্ম তার কাছে সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বন্ধুত্ব বজায় রাখা। আসলে বঙ্গবন্ধু খাঁটি বাঙালি জাতিয়তাবাদী ছিলেন বলেই ৭ মার্চের ভাষণে তার একান্ত বিশ্বাস থেকে এবং দেশের মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা-ভাবনা করে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

ছয় দফা বাংলার স্বাধীনতার সুতিকাগার বা স্বাধীনতার বীজতলা—ছয় দফার বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত ছিল একদিন এই বাংলা স্বাধীন হবে এবং সেদিন খুব বেশি দূরে নয়। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১, মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধুকে ৭ মার্চের মঞ্চে উঠতে হচ্ছে স্বাধীনতার কবিতা শোনাতে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই ছয় দফা আন্দোলনে যার সূচনা ৭ মার্চের ভাষণে তার সমাপ্তি। ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয় দফা এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ একই সূত্রে গাথা, যেন একবৃন্তে দুটি ফুল, একটি অপরটির পরিপূরক, যার মূল কথা আমদের পরম কাঙ্ক্ষিত প্রিয় স্বাধিনতা।

আমরা এই ভাষণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ১০টি বিভাগে বিভাজন করেছি। আমরা মনে করি অবিলম্বে এ বিষয়ে একটি গবেষণা সেল খুলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা কাজ শুরু করা বাঞ্ছনীয়। এ ভাষণ জাতিকে নিয়ে যাবে অনেক দূর। এ ভাষণের গবেষণার বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সুচিহ্নিত হবে।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালির হাজার বছরের জীবন-সংগ্রামের অমিয় দলিল, যার প্রতিটি বর্ণ শব্দ রক্তস্নাত, মুক্তিযুদ্ধের প্রণোদনা সঞ্চারি এবং একই সাথে মানবিক সংবেদনশীলতায় পূর্ণ। পৃথিবীতে যতদিন থাকবে বাংলা ভাষা-বাংলাদেশ ততদিন এই ভাষণ থাকবে উজ্জ্বলতর হয়ে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ভাষণ নিয়ে গবেষণা হবে, হাজার পৃষ্ঠা লেখা হবে সর্বকালব্যাপী। শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য, মানুষের আত্ম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ববাসীকে দিবে অফুরন্ত প্রেরণা। বিশ্বে আমরা সেই গর্বিত পিতার সন্তান। এ যুগের তরুণ সমাজ, হাজার মুজিব সন্তান অবশ্যই একদিন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবেই তুলবে।

তথ্যনির্দেশ

১. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. v

২. শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
'আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হল ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতী নদী। মধুমতী খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।' বিস্তারিত জানা জন্য দেখুন : ঐ, পৃ. ১-১০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৬

৪. প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. xii

৫. আবদুল ওয়াহাব, ফোকলোর, মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৫০

৬. আবদুল ওয়াহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৭. আবদুল ওয়াহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, জানয়ারি, ২০০৩, পৃ. ১১৪

৯. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, আদিবাসী লোককথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০১, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৯

১০. আবদুল ওয়াহাব, বাংলাদেশের লোকগীত : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪১৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০

১২. অহিংস ও ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবতাবাদী সমাজচিন্তক হিসেবে আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নজরুল এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের—আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রাহমান, ওয়াহিদুল হক প্রমুখকে

১৩. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ৬৪

১৪. ফোকলোর, মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু, প্রগুক্ত পৃ. ১৬৩

১৫. ফরহাদ খান, প্রতীচ্য পুরাণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ১৫০-১৫২ ও ২১২-২১৮

১৬. সরদার ফজলুল করিম, মহাত্ম গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী, 'বাংলাদেশে মাহত্মা গান্ধী, সম্পাদনা—তোফায়েল আহমেদ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃ. ২৬১

১৭. সুফিয়া কামাল, আমার দেখা মুজিব, প্রাগুক্ত, পৃ ২২

১৮. আবদুল ওয়াহাব, বাংলাদেশের লোকগীতি : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯০৮, পৃ. ২৫।

১৯. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, আদিবাসী লোককথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০১, পৃ. ১৬০।

২০. অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালির সংস্কৃতি, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন, ২০০৭ পৃ.১৮

২১. মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই, ২০০২, পৃ. ৩৮২

২২. শ্যামলী ঘোষ, আওয়ামী লীগ, ১৯৪৯-১৯৭১, অনুবাদঃ হাবীব-উল-আলম, দি ইউপিএল, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১৮

২৩. শেখ মুজিবুর রহমান, এই দেশ এই মাটি, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৭ মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৭৯-৮০

২৪. বাংলার সোনালী আঁশ খ্যাত পাট এবং পাট চাষীদের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য : 'পাট চাষিদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি
পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট চাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে, পাট চাষিদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষিকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভূত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষির ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরিব পাট-চাষি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রপ্তানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া আর কোন প্রতিকার নাই। একথা আমরা

বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং করপোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরদ্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট চাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রপ্তানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ন্তর নাই। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

রাজনীতি

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ : কিছু স্মৃতি
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
পেছন ফিরে ৭ মার্চ
৭ মার্চ : বাঙালির স্বরূপে উদ্ভাসের দিন
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ
৭ মার্চের মহাকাব্য : তার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
অসহযোগ আন্দোলন ও সাতই মার্চের ভাষণ
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য
সেই কবি, সেই কবিতা
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ
৭ মার্চ ১৯৭১ : জাতি নির্মাণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধু
নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর হওয়ার প্রেরণা
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র
শেখ সাহেব ও ৭ মার্চের ভাষণ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ : কিছু স্মৃতি

শেখ হাসিনা

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ ছুটে এসেছে নেতার নির্দেশ গ্রহণ করতে। ছয় দফা দাবি যখন পাকিস্তানিরা মানবে না তখন এক দফা বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থাৎ স্বাধীনতা, স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি। সেই ৭ মার্চের ভাষণের পূর্বের ঘটনা আমার মনে পড়ে। প্রায় প্রতিদিন মিটিং, সংবাদ সম্মেলন, দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে মিটিং, সংসদ সদস্যদের সঙ্গে মিটিং। এ ছাড়াও আরো নানা ধরনের প্রস্তুতি। অত্যন্ত ব্যস্ততা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে প্রতিটি দিন কাটছে। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মিছিল আর মিছিল। বাঙালি আজ দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ 'স্বাধীনতা আমাদের চাই, পশ্চিমাদের সঙ্গে আর নয়।'

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। ওই দিন কত মানুষ, কত মত, কত কাগজ, কত পরামর্শ। আব্বা সবই ধৈর্যসহকারে শুনেছেন। সব কাগজই গ্রহণ করেছেন। সারাটা দিন এভাবেই কেটেছে। যখন জনসভায় যাওয়ার সময় হলো তার কিছুক্ষণ পূর্বে আব্বা কাপড় পরে তৈরি হবেন। মা আব্বাকে ঘরে নিয়ে এলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আব্বাকে বললেন, ১৫ মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকার জন্য। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে মাথাটা টিপে দিচ্ছিলাম। মা বেতের মোড়াটা টেনে আব্বার কাছে বসলেন। হাতে পানদান, ধীরে ধীরে পান বানাচ্ছেন আর কথা বলছেন। যে কোনো বড় সভায় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে মা আব্বাকে কিছুক্ষণ একদম নিরিবিলি রাখতেন। সেদিন আব্বার একটু সর্দি ছিল। আমি গলায় কপালে ভিক্স মালিশ করে দিলাম। কাঁথাটা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকলেন।

আমার মা আব্বাকে বললেন, সমগ্র দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ভাগ্য আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি আজ একটা

কথা মনে রাখবে, সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে তুমি তাই বলবে। অনেকে অনেক কথা বলতে বলেছে। তোমার কথার ওপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত, তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে সেটাই ঠিক হবে। দেশের মানুষ তোমাকে ভালোবাসে, ভরসা করে।

মায়ের একথাগুলো আজো আমার কানে বাজে। কত বাস্তবধর্মী চিন্তা-ভাবনা তিনি করতেন এবং একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক তিনি ছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন।*

* শেখ হাসিনার লেখা, আমার মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব শীর্ষক প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা : ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, বৈশাখী প্রকাশনী, নবতর সংস্করণ, আগস্ট ২০১১, পৃ. ১৯-২০

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

সরদার ফজলুল করিম

ক্যাসেটের বাজারে ৭ মার্চের সেই ক্যাসেটটি কিনতে পাওয়া যায়, আমি একটি কিনেছি। '৭১-এর ৭ মার্চ দুপুর গড়িয়ে বিকেলে রেসকোর্সের ময়দানে শেখ মুজিব যে ভাষণ দিয়েছিলেন, ক্যাসেটটিতে সেই ভাষণের, মনে হয় পুরোটাই আছে। ছোট-বড় যে কোনো ক্যাসেট বাজানোর যন্ত্রে দিলেই সেই কণ্ঠ শোনা যায়। সেই কণ্ঠ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলতে বলতে শেষে বলে ওঠে : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একদিন তৈরি হলো গ্রামোফোন নামক একটি যন্ত্র, শক্ত রেকর্ডে শব্দকে আটকে রাখার কায়দা। সেই শক্ত রেকর্ডের গায়ে কাঁটা বসিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই যে শব্দ একদিন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত, সেই শব্দ হুবহু বেজে ওঠে : কণ্ঠের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওঠা পড়া। কোনোটিই আর নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অন্তত বেশ কিছুকাল, বছর থেকে বছর, যুগ থেকে যুগ।

সেই কৌশল আজ আরো কতদূর এগিয়েছে। এখন শব্দের ফিতা তৈরি হয়েছে। সে ফিতাও ঘোরাতে থাকলে শব্দ ঠিক বেজে ওঠে। কেবল যে বেজে ওঠে তাই নয়। শব্দের উপরে নতুন শব্দ আজ চালাক মূর্খ যে কেউ ইচ্ছামতো তুলে রাখতে পারে। আমি নিজে বৈজ্ঞানিক নই। মূর্খ মানুষ। ফিতা খুলেও আমি দেখেছি। ওতে ছাই, কিচ্ছু দেখা যায় না। তবু মেশিনে দিলেই আবার বেজে ওঠে। আমি আগে ভূত বিশ্বাস করতাম না। এখন করি। এ একেবারে ভূতুড়ে কারবার। আমার কাছে অপার রহস্যের ব্যাপার। একেবারে অলৌকিক। কিন্তু আমি কৃতজ্ঞ এই ক্যাসেট-ভূতের কাছে। এই ক্যাসেট এসেছে বলেই না ৭ মার্চের সেই লাখো লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে একটি রূপান্তরিত মানুষের তাঁর নিজেও অজানিত তাৎপর্যে উচ্চারিত স্বপ্ন, কামনা আজও আমার কানে সাক্ষাৎভাবে বেজে ওঠে।

ক্যাসেটটি ছাড়লেই আমি যে কেবল তুলনাহীন সেই দরাজ কণ্ঠের আওয়াজ শুনি : 'ভাই এরা আমার মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো'—তাই নয়। আমার চোখের সামনে সমগ্র দৃশ্যপটটি ভেসে ওঠে। রেসকোর্সের বিরাট মাঠ। লোক আসতে শুরু করেছে দশটা না বাজতে। শেখ সাহেব বক্তৃতা দিবেন বোধ হয় আড়াইটায়। আমি থাকি তখন মতিঝিল কলোনিতে। চাকরি করি বাংলা একাডেমিতে। সেদিন কি আমার অফিস খোলা ছিল? এ প্রশ্ন অবান্তর। একুশে ফেব্রুয়ারি আর পহেলা মার্চের পর থেকেই বাংলাদেশের মানুষের কোনটা কাজ এবং কোনটা কাজ নয়, কোনদিন অফিস আর কোন্‌দিন অফিস নয়, সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাই ৭ মার্চ আমাদের সকলেরই অফিস ছিল, করণীয় ছিল। করণীয় ছিল রেসকোর্সের ময়দানে হাজির হওয়া, করণীয় ছিল শেখ মুজিবের ভাষণ শোনা। আমার আগ্রহ ছিল কেবল ভাষণ শোনা নয়, জনতাকে দেখা। শেখ মুজিবকে সেই সুউচ্চ মঞ্চ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে না, সে আমি জানতাম। শেখ মুজিব আমার খুব যে অপরিচিত ছিলেন, এমনও নয়। একটি বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যবয়সী মানুষ। আমার প্রায় সমবয়সী। একেবারে সমবয়সী যে, তা নয়। আমার জ্যেষ্ঠ, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে নয়। মাত্র নয়-ছয়ের ব্যবধান হয়তো। কিন্তু সে পুরুষ দীর্ঘ ছিলেন আমার চাইতে অনেক। মানুষের শরীরের সঙ্গে মানুষের মনের নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ আছে। দীর্ঘ পুরুষের মনে হয়তো সাহস বেশি হয়, ক্ষুদ্র পুরুষদের চাইতে, আমার মতো ক্ষুদ্র পুরুষদের চাইতে তো বটেই। আর এই এক দুর্ভাগ্য যে, বাঙালিদের বেশির ভাগই আমার মতো ক্ষুদ্র। আবার দীর্ঘদেহী যে একেবারে নেই, তাও নয়। কিন্তু দীর্ঘদেহ হলেই কি বুকে অধিক সাহস জন্মায়? সাহস প্রতিকূল অবস্থার মুখে, সাহস জেলের নির্জন সেলের মধ্যে, সাহস ফাঁসির মঞ্চের সিঁড়িতে? না, দীর্ঘদেহ হলেই বৃহৎ সাহস তৈরি হয় না।

কিন্তু বাঙালি ক্ষুদ্র হলেও অনেক বাঙালি একত্র হলে, ক্ষুদ্র আর কৃশ আর কাহিল বাঙালি একত্র হলে, তাকে আমার বেশ দীর্ঘদেহী, শক্তিশালী ব্যক্তি বলে বোধ হয়। '৫২ সাল আমি দেখিনি। কিন্তু '৬৯ সাল থেকে এ রকম মানুষের সাক্ষাৎ এই ঢাকা শহরেই পল্টনের মাঠে, রেসকোর্সের ময়দানে, শহীদ মিনারের নিচে আর রাস্তায় একাধিকবার পেয়েছিলেম। আর দেখছিলাম অপ্রত্যাশিতভাবে এমন দীর্ঘদেহী মানুষের সংখ্যা যেন দিনকে দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, আর সকাল, বিকাল, দুপুর প্রত্যেক রোজই যেন তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটছে।

আমি জানতাম ৭ মার্চের রেসকোর্সের নানা শঙ্কা-আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে যে মানুষটি হাজির হবেন তাঁর দৈর্ঘ্য এবং সাহস অতীতের সকল দীর্ঘদেহীকেই অতিক্রম করে যাবে। এই মানুষটির চেহারা কীরূপ হবে, সেটি জানার আকর্ষণই আমাকে দুপুর থেকে টানছিল। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম সেই মানুষটির

কত কাছে যেতে পারি, তা দেখতে। দক্ষিণ মাথা দিয়ে শুরু করে আমি কেবল এগুচ্ছিলাম উত্তরের দিকে। সেই সুউচ্চ মঞ্চটির দিকে। কিন্তু একে তো ঘন প্রাচীর আমাকে এগুতে দিচ্ছিল না সামনে, তাতে যত সামনে এগুচ্ছিলাম আমি, তত আমার মনে হচ্ছিল যেন বিরাটদেহী সেই মানুষটিকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। আসলে যাকে তুমি বড় করে দেখতে চাও, সমগ্র করে, তার একেবারে কাছে যেতে নেই। তাহলে ক্রমান্বয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তোমার নজরে পড়বে : হয় তার পায়ের পাতা, নয় তার দুটি হাত, কিংবা দুই চোখ কিংবা মুখের হাঁ। যাকে আমি সঠিকভাবে দেখতে চাই, তাকে দেখতে হবে একটু দূর থেকে, যেখান থেকে তার হাত, পা, মাথা মিলিয়ে তার যে পূর্ণ অবয়ব, সেটি আমার দৃষ্টিতে আসবে। আমি তাই হতাশ হয়ে খুঁজছিলাম কোনো উচ্চস্থান, কোনো দূরত্ব যেখান থেকে ৭ মার্চের রেসকোর্সে আগত সেই অদৃষ্টপূর্ব মানুষটিকে কিছুটা দেখতে পাই। তার জন্য কখনো রেসকোর্সের মন্দিরটির বরাবর হটে আসছিলাম। কখনো আরো হটে এসে আমার নিজের অফিস বাংলা একাডেমির একেবারে ছাদে আরোহণ করছিলাম।

এমন চেষ্টাতে সেই মানুষটির যা একটু আভাস আমি পাচ্ছিলাম তাতে আমি নিজের অজান্তেই যেন রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি নিজেকে যত ক্ষুদ্রাবয়ব মনে করি, তেমন আর তখন যথার্থই ছিলাম না। আমার অবয়বকে আমি যথার্থই ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম। দেহ আমার দীর্ঘ হচ্ছিল। শরীরে আমার রোমাঞ্চ জাগছিল। সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর তাই পাকিস্তানি জঙ্গি বিমানগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে যখন আসা-যাওয়া করছিল এবং সে বিমান থেকে যে কোনো মুহূর্তে যে মৃত্যুর বাণ আমার বুকে এসে বিঁধতে পারে, সে কথা জেনেও আমার পা একটুও কাঁপছিল না। আমি ছুটে পালাতে চেষ্টা করিনি। এ স্মৃতি এক আশ্চর্য স্মৃতি। এই ক্যাসেটটা ছাড়তেই সেই স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে, আর এখনো আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

এই আমার এক দুর্লভ ভাগ্য। আজ থেকে তের বছর আগের ভাগ্য। আমার যে ছেলেটির বয়স তখন মাত্র পাঁচ, সে হয়তো আমার হাত ধরে '৭১-এর ৭ মার্চের সেই মানুষটির দর্শনে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে বোঝার মতো সচেতন মন তখনো তার তৈরি হয়নি। আজ তার বয়স হয়তো ১৮। ১৮ বছরের তরুণ। ওরই হাজার সঙ্গীসাথী আজ আবার রাস্তায় বেরুচ্ছে, মিছিল করছে, পুলিশের ট্রাকের নিচে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে, গুলির আঘাতে ঢলে পড়ছে। এই তরুণদের মিছিলও আবার স্মরণ করিয়ে দেয় আমাকে '৭১-এর সেই মার্চের দৃশ্যকে, ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানকে।

আশপাশের অনেকে প্রশ্ন তোলেন : কিন্তু সেই তেজ কোথায় আজকের মোর্চার মধ্যে, শক্তির সেই দ্যোতনা কোথায়? প্রশ্নটির সঠিক জবাব আমার জানা

নেই। তবে সেই শক্তি তথা বোধের যদি অভাব থেকেই থাকে তবে তার একটি কারণ আমার এই মনে হয়, আমার ১৭ কি ১৮ বছরের ছেলেটির ভাগ্য হয়নি ৭১-এর ৭ মার্চকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করার।

কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যেক মুহূর্তেকে কি পরবর্তীকালের সন্তানেরা প্রত্যক্ষ করতে পারে? এও এক প্রশ্ন। এখন এই মুহূর্তে যেটা প্রত্যক্ষ, পরমুহূর্তে তা পরোক্ষ, তা অতীত। এই মুহূর্তে যে আওয়াজ উচ্চারিত, যে মোর্চা সংগঠিত, পরমুহূর্তে তা বিগত, বিলুপ্ত। বস্তুজগতের প্রবহমানতার এই এক অমোঘ নিয়ম। আর এই নিয়মকে অতিক্রম করার জন্যই মানুষ তৈরি করতে চেয়েছে নানা কলা-কৌশল, ঘটনাকে, তার আবহকে, তার নায়ক-নায়িকাদের কর্মকাণ্ডকে ধরে রাখার, চিত্রে, লেখনীর অক্ষরে, শব্দে, বিবরণে, বর্ণনায়। যখন থেকে মানুষ চেষ্টা করেছে এসব কলা-কৌশল তৈরি করার, তখন থেকেই মানুষের ইতিহাস রচিত হয়েছে। তখন থেকে নির্দিষ্ট কালকেই মানুষ বলে ঐতিহাসিক কাল তার পূর্বের কাল প্রাগৈতিহাসিক।

মোটকথা মানুষকে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয় তার জীবনপ্রবাহের যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে, তার নায়ক-নায়িকাকে, তাদের বাণী আর কর্মকাণ্ডকে এবং সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আবহকে নানা কৌশলে ধরে রাখার, পুনরুজ্জীবিত করার, যেন পরবর্তী যে কোনো কালের মানুষ তার পূর্বকালের ঘটনা, মানুষ ও তাদের ক্রিয়া-কর্মকে প্রত্যক্ষের মতো বোধ করতে পারে। কারণ অতীতের মধ্য দিয়েই বর্তমানের সৃষ্টি। আর তাই অতীতের তাৎপর্যের বোধ বর্তমানের মধ্যে না থাকলে বর্তমান নিজেকে শেকড়হীন, উদ্দেশ্যহীন যাযাবর ভাবতে বাধ্য।

কিন্তু আধুনিককালের মানুষের কিংবা মানুষের কোনো কোনো অংশের এই কৌশলও লক্ষণীয় যে, সে চেষ্টা করে যেন মানুষ তার অতীতকে বিস্মৃত হয়। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বাংলাদেশের বুকেই বিদ্যমান।

বর্তমানের প্রশাসনপ্রধান, সামরিক-বেসামরিক বাহিনী এবং সরকারি, বেসরকারি সব দল স্বীকার করে যে, '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের সফল সমাপ্তিতে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ। এ কথা বাংলাদেশের যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য। এবং সকলেরই প্রতিযোগিতা, এই স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর অবদানই যে বিরাট, এ কথা প্রমাণ করতে। এবং এ কথাও স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ কোনো একটি দল বা গ্রুপের ছিল না। ৭১ সালের সংগ্রাম যথার্থই জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল এবং সেই সংগ্রামের অনস্বীকার্য নেতা শেখ মুজিব দলীয় নেতার অধিক হয়ে জাতীয় নেতার চরিত্র ধারণ করেছিলেন। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মধ্য পরিমাণ বিত্তের কৃষকের সংসারের একটি তরুণ জন্ম থেকে বা রাতারাতি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হয়নি। '৭১ সালে শেখ মুজিব যথার্থই বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন বলেই 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি তাঁর স্বআরোপিত উপাধি নয়। এ আখ্যা ছিল একটি সংগ্রামী জীবনের প্রতি দেশবাসীর সস্নেহ উপাধি। আর সে কারণেই

বাংলাদেশের জীবনে আজকের দিনের বড় প্রশ্ন, সেই অবিসংবাদী জাতীয় নেতার নাম-নিশানা আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে কেন? সরকারপ্রধান তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের এত যে স্মরণ প্রচেষ্টা, দিবস পালন, বক্তৃতা ও বিবৃতিদান, তাতে বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমানের যত নেতার নাম উচ্চারিত হোক না কেন, শেখ মুজিবের নাম অনুচ্চারিত।

আমার ইচ্ছা জাগে, আমার ছেলের বয়সী সতের কি আঠার বছরের যারা তরুণ, যারা যুবক তাদের কাছে '৭১-এর ৭ মার্চের এই ভাষণটি বাজিয়ে জিজ্ঞেস করি, এই ভাষণ শুনে তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? কিন্তু আঠার'র সঙ্গে আটান্নর ব্যবধান বিস্তর। তাই আমার নিজের ঘরের ছেলেকেও আমি আমার মনের এই কথাটি জিজ্ঞেস করতে ভয় পাই। আমার ভয়ের এক কারণ, আমার সন্তান হয়তো বলবে, 'হ্যাঁ' বক্তৃতাটি শুনে মনে হচ্ছে খুব যোশের বক্তৃতা। 'কিন্তু কেবলই কি যোশের ব্যাপার ছিল সেদিন এই ভাষণে; যোশের কথা তো যে কোনো সময়ে যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু সেদিন শেখ মুজিব যা বলেছিলেন, তা তাঁর পক্ষে সেদিনই মাত্র বলা সম্ভব ছিল, আর সে ভাষণের তাৎপর্য আজ কেবল তার শব্দের পুনর্বাজনার মাধ্যমে ধরার কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন লাখো মানুষের জমায়েতভরা সেদিনের সেই রেসকোর্স, তার মধ্যে স্থাপিত সেই মঞ্চ, শেখ মুজিব এলেন একটু বিলম্বে, তিনি উঠলেন মঞ্চে, চারদিকে তিনি দৃষ্টি ফেললেন, দেখলেন লোকে-লোকারণ্য, শুনলেন আকাশে জঙ্গি বিমানের গর্জন এবং সেই গর্জনকেও অতিক্রম করে উঠছে উদ্বেল লাখো মানুষের সংগ্রামী আওয়াজ। দেখছেন লোক তখনো আসছে আর আসছে। আর এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে শেখ মুজিব বদলে যেতে লাগলেন নিজের অজান্তে। এমনি হয়। জনতার মধ্যে জন এমনিভাবে বদলায়। জনতার বাইরে জন তথা ব্যক্তির এক রূপ : ক্ষুদ্র, শঙ্কিত, সীমিত। জনতার অংশ হিসেবে জনতার মধ্যে তার অপর এক রূপ : তেজে কম্পমান, শক্তিতে দুর্বার আর সম্ভাবনায় অসীম।

আজকের সতের কি আঠার বছরের পুত্রদের জন্য মমতায় আমার মন ভরে ওঠে। আহা! এই দৃশ্য তারা দেখেনি। সচেতনভাবে দেখার বয়স তখনো তাদের হয়নি।

এই দৃশ্য দেখলে ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য বুঝতে তাদের অসুবিধা হতো না। কিন্তু সেই ৭ মার্চ তারিখে সচেতন বয়সের যুবক ছিল না বলেই, কিংবা ৭ মার্চের পরে জন্মগ্রহণ করেছে তাঁরা—কেবল এ কারণেই কি তারা বঞ্চিত হবে, আজকের তরুণরা, এই দৃশ্য থেকে, আধুনিক বিজ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতার কৌশলের যুগে? অন্য দেশে এমন হয় না। অন্য দেশে প্রত্যেক যুগের সন্তানই তাদের অতীত সব মহৎ যুগকেই প্রত্যক্ষ করে এবং করে বলেই যে কোনো যুগের মহৎকে সে নিজের বর্তমান বলে বুকে আঁকড়ে ধরে আর জীবনদান করে তাকে রক্ষা করার সংগ্রামে। আর তাই কোনো মহৎই তার কাছে অতীত নয়। সব মহৎই

তার কাছে বর্তমান। কেবল আমাদের বাংলাদেশেরই অতীত মানে বিস্মৃত, বিলুপ্তকাল এবং বর্তমান মানে অতীতকে অস্বীকারকারী এক যাযাবর।

৭ মার্চের ক্যাসেট ফিতাটি বাজাতে আমার দুটি প্রশ্ন মনে জাগে। একটি হচ্ছে : জনতা তথা জনতার সংগ্রামে ব্যক্তির বা নেতার ভূমিকা। আমাদের তাত্ত্বিকরা নানাভাবে প্রশ্নটি তোলেন। তারা আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, কাউকে 'বঙ্গবন্ধু' বা 'জাতির পিতা' ইত্যাদি বলা অহেতুক। এটা অতিশয়োক্তি। এ হচ্ছে ব্যক্তিপূজা তথা 'পারসোনালিটি কাল্টের' সৃষ্টি ও চর্চা। প্রশ্নটির অবশ্যই এদিক, ওদিক—উভয়ই আছে। ব্যক্তি যখন নিজেকে জনতার প্রভু বলে গণ্য করে, যখন সে মনে করে সেই জনতাকে সৃষ্টি করেছে, জনতা তাকে নয়, তখন অবশ্যই ব্যক্তির অহংবোধের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে। এমন অবস্থাতেই প্রকাশ পায় ব্যক্তিকাল্ট : ব্যক্তিরতি। কিন্তু এ যেমন বিকারের দিক, তেমনি জনসংগঠনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা ঠিক যে, সংগঠনের সাংগঠনিক কমিটি থাকে। সে কমিটিতে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এটি হচেছ গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি। তাই সংগঠনের কৃতিত্ব-ব্যর্থতা কোনো ব্যক্তির একার নয়, যৌথের, কমিটির। কমিটিই হচ্ছে সংগঠনের নেতা। কিন্তু কমিটিতেও ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তফাৎ থাকে। কেউ অপর কারো চাইতে অধিক প্রাজ্ঞ, অধিক অভিজ্ঞ, অধিক সাহসী। কমিটির কার্যক্রমে এমন প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ আর সাহসীর প্রভাব থাকবেই। থাকাটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই কমিটি যখন বসে, তখন প্রাজ্ঞের কথায় আমরা অপর সকলে চমৎকৃত হই। তাকে বাহবা দিই। সাহসীর সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত হই। আমরা তাকে আমাদের সম্মুখ সারিতে স্থাপন করি। তাই প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সাহসী ব্যক্তি নেতা হয়ে ওঠেন আমাদের তথা অনুসারীদের দ্বারাই। কোনো ব্যক্তি শূন্য থেকে এসে বলতে পারে না, আমি তোমাদের নেতা এবং তার বলা মাত্র অপর সকলে যথার্থভাবে অন্তর দিয়ে বলতে পারে না, হ্যাঁ আপনি আমাদের নেতা। এমন জবর নেতৃত্ব দখল কেবল অস্ত্রধারীর পক্ষেই সম্ভব, নিরস্ত্র সংগ্রামীর পক্ষে নয়। অবশ্যই জীবনের কোনো সত্যই দ্বন্দ্বহীন নয়। অনুসারীদের দ্বারা সৃষ্ট হয় নেতা। এবং অনুসারীদের চেতনার অভাবেই তৈরি হতে পারে ব্যক্তিনেতার ব্যক্তিরতির ভাব। তাই প্রয়োজন সদা-সতর্কতার, সদা সচেতনতার যেন সমষ্টি বিস্মৃত না হয় নিজের মূল সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে এবং যেন ব্যক্তিনেতা বিস্মৃত না হয় তার শক্তির মূল তথা জনতাকে। কিন্তু এতো আদর্শ অবস্থা। এটার জন্য যেমন উভয় তরফে সার্বক্ষণিক সংগ্রাম আবশ্যক, তেমনি এর কোনো ভ্রান্তিতে হতাশ হয়ে জনতার শক্তি এবং ব্যক্তির ভূমিকা, উভয়কে নাকচ করে দেওয়ার মনোভাবও থাকা উচিত নয়। এতে ক্ষতি উভয়েরই।

শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছিলেন নিজের ঘোষণায় নয়, সংগ্রামী জনতার সস্নেহ এবং সকৃতজ্ঞ ইচ্ছার প্রকাশে।

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, শেখ 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যাটিকে তাঁর সমকালীন সাথী, অ-সাথীদের সকলে যে আনন্দের দৃষ্টিতে দেখেছে, এমন নয়। অস্বাভাবিকভাবে এই আখ্যাটিতে অনেকের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছে। তাদের মনের ভাবটি এমন : এই অজ্ঞ লোকটিকে 'বঙ্গবন্ধু' বলার কী প্রয়োজন? এমন মনোভাবের অবচেতন অনুযোগটি হচ্ছে : আমাকে 'বঙ্গবন্ধু' না বলে শেখকে বলা কেন?

তাই শেখ মুজিবকে আমরা ঈর্ষা করেছি। ঈর্ষা করেছি আমাদেরকে অতিক্রম করে বড় হওয়াতে। নানাদিকে বড় : তেজে, সাহসে, স্নেহে, ভালোবাসায় এবং দুর্বলতায়। সর্বদিকে। এবং সেই ঈর্ষা থেকেই আমরা তাঁকে হত্যা করেছি। কেবল এই কথাটিই বুঝিনি যে, ঈর্ষায় পীড়িত হয়ে ঈর্ষিতকে হত্যা করে ঈর্ষিতের স্থান দখল করা যায় না।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি এরূপ : শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণটি কি কেউ লিখে দিয়েছিলেন, তাঁর সাথী, অনুসারী, কবি, সাহিত্যিক কেউ? না, কেউ লিখে দেয়নি। এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শেখ মুজিবের এই আরেক বৈশিষ্ট্য, গুণ বলি, আর দোষ বলি। লিখিত বক্তৃতা তিনি কোনোদিন পাঠ করেননি। লিখিত বক্তৃতা পাঠে তাঁর আড়ষ্টতা আসত।

শেখ মুজিব তাঁর সমগ্র জীবনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তৃতা করেছেন। কখনো অপর কারো লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেননি। তাঁর সকল ভাষণে তাই স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ : কথার অগোছালো ভাব, হয়তো পুনরাবৃত্তি, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্বিতায় ভাস্বর। এমন তেজ লিখিত ভাষণে কখনো আসতে পারে না। শেখ মুজিবের ভাষণ যেমন লিখিত হতো না, তেমনি তাঁর প্রদত্ত ভাষণকেও লেখা যেত না। তাঁর ভাষণ তাঁর মুখ থেকেই শোনা যেত আর সেই সাক্ষাৎ শোনাতেই তার যা কিছু তাৎপর্য প্রকাশিত হতো। তাই ৭ মার্চের ভাষণ লিখিত আকারে যখন আমরা পাঠ করতে যাই, তখন তাতে তাৎপর্যময় কথা আমরা পাই, কিন্তু শেখ মুজিবকে পাই নে।

যন্ত্রকৌশল যাই হোক, নিহত শেখ মুজিবকে আর সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যাবে না। নিহত না হলেও শেখ মুজিব মৃত্যুহীন হতেন না। তা সত্ত্বেও ৭ মার্চের ভাষণে শেষ যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—এ বাক্যটি যেমনি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, তেমনি তাঁর কণ্ঠে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছিল। এ বাক্যটি বাংলাদেশের আপামর মানুষের একটি মহৎ ইচ্ছা ও স্বপ্নের দ্যোতক হয়ে সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল শেখ মুজিবের কণ্ঠে। সেদিনকার উত্তাল সংগ্রাম বাক্যটিকে অনিবার্যভাবে স্থাপিত করেছিল শেখ মুজিবের কণ্ঠে : বাক্যটি যে 'এবারের সংগ্রামই স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এ সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার সঙ্গে যে যুক্ত হয়েছিল 'মুক্তি' শব্দটিও, সেটিই আমাকে আজও বিস্মিত করে। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। শেখ মুজিব কতখানি ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, তা আমি জানিনে। কিন্তু সংগ্রামী মুজিব

অচেতনভাবে হলেও অনুভব করেছিলেন, 'স্বাধীনতা'র চাইতে ব্যাপকতর তাৎপর্যের শব্দ 'মুক্তি'। স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করে যায় মুক্তি। স্বাধীনতার যদি ভৌগোলিক সীমা-চৌহদ্দি থাকে, মুক্তি অতিক্রম করে যায় সকল সীমাকে : মুক্তি বঞ্চনা থেকে, মুক্তি বৈষম্য থেকে, মুক্তি শোষণ থেকে, মুক্তি সংকীর্ণতা থেকে, কূপমণ্ডূকতা থেকে, মুক্তি সকল দীনতা থেকে। মানুষের জীবনে এর চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কী হতে পারে। সেই মহৎ স্বপ্নই উচ্চারিত হয়েছিল সেদিনকার সংগ্রামী মানুষের নিশানবরদার শেখ মুজিবের কণ্ঠে। স্বাধীনতার সংগ্রামের শুরু এবং শেষ আছে। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের শুরু অবশ্য আছে : বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষের ক্রমবর্ধমান চেতনার মধ্য দিয়ে তার শুরু। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের শেষ নেই। ক্রমমুক্তির মধ্য দিয়েই অধিকতর মুক্তিপানে মুক্তিসংগ্রামের অনিবার অগ্রগমন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের শেষ বাক্য : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—তের বছর অতিক্রম করে আজও তাই নিঃশেষিত নয় তার তাৎপর্যের দিক থেকে। স্বাধীনতার পরে আসে মুক্তির তাগিদ। বাংলাদেশের তরুণ শক্তির নতুন সংগ্রামের আওয়াজও তাই আজ : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'।

পেছন ফিরে ৭ মার্চ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

একাত্তরের মার্চের মতো ঘটনাবহুল মাস এ দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার আটদশকব্যাপী জীবনে যে নেই, আমি হলফ করে বলতে পারি। পুরো একটি মাস যার প্রতিটি দিন ছিল আশঙ্কা উদ্বেগ প্রত্যাশায় ভরা। পুরো একটি মাস যে সময় সমগ্র দেশ এক টানটান উত্তেজনায় শক্ত হয়ে বসেছিল, পুরো একটি মাস যখন সারা দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একজন মানুষের ওপর, যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

কী অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেদিন শেখ মুজিব, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তার নেতৃত্বে, তার নির্দেশে যে অসহযোগ, এমন সফল অসহযোগ ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে নেই। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ছিল আদর্শগতভাবে অহিংস, তবে শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি, শেখ মুজিবের অসহযোগও ছিল আদর্শগতভাবে অহিংস, তবে সহিংসতা রোধ করা যায়নি শেষ পর্যন্ত। সব গণআন্দোলনের প্রকৃতি বোধহয় এই—আন্দোলনের জোয়ারে সব নিয়মশৃঙ্খলা একপর্যায়ে ভেসে যায়। নেতৃত্ব তখন অসহায় দর্শকে পরিণত হয়।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের আহূত জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বঙ্গবন্ধু। এভাবেই প্রচার হয়েছিল। ইতোমধ্যে অসহযোগের সাফল্য সারা দেশ দেখেছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণায় (১ মার্চ) সারাদেশ ছিল ক্ষুব্ধ, স্তম্ভিত। একদিকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া অসংখ্য কর্মীর প্রত্যাশা অন্যদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংলাপের বাধ্যবাধকতা। সেখানে কোনো ভুল পদক্ষেপের ফাঁদে না-পড়া, এমন এক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করতে হয়েছিল রেসকোর্সের জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কী বলবেন, ভবিষ্যৎ কমর্পন্থার কী নির্দেশনা দেবেন। অনেকের আশা ছিল, তিনি এই

মুহূর্তকেই বেছে নেবেন স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য। চাপও ছিল। কিন্তু তিনি সে ভুল করেননি। স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তবে আইন রক্ষা করে তার যতো কাছে যাওয়া সম্ভব, তা-ই করেছিলেন। গান্ধীজি কুইট ইন্ডিয়া আহ্বানের সঙ্গে এখানেই তফাৎ এই আহ্বানের। গান্ধীজি দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেননি, যা বলার বলেছেন প্রতিপক্ষকে। বঙ্গবন্ধু এই বক্তৃতায় একই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে হুশিয়ার করেছেন ও দেশবাসীকে বলেছেন প্রস্তুত থাকতে। এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তির কথায় কাজ হবে না। অস্ত্রের ভাষাতেই যা বলার বলতে হবে। তিনি জনতার প্রতিরোধের শক্তিতে আস্থা রেখেছেন। এবং চূড়ান্ত জয়ের প্রশ্নে কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি।

ইতঃপূর্বে কোনো এক লেখায় আমি বলেছি, ৭ মার্চের ঘোষণাকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা গণ্য করা যায়। না, তা করা যায় না। ওই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য সতর্কভাবে উচ্চারিত। ওই বক্তৃতায় স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না। তবে স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষ প্রস্তুত, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এটা মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস। একমাত্র সে বিবেচনাতেই ওই দিনকে দেশের স্বাধীনতা দিবস গণ্য করা যায়। ছাব্বিশে মার্চ নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু ৭ মার্চ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কোনো অস্পষ্টতা নেই।

একাত্তরের প্রবাসী সরকার বিভিন্ন বিবেচনায় ছাব্বিশে মার্চকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে। ৭ মার্চ এর ফলে তার গুরুত্ব হারায় নি। এর গুরুত্বের ভিত্তি খুব মজবুত। সেদিন এক জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে সেটা অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। এর তুলনা খুঁজতে হলে দেশের ইতিহাসের বাইরে যেতে হবে। ৭ মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত প্রত্যয়নকে চেতনায় ধারণ করে বাঙালি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে লড়েছে ও জয়ী হয়েছে।

এই বক্তৃতায়, আগামী মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে তার সম্ভাব্য অনুপস্থিতির কথাও বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি...। ২৫ মার্চে দিনগত রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন বঙ্গবন্ধু। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে। ৭ মার্চের ওই একটি বাক্যের মধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ২৫ মার্চের রাতের ওই আত্মসমর্পণ আগে থেকেই তার মাথায় ছিল। ওই রাতে কী ঘটেছে বা কী ঘটতে যাচ্ছে, তিনি জানতেন। রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথি সবাইকে আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়ে নিজে আত্মসমর্পণ, কোনো সিদ্ধান্তহীনতার বিষয় নয় বরং একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। তর্ক চলতে পারে। সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল কি ছিল না, তবে এটা যে দুর্বলের আত্মসমর্পণ নয়, আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান এক নেতার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

এই আত্মপ্রত্যয়—এটা কী ধরনের আত্মপ্রত্যয়? এ এক নেতার আত্মপ্রত্যয়, যিনি একটি জাতির আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন এবং যিনি একটি উজ্জীবিত জাতির হৃৎস্পন্দনকে কাছে থেকে শুনেছেন। যার ডাকে লাখো মানুষ জাদুমন্ত্রে জড়ো হয়, রেসকোর্সের ময়দানে। তিনি জানে, তার আসল কাজ তিনি করে ফেলেছেন। জাতিকে একটি চেতনায় একটি আকাঙ্ক্ষায় তিনি একতাবদ্ধ করেছেন। এ জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না এবং পেশিশক্তির কাছে পরাজিত হবে না এ জাতি। তার এই হিসাবটা যে কত সঠিক ছিল, পরবর্তী নয় মাসের ঘটনাবলি তা-ই প্রমাণ করেছে। আমি যদি না-ও থাকি—কথাটার তাৎপর্য গভীর। তার থাকা না-থাকা এরপর আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তিনি না থাকলেও তার জাতি এগিয়ে যাবে, যার শক্তির ভাণ্ডার তিনি সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন। যে ঐক্যের বাঁধনে তিনি সেই দুর্দিনে জাতিকে বেঁধেছিলেন, সেই ঐক্যই মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কেবলই অস্ত্রের লড়াই ছিল না, ছিল এক মনস্তত্ত্বের লড়াই। এ লড়াইয়ে জয়ের অমোঘ অস্ত্রটি বঙ্গবন্ধু তার স্বদেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর অসামান্য নেতৃত্বের উত্থান-পর্বের শেষ শীর্ষবিন্দু এই ৭ মার্চের ভাষণ। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বটি নিয়ে নানা মত আছে। সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। পরিস্থিতি ভেদে নেতৃত্বের প্রকৃতি বদলায়। জাতির উত্থান-পর্বে বা গভীর সংকটে প্রয়োজন যে নেতৃত্বের, প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনের পর যে ভিন্ন চাহিদা, সে চাহিদা প্রায়শই উত্থান-পর্বের নায়ক পূরণ করতে পারেন না—সে জন্য প্রয়োজন হয় ভিন্নতর মেধার, ভিন্নতর প্রতিভার। দুই ভিন্ন প্রতিভার সমাবেশ একই ব্যক্তির মধ্যে এক বিরল, ঘটনা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে, মাও সেতুংয়ের মধ্যে হো চি মিনের মধ্যেও সম্ভবত এটা ঘটেছিল। সব তথ্য আমার জানা নেই। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু নিহত না হলে, দেশকে তিনি কী উপায় কোন পথে পরিচালিত করতেন, সেই ভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতেন কি হতেন না—সে আলোচনা আজ একেবারেই অনাবশ্যক। যে কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তিনি মনে মনে এঁকেছিলেন তা নিমিষেই মুছে গিয়েছিল এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে মঞ্চে দেখা দিয়েছিল তার হত্যায় যারা রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এলেন, সেই নতুন নেতৃত্ব।

নতুন নেতৃত্বের বড় দুর্বলতা ছিল, এটা কোনোভাবেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না, রাজনীতির চর্চার পথে এ নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়নি। পঁচাত্তর থেকে নব্বই, ১৫ বছর কাল বাংলাদেশ এই মেকি ও আরোপিত নেতৃত্বে শাসিত হয়েছে এবং যতো দিন গিয়েছে, প্রকৃত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে এর চরিত্রগত তফাৎ ততোই স্পষ্ট হয়েছে। এবং দেশের দুর্ভাগ্য, এ নেতৃত্ব নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরপর আপাতদৃষ্টির বিদায় নিলেও এ এক মারাত্মক উত্তরাধিকার। গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে নষ্ট করে রেখে যাওয়ার উত্তরাধিকার। গণতন্ত্রের সেই

ভাঙাঘর আবার খাড়া করতে পারেনি পরপর তিনটি নির্বাচিত সরকার। এমনকি মেরামতের কাজ হাতে নেবে, সে ইচ্ছাটি পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। নাম সর্বস্ব নির্বাচিত সরকার। স্বৈরতন্ত্র বিদায় নিয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র সে শূন্যতা পূরণ করেনি।

স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থার একটি হলো সংসদ ও সংসদীয় নির্বাচন। গণতন্ত্রের চাকা সচল রাখে নিয়মিত ও সুষ্ঠু নির্বাচন। স্বৈরতন্ত্র সবচেয়ে বেশি ভয় পায় নির্বাচনকে। আমরা গণতন্ত্রের মুখোশধারী রাজনৈতিক সরকারও দেখেছি, যারা বিদায়ী স্বৈরতন্ত্রের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার বহন করেছে ও নির্বাচনকে নানা কৌশলে প্রভাবিত করতে চেয়েছে। আমলা গোষ্ঠীর মাথায় লাঠি ঘুরিয়েছে। বিচার ব্যবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল করেছে। কোনো ক্ষেত্রেই স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা রক্ষা করেনি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে মাটি চাপা দিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্যে নিজেদের ক্ষমতার নিরাপত্তা খুঁজেছে।

পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ফলে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ তার স্বপরিচয়ে স্থির হতে পারেনি। একাত্তরের ৭ মার্চ আর আজকের ৭ মার্চের মধ্যে ৩৮ বছরের ব্যবধান। দেশ স্বাধীনতার খোলস নিয়ে বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে। জরুরি অবস্থার মতো একটি আলো-আঁধারির জগতে ঠেলে দিয়েছে দেশকে। বঙ্গবন্ধু এক অসামান্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু নেতৃত্বের উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেননি। সে জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। একাত্তরের ৭ মার্চে তিনি যে উচ্চতায় উঠেছিলেন, কৃতজ্ঞ জাতি আজ সে-কথাই স্মরণ করবে, তাঁকে তার প্রাপ্য সম্মান জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

৭ মার্চ : বাঙালির স্বরূপে উদ্ভাসের দিন

মুস্তফা নূরউল ইসলাম

প্রস্তাবনায় নিবেদন যে, অতীব গুরুত্বের সঙ্গেই চিহ্নিত করে নেব কোটি বাঙালির জীবনে—বিশেষ করে আজ ৭ মার্চ এবং আত্মবিশ্বাসে ধারণ করে নেব হাজার বছরের বাংলায় এই দিন উজ্জ্বলতম এক মাইলস্টোন। এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে অবলোকন করছি—সন উনিশশ' একাত্তর, এসেছিল সেই দিন। সেদিনকার ৭ মার্চ—আগ্রাসী দুশমন কলোনিয়াল অপশক্তি পাকিস্তানিত্বের উৎখাতের নিশানায় রণাঙ্গনে লড়াইয়ের ডাক। তার পরে থেমে ইতোমধ্যে গড়িয়ে গেছে সাড়ে তিন দশকেরও বেশি। দেশের সৎ মানুষ মাত্রেরই অবশ্য জানা-সেই ৭ মার্চে অবধারিত নিয়তি কথা বলেছিল কালের সন্তান মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে। ঢাকায় রমনার রেসকোর্স ময়দানে উপচেপড়া বিশাল জামায়েতে তার সে ডাক ছড়িয়ে গেল দেশের দূর-দূরান্তের জনপদ অবধি সবখানেতে।

বছরে বছরে পাড়ি দিয়ে আবারো আজ ৭ মার্চ। তবে নিশ্চয় নয় এ মোটা দাগের সংখ্যায় কোনো এক তারিখ মাত্র এবং নয় নস্টালজিয়ায় অতিচরিতা-চর্বণ। অবকাশ এসেছে, অবশ্য করেই খেয়ালে আনতে চাইছি সেই ৭ মার্চ, আর সুস্থ উত্তরাধিকার চেতনার ধারাবাহিকতাতেই বাংলাদেশ—বাঙালি আমাদের ৭ মার্চ অনিবার্যতায় উত্তরণ। লক্ষ্য করতেই বলি, বলা হচ্ছে এমন করে আমাদের ইতিহাস ৭ মার্চ—অনিবার্যতা। সচেতনজন সন্ধান নেবেন অমন করেই। তো আমাদের জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি-অনিবার্যতা; এসেছে ছাব্বিশে মার্চ; ষোলই ডিসেম্বর।

দুই

বাঙালিত্ব-আইডেনটিটির এবং বাঙালির একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, 'দেশমাতা সত্যে' অবিশ্বাসী হিংস্র দালাল জোটের কথা নিশ্চিত করেই বাদ রাখব, কাল

ব্যবধান বটে, আজো কিন্তু তেমনটাই সুস্পষ্ট শুনতে পাই, কী কথা কয় 'দিবস' ৭ মার্চ। অগ্নিপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতীকি কণ্ঠে দেশব্যাপী জনযুদ্ধের অমন মরণ-শপথ আহ্বান : ভায়েরা আমার ...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং এই সঙ্গে কারো অমন দৃঢ়-কঠিন চ্যালেঞ্জ : ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।...মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ইতিহাস সাক্ষ্য, অতঃপর আর অবশ্য অপেক্ষা করতে হয়নি। ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের সারাটা দেশ জুড়ে দ্রুত লড়াইয়ের ময়দানে কোটি বাঙালির কেমন দ্রুত জীবনবাজি উৎসর্গমন্ত্র খাতায় বাঁধা : এবং দীক্ষামন্ত্রের আওয়াজ—বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/বাংলাদেশ স্বাধীন করো : জয় বাংলা; বাংলার জয়।

এখন তা হলে বলবার-দেশপ্রেম-ইমানে যার ব্রত সংকল্প, বারংবার করেই তাঁর কাছে ফরজতুল্য হয়ে আসে ওই ৭ মার্চের ডাক। এবং সেই খানে জানা, তাবৎ মুক্তির সংগ্রাম, সর্বার্থেই স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তিন

তবে গভীর দ্বিধায় প্রশ্ন জাগে-এ কোন্ বাস্তবতার পটে এই বর্তমানে আমাদের বসবাস? জবাবে যার যার নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাতেই তো জানান দিচ্ছে, চারদিক ছাপিয়ে কেমন বেজায় দুঃসময় আজ, অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে ভাঙনের ধ্বস লেগেছে আমাদের সমুদয় শুভ মূল্যবোধে, মানুষে মানুষে প্রতারণা সীমাহীন অবিশ্বাস, মানবসম্পদের নির্বাসন, সর্বত্র ছড়িয়ে ফ্রাস্ট্রেশনের পালা এবং গ্রাস করে নিয়েছে তৃণমূল অবধি জনমানুষের ঘরে-পরিবারে অভাব-বঞ্চনা-দারিদ্র্যের সর্বাত্মক হামলা। কী বলব? ইতি নেই অভিশপ্ত হেন এই মতো তালিকার। আর কী যে নিষ্ঠুর সত্য,—সব ছাড়িয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে বাঙালি লক্ষ-কোটি মানুষের একাত্তর-অর্জন-মার্চ অভিযান, ৭ মার্চের লড়াকু ডাক।

অতঃপর পুনরায় বলবার যে, উপরি বর্ণিত তাবৎ সত্ত্বেও আজকের এই দিনে আমাদের ওই ৭ মার্চ। যদিও কবিতার চরণ থেকে ধার করে নিয়ে এমনতর বলা : 'এসেছে সে একদিন/লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে...আমাদের একাত্তর মার্চে সেই ইতিহাসের সূচনা-প্রহর। তবে অবশ্যই অকস্মাৎ ঘটে না কিন্তু এমন। পটভূমিতে বয়ে আসে ইতিহাসের ধারা। অতএব অতি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি, এই মতো সম্মানের তাগিদ-কেমন করে কোন সড়ক ধরে দিবস ৭ মার্চে আমাদের উত্তরণ।

লক্ষ্য করব—অবশ্যই নয় কাকতলীয় যোগাযোগ : এই সেদিন গেল আমাদের ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি, দীক্ষা আমাদের 'একুশ' সত্যে; আজ উদ্‌যাপন করছি মার্চ ৭। প্রাণিত আমরা লাস্ট ফ্রন্টিয়ারের মুক্তির স্বাধীনতার সংগ্রামী মন্ত্রে। এখন তবে সেই সড়ক।

চার

সৎ এবং সচেতন বিশ্বাসের সবারই জানা—ব্রিটিশ ইন্ডিয়া নামের উপমহাদেশে একদা কায়েম হয় উদ্ভট অবয়বের সেই রাষ্ট্র পাকিস্তান পৃষ্ঠপোষক মাতব্বর তারা প্রচার করতেন Homeland of Indian Muslims প্রশ্ন আদপেই এবং সম্পূর্ণতই তাই কি? উন্মত্ততার তালেমাতা গগণবিদারী স্লোগান ছিল লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। তা তদর্থে লড়াই কিন্তু মোটেই করতে হয়নি। নেতা-কর্মী কাউকেই একবেলার জন্য হলেও ইংরাজ সরকারের জেলহাজত খাটতে হয়নি। আসলে গোড়াতে কাজ করে গেছে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে), তখনকার সময়কার আশু কার্যবরণ হেতু, বর্ণিকী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ স্বার্থ। লন্ডনে বসে ওদের পার্লামেন্টে প্রস্তাবে গৃহীত হয়—Partition of India Act 1947. Ges All India Muslim League Avi All India Congress-এই দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাগাভাগি, ক্ষমতার হস্তান্তর। আর তাই থেকে ওদের জন্য India/ভারত/হিন্দুস্থান এবং আমাদের বরাতে পাকিস্তান।

বলা গেছে উদ্ভট সেই রাষ্ট্র। কেন তবে এমন হবে। বিশ্লেষিত করা 'উদ্ভট' সহজ জবাবে জেনে রাখতে চাই—দেশরাষ্ট্র যখন, প্রথমতই তখন ভৌগোলিক সংশ্লিষ্টতা মোটে থাকবে না? বাসিন্দা মানুষে মানুষে মিল-সমন্বয়? বাস্তবতায় হয়েছিলটা কী? হাজার দেড় হাজার মাইলের দুস্তর দূরত্বে দুই ভূগোলাংশের দুটো অঞ্চল। এবং আবার এদিকটায় বলা হচ্ছে জাতীয় পরিচিতিতে পূর্বের-পশ্চিমের প্রান্তের সবাই মিলে এক জাতি 'পাকিস্তানি'। কিন্তু এই নয়া বানানো পাকিস্তানিদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক/এথনিক বৈশিষ্ট্যে, ভাষা-সংস্কৃতি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রয়ে গেছে বিশাল ব্যাপক ফারাক। তবে করাচি-লাহোর-পিন্ডি কেন্দ্রিক সিংহাসনে প্রভু শক্তির তরফে প্রচারণা চালানো হতো Five thousand years of pakistan, উচ্চকণ্ঠে সদ্য জানান দেওয়া হতো pakistan has come to stay এবং শরা-শরিয়তের দোহাই পেড়ে তুঙ্গে সে কী জিকিরের বহর—পাকিস্তান মানেই ইসলামি হুকুমৎ, ইসলামি উম্মাহ, ইসলামি কওম। তথাপি আমাদেরই সরাসরি অভিজ্ঞতা—সেই জিগিরের অছিলাতে শাসক-শোষক পাকিস্তানঅলাদের সর্বগ্রাসী আছড় এসে পড়েছিল এই বাংলায়, এই বাংলার মানুষের ওপরে।

সদ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল প্রত্যাখ্যাত আগ্রাসনের অবসান ঘটেছে : অতঃপর এখন আরেক চেহারাতে পাকিস্তানের আগ্রাসন। এলো ভাষা-দাসত্বের হামলা। এলো পরভাষা উর্দুর লেবাসে। সেই একই জিকির—উর্দুভাষার হরফ মূলে রয়েছে 'পবিত্র' আরবি। অতএব ইসলামিয়াতের দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। আসলে শাসক জোটের ভাষা ছিল উর্দু। ওদের শাসন-শোষণের স্বার্থেই তাই উপনিবেশ বাংলা অঞ্চলের বাঙালি জনমানুষের ওপরে উর্দুকে চাপানোর যতো অপপ্রয়াস। আর বাকি কায়েদে আজম তো ফরমানই জারি করে দিয়েছিলেন, ...তবে মোকাবিলায় আমরাও কিন্তু জগতের বিভ্রান্ত হয়নি; ফরমান মাথা পেতে নিই নি। আমাদের দিক থেকে প্রতিরোধ সেই প্রথম থেকেই। পাকিস্তান কায়েমের শুরু থেকেই লক্ষ্য করবার যে, আমাদের প্রতিবাদী প্রতিরোধী প্রত্যয় দানা বেঁধে উঠছে। অভিভাবক কাজী মোতাহার হোসেন এখন চূড়ান্ত করেই জানিয়ে দিচ্ছেন—বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ওপর রাষ্ট্রভাষারূপে চাপাবার চেষ্টা করা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ... শিগগিরই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হওয়ার আশঙ্কা আছে। যুগপৎ অপর অভিভাবক ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সতর্কবাণী—মোটের উপর বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য। এবং এক সাথে দিচ্ছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর উচ্চারণে আমাদের বাঙালির আইডেনটিটির মৌল সত্ত্বাটি—বাঙালি এটি একটি বাস্তব কথা।

এখন চিহ্নিত করে নেব, সেই যাত্রা শুরুর কাল থেকেই তো মাতৃভাষা বাংলার অধিকার নিয়ে, আর্থ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির অভিযান নিয়ে এবং মাটির সন্তান স্বরূপে বাঙালিত্ব নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরুর পালা। ক্রমে ওদের বাঁধন যতোই শক্ত হয়েছে বাঙালিত্বের মুক্তির সড়কে দুঃসাহসী প্রতিরোধী আমাদের অভিযান ততোই একটা কাতার বাঁধা দুর্নিবার হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যে সন উনিশশ' বায়ান্ন, মাস ফেব্রুয়ারি এবং যেন অবশ্য করেই প্রতীকি একুশে। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর।

অতঃপর প্রস্তাব যে, চিহ্নিত করে যাব একেক নিশান ফলক, কথা কয় কাল সময়ের কণ্ঠ। চুয়ান্নতে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয়, সাতান্নতে টাঙ্গাইল কাগমারিতে সংস্কৃতি সম্মেলনে, একষট্টিতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, বাষট্টিতে ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টিতে ছয় দফা আন্দোলন, সাতষট্টিতে আবারো রবীন্দ্র আন্দোলন এবং তার পরপরই তো ঊনসত্তরে পাকিস্তানিত্বকে হটাবার নিশানায় সারাটা দেশজুড়ে অমন ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান।

ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছি আমরা সেই ইতিহাস ধারার শেষ প্রান্তে—সামনেই সত্তরের নির্বাচন। আওয়ামী লীগের ব্যানারে বাংলার জনমানুষের চূড়ান্ত বিজয়। লক্ষ-কোটি কণ্ঠে ঈমানের সেই মহত্তম উচ্চারণ দিকে দিকে উঠে বাজি—তোমার দেশ আমার দেশ/বাংলাদেশ বাংলাদেশ, আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে।

বলবাহুল্য, বর্তমান অবকাশে পটভূমি কথার কেবল রূপরেখাটি তুলে ধরবার প্রয়াস খানিক পাওয়া গেছে। অবলোকন করতে চেয়েছি—কোন্ সড়ক ধরে এগিয়ে আসছে বাঙালির একাত্তর, একাত্তরের মার্চ : ক্রমে কেমন হয়ে উঠছে আমাদের নেশন স্টেট-বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ

মযহারুল ইসলাম

৭ মার্চের বক্তৃতা সম্পর্কে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ৬ মার্চ সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমি বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ওপর স্বাধীনতা ঘোষণার এক বিরাট চাপ এসেছিল। এক সময় বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে ঠাট্টাচ্ছলে আমাকে বললেন : 'অধ্যাপক, আপনার এই গুণধর ছাত্রদের সামলান। এদের নিয়ে আমি আর পারছি না।' তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন প্রখ্যাত সংগ্রামী ছাত্রনেতা আবদুর রউফ এবং আরো কয়েকজনকে। রউফ তখন নির্বাচিতগণ গণপরিষদ সদস্য। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র ছিল। আমি আবদুর রউফ এবং আরো কয়েকজন ছাত্রনেতাকে নিয়ে নিকটস্থ সাংহাই চীনা রেস্তোরায় গেলাম এবং সেখানে আহারের সময় তাদের সাথে সুদীর্ঘ আলোচনায় তারা সবাই সম্মত হল যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আগামীকাল অর্থাৎ ৭ মার্চ তারিখে ঘোষণা করা হবে কি না হবে তা সম্পূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধুর ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। রাত্রি প্রায় বারোটার দিকে ছাত্রনেতাদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে আমাদের আলোচনার ফলাফল তাঁকে জানানো হল। তিনি আনন্দে গদগদ হয়ে আমাকে ও ছাত্রনেতাদের জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। ছাত্রনেতৃবৃন্দের এই আচরণের জন্য আমি তাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ।

এলো ৭ মার্চ, ১৯৭১। বাঙালির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিন বাঙালি জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেবল-বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ চারি-দিকে। সে দৃশ্য যারা না দেখেছে তাদের নিকট যেন

বর্ণনা করা যায় না। বাঁধ ভাঙা মানুষ, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়—বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার দেশ আমার দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ, 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' ইত্যাদি শ্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস-মাটি সেদিন কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। অথচ লাখো লাখো জনতা গ্রাম-বন্দর-অলিগলি থেকে চলেছেন রেসকোর্স ময়দানের দিকে। তাঁদের হাতে রয়েছে লাঠি, রড, বাঁশ ইত্যাদি। এই দিনের রেসকোর্স ময়দানের ঘটনাবলির চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ৮ মার্চের দৈনিক পাকিস্তান লিখেছে : "মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়ছে জনসমুদ্রের উত্তাল কণ্ঠ। শ্লোগানের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছে। লক্ষ কণ্ঠে এক আওয়াজ। বাঁধ না মানা দামাল হাওয়ায় সওয়ার লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ। হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে পূর্ব বাংলার মানচিত্র অঙ্কিত সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের পতাকা। লক্ষ হস্তে শপথের বজ্রমুষ্ঠি মুহুর্মুহু উত্থিত হচ্ছে আকাশে। জাগ্রত বীর বাঙালির সার্বিক সংগ্রামের প্রত্যয়ের প্রতীক, শতকোটি মানুষের সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতীক বাঁশের লাঠি মুহুর্মুহু শ্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে। এই ছিল গতকাল রোববার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সভার দৃশ্য।"

দেশ-বিদেশ থেকে সাংবাদিকরাও এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনতে; তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে। স্বাধীনতার জন্য একটি জাতি যে কীরূপ উদ্দাম, উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে তা দেখে সেদিন দেশ-বিদেশের সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন সবাই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর নির্দেশ শুনবার জন্য। দেখলেন বাংলার মানুষ শুধু তাঁর কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি। তারপর জলদগম্ভরি স্বরে ঘোষণা করলেন তাঁর নির্দেশাবলি :

"ভাইয়েরা আমার!

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করিয়েছিলেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে—আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনেতিক সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে দেশের সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখল। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দেয়া হল এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হল। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হল আমরা তাঁকে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পার্টির নেতা নই সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। ভুট্টো সাহেব বললেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে। তিনি মার্চে তিন তারিখে অধিবেশন ডাকলেন।

আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা মেনে নেব, এমনকি তিনি যদি একজনও হন। ...,

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা কে করেছেন—এই প্রশ্নে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত বির্তকের সৃষ্টি যাঁরা অতীতে করেছেন এবং এখনো করতে প্রয়াস পান, তাঁরা যদি ১৯৬০ সালের গোড়া থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাত্রি অবধি সমস্ত ঘটনার ইতিহাস-বিজ্ঞানসম্মত একটি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তাঁরা এ কথাটি সহজেই অনুধাবন করবেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যথার্থ স্থপতি ঐ একজনই—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কেবল যে তিনি ঘোষণারই নায়ক—বলেছেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—তা নয়, ঘোষণার পূর্বশর্ত হিসেবে যে ভিত্তি ও পটভূমিকার প্রয়োজন, তা বছরের পর বছর সুকৌশলে তিল তিল করে তিনিই নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন নিজে এবং সমস্ত জনগণকে, জাতিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে এনে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এই ক্ষেত্র প্রস্তুতটিই বড় কথা। স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ইমারতটির তৈরিতে তাঁর হাত ও সেই হাতের সাথে সমস্ত বাঙালি জাতির হাত একত্রে মিলে নির্মাণকর্ম সম্পন্ন করেছেন। এদিক থেকে লেনিন, মাও সেতুং এবং কামাল পাশার সঙ্গে মুজিবের যথার্থ মিল আছে—চারজনের আন্দোলন ও ত্যাগের চারিত্রিক ভিন্নমুখিতা সত্ত্বেও। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু রমনার মাঠে যে নির্দেশ ঘোষণা করেছেন, ৮ই মার্চে তাজউদ্দিন আহমদ তা ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন অফিস, ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানে কীভাবে ও কত সময় ধরে হরতাল পালিত হবে এবং কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান হরতালের আওতায় পড়বে না পড়বে তার পূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

যা হোক, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশানুযায়ী ৮ মার্চ থেকে প্রতিটি গৃহশীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিটি শহর ও গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। সরকারি, আধাসরকারি অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারি বন্ধ থাকে। তবে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাংলাদেশের ভেতর টেলিফোন ও ট্রাঙ্ককল ব্যবস্থা, বিদেশে সংবাদ পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে চালু থাকে। ব্যাঙ্কও চালু থাকে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার বন্ধ রাখা হয়। প্রদেশের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, সব রকম কর প্রদানও স্থগিত রাখা হয়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যে কোনো প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসহযোগিতা দেখান হয়।

পরদিন ৯ তারিখে পল্টনে মওলানা ভাসানী একটি ভাষণ দেন। তাঁর পাশে ছিলেন জাতীয় লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পল্টন ময়দানে এই বৃদ্ধ জননেতা ঘোষণা করেন, "শেখ মুজিবের নির্দেশিত ২৫ মার্চের মধ্যে কোনো কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবের সহিত মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল গণ-আন্দোলন শুরু করিব।"

ভাসানী একথা উপলব্ধি করলেন যে, দেশ আজ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধভাবেই পশ্চিমা শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন : 'মুজিব আমার ছেলের মত। আর ছেলে যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পিতৃতুল্য হয়ে তিনি কি নিশ্চুপ থাকতে পারেন?' ভাসানী সেদিন শেখ মুজিবের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে জনগণকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানান।

৭ মার্চের মহাকাব্য
তার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক আবাহনী দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রমনার ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির ডাক দিয়েছিলেন। অনেকে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে আমেরিকার গেটিসবার্গে দেওয়া প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের বিশ্ববিখ্যাত ভাষণটির সঙ্গে তুলনা করেন। লিঙ্কনের বলা—'এ গভর্নমেন্ট অব দ্যা পিপল, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল' আজ যেমন সারাবিশ্বের গণতান্ত্রিক চেতনার মর্মবাণী, তেমনি ঢাকায় ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবের বলা—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম কথাটিও আজ সারা দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষের কাছে মুক্তিমন্ত্রতুল্য।

বাংলাদেশের কবি নির্মলেন্দু গুণ শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণকে বলেছেন একটি মহাকাব্য। আর সেই মহাকাব্যের মহাকবি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি গুণের কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে কবি অভিহিত করার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে লন্ডনের সানডে টাইসম পত্রিকার মতো কাগজে। কাগজটি শেখ মুজিবকে নাম দিয়েছিল 'এ পোয়েট অব পলিটিক্স।'

কবি নজরুল ইসলামের কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতাটি পাঠ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'রাজনীতি অথবা রাজনৈতিক সংগ্রামে কবিতা অনেক সময় অস্ত্রের চাইতেও শক্তিশালী হাতিয়ার। এ কথার প্রমাণ হিসেবে তিনি নিজেই ব্রিটিশরাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করার মুহূর্তে দেশবাসীর

উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তুম হামকো খুন দো' হাম তুমকো আজাদী দুঙ্গা' ('তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'।) এটিও একটি কবিতা।

মহাত্মা গান্ধীর সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। তার স্বাধীন আন্দোলনের মন্ত্র ছিল অহিংস অসহযোগ। কিন্তু তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ডাক দিতে গিয়ে কবিতার ভাষায় বলেছেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করে ছাড়ব অথবা মৃত্যুবরণ করব। তাই বলা চলে, মহাত্মা গান্ধীও তার স্বাধীনতার আন্দোলনকে কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারে দ্বিধা করেননি।

একাত্তর সালের ৭ মার্চের ভাষণ অবশ্যই একটি মহাকাব্য এবং এই মহাকাব্যের কবি শেখ মুজিব। মহাকাব্যের মতো এই কবিতার পরিধি বিস্তৃত নয়। কিন্তু বক্তব্যে, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় মহাকাব্যের চাইতে বড়ো এবং বিস্তৃত। লিঙ্কনের কয়েক লাইনের গেটিসবার্গ ভাষণের মতো শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণটিও তাঁর অন্যান্য ভাষণের চাইতে তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও শক্তিতে দুর্জয়। এই ভাষণ বাংলার মানুষের সুপ্ত চেতনাকে প্রচণ্ড আঘাতে জাগ্রত করেছে।

এই ভাষণটির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু এই ভাষণটির মধ্যে যে সুদূরপ্রসারী একাধিক রাজনৈতিক দর্শনের সমন্বয় ঘটেছিল, তা অনেক পরে এই ভাষণটির বিশ্লেষণ দ্বারা অনেকে উপলব্ধি করেছেন। এ বিষয়টির দিকে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কলকাতার অধুনালুপ্ত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার এককালের সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি কলকাতায় ছিলাম। বিবেকানন্দ মুখার্জিকে নামে চিনতাম এবং তার লেখাও পড়েছি। তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। তিনি আমাকে তার দুই খণ্ডে লেখা 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস'ও উপহার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেন, 'এই ভাষণটিকে তোমরা সাধারণভাবে নিও না। এটি শুধু তোমাদের দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নয়; এর মধ্যে উপমহাদেশের দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারার দর্শনের প্রভাব রয়েছে এবং তোমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী ধাপেরও নির্দেশ রয়েছে। ভাষণটি স্কুল-লেভেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পঠন-পাঠনে এই ভাষণের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।'

তাঁর মতে, অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রামের দুটি শক্তিশালী ধারা ছিল। একটি ধারায় গান্ধী-রাজনীতির দর্শন ছিল অহিংস-অসহযোগ এবং নিরস্ত্র প্রতিরোধ, যাকে তিনি সত্যাগ্রহ নামেও অভিহিত করেছেন। গান্ধী মনে করতেন, সশস্ত্র ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে তার নিরস্ত্র দেশবাসী যুদ্ধ করে পারবে না। অনর্থক রক্তক্ষয় হবে। সুতরাং নিরস্ত্র নৈতিক যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশরাজকে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন।

নেতাজী সুভাষ বসু ছিলেন গান্ধী-রাজনীতির এই ধারা ও দর্শনের বিরোধী। তিনি সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে দ্বারা ভারতের (অবিভক্ত) স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী বিদেশে পালিয়ে যান এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। তার অসাম্প্রদায়িক রণধ্বনি ছিল জয় হিন্দ এবং যুদ্ধে লিপ্ত তার বাহিনীকে মুক্তি ফৌজ নামেও অভিহিত করা হতো।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে, তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হিসেবে রাজনীতির শুরু করলেও সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক দর্শনই তাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৪২ সালে ছাত্র থাকাকালে তিনি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত কলকাতায় ইংরেজদের নির্মিত হলওয়ে মনুমেন্ট ভাঙার আন্দোলন ও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। আবার ১৯৪৬ সালে দেশভাগের আগে কলকাতা ও অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তা প্রতিরোধের জন্য মহাত্মা গান্ধী যখন কলকাতার বেলেঘাটার বাড়িতে সে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন, তখন সেই অনশন থেকে গান্ধীজিকে বিরত করার জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একজন যুবনেতা হিসেবে ওই বাড়িতে গান্ধী সমীপে গিয়েছিলেন।

গান্ধী ও সুভাষের রাজনীতির মধ্যে তিনি যে সুভাষ বসুর রাজনীতিরই বেশি অনুরক্ত ছিলেন তা আরো বোঝা যায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণভবন নামে পরিচিত প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নিচের তলার বড়ো হলঘরটি তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন প্রমুখ অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতাদের ছবি দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। এসব ছবির মধ্য সবচেয়ে বড়ো ছবিটি ছিল সুভাষ বসুর। শেখ মুজিবের মুক্তিবাহিনীও মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল এবং রণধ্বনি ছিল জয় বাংলা।

রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সাতচল্লিশে দেশভাগের আগেই তিনি আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে যুক্ত হন এবং একই সময়ে হাশিম-শরৎ-বসু মিলে যে অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন মুক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেন। র‍্যাডক্লিফের ছুরিতে বাংলা ভাগ হলেও পূর্ববাংলাকে একটি স্বাধীন অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্ররূপে গঠনের চিন্তা তার মনে কাজ করতে থাকে তখন থেকেই।

বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনী লেখায় ডিকটেশন দেওয়ার সময় আমাকে বলেছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে ফজলুল হকের, ফজলুল হক থেকে সুভাষচন্দ্র আবুল হাশিম-শরৎচন্দ্র (সুভাষ বসুর ভাই) এবং দেশ ভাগের পর ভাষা

আন্দোলন ও ছয় দফা পর্যন্ত যদি বাংলার রাজনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করো, তাহলে দেখবে অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন বাংলার সুপ্ত চেতনার জন্ম সাতচল্লিশের বাংলা ভাগের আগেই এবং সেই চেতনারই প্রথম বহির্প্রকাশ আটচল্লিশ সালেই অসাম্প্রদায়িক ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

আমি বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি গান্ধী-রাজনীতির কখনো অনুরাগী ছিলেন না। ছিলেন সুভাষ বসুর রাজনীতির অনুরাগী। তাহলে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় আপনি গান্ধীর মতো পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন কেন? কেন শুরুতেই সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেননি? বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'কেন, আমার ৭ মার্চের বক্তৃতায় কি সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেইনি? তাহলে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো, কথাগুলো কেন বলেছিলাম? আবার একই বক্তৃতায় দেখবে, হানাদারের প্রতি শান্তি প্রস্তাবও আছে। বলেছি, তোমরা আমাদের ভাই। আমার মানুষকে হত্যা করো না। আমার এই প্রস্তাবে তারা সাড়া না দিলে তাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব এই কথাও বলেছি। এটা নিরস্ত্র প্রতিরোধের ডাক। একটি নিষ্ঠুর বিদেশি হানাদার বাহিনীর সামনে আমি সহসা নিরস্ত্র মানুষকে ঠেলে দিতে পারি না। তাই গান্ধীজির কৌশল গ্রহণ করে প্রথমে অহিংস অসহযোগের কথা বলেছি, কিন্তু একই সঙ্গে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতির ডাকও দিয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ যে স্বতঃস্ফূর্ত একটি সুচিন্তিত ভাষণ এটা বুঝতে আমার আর তখন দেরি হয়নি। কলকাতার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও আমাকে ৭ মার্চের ভাষণের এই ব্যাখ্যাটিই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো এত স্পষ্ট করে বলেননি। আমার আর বুঝতে দেরি হয়নি যে, অহিংসা ছিল গান্ধীর কাছে কৌশল নয়; বিশ্বাস। কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় অহিংস অসহযোগ ছিল তার সাময়িক কৌশল; বিশ্বাস নয়। তার বিশ্বাস ছিল সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র যুদ্ধের রাজনৈতিক দর্শনে। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি গান্ধীর অহিংস অসহযোগকে বিশ্বাস হিসেবে নয়, সাময়িক কৌশল হিসেবে এবং সুভাষের রণনীতিকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে এমন চমৎকারভাবে মিশ্রিত করে জনগণকে জনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যার কোনো তুলনা সমসাময়িক বিশ্বে নেই।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে তোমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী ধাপে করণীয় কী, তারও নির্দেশ রয়েছে। নইলে তিনি ৭ মার্চের ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম' বলেই ক্ষান্ত হতেন, সঙ্গে মুক্তির সংগ্রাম কথাটি উচ্চারণ করতেন না, কথাটি দীর্ঘকাল আমার মনে ছিল না। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমি লন্ডন থেকে কিছুদিনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। তবু একদিন তার বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়িতে দেখা হতেই বিবেকানন্দ

মুখোপাধ্যায়ের কথাটা মনে পড়েছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বঙ্গবন্ধু আপনি ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রাম কথাটা বলেই ক্ষান্ত হননি, মুক্তির সংগ্রাম কথাটাও যোগ করেছেন। এটা কি কথার পিঠে কথা বলা, না এর কোনো তাৎপর্য ছিল?

বঙ্গবন্ধু বললেন, তখন আসন্ন যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমিও কথাটার তাৎপর্য ততটা ভেবে দেখিনি। তারপর মনে হয়েছে আমার অবচেতন মনে কথাটার তাৎপর্য লুকানো ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে আমি বুঝিয়েছি, বিদেশি শাসন অবসানের যুদ্ধ। কিন্তু বিদেশি শাসনের অবসান হলেই দেশের মানুষের মুক্তি অর্জিত হয় না। তাই স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জনের লড়াই; যে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে আমার বাকশাল গঠন ও দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ্যে যাত্রা।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে এ কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন। ওই বছর আগস্ট মাসেই দেশি-বিদেশি চক্রান্তে তিনি পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নিহত হন। আমার মনে হয়, বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করতে না পারায় তার প্রথম বিপ্লব একটি স্বাধীন সুখী সেক্যুলার বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য থেকেও দেশটি অনেক পেছনে চলে এসেছে। বঙ্গবন্ধু এখন নেই, কিন্তু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ আছে। এই ভাষণে বর্ণিত স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। এই ভাষণই অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে নতুনভেবে জেগে ওঠার প্রেরণা জোগাতে পারে।

অসহযোগ আন্দোলন ও সাতই মার্চের ভাষণ

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ধর্মজ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে : ১ মার্চ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার/বাংলাদেশের সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চের ভাষণ হচ্ছে ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জনসমষ্টির পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা। ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্র ক্রিয়াশীল ছিল এবং ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ শুরু করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার/বাংলাদেশের সর্বাত্মক অসহযোগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায়। এই আন্দোলন অনন্য ও তুলনাহীন। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বৃটিশবিরোধী যে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল তার মাত্রা ও গভীরতা পূর্ববাংলার/বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে একটি দু'টি আঁচড় কেটেছিল এবং ভারতবাসীর অংশগ্রহণ ব্যাপক ও বিশাল ছিল না। বিপরীতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সর্বাত্মক হয়েছিল ও সর্বস্তরের জনসাধারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ববাংলায়/বাংলাদেশে অবস্থিত সিভিল প্রশাসন, আধাসামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগ, ব্যাংকার্স, টেলি কমিউনিকেশনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, রেডিও-টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিল এবং বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের রাজনেতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র বিদীর্ণ করে পূর্ববাংলা/বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বাত্মক

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এবং ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা এবং অসহযোগ আন্দোলন উৎসারিত বঙ্গবন্ধুর ৩৫টি নির্দেশ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ম্যগনাকার্টা। অসহযোগ আন্দোলনের তিন দিক : প্রথম দিক হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতা (রাষ্ট্র নির্মাণের নৈতিক দিক), দ্বিতীয় দিক হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা (সার্বভৌমত্ব নির্মাণের দিক), তৃতীয় দিক হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের নির্দেশাবলী (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি)।

সাধারণ মানুষের এই সক্রিয় ভূমিকা থেকে তৈরি হয়েছে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা। পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ সার্বভৌম ছিল না, বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ সার্বভৌম। সাধারণ মানুষের এই সার্বভৌমত্বের বোধ থেকে নির্মিত হয়েছে সিভিল সমাজের সংজ্ঞা। বঙ্গবন্ধু সিভিল সমাজের কর্তৃত্বের ভিত্তি তৈরি করেছেন অসহযোগ আন্দোলনের পরিসরে ৩৫টি নির্দেশ ও ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে দিয়ে। এই নির্দেশাবলী ও ভাষণের অন্তঃসার হচ্ছে পাকিস্তানি সামরিক সমাজের কর্তৃত্বের বিপরীতে বাংলাদেশে সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানের অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিপরীতে বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানের অসংসদীয় সরকার ব্যবস্থার বিপরীতে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য ও গন্তব্য একটাই, সর্বস্তরে দায়বদ্ধতা তৈরি করা।

সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক রাজনীতির ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে। মধ্যপন্থী রাজনীতি তৈরি করেছে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং বামপন্থী রাজনীতি তৈরি করেছে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই দুই অধিকারের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই তিন অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে তৈরি হয়েছে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, যে-রাজনীতির লক্ষ্য একটি জাতি ও একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এভাবে মধ্যপন্থী রাজনীতি থেকে তৈরি হয়েছে মূলধারার রাজনীতি। এই রাজনীতির বাইরে থেকেছে চরম দক্ষিণ ও চরম বামপন্থী এবং এই রাজনীতির অন্তর্গত হয়েছে বাম (কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এবং মধ্য (আওয়ামী লীগ) পন্থা। পাকিস্তানে নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতি ও প্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতি ছিল না। সেজন্য সামরিকতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র-আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রিক ও ফিউডাল-ব্যবসায়ী চক্র সমাজব্যবস্থায় কেন্দ্রিক ছিল। এই দুই স্বার্থ থেকে উৎসারিত হয়েছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদ। বাংলাদেশ রাষ্ট্র ১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৭ মার্চের নীতিনির্ধারণী ভাষণে, অসহযোগ আন্দোলনের পরিসরে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং প্রতিনিধিত্বশলি রাজনীতি, পাকিস্তানের বিপরীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন। রাজনীতির এই দুই দিক ক্ষমতা

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দরকার। নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা তৈরি করে এবং প্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা তৈরি করে। সেজন্য বাংলাদেশে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে এই দুই দায়বদ্ধতার বোধ রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি দেযা হয়। ৩৫টি নির্দেশ এবং ৭ তারিখের ভাষণ এদিক থেকে পরস্পর প্রবিষ্ট।

১ মার্চ থেকে বাঙালি জনসাধারণ স্বাধীন হয়ে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ছিল সমস্যা, বাঙালিদের জন্য অকার্যকর; বাংলাদেশ রাষ্ট্রে, যার উদ্ভব ১ মার্চ থেকে, স্বাধীনতা হয়ে ওঠে জীবনযাপনের বিষয়, প্রাত্যাহিকতার অংশ। এই বোধ বাস্তব হয় রাজনেতিকতার স্তরে। অসহযোগের পরিসরে গণভুবনে স্বাধীনতা রাজনৈতিকভাবে গ্যারান্টি পেয়ে যায় এবং ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জনসমষ্টির জন্য একটি রাষ্ট্রের গ্যারান্টি প্রদান করেন। তখন থেকে স্বাধীনতা, মানুষের হৃদয়ের বদলে বাস্তবে প্রাত্যাহিকতায়, জীবনযাপনে সত্য হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা শুধু আকাঙ্ক্ষা কিংবা ইচ্ছা কিংবা আশা কিংবা বোধ নয়, স্বাধীনতা একটি বাস্তব তথ্য, প্রমাণযোগ্য তথ্য, একটি গণভুবন, একটি রাষ্ট্র, যেখানে স্বাধীনতা ও রাজনীতি পরস্পর প্রবিষ্ট। রাজনৈতিকতার স্তরে স্বাধীনতা যেমন সম্ভব তেমনি মুক্তি সম্ভব। স্বাধীনতা রাজনেতিক, মুক্তি মানুষের সামগ্রিক বোধ। ১ মার্চ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে, জনসাধারণ এই দ্বিবিধ বোধে আপ্লুত ছিল। প্রথম বোধ থেকে উৎসারিত হয় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়ে সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, এই অসম্ভব সম্ভব হয় সর্বাত্মক অসহযোগের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বোধে কার্যকর ছিল মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য দরকার সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, যা-কিনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হতে থাকে অসহযোগের প্রতিটি দিনে। সেজন্য এই দ্বিবিধ বোধ থেকে তৈরি হয় ন্যায়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব বাংলাদেশ রাষ্ট্র ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র হবে পাকিস্তানের অ-ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের বিপরীতে। ১ মার্চ থেকে স্বাধীনতা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ, রাজনৈতিক কর্মপন্থার লক্ষ্য, কিন্তু বাস্তবে, মানুষ এই কারণেই রাজনৈতিক রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করতে তাকে। অসহযোগের যুক্তিশীলতা হচ্ছে স্বাধীনতার রাজনীতি এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হচ্ছে উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনযাপন। স্বাধীনতা হচ্ছে একটি বাস্তব তথ্য, প্রমাণযোগ্য তথ্য, সেজন্য স্বাধীনতা ও রাজনীতি পরস্পর প্রবিষ্ট এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে, ১ মার্চ থেকে স্বাধীনতা ও রাজনীতি একটি প্রকাশ্য ভুবন পেয়ে যায়। উপনিবেশের বাংলাদেশে, পূর্ব পাকিস্তানে, নিয়তিবাদ জীবনযাপনের একটি উপাদান হিসাবে কাজ করেছে, কিন্তু ঔপনিবেশিকোত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নিয়তিবাদের বদলে সর্বাত্মক অসহযোগকালে, স্বাধীনতা ও রাজনীতির পরস্পর প্রবিষ্টতা থেকে শুরু হয় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে জীবনযাপন। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তে স্বাধীন জীবনযাপনের এই বার্তা সারা বিশ্বে পৌঁছিয়ে দেন। এভাবেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠন শুরু হয়ে যায়।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা

হাসনাত আবদুল হাই

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবনেই সুবক্তা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের সম্পূরক ছিল অসাধারণ বাগ্মিতার পারদর্শিতা। জন্মগত প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বক্তৃতাকে রূপান্তরিত করেছিলেন এক মনোহর শিল্পে। এই শিল্পরূপের বৈচিত্র্য অতুলনীয়। এখানে যেমন যথাশব্দের ব্যবহার এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, একইসঙ্গে অগ্রসর হয়েছে বাচনভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের অনায়াস নিয়ন্ত্রণ।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা প্রায়োগিক সার্থকতায় বিস্ময়কর। সময়, পেক্ষাপট এবং শ্রোতার প্রকৃতি সামনে রেখে তিনি নির্ধারিত করেছেন বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের আন্দোলিত ধ্বনি এবং উচ্চারিত কথামালা। অধিকাংশ সময়েই তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তাৎক্ষণিকভাবে, পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই। মঞ্চে ওঠার পূর্বমুহূর্তে অথবা মঞ্চে উঠেই তিনি শ্রোতার সমাবেশ দেখে মনে মনে রচনা করে নিয়েছেন বক্তৃতার কথা। বক্তৃতার সময় তাকিয়েছেন সামনে, বাঁয়ে এবং ডানদিকে যেন জনতার সব অংশই নিমিষে সম্পৃক্ত হয়ে যায় মঞ্চে বক্তৃতাদানকারী নেতার হৃদয় ও কণ্ঠস্বরের সঙ্গে। তাঁর বক্তৃতা সেতুবন্ধ হয়ে বক্তা ও শ্রোতাকে অবিচ্ছিন্ন করে গড়ে তুলেছে, রচনা করেছে দুর্মর নৈকট্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রায় সব বক্তৃতা বক্তব্যের স্পষ্টতায়, বাচনভঙ্গির ওজস্বিতায় এবং অভিঘাতের গভীরতায় স্মরণীয়। এদের মধ্যে ১৯৭১-এ ৭ মার্চের বক্তৃতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ এমন এক বক্তৃতা যা বার বার শোনার মতো। এ বক্তৃতা শুনে শিহরিত, আলোচিত হয় দেহ-মন। আবেগ এবং যুক্তির এক অত্যুজ্জ্বল মিশ্রণ ঘটেছে এ বক্তৃতায়। আবেগ ও মননের কাছে আবেদনে ৭ মার্চের বক্তৃতা কালজয়ী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটিকে ঐতিহাসিক বক্তৃতা বলা হলে যথেষ্ট হবে না। সেই বক্তৃতা পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা। ভাষার শক্তিতে, আবেগের স্ফূরণে এবং বক্তব্যের শাণিত ক্ষুরধারে ৭ মার্চের বক্তৃতা ছিল অসাধারণ এবং অদ্বিতীয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো রাজনীতিবিদ বা গণনায়ক কখনো এমন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে, তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় এবং সময়োপযোগী করে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার উদাহরণ নেই। বঙ্গবন্ধু ভালো বক্তা ছিলেন এবং সব সময়ই বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু ৭ মার্চের বক্তৃতা শুধু তার নিজের অতীত সব বক্তৃতা নয়, আরো অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নেতার বক্তৃতাকে অতিক্রম করে গেছে। তুলনায় কাছে আসতে পারে এমন কোনো বক্তৃতার কথাও মনে করা যায় না, এতই বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী ছিল তাঁর সেই বক্তৃতা। তার সামনে উপস্থিত ছিল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাসহ লাখো জনতা। বক্তৃতা শুনে কেবল তারাই অনুপ্রাণিত, উদ্দীপ্ত এবং সংকল্পবদ্ধ হয়নি; যারা রেডিওতে শুনেছে, অযুত, কোটি সেই সব শ্রোতাও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতো একইভাবে আবেগে, উচ্ছ্বাসে এবং অকুতোভয়ে উদ্বেলিত হয়েছে। বক্তৃতার প্রতিটি কথা স্পর্শ করেছে হৃদয়ের তন্ত্রী এবং একই সঙ্গে মনন ও প্রাজ্ঞতার যৌক্তিক মানদণ্ড। সেই বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলতে হয়েছে, আবার একই সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের দাবি ও অধিকার মেনে নেওয়ার জন্য শাসকদের শেষ সুযোগ দিয়ে আহ্বান করা হয়েছে। বিপরীত দুই শক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য এমন মোক্ষম বক্তব্য উপস্থাপন এক অভাবনীয় কৃতিত্ব। দ্ব্যার্থবোধক মনে হলেও ৭ মার্চের বক্তৃতার সুযোগসন্ধান ও চতুরতার ভূমিকা ছিল না, বক্তৃতাটি ছিল সময়ের দাবি ও প্রয়োজন মনে রেখে এমন এক ঘোষণা ও অঙ্গীকার—যেখানে সমসাময়িক বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছেন। সেই বক্তৃতায় প্রতিফলিত হয়েছে কোটি কোটি বাঙালির প্রাণের কথা, তাদের ক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামী সত্তার বজ্রকণ্ঠ। জনগণের নেতা হয়ে বঙ্গবন্ধু রক্তপিপাসু হন্তারক প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, এ দেশের মানুষকে চোখ রাঙিয়ে বেয়নেট-বুলেট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না। যদি স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে না নেওয়া হয় এবং বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ শাসনের সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধ যে অনিবার্য, এ ঘোষণাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার বক্তব্যে। জনগণকে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন তিনি স্পষ্ট ভাষায়। তিনি তাদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছেন, যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।

৭ মার্চের বক্তৃতার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে যদি জনগণের অধিকার মেনে নেওয়া না হয় প্রতিক্রিয়া কী হবে, তার উল্লেখ করে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ন্যায্য পাওনা দেওয়া না হয়,

তাদের রাষ্ট্রে পরিচালনার ভার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরেই বাঙালিদের অধিকার রক্ষার জন্য শাসকদের শেষ সুযোগ দেওয়ার ইঙ্গিত।

১ মার্চ গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাকে সহায়তা করেছিল জুলফিকার আলী ভূট্টো। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ শাসনে যতটা না উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব ছিল তার চেয়েও বেশি আগ্রহী ও সংকল্পবদ্ধ ছিল স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছে এবং ক্রমেই সেই দাবি গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে; যার অন্তিমে ছয় দফার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নর-নারী নির্বাচিত করেছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে। যখন দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক আমলা এবং শিল্পপতিদের চক্র বাঙালিদের ক্ষমতায় আসতে দিতে চায় না তখন স্পষ্ট হয়ে গেল তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে সম্মত নয়। ১ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করে সামরিক সরকার তাদের এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে নিয়ে এলো। ক্ষোভে, প্রতিবাদে এবং ঘৃণায় ফেটে পড়ল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি। কেন্দ্রের শাসন উপেক্ষা করে তারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে প্রদেশের দৈনন্দিন সরকারি কাজ কর্ম সম্পাদনে সহযোগিতা করল। প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় লাখ লাখ মানুষের মিছিল বের হলো, প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো এবং অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত হলো। সামরিক সরকার বেগতিক দেখে দর কষাকষির জন্য বৈঠকের ব্যবস্থা করল; কিন্তু একই সঙ্গে বিদ্রোহ দমনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পেন বোঝাই করে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রও আনতে থাকল। এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেল, তারা মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছাত্রনেতারা সময়ক্ষেপণ না করে বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের ওপর স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিল। তারা পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে তার স্থানে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত সবুজ পতাকা।

৭ মার্চের বক্তৃতার আগে বঙ্গবন্ধু দুটি বিপরীত স্রোতের মাঝখানে দেখতে পেলেন নিজেকে। একদিকে ছাত্র জনতার দাবি—এখনই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হোক, অন্যদিকে চতুর সামরিক শাসক ও তাদের দোসরদের পক্ষ থেকে সমঝোতায় আসার জন্য বৈঠকের আহ্বান। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু যে উভয় সংকটে পড়লেন তার তুলনা নেই কোনো রাজনৈতিক নেতার অভিজ্ঞতায় এবং জীবনে। এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়নি আর কোনো জননেতাকে কোনো দেশে, কোনো সময়ে বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে ৭ মার্চ ছিল সবচেয়ে কঠিন

এক পরীক্ষার মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচন করেছে এবং নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছে। টালবাহানা করার পর যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দলবল নিয়ে ঢাকায় এসে ছয় দফা নিয়ে আলোচনা করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে তখন সেই উদ্যোগকে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আবার যে উত্তাল জনসমুদ্র প্রতিদিন রাস্তায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামী শ্লোগান দিচ্ছে তাদের আশ্বাস দেওয়া না হলে তা যে হবে হতাশাব্যঞ্জক, সে কথাও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। ছাত্রদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের পর জনতার পক্ষ থেকে স্বাধীনতার জন্য ঘোষণার দাবি প্রায় দুর্বার হয়ে উঠল। ৭ মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে এই দুই বিপরীত স্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমন বক্তব্য রাখতে হবে, যা তাকে জনতার দাবি রক্ষার প্রতিই অধিক দায়িত্বশীল এবং আন্তরিক বলে প্রমাণিত করবে। এমন কঠিন বক্তৃতা বঙ্গবন্ধুকে আগে কখনো দিতে হয়নি, পৃথিবীর কোনো নেতার সামনেও এমন পরীক্ষা এসে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়নি।

বক্তৃতায় কী বলবেন, কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবেন, আবার একইসঙ্গে শত্রুশিবিরে ভীতির সঞ্চার করে দেবেন, এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সময় পাননি বঙ্গবন্ধু। তাকে খুব স্বল্প সময়ে ভেবে নিতে হয়েছে, ঠিক করতে হয়েছে তার বক্তৃব্য। আর এটা তাকে করতে হয়েছে প্রচণ্ড চাপের মুখে। কারো সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শের সুযোগ পাননি তিনি, কোনো ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা মনেও আসেনি তার; কেননা ইতিহাসে এমন ঘটনা, সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হননি কোনো নেতা। বেশ বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুকে একাই ভাবতে হয়েছে কী বলবেন জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে, কোন কথা শুনে তারা উদ্দীপ্ত হবে, তাদের সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত থাকবে। যাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন সমঝোতার শেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য, তাদেরই বা কীভাবে বোঝানো যাবে যে দাবি মেনে না নিলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য। চূড়ান্ত ভাষায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলে সমঝোতার শেষ সুযোগ দেওয়া যাবে না সামরিক শাসকদের, আবার স্বাধীনতার উলেখ করা না হলে সংগ্রামী চেতনায় অকুতোভয় জনতা সন্তুষ্ট হবে না। এই উভয় সংকটে থেকে বঙ্গবন্ধু মনে মনে তৈরি করে নিয়েছেন ৭ মার্চের বক্তৃতা এ কথা বেশ বোঝা যায়। এ ছিল এমন এক বক্তৃতা, যা শুনে শ্রোতার ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে বন্যার প্রবল স্রোতের মতো, তাদের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে। ৭ মার্চের বক্তৃতায় স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা ছিল। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—এ কথায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। ৭ মার্চ পর্যন্ত সংগ্রাম চলছে এবং চলবে, যতদিন না বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা বঙ্গবন্ধু জানতেন। পূর্বাপর বক্তৃতাটি শোনা হলে শাসকদের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন নিয়ে যে আলোচনা সেটিও এই

সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আলোচনা ব্যর্থ হলে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে তারও ইঙ্গিত এবং নির্দেশনা রয়েছে 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, যার যা আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকো'—এ ঘোষণায়।

দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু কি আপোসের চেষ্টা করেছিলেন? ৭ মার্চের বক্তৃতা কি ছিল দ্ব্যর্থবোধক? প্রতিটি লাইন পড়া হলে, চলমান ঘটনা স্মরণ করলে এ ধারণা অমূলক মনে হবে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের জন্য স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবি নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন এবং সেই স্বায়ত্তশাসন আদায় করার উদ্দেশ্যে আলোচনায় শেষবারের মতো বসতে রাজি হয়েছিলেন। আলোচনায় ছয় দফার কোনো অংশ নিয়েই তিনি এবং তার সহকর্মীরা ছাড় দেননি, সুতরাং স্বায়ত্তশাসন, যা ছিল স্বাধীনতারই নামান্তর বা ভূমিকা, সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কোনো দ্ব্যর্থবোধক অবস্থান গ্রহণ করেননি। যদি এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অস্বীকৃত থাকত এবং সামরিক শাসকশ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি উপেক্ষা করে, তাহলে সশস্ত্র সংগ্রামই হবে একমাত্র উপায়—এ ঘোষণাও ছিল ৭ মার্চের বক্তৃতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। শুধু সময় নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। এক অংশ চেয়েছে ৭ মার্চেই স্বাধীনতার ঘোষণা এবং যুদ্ধ শুরুর নির্দেশ। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন এবং যুদ্ধ শুরুর জন্য বাঙালিদের প্রস্তুত হতেও বলেছেন। কিন্তু আলোচনায় শাসকশ্রেণিকে বাঙালিদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য শেষ সুযোগও দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বিপ্লবী নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁকে জনগণের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা যেমন মনে রাখতে হয়েছে, দাবি আদায়ের পর্যায়ক্রমিক ধাপের প্রসঙ্গেও সচেতন থাকতে হয়েছে। এখানে আপোসের প্রশ্ন ছিল না, ছিল ধৈর্য প্রদর্শন ও যুক্তির সহায়তায় দাবি আদায়ের কৌশল। এই কৌশল যখন সফল হয়নি তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আরো আগে, ৭ মার্চের বক্তৃতায়। কেউ বলতে পারবে না যে, তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্যে জনগণকে প্রস্তুত হতে বলেন নি। তবে তাঁর হয়ত একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে রক্তপাত ছাড়াই বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতা (স্বায়ত্তশাসন) অর্জিত হবে। তিনি রক্তপাত চাননি, হত্যাকাণ্ডে তিনি শোকাভিভূত হয়েছেন, আর তাই সামরিক শাসকদের তর্জনি তুলে বলেছেন—'আর যদি একটা গুলি চলে...'।

খুব সংক্ষিপ্ত ছিল ৭ মার্চের বক্তৃতা কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায়, গুরুত্বে এবং ব্যাপকতায় এর সমতুল্য দ্বিতীয় বক্তৃতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আব্রাহাম লিংকন গেটিসবার্গ বক্তৃতা দিয়েছেন মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং ধারণা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে। বেশ ভেবেচিন্তে অনেক সময় নিয়ে লেখা সেই বক্তৃতা। উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'নেভার

সো মেনি' শীর্ষক যে বক্তৃতায় ব্যাটল অব ব্রিটেনে নিহত বৈমানিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, সেটিও সুলিখিত এবং বেশ চিন্তা-ভাবনা করে লেখা। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে যে বক্তৃতা দেন সেটি প্রায় তাৎক্ষণিক জনসভায় দাঁড়িয়েই অথবা তার অব্যবহিত আগে তাঁকে ঠিক করতে হয়েছে কী বলবেন। তাঁর সময় ছিল না ভাবনা-চিন্তার, তদুপরি ছিল অসম্ভব চাপ। এ সত্ত্বেও যে বক্তৃতাটি তিনি রেসকোর্সের জনসমুদ্রের সামনে দিয়েছিলেন সেটি অবিস্মরণীয়। পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে চিরকাল।

বহু বছর হলো ১৯৭১-এর ৭ মার্চ অতিবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এখনও বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তৃতা যখন শোনা যায় শ্রোতার প্রতিটি লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়, আবেগে উদ্বেলিত হয় মন এবং প্রবল শক্তিতে জেগে ওঠে সব চেতনা। কথামালার এই অবিনশ্বরতা আর কোনো বক্তৃতায় রয়েছে বলে জানা নেই। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা আমাদের অমূল্য উত্তরাধিকার, যার গৌরব অনুভূত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য

হারুন-অর-রশিদ

৭ মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। চল্লিশ বছর পূর্বে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সমাবেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখেন—ইতিহাসখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণ। তৎকালীন পাকিস্তানি জনগণই শুধু নয়, সারা বিশ্বের মানুষ ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে আছে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে কী বলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য এ ছিল অন্তিম মুহূর্ত। অপরদিকে, স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার অর্জনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা।

পেছনে ফিরে তাকানো যাক। বাঙালিদের ব্যাপক সমর্থন ও ভোট (১৯৪৬) না পেলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো কি-না সন্দেহ, সেখানে-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ রাষ্ট্রে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের। শুরু থেকেই পূর্ববাংলা পরিণত হলো পশ্চিম অংশের 'কলোনি' বা বাজারে। গণতন্ত্রহীন অবস্থায় সামরিক-বেসামরিক আমলা নিয়ন্ত্রিত এ রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠা পেল পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। শোষণ-শাসনের পাশাপাশি বাঙালিদের উপর চলল জাতি-নিপীড়ন। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বাঙালিদের মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট অতি দ্রুত চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের মুখোমুখি নিয়ে এসে দাঁড় করায়। এমনি ফলাফলের জন্য শাসকগোষ্ঠী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। শুরু হলো প্রাসাদ (ক্যান্টনমেন্ট) ষড়যন্ত্র। এরই অংশ হিসাবে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য

Constituent Assembly-র অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চের সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই দেশ পরিচালিত হতে থাকলো। তিনিই হয়ে উঠলেন *de facto* সরকার প্রধান। তাঁর ধানমণ্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়িটি পরিণত হলো ব্রিটেনের নম্বর ১০ ডাউনিং স্ট্রিট (প্রধানমন্ত্রীর অফিস-কাম-বাসভবন)-এর অনুরূপ। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক Evening standard পত্রিকার ভাষায় :

'Sheikh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East Pakistan, with the complete support of the population... Rahman's home in Dhanmondi, already know as Number 10 Downing Street in imitation of the British prime Minister's residence has been besieged by bureaucrats, politicians, bankers, industrialists and people from all walks of life'. (12 March 1971, p. 10.)

সারাদেশ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে জনগণের উপর রাষ্ট্রিয় বাহিনী নির্বিচারে গুলি ছুঁড়ে প্রতিদিন বহুজনকে হতাহত করে চলে। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে ওঠে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। সবাই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বড় ধরনের রাজনৈতিক ঘোষণার অপেক্ষায় অধীর। এমনি এক প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঘোষণা এলো। দেশ-বিদেশের সকলের ধারণা, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ তাঁর ভাষণে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। বিদেশি পত্র-পত্রিকায় এই মর্মে খবর ছাপা হয় (দ্রষ্টব্য : The guardian, 5 March 1971, p. 12; The Sunday Times. 7 March 1971, p. 1, 9; The Observer, 7 March 1971, p.2; The Daily Telegraph, 6 March, 1971, p.1)। দি ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক-এর ঢাকা থেকে পাঠানো একটি প্রতিবেদন—'E. Pakistan UDI (Unilateral Declaration of Independence) Expected-এ শিরোনামে পত্রিকাটির ৬ মার্চ সংখ্যায় ছাপা হয়। এতে ঢাকার বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিরই বিশদ বর্ণনা করে বলা হয়, 'Sheikh Mujibur Rahman is expected to declar independence tomorrow'। দি সানডে টাইমস পত্রিকার ৭ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত করাচি থেকে পত্রিকার প্রতিনিধি পিটার হেজেল হার্স্ট প্রেরিত প্রতিবেদনে 'East Pakistan leader could declare UDI'. এতে দুই ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয় : মুজিব একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন, নতুবা নিজেই Constituent Assembly-র অধিবেশন ডেকে উভয় অংশের প্রতিনিধিদের যোগদানের আহ্বান জানাতে পারেন।

শেখ মুজিব কর্তৃক একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণার সম্ভাবনা দেখে পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক চক্র নতুন কৌশল অবলম্বন করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ মার্চ রাতে দেশবাসীর উদ্দেশ্য এক বেতার ভাষণে ইতঃপূর্বে অনির্দিষ্টকালের জন্যে

স্থগিত ঘোষিত Constituent Assembly-র সভা ২৫ মার্চ আহ্বানের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনে যে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণে তার সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় মুজিব-ইয়াহিয়া-ভূট্টো বৈঠক। এর পেছনে পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক চক্রের উদ্দেশ্য ছিল কালক্ষেপণ, যাতে পশ্চিম অংশ থেকে এ সুযোগ সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে এসে এখানে মোতায়েন করা যায়। ২৫ মার্চের সেনা-অভিযানই ছিল তাদের মূল পরিকল্পনায়।

বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড এ বিষয়ে ওয়াকেফহাল ছিলেন না, এরূপ কেউ কেউ বলার চেষ্টা করে আসছে, যা বাস্তবতা ভিত্তিহীন। প্রকাশ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছিল। কাজেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নীল-নকশা বুঝতে কোনোরূপ অনুমানের আশ্রয় নেওয়া দরকার হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে এটি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে মূল বক্তব্য কী হবে, তা স্থির করার লক্ষ্যে এর পূর্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি একটানা ৩৬ ঘণ্টা বৈঠকের পরও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় যা বলা আবশ্যক, তাই বলবেন বলে বঙ্গবন্ধুর নিজের উপর দায়িত্ব নিলেন (দ্রষ্টব্য, 'Speeches at Dhaka Race Course and Gettysburg, Mofizur Rahman is the Financial Express, 31 March 1995, p.9). এরপর 'রাজনৈতিক কবি' (নিউজউইক ম্যাগাজিনের কথায়) সভামঞ্চে এসে উপস্থিত। বর্ণ-বৈষম্যবাদ বিরোধী, আমেরিকার কালো মানুষের প্রিয় নেতা, বিশ্বনন্দিত মার্টিন লুথার কিং-এর মতো তাঁর জনগণকে একটি স্বপ্নের কথা (*I have a dream*) বলতে নয়, তাদেরকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাতে তিনি এলেন। মাত্র ১৯ মিনিটের এক ভাষণ রাখলেন। কী চমৎকার বক্তব্য। যেমনি সারগর্ভ, ওজস্বী ও যুক্তিযুক্ত, তেমনি তির্যক, তীক্ষ্ণ ও দিক-নির্দেশনাপূর্ণ। অপূর্ব শব্দশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও উপস্থাপনা। একান্তই আপন, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন, 'আমাদের আর দাবায়ে (দাবিয়ে বা দাবাইয়া নয়) রাখতে পারবা না'। বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে—পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাঙালিদের অবস্থা ব্যাখ্যা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরা, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা, সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ার ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে কোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শ দান, ইত্যাদি কিছুর পর ঘোষণা করেন : '...ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

এ ছিল একজন দক্ষ কৌশুলির সুনিপুণ বক্তব্য উপস্থাপনা। বিশেষ করে ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি স্বাধীনতার কথা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকল না, অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার অভিযোগ উত্থাপন করাও শাসকগোষ্ঠীর জন্যে আদৌ সহজ ছিল না। *The Daily Telegrahy* পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক ঢাকা থেকে প্রেরিত The end of the old Pakistan শিরোনাম এক প্রতিবেদনে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : On sunday (৭ মার্চ) Sheikh Mujib came as near to declaring this (স্বাধীনতা) as he without inviting immediate harsh reaction from the army (10 March 1971 p. 14).

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বিশ্বে যাতে চিহ্নিত না হন, এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সদাসতর্ক ছিলেন। তা নাহলে, স্নায়ুযুদ্ধ চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তার সম্মুখে দৃষ্টান্ত ছিল কীভাবে নাইজেরিয়ার বেয়াফ্রা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (১৯৬৭-১৯৭০) বৃহৎ শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কঠোর হস্তে দমন করা হয়। তাই বঙ্গবন্ধু ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর অ্যাপরোচ হলো : মেজরিটি (বাঙালি) মাইনরিটি (পশ্চিম পাকিস্তানি) থেকে বিচ্ছিন্ন হবে কেন? বরং মাইনরটিই 'সিসিড' করেছে যা আক্রমণকারী—এটাই প্রতিভাত বা দৃষ্ট হোক (দ্রষ্টব্য : The Sunday Times, 7 March 1971, p.9). নিউজউইক ম্যাগাজিনে এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা মেলে :

'A month ago, at a time when he was still publicly refraining from proclaiming independence, Mujib privately told Newsweek's Loren Jenkins that 'there is no hope of salvaging the situation. The country as we know it is finished' But he waited for president Mohammed Yahya Khan to made the break. 'We are the majority so we cannot secede.' (Poet of polittcs', Newsweek, 5 April 1971).

বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত এই যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে সমর-কৌশলীদের বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, রাজনৈতিকভাবে দেখলে, ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্ব জনমতের সমর্থন এবং কূটনীতি উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সংগ্রামের পক্ষে এর সুফল পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে অন্যতম। অনেকে এ ভাষণকে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালের বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। আব্রাহাম লিংকনের সে ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত (মাত্র ৩ মিনিট) ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রেক্ষিত ভিন্ন

হলেও উভয়ই ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। লিংকনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তি : 'This Goverment of the people, by the people and for the people will perish from the earth,' বঙ্গবন্ধু বললেন : '৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর অমর রচনা, বাঙালির মহাকাব্য। এ মহাকাব্য বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের ধারা ও স্বাধীনতার লালিত স্বপ্ন থেকে উৎসারিত। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই এ মহাকাব্য রচনা সম্ভব ছিল, কেননা তিনিই হলেন এ ধারার সার্থক প্রতিনিধি।

সেই কবি, সেই কবিতা

আতিউর রহমান

'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশালাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

—বঙ্গবন্ধু; রেসকোর্স ময়দান, ৭ মার্চ, ১৯৭১

আজ ৭ মার্চ। এক অর্থে বাংলাদেশের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দিনগুলোর একটি। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে বাইরে রাখার হীন উদ্দ্যোমে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। সারা বাংলাদেশ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। সারা বাংলাদেশে প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বাঁধে। বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র নেতৃত্বে পুরো বাঙালি জাতি একাট্টা হয়ে যায়। দলমত নির্বিশেষে তিনি কার্যত বাংলাদেশের পরিচালনা ভার হাতে নিয়ে নেন। শুরু করেন অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনেরই একপর্যায়ে ৭ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। সারা বিশ্ব অনুমান করেছিল যে, তিনি হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করে দেবেন। কিন্তু তিনি সেদিন 'প্রায়-স্বাধীনতাই' ঘোষণা করলেন। পাকিস্তানিদের শেষ সুযোগ দিলেও কার্যত তিনি সেদিন স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বেরই জানান দিলেন। জন আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সেদিন এমন এক বক্তৃতা দিলেন যা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে আজ স্বীকৃত। সেদিন তিনি যেভাবে জনসমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন তা যেন এক অমর কবির ভাবগম্ভীর পদার্পণ। আমাদের সাহিত্য জগতের অন্যতম উজ্জ্বলতম কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় তিনি

সেদিন এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে। তাঁর বজ্রকণ্ঠের বাণী জনসমুদ্রে যে আন্দোলন তুলেছিল তা যেন আজও শেষ হবার নয়।

"...শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা।
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি
শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি;
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।"

-নির্মলেন্দু গুণ, 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'

পঞ্চাশ-উত্তর পুরোটা সময় রাজনৈতিক-সামাজিক-নান্দনিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশনা, অঙ্গুলি হেলন, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভঙ্গিই প্রভাবান্বিত করেছে সদ্যোজাত বাঙালি জাতিকে। সেই অর্থে '৭১-এর ৭ মার্চের কালজয়ী সেই ভাষণটিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ এক রাজনৈতিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের মতো দীঘলদেহী এই শ্রেষ্ঠ বাঙালির সেদিনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। এই ভাষণেই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম রাজনীতির এই অতুলনীয় কবির আবেগ, গরীবের প্রতি মমত্ববোধ, চরম উত্তেজনাময় পরিবেশেও সংযত থাকার পরিমিতিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের শেষ পরিণতি সার্বিক মুক্তির আহ্বান :"... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত কের ছাড়বো, ইনশালাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তিনি চান মানুষের অধিকার। এই ভাষণেই তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি ছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষেরই অংশ। ঐতিহ্যের সন্তান।

'দাবায়ে রাখতে পারবা না'র মতো আঞ্চলিক ভাষা ও অনুভূতির মিশেলে এমনি সাহসী উচ্চারণের কারণেই তাঁর ঐ ভাষণটিকে রাজনীতির এক মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন অনেকে। এমন মহাকাব্য একদিনেই তৈরি হয় না। মাটি-ঘেঁষা রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি নিরন্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার জন্যই তিনি

এমন অনুপম এক হৃদয়কাড়া রাজনৈতিক কবিতা লক্ষ-কোটি মানুষের সামনে সেদিন ওভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন।

ওই কবিতায় তিনি বাঙালির হাজার বছরের ক্ষোভ ও স্বপ্নের নির্যাস তুলে এনেছিলেন। একেকটি শব্দ যে একেকটি যুগের প্রতিধ্বনি। ৭ কোটি বাঙালির দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনা তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। সেই দুঃখ, বঞ্চনা ও অপমানকে আত্মস্থ করে এমনভাবে শব্দের সঞ্চার করেন যা বাঙালির ইতিহাসে কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। সেদিন তিনি বাঙালির স্বাধীনতার নানামাত্রিক আকাঙ্ক্ষা অন্তরের গভীরতম তল থেকে উৎসারিত করেছিলেন। পুরো বক্তৃতায় তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইঙ্গিতই দেননি; একই সাথে অর্থনৈতিক মুক্তির নানা দিকও সেদিন তাঁর ভাষণে ফুঠে উঠেছিল। তাঁর সেই বক্তৃতাটি ছিল আসলে একটি রণকৌশল। শুধু পাকিস্তানি দুশমনদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের আভাসই তিনি সেদিন দেননি, দিয়েছিলেন কী করে গরিব-দুঃখী বঞ্চিত মানুষের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে তা থেকে মুক্তির পথ সন্ধানেরও ইঙ্গিত। শুরুই করেছিলেন মুক্তি শব্দটি দিয়ে। 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়; বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' একথা বলার পরপরই তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। তিনি আশা করেছিলেন জাতীয় সংসদ বসবে। জাতীয় পরিষদের সদস্যরা শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। সেই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে "এদেশকে আমরা গড়ে তুলব, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। পরক্ষণেই তিনি ফিরে যান বঞ্চনার ইতিহাসে। গর্জে ওঠেন, ...২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।" এরপর এক নিঃশ্বাসে তিনি বাঙালিকে ক্ষমতার বাইরে রাখার ইতিহাস তুলে ধরেন। চুয়ান্নতে নির্বাচনে জিতেও কেমন করে বাঙালিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় সেখান থেকে শুরু করে আটান্ন, ছেষট্টি ও ঊনসত্তরের কথা বলেন। এরপর আবার তুলে ধরেন নিরীহ বাঙালির ওপর গুলির কথা। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে, "...আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরীব-দুঃখি-আর্তমানুষের বিরুদ্ধে।" শহীদদের রক্ত পাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধু কোনো আলোচনায় যেতে রাজি ছিলেন না। একই সঙ্গে নিঃস্বার্থ বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দেন, 'প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' হরতালে গরীব মানুষের খুব কষ্ট হয়। সে কথা তিনি জানতেন। তাই রিক্সা-গরুর গাড়ি, রেলগাড়ি, লঞ্চ চলার ঘোষণা দেন। অফিস আদালত চলবে না। মালিকদের হরতালে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের বেতন দিতে বলেন। গরিব কর্মচারীর যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য তিনি ব্যাংক দু'ঘণ্টা খুলে রাখতে বলেন যাতে তারা বেতন নিতে পারেন। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে চালু রাখেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে যাতে টাকা না

পাঠানো যায় সে ব্যবস্থা করতে বলেন। সরকারি কর্মচারীদের বুঝিয়ে দেন বাংলাদেশ তখন কার নিয়ন্ত্রণে। তিনি বলেন, "আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত এই দেশের মুক্তি না হবে ততোদিন খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো।' অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি বিভেদ ভুলে যেতে বলেন। আসল রণকৌশল হিসেবে গেরিলা যুদ্ধের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলেন সেদিন। 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।... ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। মরতে যখন শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ... মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।"

পুরো ভাষণে মুক্তি শব্দটি বারে বারে এসেছে। শেষ করেছেন এই বলে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কোন সেই মুক্তি? নিশ্চয় সে মুক্তি শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তা যে ছিল না তা তাঁর সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোতে অনুরণিত হয়েছে (দেখুন, আতিউর রহমান, ২০০৯, *শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম*, দীপ্তি প্রকাশনী)। তার অন্তরের বহুমাত্রিক সেই মুক্তির ধারণা সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও স্থান পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।' (দেখুন, বিচারপতি গোলাম রাব্বানী, ২০০৮, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান : সহজপাঠ*, সমন্বয়, পৃ. ৩০)।

স্বাধীনতার বহুমাত্রিকতা নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা করেছেন নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তিনিও মনে করেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা বা মুক্তির ভাবনার তল ছিল খুবই গভীরে। তাঁর মতে, "বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সভ্যতা, সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা, সব মানুষের মানবাধিকারের স্বীকৃতি।" (দেখুন, নজরুল ইসলাম সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, ২০০৭, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স)।

এমন উজ্জ্বল এক ভাষণেই দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের। বাঙালি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এমন এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিল যা সকল বিচারেই অতুলনীয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আক্ষরিক অর্থে জনযুদ্ধ। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সন্তানের রক্তে ভেজা বাংলাদেশের লাল সূর্য পতাকা খামচে ধরেছিল যুদ্ধাপরাধী শকুনের দল। সেই খামচি থেকে আজও রেহাই পায়নি আমার

প্রিয় পতাকা। তারা বঙ্গবন্ধু, চার নেতাসহ জাতীয় অনেক নেতৃবৃন্দকে শারীরিকভাবে হত্যা করেছে। রক্তের সেই হোলিখেলা আজও শেষ হয়নি। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুকন্যার নেতৃত্বে ফের যখন বাংলাদেশ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে তখন আবার এসেছে আঘাত। এই আঘাত প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যে নিরন্তর যুদ্ধ। এ যুদ্ধের শেষ নেই। তাই পুরো জাতিকে সদা সতর্ক থাকতে হবে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। ২৫ ফেব্রুয়ারি রক্তের যে হোলি খেলা খেলেছে রাষ্ট্রদ্রোহীরা তাতে দেশের সামরিক বাহিনীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা থেকে জাতি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সবাইকে এই দুঃসময়ে সতর্ক থাকতে হবে। সচেতন থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী সেই ভাবনাই আজও আমাদের দিকনির্দেশনা দিতে পারে। কী করে এই ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে জাতি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আবারও প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার সময় এসেছে। বাঙালির বহুমাত্রিক মুক্তির সংগ্রাম চলছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

মনিরুল ইসলাম

'বাংলাদেশ-অভ্যুদয়ে'র ইতিহাসে ৭ই মার্চ নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। তবে সে ৭ই মার্চের আগে ৩রা মার্চ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যারা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেন, তাদের এখন থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের প্রতিটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসবে কীভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গর্ভে একটা বিপ্লবী আন্দোলন বেড়ে ওঠে। কীভাবে একটির নিঃশেষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আরেকটি সামনে এগিয়ে আসে। এজন্য আরও ভাল হয়, যদি কোনো অনুসন্ধিৎসু ছাত্র আরও বিষদ জানতে চায়, তাহলে ৬ দফা দেয়ার সময়কাল থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা। তাহলেই দেখা যাবে 'আন্দোলনের ডক্টরেট' কেমন নৈপূণ্যের সাথে একটা আন্দোলনকে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক বক্তব্যের ধারাবাহিকতার সাথে আন্দোলনের কর্মসূচির সংমিশ্রণ এবং সে লক্ষ্যে একেকটা সহযোগী সংগঠনের কার্যকরী পদক্ষেপ সঠিক তাল-লয়-মাত্রার পরিচয় বহন করে। ৩রা মার্চ সারাদেশের সাথে ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন শেষে পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন নূরে আলম সিদ্দিকী। মঞ্চে অন্যান্য বক্তাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাভাবিকভাবেই সভার গুরুত্ব অনেককাংশে বেড়ে যায়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির সাথে শেখ মুজিবের কোনো সম্পর্ক নাই, স্বার্থান্বেষীদের এমন অপপ্রচারের পথ রুদ্ধ। সভায় স্বাধীন বাংলার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। ইশতেহারে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বাঙালি জাতির জাতি-রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'-এর আর্থসামাজিক কাঠামোরও ইঙ্গিত দেয়া হয়। পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে

বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর কথা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে জাতীয় সংগীত ঘোষণা করা হয়। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে ৩রা জানুয়ারি রেসকোর্সের শপথ অনুষ্ঠানে এটাই 'জাতীয় সংগীত' হিসাবে গাওয়া হয়েছিল। সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সংগঠন এবং জনগণকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে আহ্বান জানানো হয়। ইশতেহারে পাকিস্তান বাহিনীকে ঔপনিবেশিক দখলদার বাহিনী বলে উল্লেখ করে সর্বত্র পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়। বাঙালির এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। ওই দিন থেকে তাঁর নির্দেশে বাংলাদেশের সমগ্র কার্যপরিচালিত হবে। সমস্ত ইশতেহারটিই স্বাধীনতার একটি অনন্য দলিল। বাংলাদেশের জনগণ ওই ইশতেহারের দ্বারা তাদের করণীয় কি তা সহজেই বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীন বাংলার পক্ষের এই ঘোষণার বিপক্ষে কথা বলার মত লোক বাংলায় না থাকলেও ওই সভাতেই শেখ মুজিব তার ভাষণে 'তবুও পাকিস্তান পন্থীদের' জন্য একটু জায়গা করে দিয়েছিলেন। এমনটি করতে হয়েছিল সম্ভবত সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষিত করার জন্যই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য রাখবেন বলেই আকারে ইঙ্গিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দাবি সমর্থন ক'রে তার বক্তব্যে হেঁয়ালি আকারে বলেন :

> জাতীয় পরিষদের সভা ডাকুন-শাসনতন্ত্র রচনা নিয়ে সেখানে আলোচনা হোক—আর তার ফলাফল যা-ই হোক শোভনভাবে মেনে নিন। সবচেয়ে খারাপ কিছু হলে পাকিস্তান কনফেডারেশন হতে পারে একটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে—আর সেই সাথে ঝোঁক থাকবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি (আর সেটা ৬ দফার সঙ্গে সঙ্গে ১১ দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে যা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের ফলপ্রসূ নেতৃত্বের মাধ্যমেই সম্ভব);
>
> শান্তিপূর্ণভাবে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান শাসনতন্ত্রসহ আলাদা হয়ে যাক আর তারপর বহু আর্থসামাজিক পারস্পরিক সম্পূরকতাসহ দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসাবে বসবাসের চেষ্টা করুক—
>
> উল্লিখিত দু'টি প্রস্তাবই প্রত্যাখান করে সহিংস পন্থায় এগুলে এক দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজ পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ প্রত্যয়ী নেতৃত্বের পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘায়িত বৈরিতার পরিণতি মোকাবেলা করুন।

"তবু পাকিস্তান" পন্থীদের প্রতি এ প্রস্তাব ছুড়ে দেয়ার পাশাপাশি ওই সভা থেকে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার আহুত নেতাদের সম্মেলনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। যারা নিরীহ কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রদের প্রাণহানির জন্য দায়ী এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের সাথে বৈঠকের প্রশ্নই ওঠে না। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে আন্দোলনরত তখনও এদেশের এক শ্রেণীর প্রগতিশীলেরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত খুঁজতে ব্যস্ত এবং পাকিস্তানের মোহ ত্যাগ করতেও অপরাগ।

'৭১-এর মার্চ মাসে এসে দলের মাঝে বহুমত ও বিতর্ক প্রধানত দু'টি ধারায় আবর্তিত হতে থাকে। ৬ দফায় বিশ্বাসী কিন্তু স্বাধীন বাংলা-ভাবনার অংশীদার নয়—এই মতধারাটি জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলা স্রোতে মিলিত হয়ে যায়। সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে এদের আপত্তি থাকলেও এখন তা স্থগিত রেখেই সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসীদের সাথে স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে শামিল হয়। এই ধারা ছাত্র শ্রমিকসহ দলের সংখ্যাগরিষ্টের মত হিসাবে তখন প্রতীয়মান হয়। শেখ মুজিবের পরোক্ষ সমর্থনে এরাই পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াতে বলে, জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশে ক্রমশ এক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন গড়ে উঠতে শুরু করে। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ার প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ঠিক এরই বিপরীতে একদল পাকিস্তান প্রেমী কীভাবে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং শেখ মুজিবের উপর একটা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। এ দুয়ের টানাপড়েনে আওয়ামী লীগ একটা কনফেডারেশনের ভিত্তিতে দু'টি স্বাধীন দেশের প্রস্তাব তুলে ধরেছে। সবারই জানা পাকিস্তানের গোয়ার জেনারেলরা যা কোনোদিনই মানবে না। আওয়ামী লীগের মাঝের এই দুই ধারার সংগ্রামে সাধারণ জনসাধারণ স্বাধীন বাংলার পক্ষে হলেও উপরের তলার এক সম্প্রদায় এবং আমরা ও মতিভ্রষ্ট বুদ্ধি বিক্রেতারা পাকিস্তানের পক্ষেই ওকালতিতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম দলের মাঝে না থেকে তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। জনগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের মতামত জানিয়ে দিচ্ছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া কর্তৃক স্থগিতকৃত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার আহ্বান করে ২৫শে মার্চ তারিখে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাঝে বেড়ে ওঠা নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে সমগ্র জাতি তাকিয়ে আছে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক এক ভাষণ দেন। যে ভাষণ শেখ মুজিবের দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ বলে বিবেচিত। এখন থেকে 'বাংলাদেশ স্বাধীন'—এমনটি ঘোষণা না করলেও, তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই সাথে জাতির সামনে দিয়ে যান এক দিকনির্দেশনাও, যাতে ভবিষ্যৎ করণীয় কি তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই জনসভা থেকে ইাহিয়ার অধিবেশন আহ্বানের জবাবে তিনি অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেন :

১. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার;
২. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর;
৩. সামরিক বাহিনীর সকল সদস্যকে অবিলম্বে ব্যারাকে ফেরত;
৪. পূর্ববর্তী সপ্তাহে যে সকল ঘটনায় লোক নিহত হয়েছে সে সব ঘটনা সম্পর্কে তদন্তানুষ্ঠান।

এ সবের বাইরে বাংলাদেশের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করতে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় শুধুমাত্র পুলিশ ও ই.পি.আর-এর ব্যবহার; প্রয়োজনে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা, বেসামরিক নাগরিকের ওপর গুলিবর্ষণ বন্ধ করাসহ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্য আনয়ন বন্ধ করার আহ্বান জানান। ৭ই মার্চের ভাষণের পর ৮ই মার্চ থেকে শুরু হয়ে যায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বাংলাদেশে পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব। শেখ মুজিবের এই ভাষণ থেকে স্বাধীন বাংলার কর্মীরা কিছুটা মন মরা হলেও সারা দেশে বাংলাদেশের পক্ষে আরও জোরদার আন্দোলনের সূচনা ঘটে। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে প্রতিহত করতে সারা দেশেই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। তবে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না থাকায় পাকিস্তানপ্রেমীদের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তারা তাদের চিরাচরিত পন্থায় শেখ মুজিবের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিকে তারা আমলে না নিয়েই শুধুমাত্র পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন চক্রের শুভবুদ্ধির উদয় হতে পারে এই আশায় স্বপ্ন দেখতে থাকে। তারা ভুলে যায় যে শেখ মুজিবের দাবি পূরণ হলে জাতীয় পরিষদে যোগ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে মাত্র। বাংলাদেশের জনগণ এদের ভাবনার বিপরীতে স্বাধীন বাংলায় বিশ্বাসীদের সাথেই একাত্মতা ঘোষণা করে। কার্যত বাংলাদেশের সর্বত্র শেখ মুজিবের নির্দেশই আইনি স্বীকৃতি নিয়ে কার্যকর হতে থাকে। পাকিস্তানের পক্ষের আলোচনা শুধু সংবাদপত্রের পাতাতেই এক শ্রেণির মানুষের ভ্রান্তি বিলাস হিসাবে স্থান পায়।

৭ মার্চ ১৯৭১
জাতি নির্মাণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধু

খুরশীদা বেগম

'মধ্য দুপুরের তপ্ত সূর্যের নীচে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর উল্টো আঁচড়ানো মসৃণ ধূসর চুলের ধার ঘেষে কপালে সেঁটেছিল স্বেদবিন্দু। গভীর শ্রান্তিতে তাঁর চোখ দুটি ছিল রক্তাভ, কিন্তু অহঙ্কার ও আশায় তাঁর মুখমণ্ডল ছিল প্রদীপ্ত।' ('He stood under a hot noon sun, beads of sweat clinging to his forehead around the edge of his slicked back grey hair. His eyes were red from fatigue, but his face glowed with pride and hope.)

'তিনি' দাঁড়িয়েছিলেন বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডি, তাঁর বাসার সামনে। নেতার চোখে-মুখে বিম্বিত আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও গণজীবনের উপর চেপে বসা সকল অপশাসন, শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত তখন পূর্ববাংলার কোটি-কোটি বাঙালির জাতিসত্তায়। পরম আত্মসচেতনতায় দৃঢ়বদ্ধ সংগ্রামী জনগণের অন্তর্নিহিত আবেগ ও প্রত্যয়ের মূর্ত প্রতীক তিনি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর প্রতি পরম আস্থা ও সমর্থনে ছাত্র-জনতা শ্লোগান দিয়ে যায় 'জয় বাংলা'। তিনি ফিরে দাঁড়ান বাগানের এক পাশে অপেক্ষমান বিদেশি সাংবাদিকদলের দিকে :

'আমার জনগণ ঐক্যবদ্ধ, তাঁদেরকে থামিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আপনারা কি মনে করেন, আমার জনগণের এই চেতনা ও আত্মাকে কোন মেশিনগান সত্যিই ধ্বংস করতে সক্ষম?' ('My people are united, they cannot be stopped. Do you think machine guns can really extinguish the spirit and soul of my people?')

মার্চ, উনিশ শ' একাত্তরের এই প্রথম ভাগেই বঙ্গবন্ধু বিশ্ববাসীকে ইঙ্গিত প্রদান করেন, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধ তাঁর বাংলার মানুষের জাগ্রত আত্মাকে অবদমন করতে পারে এমন কোনো শক্তি আর নেই। তাঁর এই অকুণ্ঠ বিশ্বাস একটি বঞ্চিত অপমানিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক বাণীর প্রত্যয়ে মুক্তি-সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ করে দেয়। ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ Newsweek-এর সংবাদ প্রতিবেদনে Loren Jenkins মুজিব নেতৃত্বে গণজাগরণের এই মহতী পর্ব সম্পর্কে লিখেছিলেন :

'গত মাসেই বাংলাদেশে, মুজিবের সমর্থক 'বাঙালি জাতি' যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নামকরণ করেছে, সেখানে জনগণের এক অভূতপূর্ব এবং শক্তিশালী জাগরণ ঘটেছে যারা কিনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিগত ২৩ বছরেরও অধিক কালব্যাপী পাঞ্জাবি সংখ্যালঘিষ্ঠ দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত এবং প্রতারিত হয়েছে।'

('For last month in Bangladesh, the 'Bengali Nation' as Mujib's supporters renamed East Pakistan, there occurred a strange and powerful awakening of a people who have been exploited, reviled, humiliated and cheated by the Punjabi minority since Pakistan was founded more than 23 years ago.')

সংবাদ প্রতিবেদক ঔবহশরহং জানান, কীভাবে সেখান থেকে রাতারাতি অপসারিত হয়েছে পাকিস্তানের সাদা-সবুজ পতাকা এবং যার পরিবর্তে উড্ডীয়মান হয়েছে লাল-সবুজ-হলুদে খচিত একটি নতুন বাঙালি পতাকা ('a new Bengali flag').

এইখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের সার্থকতা। পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার বাঙালি জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ গড়নে অন্যতম ভূমিকা পালন শুধু না, এই জাতীয়তাবোধকে এমন একটি স্তরে টেনে নিয়ে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি যে, ধর্ম-বর্ণ বা রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল জনগণ বাঙালি জাতি পরিচিতি সংরক্ষণ এবং জাতিস্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে বাংলাদেশ নামে একটি জাতি রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে একটি অসীম সাহসী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 'একক' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এটিই চূড়ান্ত পর্যায়। অর্থাৎ 'জাতি' হিসেবে বিকাশমান 'একক'টির উপাদানসমূহের ভিত্তিভূমে এক ও অভিন্ন স্বার্থের শিকড় যতই গভীরে প্রবিষ্ট হয়, ততই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এর অবস্থান ও উপলব্ধ হয় এর উপস্থিতি। এবং এই পর্বেই অন্যান্য বহিঃশক্তি/গোত্র/জাতি ইত্যাদির সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের এক পর্যায়ে একটি জাতি গোষ্ঠী তার বসতি এলাকায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। জাতীয়তাবোধের চেতনা-সিঞ্চিত এই প্রয়াসই রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম মৌল চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল ডয়েচের ভাষায় জাতীয়তাবোধের এই উপাদানটি হচ্ছে : 'The preference for

the competitive interests of this nation and its members over those of all outsiders.' তাঁর মতে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত একটি জনগোষ্ঠী এক পর্যায়ে সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্রে নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে এমনটা আশা করা যায়।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষা ধারণ ও সঞ্চারণ করতে নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ৫ই এপ্রিল ১৯৭১ Time Magazine-এর রিপোর্ট ছিল :

> 'জীবনের বেশীরভাগ সময়েই তিনি ছিলেন রাজনীতিতে নিবেদিত। প্রথমে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেন। ১৯৪৭-এ উপমহাদেশের বিভক্তির পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের খবরদারি অস্বীকার করেন।' ('...he has devoted most of his time to politics. First he opposed British rule in India. After the sub continent's partition in 1947 he denounced West Pakistan's dominance of East Pakistan...').

এই কর্মকাণ্ডের পিছনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চিন্তা-চেতনা তাঁর মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল যা তাঁর জীবনব্যাপী সকল কর্মকাণ্ডে, বক্তব্যে কিংবা দর্শনে প্রতিফলিত। তাঁর নেতৃত্বের অভিজ্ঞতাধন্য পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে বিষয়টি নতুন কিছু না। তবে লন্ডনে ঞযব ড়নংবৎাবৎ ২৮ মার্চ ১৯৭১ বিশ্ববাসীকে মুজিব নেতৃত্ব সম্পর্কে জানানোর অভিপ্রায়ে লেখে 'How Mujib Turned into Bengal's Hero'. Cyril Dunn তাঁর প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে ভাষা সংগ্রামে মুজিবের স্পর্শকাতরতা উল্লেখ করে লেখেন :

> 'পাকিস্তানের বয়স যখন এক বছরেরও কম, 'মুজিব'-যেভাবে তাঁকে ডাকে সবাই, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে সংগ্রাম শুরু করেন।' (Pakistan was less than a year old when 'Mujib'-as everyone calls him-began fighting for Bengali nationalism')

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান সাম্প্রদায়িক পরিচিতি সংরক্ষণের জন্য যে ভূ-রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ঘটিয়ে ছিলেন পূর্ব বাংলার জনগণ, ১৯৪৮ সাল থেকে জাতিসত্তা বিকাশের অন্যতম মৌল উপাদান বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐ সংকীর্ণ পরিধি থেকে বেরিয়ে আসতে থাকেন তারা। অন্যকথায়, স্থূলতা থেকে জনগণের উত্তরণ ঘটে সূক্ষ্ম জীবনবোধে এবং ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তা। স্থূল জীবন চর্চা থেকে গণমানসের মুক্তি লাভ যদি প্রগতি হয়, তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রগতির পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই। এই অগ্রসরমান জীবন বোধে জাতির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক স্বার্থের অন্তরায়সমূহ অনেকাংশে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়তে শুরু করে এবং গড়ে -ওঠে বিভিন্নমুখী আন্দোলন। কখনো রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে, কখনো সাংস্কৃতিক অবদমনের রাষ্ট্রীয় পলিসির বিরুদ্ধে, কখনো স্বায়ত্তশাসন, কখনো

সার্বজনীন শিক্ষা, কখনো সাধারণ নির্বাচন ইত্যাদির দাবিতে। এই সকল ঐতিহাসিক প্রতিবাদ, আন্দোলন, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই মুজিব উঠে আসেন জনজীবনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বরূপে। 'সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাঙালিগণ তাকে মনে করে একজন অক্লান্ত সাহসী রাজনীতিক হিসেবে, একজন যাদুকর বাগ্মীরূপে এবং একজন নেতা যার উপস্থিতি (জনমনে) অহঙ্কার ও আশা জাগরূক করে।' ('The overwhelming majority of East Bengalis remember him as an untiring courageous politician, a spellbinding orator and a leader whose presence inspired pride and hope.')

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনগণের অভিজ্ঞতা সাপেক্ষেই নির্ধারিত হয় এইরূপ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বৈ নয়। জাতি-জনগণের সকল সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা-সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে উঠে এসে ঐ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যরূপে পরিস্ফুটিত করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে পরিচালিত করতে সক্ষম ব্যক্তি জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত হন রাজনৈতিক নেতৃত্বরূপে। ক্রমাগত গণসংযোগ ও যোগাযোগের সাবলীলতায় পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসে ধীরে ধীরে স্থাপিত হয় নেতা ও জনগণের সম্পর্ক। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরম মমতায় ধারণ করেছেন বঙ্গবন্ধু, লক্ষ্য অর্জনে বারংবার চরম মূল্য দিতে দ্বিধা করেননি। গণঅভিজ্ঞতার কষ্ঠিপাথরে তাঁর এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা যাচাই হয়েছে এবং এক পর্যায়ে তার 'নেতৃত্ব' জাতির আকাঙ্ক্ষার 'প্রতীক'রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের ভাষায় :

> 'বঙ্গবন্ধু এবং শুধু বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন সেই প্রতীক যাঁর চারিদিকে নিঃসহায় এক উদ্দেশ্যের সমর্থকেরা জড়ো হয়েছিল।' জাতির মর্মবেদনা, উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক রাজ্জাক বলছেন :
>
> 'শুধু বাঙ্গালী হতে চাওয়ার জেদ।... আমাদের শুধু এই জাতি হিসেবে পরিচয় দেয়ার ঐকান্তিক কামনা। এটাই আমার বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধুকে আমাদের যুগের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে... এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটি এবং জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন।... জনতা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গভীর ইচ্ছা তার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল।'

নেতা জনতার একীভূত এই 'ইচ্ছার' অভিব্যক্তিই 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র'।

যুগে যুগে বাঙালির ইতিহাসকে স্বপ্ন ও সাধনা দিয়ে ধন্য করেছেন যে সকল বরেণ্য রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক শিল্পী সমাজসেবী এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের সকলের অবদানকে একটি পরম আকাঙ্ক্ষা ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে সংস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে মানুষটি তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইতিহাসের যে মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর হাতে সম্পাদিত হয় এই কাজ, সেটি ৭ মার্চ, ১৯৭১।

পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে, পাকিস্তানি দানবীয় অপশক্তির প্রকাশ্য বা গোপন নানারূপ ষড়যন্ত্র ও তৎপরতার মধ্যে, কোন গোপন অবস্থান থেকে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে, লক্ষ লক্ষ মানুষে জনাকীর্ণ সভায় জনগণের অবিসংবাদিত নেতা, 'মুজিব' ঘোষণা করেন,

'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।...'

পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছালো জনতারই কাঙ্ক্ষিত ঐ ঘোষণা। কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তা রূপান্তরিত হলো একটি অকুণ্ঠ বাঙালি জাতীয়তাবাদী সত্তায়। একটি সংগ্রামী 'একক' রূপে জনগণ রূপান্তরিত হলেন জনগণের ভাগ্য বিধাতারূপে। বিশ্বের রাষ্ট্র-সভায় আর একটি জাতির নাম সংযোজিত করতে, আর একটি জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম দিতে সংগ্রামে সংস্থাপিত হলেন দারিদ্র্যপীড়িত এক বিশাল জনগোষ্ঠী।

'মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (বাঙালি জাতি) ঘোষণা করেছেন।' ('Mujib proclaimed East Pakistan the sovereign independent People's Republic of Bangladesh (Bengali nation)'

৫ এপ্রিল, ১৯৭১ বিশ্ববাসীকে জানাতে News Week যে বিস্তারিত সংবাদ প্রতিবেদন পরিবেশন করেছিল, উপরের সংবাদ তারই অংশবিশেষ। রেডিও, টেলিভিশনসহ এমনতর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিশ্ব জেনেছিল বাঙালি জাতির কথা, তার আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের কথা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাঙালির নেতা মুজিবের কথা।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পিছনে বাঙালির যে দ্বিমুখী আকাঙ্ক্ষা মৌল 'ইনপুট' হিসাবে কাজ করেছে তা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সমর্থিত। শাস্ত্রীয় তত্ত্বসূত্রে 'আত্মপরিচিতি সংরক্ষণ' ও 'আত্মকল্যাণ নিশ্চিতকরণের' তাগিদেই প্রধানত একটি জাতিগোষ্ঠী তার নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা ঘোষণার পরই আর একটি ঘোষণা ছিল :

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।'

বলা বাহুল্য, এই ঘোষণায় গণমানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে। এই মুক্তির পথ আরো জটিল এবং কণ্টকাকীর্ণ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কায়েমী স্বার্থের ঘন বুনটের এই জাল ছিঁড়ে গণমানুষের মুক্তি নিশ্চিত করা বড় সহজ কাজ নয়। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন গণমানুষের প্রখর আত্মসচেতনতা ও আত্মকল্যাণ নিশ্চিতকরণের দৃঢ় প্রত্যয়। এই দুই উপাদানে শক্তি-সমৃদ্ধ জনগণ সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেই খুঁজে নিতে পারে মুক্তির পথ ও কৌশল। বঙ্গবন্ধু গণজীবনে সঞ্চারণ করেন এই সাধনার মূলমন্ত্র :

'কেউ আমাদের দাবায় রাখতে পারবে না।'

গণমানুষের শক্তি ও চেতনার উপর তাঁর এই গভীর আস্থা ও বিশ্বাস পরম রাজনৈতিক বাণীর আবেদনে যেন প্রোথিত হয় গণমর্মে বর্তমান এবং আগামীর জন্য। আত্মপরিচিতিতে গৌরবান্বিত, আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত, আত্মকল্যাণ সাধনে প্রাণিত কোটি কোটি বাংলার মানুষ মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যান। আসন্ন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য জনগণকে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি :

'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো...'

অথবা

'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্।'

দেশের মানুষকে মুক্ত করার দায়িত্ব দেশের মানুষের উপর অর্পণ করে দিলেন তিনি। সৃষ্টিকর্তার নামে ন্যায়ের সপক্ষে হিমালয়-দৃঢ় শপথ ধারণ করলেন জনগণ। এবং সফল হয়েছিল সশস্ত্র, সুসজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অপুষ্ট এবং প্রায় নিরস্ত্র একটি জনগোষ্ঠীর অভূতপূর্ব গেরিলাযুদ্ধ। বাংলার সমতল ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতা গেরিলাযুদ্ধের জন্য আদর্শ স্থান না হওয়া সত্ত্বেও পরাস্ত হয়েছিল আধুনিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান পাকিস্তানি নিয়মিত সামরিক বাহিনী। ১৫ মার্চ ১৯৭১ Time Magazine বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য তুলে ধরেছিল :

'পূর্ব পাকিস্তানি নেতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, আমি ওদের (মেরুদণ্ড) ভেঙে দেবো এবং ওদেরকে, নতজানু হতে বাধ্য করবো।' ('The East Pakistan leader said to the West Pakistanis, I will break them and bring them to their knees)'.

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ স্বাধীন বাংলার মাটিতে নতজানু হয়েছিল বিশাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চরম পর্বে সশস্ত্র যুদ্ধের দায়িত্ব জনগণের হাতে তুলে দেয়ার মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু জনগণকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন এই মর্মে যে যুদ্ধ চলাকালে গণযুদ্ধে নেতৃত্ব দানের সুযোগ তিনি নাও পেতে পারেন। তিনি অনুমান করেছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করবে। তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি...।'

অর্থাৎ জনগণকে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং যা করণীয় করতে হবে। মুজিব তাঁর নেতৃত্বের 'বিকেন্দ্রীকরণ' ঘটিয়েছেন যেন। যে বিশাল সাধারণ জনগণকে 'অশিক্ষিত', 'অজ্ঞ', 'অবুঝ' ইত্যাদি বলা হয়, মুজিবের নেতৃত্বে তারাই হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক ধী-শক্তিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী। ব্যক্তিক পর্যায়ে জনগণের সকলেই যেন নিজেকে নিজে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জন

করেছিলেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবের অবর্তমানে নেতৃত্বের সংকট তাই প্রবল হয়ে ওঠে নাই। কোটি কোটি মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেতৃত্ব সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে পরিচালিত করেছে অসাধারণ গণদক্ষতায়।

বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাতে ইতিমধ্যে তিনি জনগণের মন ও অভ্যাস থেকে পাকিস্তানের ভিত্ উৎপাটিত করেন একটি সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে। এই অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার এবং জনজীবনে নিজস্ব রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবায়িত করেন। ৭ মার্চ-এ তিনি জনগণকে আহ্বান জানান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যাংকিং পরিচালনা, সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় কাজ ইত্যাদির দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে। অলক্ষ্যে গণমনে সঞ্চারিত হয় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজ অধিকার চর্চার আবেগ, আস্থা ও আত্মবিশ্বাস।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে মুজিব এই রাষ্ট্রটির বৈধতা নিশ্চিতকরণে যে অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ধারণ করেন তা বিস্ময়কর। তিনি অস্ত্র-শক্তিতে উদ্ধত ইয়াহিয়া সরকারকে হুমকি দিয়েছিলেন :

'আর যদি একটা গুলি চলে...'

তৎক্ষণাৎ বিশ্ববাসী জেনেছিল, একটি জনগোষ্ঠীর ন্যায়-সংগ্রামের কথা, তার চরম ধৈর্য ও তিতিক্ষার কথা। মুজিব নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের খোলা মঞ্চ থেকে ঘোষণা দিলেন। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি কোথাও এতটুকু ভাঙলো না, কিন্তু পাকিস্তান ভেঙে গেলো। পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছিল তাদেরই হাতে যারা এটিকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। বৈধতার দাবি নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে গেল বিশ্ব বিবেকের সামনে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এই উদ্ভবকে সমর্থন জানালেন। কূটনীতির কৌশলগত অবস্থানে বাংলাদেশের যৌক্তিক ও নৈতিক শক্তি ছিল সুদৃঢ়।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সেই 'গুলি'টি নিক্ষিপ্ত হয় ২৫শে মার্চ রাতে। গণহত্যা ও বর্বরতার নগ্ন প্রকাশে স্তম্ভিত হয় বিশ্ববিবেক। অস্ত্র হাতে তুলে নেন বাংলার মানুষ। হতবুদ্ধি ও আতঙ্কিত অসংখ্য মানুষ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, রাজনীতিক সংস্কৃতিকর্মী, বিদ্রোহী বাঙালি সামরিক অফিসার, সেপাই, পুলিশ চলে যান প্রতিবেশী দেশ ভারতে। কেউ আশ্রয়ের নিরাপত্তার তাগিদে। কেউ যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। শুধু 'একজন' যান নাই ভারতে। তিনি কেন ধরা দিলেন পাকিস্তানিদের হাতে, কেন গা-ঢাকা দিলেন না, ইত্যাদি প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ তুলে মুক্তিযুদ্ধের এই সফল নেতৃত্বকে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতিকে এ যাবৎকাল অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে একটি সত্য মধ্যদুপুরের সূর্যের মত স্বর্ণোজ্জ্বল, সেটি নির্দেশিত হয় নাই মুজিব সমালোচকদের মুখে। সত্যটি এই যে, ৭ মার্চের ভাষণে তিনি জনগণকে 'যার যা' কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে

বলেছিলেন। কোন বিদেশি শক্তির কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ বা সাহায্য গ্রহণের এতটুকু কোন ইঙ্গিত দেন নাই। বাংলাদেশ থেকে প্রায় দেড় কোটি মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বেশীরভাগই প্রায় চলে গিয়েছিলেন ভারতে। যিনি অবধারিত মৃত্যুর মুখেও ভারতে যান নি, তিনি জনগণের 'মুজিব'। এই একটি মাত্র ব্যক্তির ভিন্ন অবস্থান গ্রহণে উদ্ভাসিত ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অবয়ব এবং অটুট থেকেছে জনগণের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি'। ভারতের বিশাল সাহায্য সমর্থন, বিরাট অবদান-এই স্বাধীনতাকে ছাপিয়ে আর বড় হয়ে উঠতে পারে নাই। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবির তীক্ষ্ণ ধারে শাণিত হয়েছে বিশ্বমানবতা, এবং পরাশক্তিসহ সকল রাষ্ট্রশক্তিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয়েছে এই সংগ্রামের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং যথার্থ আবেদনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ, সংহত হয়েছে স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে পাকিস্তানের কোন আঁধার কারাবাসে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তখন প্রতিটি দিন ও রাত কাটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। নিঃশঙ্ক চিত্ত। তিনি তাঁর জনগণের মরণপণ লড়াইয়ের শুদ্ধতা ও বৈধতার প্রতীক। নিঃসঙ্গ কারাবাসে তার বন্দিত্বেই তখন নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত নেতৃত্ব। তিনি ধরা দিয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর নেতৃত্বকে। কোন অস্ত্রীয় প্রহরা, কোন শৃঙ্খল, কোন কারাগারের লৌহদেয়ালের সাধ্য কী সেই নেতৃত্বকে এতটুকু স্পর্শ করে, ক্ষুণ্ন করে বা অবদমন করে রাখে!

নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর হওয়ার প্রেরণা

তোফায়েল আহমেদ

৭ মার্চ এলেই মনে পড়ে ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নয়ন জুড়ানো স্বাধীনতার অমর মহাকাব্য পাঠের দৃশ্য। অমন দৃশ্যপট আর জাতির জীবনে আসেনি। আর কখনোই আসবে না অমন গৌরবময় সোনালি দিন। ৭ মার্চের বসন্তে জাতির হৃদয় জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়েছিল, উত্তাল হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ডাকে। অগ্নিঝরা ইতিহাসের উত্তাল মার্চ, অসহযোগ আন্দোলনের উর্মিমুখর দিনগুলো আজও চোখে ভাসে। বাঙালি জাতি তাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে স্বাধীনতার মন্ত্রে এক সুতোয় বাঁধা পড়ার দিন ৭ মার্চ। সে দিন তাঁর অঙ্গুলি হেলনে পাকিস্তানের পতন ঘটেছিল। তাঁর বজ্রকণ্ঠে ফুঁসে উঠেছিল পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। তাঁর বাঁশির সুরে নগর-বন্দর থেকে গ্রামের মেঠোপথে মানুষের হৃদয় মুক্তির নেশায় জেগে উঠেছিল। রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মঞ্চ ঘিরে সে দিন সকাল থেকেই বিক্ষুব্ধ বাংলার জনগণ এক স্রোতে এসে মিশেছিল। সে কি উন্মাদনা! সে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ! কি উত্তেজনাময় দিনই না ছিল বাঙালি জাতির জীবনে। এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার স্বপ্ন সামনে রেখে কী বলবেন তাঁর জনগণকে? এই প্রশ্নটিই ছিল সবার কৌতূহলী মনে।

একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ সামনে নিয়ে যারা সংগ্রাম করে, শত অত্যাচার, নির্যাতনের দুঃসহ যন্ত্রণা তাদের গতিপথকে রোধ করতে পারে না। তাই কারাগারের অন্ধকার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে নয়, কবরের পাশে দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকদের কাছে মাথা নত করেন নি। কোনো কিছুই তাঁকে তাঁর অঙ্গীকার আর লক্ষ্য থেকে সরাতে পারেনি।

৩রা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন। ১লা মার্চ হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সভা। সকাল ১০টা থেকে বৈঠক শুরু হয়। একই দিন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন, 'যদি তারা পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে ৩রা মার্চ অধিবেশন বসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জীবনযাত্রা নীরব নিথর করে দেওয়া হবে।' এর পরপরই বেলা ১টায় ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেন, 'পাকিস্তানে এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করছি।' এই ঘোষণার পর উত্তাল ঢাকা থেকে যেন আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ থেকে ছাত্ররা বের হয়ে আসে। ঘর থেকে জনতা ছুটে আসে রাজপথে, পল্টন ময়দান যেন জনসমুদ্রে।

হোটেল পূর্বাণীর চারদিক জনস্রোত। ঢাকা শহরে শ্লোগান আর শ্লোগান। 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো সোনার বাংলা মুক্ত কর', পিণ্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা', 'পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা-বাংলা', 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। ইয়াহিয়ার ঘোষণায় জনতার রুদ্ররোষে ঢাকা হয়ে পড়ে মিছিলের নগরী। হোটেল পূর্বাণীতে দেশ-বিদেশের অগণিত সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায়। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা নিয়ে সাংবাদিকদের বললেন, 'বিনা চ্যালেঞ্জে আমি কোনো কিছুই ছাড়ব না। ছয় দফার প্রশ্নে আপোস করব না। দুই থেকে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল চলবে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।' ওইদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো ছাত্রলীগ আর ডাকসুর সমন্বয়ে। নেতৃত্বে ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন।' আজকাল অবাক হয়ে লক্ষ্য করি ইতিহাস বিকৃতির ধারায় অনেকেই মননের দীনতা ও নীচতা প্রকাশ করেন বিভিন্ন মিডিয়ায়। তারা ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে এড়িয়ে নিজেকে বড়ো করে দেখান। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই রক্তঝরা প্রতিটি দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ হতো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। স্বাধীনতার ইশ্তেহার পাঠ, স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন—ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জায়গা পাওয়া প্রতিটি আলোকিত ঘটনাই ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। তখন বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে সামনে নিয়েই পথ হেঁটেছে। আমরা শুধু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সেদিন কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছি। ইতিহাস বিকৃতির আস্ফালন দেখি আর ভাবি, আদর্শচ্যুত হলে মানুষ বোধহয় এভাবেই মিথ্যার মোড়কে সত্যকে গোপন করতে চায়।

৭ মার্চে স্বাধীনতার ডাক এসেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করেছিল। যারা আজ ইতিহাস বিকৃত করছে, তাদের জন্য

ইতিহাস কাঠগড়া নির্ধারণ করে রেখেছে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশ। কী স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের স্রোত। বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীন বাংলাদেশ তখন সবার হৃদয়ে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা আঁকা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। ৩রা মার্চ পল্টনে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ উত্তাপ রূপ নিল। বঙ্গবন্ধু এলেন, তুমুল করতালি আর স্লোগানের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীন বাংলার ইশতেহার পাঠ হলো। জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হলো। ইশ্‌তেহারে বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়। এদিকে ৫ মার্চ পর্যন্ত টানা হরতাল। চলমান অসহযোগ আন্দোলনের মুখে রাজশাহী, খুলনা, রংপুর ও চট্টগ্রামে শাসকের বুলেটে রক্তাক্ত হলো বাংলাদেশ। সান্ধ্য আইন জারী হলে বীর বাঙালি তাও অমান্য করল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি জাতি এতটাই অবিচল আস্থায় স্বাধীনতার মন্ত্রে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল যে, তাদের রুখে দাঁড়ানোর সাধ্য আর শাসকের নেই। মৃত্যুকে জয় করে রাজপথে নামার সাহস যেন বীর বাঙালি অর্জন করছে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে। প্রতিদিন ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে মিলিত হতে থাকে জনতার মিছিল। যেন ওটাই বাঙালির ঠিকানা। নেতার নির্দেশ নিয়ে তারা আরো বেশি সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এসএম আহসানকে সরিয়ে বেলুচিস্তানের কসাই বলে খ্যাত টিক্কা খানকে গভর্নর করেন। ১০ই মার্চ ইয়াহিয়া খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করেন। ২৫শে মার্চ ডাকেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। আর বীর বাঙালিদের মাঝে তখন রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক কী নির্দেশ দেন তা শুনতে, দেখতে রক্তে নেশা ধরানো উন্মাদনা।

১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই নভেম্বরের সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৭ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু আমাকে তার নির্বাচনী সফরসঙ্গী করেন। আমার জীবনে এমন জ্যোতির্ময়, হৃদয়বান নেতার সান্নিধ্য আর আসবে না ভাবতেই মন খারাপ করে। বঙ্গবন্ধুকে ওই সময়ে কাছ থেকে দেখেছি, তাঁর চিন্তা-চেতনায় স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই ছিল না। মাত্র ২৭ বছর বয়সে আমি তখন জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছি। নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনেই জনগণ নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে আমাদের নয়, সেদিন বঙ্গবন্ধুকেই নির্বাচিত করেছিল। আমরা কেবল জাতির আস্থার প্রতীক বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধি ছিলাম মাত্র। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার পথে হাঁটছেন তা পাকিস্তানি শাসকচক্র আর জুলফিকার আলী ভুট্টো বুঝতে পেরেই বাঙালির অবিসংবাদিত নেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। কিন্তু ইতিহাসের চিরসত্য হচ্ছে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতি জনগণের বিশ্বাস, জনগণের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার আর প্রিয় মাতৃভূমির সঙ্গে তিনি কোনোদিন প্রতারণা

করেন নি। যার জন্যে ইয়াহিয়া ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন।

৭ মার্চের সেই দিনটির কথা ভাবলে কত অবাক হই। বঙ্গবন্ধু সেদিন নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র বীরের জাতিতে পরিণত করেন। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে ছুটে আসা ১০ লাখেরও বেশি জনতা যেন ছিল প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দেয়ার একেকজন দূত। সেদিন স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার উন্মাদনা ছড়িয়েছিলেন। সেই উন্মাদনা গোটা জাতির রক্তে ছড়িয়েছিল। নেতা জানতেন তাঁর মানুষের ভাষা। জনগণ বুঝত তাঁর ইশারা। নেতার কণ্ঠের মাধুর্য তাদের জানা ছিল। তাই জাতি সেদিনই নেতার ডাক পেয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। ৭ মার্চ সকাল থেকেই সারাদেশের জনস্রোত এসে মিলিত হতে থাকে রেসকোর্স ময়দানে। রেসকোর্স ময়দান যেন বিক্ষুব্ধ বাংলার চিত্র। সেদিন তাদের প্রিয় নেতা হৃদয় আর বিশ্বাস থেকে যে ডাক দিয়েছেন তা তারা সানন্দে গ্রহণ করেছে। সকাল থেকেই কী এক উত্তেজনায় টালমাটাল দেশ। কী বলবেন আজ বঙ্গবন্ধু? এই প্রশ্ন নিয়ে লাখ লাখ মানুষের মিছিল ছুটে আসে রেসকোর্স ময়দানের দিকে। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে দৃঢ়তার সঙ্গে আপোসহীন অবয়ব নিয়ে নেতা এসে দাঁড়ালেন জনতার মঞ্চে।

জনতার হৃদয়ে যেন আকাশ স্পর্শ করার আনন্দে দোলা দিয়ে গেল। নেতা যখন মঞ্চে উঠলেন, মনে হলো আমরা হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছি তার সেই দুনিয়া কাঁপানো ঐতিহাসিক ভাষণ। যাকে মানুষ তুলনা করে আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস' বলে খ্যাত ভাষণের সঙ্গে। সাজানো গোছানো নির্ভুল ছন্দোবদ্ধ, প্রাঞ্জল উদ্দীপনাময় ভাষণটি তিনি রাখলেন। কী আস্থা তাঁর প্রিয় স্বদেশের মানুষের প্রতি, প্রধানমন্ত্রিত্ব এমনকি জীবনের চেয়েও কত বেশি প্রিয় তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা, তাই তিনি শোনালেন। এতটাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন যে ভাষণে তিনি একদিকে স্বাধীনতার ডাক দিলেন, অন্যদিকে শাসকের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করার পাতানো ফাঁদেও পা দিলেন না। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' যেমন বললেন তেমনি চার শর্তের জালে ফেললেন শাসকের ষড়যন্ত্রের দাবার গুটি। বললেন, সামরিক শাসক প্রত্যাহার করতে হবে। সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। রক্তের দাগ না মোছা পর্যন্ত অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার কথাটিও বললেন। ক্যান্টনমেন্ট তখন গুলিবর্ষণ, বোমা হামলার প্রস্তুতি। কিন্তু নেতার বিচক্ষণতায় রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হলো। ৭ই মার্চের ভাষণ নয়, যেন মহানায়কের বাঁশিতে উঠে আসা স্বাধীনতার সুর। সেই সুরে বীর বাঙালির মনেই নয়, রক্তেও সশস্ত্র স্বাধীনতার নেশা ধরিয়ে দেয়। ভাষণটি বঙ্গবন্ধু নিজ সিদ্ধান্তেই দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের সহযাত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব জানিয়েছিলেন, '৬ই মার্চ সারারাত বঙ্গবন্ধু বিচলিত অস্থির ছিলেন, তিনি কী বলবেন তাঁর জনগণকে তা নিয়ে। বেগম মুজিব বলেছিলেন, 'তুমি যা বিশ্বাস কর তাই বলবে'। সেই দিনটির কথা মনে পড়লে এখনো শিহরিত হই। মনে হয় বঙ্গবন্ধু যদি আবার ডাক পাঠাতেন, আবার যুদ্ধে যেতাম। এখনো কানে বাজে নেতা বলছেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের অধিকার চাই।'

কত স্মৃতি ভাসে। কত সুখের স্মৃতি। কত বেদনার স্মৃতি। ৭ মার্চের স্মৃতি অমলিন। মঞ্চে যখন তিনি উঠলেন, মনে হলো এই দিনটির জন্যই বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের সংগ্রাম আর অপেক্ষা। মনে পড়ছে সেই কথাটিই—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। বঙ্গবন্ধু এলেন, দেখলেন আর হৃদয় জয় করে ফিরলেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র

এম সাইদুর রহমান খান

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—বঙ্গবন্ধুর এই অমিত বাণী হৃদয়ে ধারণ করেই লাখ লাখ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ দিয়েছে অগণিত মুক্তি সংগ্রামী।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অধীনে ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদের যে সাধারণ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয় তাতে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সব হিসাবনিকাশ ওলোট-পালট হয়ে যায়। নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বাংলার জনগণ ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছে, কাজেই এর ভিত্তিতেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি সামরিক সরকারের নানা ষড়যন্ত্র। এরই অংশ হিসেবে দেখা গেল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্বনির্ধারিত ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১ মার্চ আকস্মিকভাবে বেতার-টিভিতে ভাষণের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। আগুনের লেলিহান শিখার মতো প্রতিবাদে ফেটে পড়ল বাংলার জনগণ। অফিস-আদালত, দোকানপাট বন্ধ হলো। স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা বন্ধ রেখে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে উপস্থিত ঐতিহাসিক ছাত্রসভাতে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়। গোটা

বাঙালি জাতি সেদিন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বজ্রকঠিন শপথে ছিল ঐক্যবদ্ধ। ৬ দফা মানতে হবে, 'জয়বাংলা' শ্লোগানে ঢাকাসহ সারাদেশ ছিল মুখরিত। বঙ্গবন্ধু সেদিন (১মার্চ) হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের, বললেন, 'আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচকরা (যাদের অধিকাংশই স্বাধীনতাবিরোধী বা উগ্র বামপন্থি) প্রায়ই বলে থাকেন কেন তিনি ৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তাদের মতে, ওইদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলে নাকি অতি সহজেই দেশ স্বাধীন হতো এবং ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হতো। প্রশ্ন হলো, আসলেই কি ব্যাপারটি অত সহজ ছিল? পরিবেশ পরিস্থিতি কি ওই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করার অনুকূলে ছিল? এসব প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে তখনকার বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ দরকার। ষাটের দশকে এশীয় রাজনীতিতে পাকিস্তান ছিল আমেরিকার প্রধান মিত্র। চিনের সঙ্গেও পাকিস্তানের ছিল মধুর সম্পর্ক। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ছিল বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্ধ সমর্থক। এমন এক পরিবেশে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়েছিল। তার পিছনে যে হতদরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তারাও কিছুদিন আগ পর্যন্ত প্যান ইসলামিক আবেগে তাড়িত হয়ে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। শহরাঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছাত্র-জনতার কণ্ঠে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' শ্লোগান উঠেছে ঠিকই, তবে সে শ্লোগান সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মনে কতটুকু আসন করতে পেরেছে তার পরীক্ষা তখনও হয়নি। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচন তারা ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দিয়েছে, স্বাধীনতার পক্ষে নয়। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তার প্রতিক্রিয়া দেশে ও বিদেশে কিরূপ মারাত্মক হতে পারে বিচক্ষণ মুজিব তা ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আলোচনার টেবিল ছেড়ে এসে রাজপথে এরূপ ঘোষণা দিলে তিনি বিশ্ব দরবারে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসাবে চিহ্নিত হতেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রামে পৃথিবীর কোনো জাতিই সমর্থন করে না। মুজিবকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালানো বিশ্ববাসীর কাছে বৈধ বলে গণ্য হতো। এরূপ অবস্থায় পাকিস্তানের বন্ধুরা পাকিস্তান রক্ষার অজুহাতে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেত। সপ্তম নৌবহর তখন আর হয়তো বঙ্গোপসাগর থেকে ফিরে যেতে না।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সেই উত্তাল দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ডাকে মাথা তুলে দাঁড়াল পূর্ববাংলা, বিশ্ববাসী দেখল এক অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলন। এই সময়টা ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে যেমন সবচেয়ে গৌরবের, তেমনি আবার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময়ও বটে। অনেক বিকল্পের মধ্য থেকে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। সে সিদ্ধান্তে এতোটুকু ভুল হলে জাতিকে দিতে হতো চরম মূল্য। বাঙালি জাতির সৌভাগ্য এমন এক বিচক্ষণ দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন তার কাণ্ডারি।

৭ মার্চের ভাষণকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর ওপর নানা মহলের চাপ আসতে থাকে। ৬ মার্চের রাত ছিল তার জীবনে এক মারাত্মক সমস্যাপূর্ণ রাত। তাঁর তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল হলে তা হবে দেশের জন্য ভয়াবহ। পরদিন ৭ মার্চ সকালে পাকিস্তান নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ওই বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পরিষ্কার ভাষায় ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের কথা বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেন। পূর্ববাংলায় স্বঘোষিত স্বাধীনতা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করবে না। এরপর বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। সে বৈঠক শেষে ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে) থেকে আগত উগ্র জাতীয়বাদী ছাত্র নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আ স ম রব প্রমুখ। তাঁদের দাবি—পূর্ববাংলা স্বঘোষিত স্বাধীনতা। অন্যদিকে দলের প্রবীণ ও দক্ষিণপন্থি নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে। এহেন বিভিন্নমুখী চাপের মুখে এক উত্তপ্ত পরিবেশে স্বাধিকার আন্দোলন যখন একেবারে চরম পর্যায়ে এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রায় পুরোটাই উগ্র জাতীয়বাদীদের নিয়ন্ত্রণে তখন বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে কী ভাষণ দেন তা জানার জন্য সবাই উদগ্রীব। অবশেষে তিনি মাত্র ১৭ মিনিটের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে সকল মহলকেই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানের সামরিক চক্র চেয়েছিল শেখ মুজিব একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিক। তাহলে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং একটি স্বীকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার নায়ক হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত করা সহজ হতো। দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবি মুজিব সামরিক জান্তার সেই ফাঁদে পা দেন নি। তিনি বায়াফ্রার রাজনীতাবাদীদের পথ অনুসরণ করেননি। একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অসময়ে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তার ফল হবে একটা বিরাট শূন্য। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্লাকশিপ হিসেবে চিহ্নিত হবেন, স্বাধীনতা নামক সোনার হরিণটি চিরদিনই অধরা থেকে যাবে বায়াফ্রার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ওজুকো এমেকার মতো। তেলসমৃদ্ধ বায়াফ্রা এখনও নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশ হিসেবেই টিকে আছে, বাধ্য হয়ে বায়াফ্রাবাসী তা মেনে নিয়েছে। স্বাধীনতা

সংগ্রামের বেদিমূলে অসংখ্য বায়াফ্রান তরুণ সেদিন তাদের বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করলেও নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে সেই রক্তদান বৃথা যায়। পাঞ্জাবের শিখ নেতা ভিন্দ্রানেওয়ালের খালিস্তান আন্দোলন কিংবা প্রভাকরণের এলটিটি আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। শেখ মুজিব তার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বলে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন হঠকারী সিদ্ধান্ত অনেক সময় সস্তা জনপ্রিয়তা এনে দিলেও বাংলার স্বাধীনতা অর্জনকে তা দূরে ঠেলে দেবে। তাই তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হিসাবনিকাশ করে কৌশলের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যান। শেখ মুজিব সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আক্রমণোদ্যত পাকবাহিনীর হাতে গণহত্যার একটি শক্তিশালী অজুহাত তুলে দেয়া হতো এবং হাজার হাজার নর-নারীর রক্তে ভেসে যেতে পারতো রেসকোর্স ময়দান। (উল্লেখ্য, শেখ মুজিব যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন রেসকোর্স ময়দানের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার চক্কর মারছিল)।

রাষ্ট্রদ্রোহী জনগণের ওপর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ তখন বহির্বিশ্বে বৈধতা পেতো। সব দোষ তখন মুজিবের ওপর চালানো হতো। বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক মুজিব এ ধরনের সম্ভাব্য মারাত্মক পরিস্থিতি সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। তাই তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যা ছিল প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতার ঘোষণা। কারণ তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে' এটা তো ছিল কৌশলগতভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার উদাত্ত আহ্বান। আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ না করে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রমাণিত হবার আহ্বান সম্ভাবনা এড়িয়ে তিনি কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করেন। শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই তিনি সুকৌশলে ওই ভাষণে বাংলার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। তিনি এটাও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তাকে হয়তো ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দি করে রাখা হবে কিংবা হত্যা করা হবে। তাই তিনি তাঁর প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা সব রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেবে। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। শত্রুর বিরুদ্ধে এমন হুশিয়ারি কেবলমাত্র মুজিবের মতো অবিসংবাদিত নেতার পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি তার ভাষণে জনগণকে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন এবং আপনাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরও রক্ত

দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'। এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, অন্যদিকে এর সফলতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কেবলমাত্র আত্মবিশ্বাসী এক রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই এ ধরনের উক্তি করা সম্ভব। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—বঙ্গবন্ধুর এই অমৃত বাণী হৃদয়ে ধারণ করেই লাখ লাখ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ দিয়েছে অগণিত মুক্তি সংগ্রামী। ওই ৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ—যা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে যে বাঙালি জাতিকে তিনি ধাপে ধাপে প্রস্তুত করেছিলেন স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে, এই ভাষণের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত পরিণতির আহ্বান জানালেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এ ভাষণ ছিল আমাদের যুদ্ধ স্লোগান। তার এই বক্তৃতা সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত এই ভাষণই ছিল কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। অনেকের মতে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ ভাষণের চেয়েও আবেগময়। ভাষণটি ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বর সংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে যেভাবে স্বাধীনতার মুলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। এই বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফলশ্রুতি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

শেখ সাহেব ও ৭ মার্চের ভাষণ

নির্মল সেন

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ বেতার-টেলিভিশনে প্রচারের দাবি জানানো হয়েছে। আমি বুঝতে অক্ষম, এতোদিন শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ভাষণ বেতার, টেলিভিশনে বাজানো হয়নি কেন? বাংলাদেশ তো একদিন টুপ করে আকাশ থেকে পড়েনি। এর পেছনে অসংখ্য সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের প্রথম নাম শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাঁকে মুছে ফেলা যায়নি। প্রকাশ্যে বা গোপনে হোক মানুষ তার ভাষণ বাজিয়েছে। তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তার নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু সফল হয় নি। আজকে স্পষ্ট বলা দরকার ১৫ আগস্টের পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা আদৌ বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। তাই তারা প্রথমে হত্যা করেছিল বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরে একে একে বাংলাদেশের সমস্ত ঐতিহ্য শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা প্রথমে হস্তক্ষেপ করেছে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চারনীতিতে। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। তারা কলমের খোঁচায় ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রকে করেছে সামাজিক ন্যায়বিচার। মনে হয়, তারা মার্কস এবং এঙ্গেলসের উত্তরাধিকারী। দেখা যাবে বাংলাদেশের সংশোধিত সংবিধানের ভিন্ন রূপ। সংবিধান সংশোধন করে জিয়াউর রহমান যে সংযোজন করেছিলেন, তার ভূমিকায় প্রথমে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন ও অন্যান্য সংসদ সদস্যের নাম আছে। পড়লে মনে হবে, সংবিধান সংশোধন করেছিলেন শেখ সাহেব ও তৎকালীন আওয়ামী লীগের সদস্যরা। কিন্তু এ করেও

কি শেখ সাহেবকে মুছে ফেলা গেছে? আমি তো ৭ মার্চের ভাষণ সামনের বেঞ্চে বসে শুনেছিলাম। সে ভাষণে সবকিছু ছিল।

যারা বলেন শেখ সাহেব দেশকে অপ্রস্তুত রেখে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, তারা কি লক্ষ্য করেননি শেখ সাহেব ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে'।... শেখ সাহেবের এ ভাষণের পরও কি বিশ্বাস করতে হবে তিনি সংগ্রামের ঘোষণা দেননি ৭ মার্চ? তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করতে যে সেকালে কত বড় বুকের পাটা দরকার, তা কি কেউ অনুভব করতে পারবেন? একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের কথা কেউ কোনোদিন শুনেছেন? আমি তৎকালীন বামপন্থি নেতাদের বলতে শুনেছি, শেখ বুর্জোয়াদের নেতা। তাই তিনি ৭ মার্চ স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। কিন্তু আমার বাম বন্ধুরা কি খেয়াল করেছেন, শেখ সাহেবের পক্ষে ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না? তবে যারা তাঁর ঘোষণার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা আপনাআপনিই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা যুদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। আজকে একদল লোক বলে, স্বাধীনতার ঘোষক শেখ মুজিবুর রহমান নন—ঘোষক হচ্ছেন মেজর জিয়াউর রহমান। এ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবল বিতর্ক চলছে। জিয়াউর রহমানপন্থিদের বলতে চাই যে, ২৭ মার্চের সাহসী ঘোষণার জন্য আমি জিয়াউর রহমানকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে ঘোষণা জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন তার ভিত কে রচনা করেছিল? শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ভাষণ কি জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ভাষণ থেকে পৃথক করে দেখা যায়? তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধ থাকে?

আমি সারা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘুরেছি। প্রতিটি শিবিরে গিয়েছি। সেখানে দুটি শব্দ শুনেছি, একটি *শেখ মুজিবুর রহমান আর একটি জয় বাংলা*। আমি জয় বাংলা বলে হাজার হাজার তরুণকে ছুটতে দেখেছি। আমি শরণার্থী শিবিরে গিয়েছি। সেখানে প্রতিটি ঘরে একটি নামই শুনেছি, সে নামটি হলো শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানের নাম নিয়ে অসংখ্য তরুণ মৃত্যুবরণ করেছে। মৃত্যুর পূর্বে বলে গেছে, তার সমাধি যেন স্বাধীন বাংলায় হয়। এই ইতিহাস পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে। আমরা লক্ষ্য করলাম, তিনি শুধু সংবিধান সংশোধনই করলেন না, তার আমলে জয় বাংলা শব্দ যেন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। পাকিস্তানি হানাদারদের মতো টেলিভিশন ও বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বাঙালির মন থেকে শেখ সাহেবের নাম কি মুছে ফেলা গেল? আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা বুকে

হাত দিয়ে বলুন, বাংলাদেশ থেকে শেখ সাহেবের নাম কি মুছে ফেলা যাবে? শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে? আজকে সেনাবাহিনীর যে সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য বহন করেন, তারা কি বাংলাদেশ ও তার সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে মনে করেন না? আজকে প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আপনি তো সব ইতিহাসের খবর রাখেন। আপনি কি ৭ মার্চের ভাষণ ছাড়া বাংলাদেশ কল্পনা করতে পারবেন? শেখ সাহেব ৭ মার্চের বাংলাদেশের হাটে-মাঠে-ঘাটে এবং মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। এ সত্যকে আপনি অস্বীকার করবেন কী করে? আমি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে শেখ সাহেব কি একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নি? আজকে আপনার কি একটু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই? ওই মহান নেতার মৃত্যু দিবসে আপনি জন্ম দিবস পালন করেন। আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক কারণে অনেক কিছু করতে হয়। অনেক কৌশল নিতে হয়। কিন্তু যে কৌশল আদর্শগতভাবে মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়, যে কৌশল মানুষকে নীতি বিবর্জিত করে, সে কৌশল আপনি নেবেন কেন?

এবার রাজনীতির হৈচৈ নেই। আপনারা সবাই নীরবে বসে চিন্তা করুন। ওই লোকটির প্রতি কী অন্যায় আপনারা করছেন? তাঁর হত্যার বিচার পর্যন্ত আপনারা সঠিকভাবে হতে দেননি। একটি রাষ্ট্রের রাষ্টপতির হত্যার বিচার হয়নি। এ লজ্জা, এ দুঃখ রাখব কোথায়? তাই আমার আবেদন, ওই মানুষটিকে এবার আসুন সবাই শ্রদ্ধা জানাই। তার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করি। আমি বিশ্বাস করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যদের শেখ সাহেবের ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকবে না। কারণ শেখ সাহেবের নাম না থাকলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকে না। আর আপনাদের অস্তিত্বও ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা হয়ে যায়। তাই আমি আবেদন জানাব, এবার যেন শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ভাষণ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। আমি রাজনীতি করি। কিন্তু আওয়ামী লীগ করি না। আওয়ামী লীগের বিপরীতে আমার অবস্থান। তবুও আমি শেখ সাহেব ও ৭ মার্চকে অস্বীকার করতে পারি না।

ইতিহাস

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও গণতান্ত্রিক চেতনা
ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের নেপথ্যে
সেই দিন, সেই ভাষণে! সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা
ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ
বঙ্গবন্ধু, ৭ মার্চ এবং সেই সময়
৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং আমাদের উপলব্ধির তারতম্য
স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ছাত্র ইউনিয়ন
সেই ৭ মার্চ
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ
কালোত্তীর্ণ ভাষণটি বাঙালি জাতির অনন্ত প্রেরণা
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাসের এক মহাকাব্য
৭ মার্চ, আরেক 'মনুম্যান্ট'
সেই আর্তনাদের ইতিহাস
৭ মার্চের কবিতা
৭ মার্চ '৭১ ও বঙ্গবন্ধু
৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও গণতান্ত্রিক চেতনা

কামাল উদ্দিন হোসেন

এই অমর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্বের ও পরের কতিপয় ঘটনার কথা মনে রাখা দরকার। ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রমূলক আকস্মিক সংসদ অধিবেশন ডাক দিয়ে ১লা মার্চ '৭১ সালে মুলতবির যে ঘোষণা দেয়া হয় তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রকাশ ও তার সঙ্গে অনেকগুলি ঐতিহাসিক শ্লোগানও দেয়া হয়—"স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; মুক্তি যদি পেতে চাও, বাঙালিরা এক হও।" নতুন প্রজন্মকে শোনাবার মত। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর এই সময়ের কার্যক্রম ছিল ব্যক্তির সঙ্গে দেশ ও জাতির স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক সংঘাতের কয়েকদিন আগে ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে পাক হানাদার বাহিনীর একাংশের সঙ্গে বাঙালি সংগ্রামীদের সংঘর্ষ—যেখানে বেশ কিছু হতাহত হয়। একে যুদ্ধের একাংশ বলা যায়।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেনা স্বৈরশাসকদের কালেই ২৩ মার্চ ছাত্রদের অনুরোধে ও তাদের সম্মুখে নিজের হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন বঙ্গবন্ধু এবং তা আরো অনেক স্থানে উত্তোলিত হয় এবং আজও উত্তোলিত আছে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বিনা সঙ্কেতে আপোষ আলোচনার ছদ্ম বেড়াজালে অতর্কিতে নিরস্ত্র জনগণের ওপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে, কোনো বাছবিচার করে নি পাকিস্তান সমর্থক ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে। এই নারকীয় আক্রমণের প্রতিক্রিয়া

ও প্রতিবাদ স্বরূপ যে ডাক, সে যিনিই দিক, ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের মনের ডাক। শুরু হয় সংগ্রাম, আর স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম নয়, পুরোপুরি স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ। আর এই নির্মম গণহত্যার জন্যে টিক্কা খান বিশ্ব সাংবাদিকদের কাছে Butcher of Bangladesh—বাংলাদেশের কসাই বলে পরিচিত হয়।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বায়ান্ন সালের অমর একুশের ভাষা আন্দোলন—যা ছিল ১৯২৬ সালের আবুল হুসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ নিয়ে শিখা পত্রিকাকেন্দ্রিক বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সচেতন উত্তরসূরি অর্থাৎ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম। অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে জাতীয় চেতনাবোধের বহিঃপ্রকাশ। বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন। এরপর ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয়, ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসনের ও একদশক জুড়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষে গণঅভ্যুত্থানে তার মুক্তি ও এক বিশাল জনসভায় তাকে জনগণের 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় ভূষিতকরণ, স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর পতন, ইয়াহিয়া খানের আর এক সামরিক স্বৈরশাসন প্রবর্তন। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া প্রবর্তিত LFO-এর অধীন পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছয়দফা অর্জনের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিপ্লব—যার ফলে কেবল পূর্ব পাকিস্তানে নয়, সারা পাকিস্তানে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে। তার সঙ্গে ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্ব, পূর্ব বাংলার পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালিদের দ্বারা শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ছয়দফার দাবিও মনে রাখতে হবে।

স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া পাকিস্তান পার্লামেন্টের অধিবেশন ডেকেও ভুট্টোর যোগসাজশে ও তাদের স্বার্থে সংসদ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করলে তার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিরা গণরোষে ফেটে পড়ে এবং ৩ মার্চ পল্টনের মাঠে প্রতিবাদ সভায় শেখ মুজিবসহ বক্তাগণ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম ঘোষণা করা হয়। ৭ মার্চ ছিল শেখ মুজিবের দ্বারা আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার কথা এর পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পর্যন্ত সকল ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত পরম্পরায় এক সূত্রে গাঁথা। যুদ্ধ চলে শেখ মুজিবের নামে।

শেখ মুজিব ছিলেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক কারিশম্যাটিক নেতা, যেখানে জনগণ নেতার সঙ্গে, আর নেতা জনগণের সঙ্গে এক। তাঁকে দেখতে হবে বচন অপেক্ষা আচরণের সঙ্গে, গুরুত্ব সেইখানে। সারা দেশের আগ্রহী জনতাকে স্রেফ তাদের তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন তার ব্যঞ্জনা ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী ইতিহাস

সৃষ্টিকারী। ইতিহাস যদি হয় সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতাশ্রয়ী জীবনযাত্রার সার্থক বিবরণ, তাহলে সেইদিন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী বাঙালিরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সংগঠিতভাবে নিজ অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে—ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, অঙ্গীকার নিল মুক্তির, অঙ্গীকার নিল স্বাধীনতার। কথা দুটো সমার্থক, গুণে ও তাৎপর্যে এক নয়। মুক্তি হলো বাংলার জনগণের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সার্বিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। আবার এই মুক্ত বাঙালি জাতি নিজের ভবিষ্যৎ স্বাধীনভাবে গড়ার স্বাধীন রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সাংস্কৃতিক আদর্শ নিজের মত করে পরিচালনা করবে। গঠন করবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বা নেশন, বিশ্ব রাষ্ট্রজুড়ে আসন গ্রহণ করবে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে।

এই অঙ্গীকারের বাস্তব গণতান্ত্রিক দিকটা দেখা যায়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্বে। বাস্তব যদিও ছিল বহুজাতিক, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ছিল যদিও সংখ্যাগুরু কিন্তু ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরিতে, সেনাবাহিনীতে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছিল বঞ্চিত, পশ্চাৎপদ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান পত্তনের পর থেকে '৭১ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে আসে নি—যদিও ১৯৫৬ সালে একটা সংবিধান রচিত হয়েছে, কিন্তু ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের অবৈধ ক্ষমতা দখলের পর চলেছে দেশের সামরিক স্বৈরশাসন, যার সিংহভাগ ক্ষমতাধর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি গোষ্ঠীর লোক। ইসলামের নামে চাপাতে চাইল বাঙালিদের ওপর উর্দু ভাষা, রাষ্ট্রভাষা, ১৯৫২-এর রক্তক্ষয়ী অমর একুশের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্যে বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছিল সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, যা আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসনে গেল বিপর্যস্ত হয়ে। ক্রমে জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণপ্রতিরোধ, যার সাংগঠনিক দাবি রূপ নিল বিখ্যাত ছয়দফাতে। জেল, জুলুম, নির্যাতন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ভণ্ডুল, গণবিক্ষোভ, গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুবের পদত্যাগ, সামরিক শাসকরূপে ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ, পাকিস্তান সংবিধান বাতিল, সামরিক শাসন চাপানো, শেষে এলএফও'র অধীন প্রথম ও শেষ নির্বাচন ও নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়। কিন্তু টালবাহানা করে ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টোর সঙ্গে যোগসাজশে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার যে চক্রান্ত তার প্রতিবাদে এই ঐতিহাসিক সমাবেশ—যেখানে শেখ মুজিব নির্বাচনে অবিসংবাদিত জয় লাভ করে বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব লাভ করেন। এই মহাসম্মেলনে তিনি জনগণকে সংগঠিত করে ইয়াহিয়ার সংগঠিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তির নামে জনগণের সংগঠিত অধিকারের শক্তিকে দাঁড় করান, যাকে বলে অরগানাইজড মাইট বনাম অরগানাইজড রাইট। ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হলো দখলদার

বাহিনীতে, অকুপেশন আর্মিতে। ২৫ মার্চের অতর্কিতে বাংলার জনগণের ওপর গণহত্যা চালিয়ে আরো অবনমিত হলো হানাদার বাহিনীতে। বাধ্য করল বাংলার জনগণকে এই হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণের বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হাতিয়ার তুলে নিতে। মুক্তিসংগ্রাম রূপ নিল মুক্তিযুদ্ধে। বাংলা বাঙালির জনগোষ্ঠী যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় জয়লাভ করে হয়ে যায় জাতি বা নেশন, পাক শাসক-শোষণ থেকে মুক্ত, স্বাধীন জাতি এই হলো ঐতিহাসিক ৭ মার্চের সম্মেলন থেকে ইতিহাস সৃষ্টি, একটি স্বাধীন জাতির সৃষ্টি, বাঙালি জাতি, স্বাধীন ও সার্বভৌম। ৭ মার্চ বাঙালিরা আর সম্প্রদায় নয় একটি জাতি সম্প্রদায় বা ন্যাশনালিটি, কেবল নেশন হতে বাকি তবে প্রস্তুত।

এই ৭ মার্চে শেখ মুজিব অনেকের অনুরোধ, অনেকের প্রত্যাশা, আমাদের মত অনেকের রেডিওর কাছে আগ্রহে অপেক্ষা সত্ত্বেও সরাসরি কোনো স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তখন হতাশ হলেও পরে একটা গণতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ পেয়েছি তা বলতে হয়। এই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই ছয়দফার ডাক থেকে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গণআন্দোলন করে এসেছে। কোনো সশস্ত্র গণবিপ্লবের পথ ধরে নি। সশস্ত্র বিপ্লব আর ৭ মার্চের গণসম্মেলন এক নয়। তার ওপর এই সম্মেলনের নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জননেতা, জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী দখলদার বা অকুপেশন বাহিনী হলেও হানাদার বাহিনী হয় নি, হতে পারে শেষ পর্যন্ত হয়ও, কিন্তু তা ৭ মার্চে নয়, তখনও শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত ছিল, ইয়াহিয়া গণপরিষদের অধিবেশন ডাক দিলেই চুকে যায়। তিনিও দায়মুক্ত। শেখ মুজিব দায়বদ্ধ। গণপরিষদ যা নির্ধারণ করবে তাই হবে গণতান্ত্রিকভাবে বিধিসম্মত। সেই দিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে, ইয়াহিয়া বলতে পারতেন আওয়ামী লীগ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শেখ মুজিব সেই প্রচণ্ড উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে সংযত থেকে প্রজ্ঞার সঙ্গে গোটা পরিস্থিতিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ রাখলেন। জনগণও মেনে নেয়। নজিরবিহীন ঐতিহাসিক সার্বিক গণঅসহযোগ আন্দোলন সূচনা করলেন, সম্পূর্ণ অচল করে দিলেন, ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা পাক বাহিনী ক্যান্টনমেন্টে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। সারা দেশে হাইকোর্টের বিচারকবৃন্দ, সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্টেট ব্যাংকের অধিকর্তাগণ থেকে নিম্নতম জনসাধারণ শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বেচ্ছায় পরিচালিত হতে থাকল। সত্যিই এক গণতান্ত্রিক গণবিপ্লব, গৌরবময় বিপ্লব সূচিত হলো।

ভাষণের এক জায়গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান যারা আছে তারা আমাদের ভাই, বাঙালি...এই ক্ষুদ্র বাক্যাংশের মধ্যে তিনি জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাকে কেউ বিশদ করলে এর

অর্থ স্পষ্ট হবে। তিনি পূর্ব পাকিস্তান বলেন নি, পূর্ববাংলা বলেন নি, বলেছেন বাংলা। স্বাধীনতার পর কেবল যোগ করলেন দেশ। আরো দুটো বিষয় উল্লেখ করতে হয়, হিন্দু-মুসলমান যারা আমাদের ভাই ও বাঙালি, অর্থ হলো দেশের জনগণ হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভাই, যা সে সময়ের পাকিস্তানি ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিজাতিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবল তাই নয়, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় যে সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার জনগণ ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম-বর্ণ-হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি বলে তাদের সংগঠিত সত্ত্বার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাকে তিনি সাংস্কৃতিক স্তর থেকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে আসেন। পাকিস্তানে দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুসারে মুসলমান-মুসলমান ধর্ম-ভাই, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়, হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং সংখ্যাগুরুর দেশ হিসাবে পাকিস্তান হলো মুসলমানের দেশ, হিন্দু বা সংখ্যালঘু পৃথক সম্প্রদায়। বঙ্গবন্ধু সেই পাকিস্তানেই, ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে হিন্দু-মুসলমানকে ভাই বললেন, তাদের আবহমান কালের অসাম্প্রদায়িক পরিচয় 'বাঙালি'ও বললেন। বাঙালি জাতীয়তার সূত্রপাত ঘটালেন। বিলোপ করলেন দ্বিজাতিতত্ত্ব, রদ করলেন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ।

এখন দেখতে হয়, হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও কীভাবে ভাই হয়। এক কথায় বললে বলা যায়, মুসলমান আমাদের ধর্মভাই, হিন্দু আমাদের জাতীয় ভাই। এর তাৎপর্য একটু খোলাসা করতে হয়। শেখ মুজিব সব সময় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেছেন, গণতান্ত্রিক সমাজের কথা বলেছেন, তাত্ত্বিকভাবে না বলে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বলেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মের একটা স্থান আছে, যাকে অন্য কথায় বলা যায় ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। ধার্মিক ও সাম্প্রদায়িকের পার্থক্য বুঝতে হবে প্রত্যেক নাগরিক যে যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কিন্তু প্রত্যেক নাগরিক ধর্ম বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে একজন এক ভোটের ভিত্তিতে সরকারে সমান অংশীদারিত্বের বলে সমানাধিকার ভোগ করবে। ধর্মের ভিত্তি একধর্মবিশ্বাস বা কমন বিলিফ যা সৃষ্টি করে এক সম্প্রদায় যার কার্যকারিতা সামাজিক স্তরে। জাতীয়তার ভিত্তি একধর্মবিশ্বাস বা কমন বিলিফ নয়, তবে ভিত্তি হচ্ছে সমানাধিকার বা ইকুয়াল রাইট, যার কার্যকারিতা রাজনৈতিক স্তরে। কমন বিলিফের ভিত্তিতে যে সামাজিক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় তার সদস্যরা হলো ধর্মভাই। আর ইকুয়াল রাইটের ভিত্তিতে যে জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয় সেটা হলো রাজনৈতিক সম্প্রদায়, এই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ই হলো জাতি—ইংরেজিতে যাবে বলে ন্যাশনালিটি আর এই ন্যাশনালিটি স্বাধীন রাষ্ট্র পত্তন করলে হয় নেশন বা জাতিরাষ্ট্র বা জাতি। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু এই জাতির বা নেশনের ভিত গড়েছিলেন। সেই হিসাবে হিন্দু-মুসলমান হলো জাতীয় ভাই যাকে তিনি ঐতিহাসিক পরিচয়ে অভিহিত করলেন বাঙালি বলে। আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে যা বাস্তব। ধর্মসংস্কারমুক্ত হয়ে

যখন ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সম্পর্কে কোনো জনগোষ্ঠী ইকুয়াল রাইট ভোগের ভিত্তিতে এক হয় সেটা হলো জাতি, যার সদস্যরা অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ভাই। বাঙালি বলতে আমরা এই জাতীয় ভাই বুঝি, জনসাধারণকে সেটা বোঝাতে হবে। দুটোতে কোনো বিরোধ নেই। ধর্মগোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা ভাষা সংস্কৃতির ভিত্তি তো অসম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হচ্ছে জাতি—নেশন।

আগরতলা মামলা ভণ্ডুল হবার পর যে জনসম্মেলনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত করেছিল, আমার মতে ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক অভিধায় ভূষিত হবার যোগ্য। বিশ্বাস স্বপ্ন-আদর্শ এই ভাষণের মধ্যে এক করে শেখ মুজিব বাঙালি জাতির মূর্ত প্রতীক হয়ে গিয়েছিলেন। শেখ মুজিব বাংলার জনগণের অব্যক্ত অসংগঠিত বাসনাকে এই ঐতিহাসিক ভাষণে ঐতিহাসিক মুহূর্তে সাংগঠনিক রূপ দিয়েছিলেন। এই ৭ মার্চ ১৯৭১ সালেই জন্ম হয় বাঙালি জাতির। জন্ম হয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রিক আদর্শ পূরণের। এখানে সেই অমর ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী শ্রোতার আবেগমথিত বর্ণনা উদ্ধৃত করলে নতুন প্রজন্ম সেই ভাষণের ঐতিহাসিকতা উপলব্ধি করতে পারবে। অংশটি সরদার ফজলুল করিমের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' নিবন্ধ থেকে নেয়া।

> "কিন্তু কেবলই কি যোশের ব্যাপার ছিল সেদিন এই ভাষণে' যোশের কথা তো যে কোন সময়ে যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু সেদিন শেখ মুজিব যা বলেছিলেন, তা তার পক্ষে সেদিনই মাত্র বলা সম্ভব ছিল, আর সে ভাষণের তাৎপর্য আজ কেবলমাত্র তার শব্দের পুনর্ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ধরা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন লাখো মানুষের জমায়েত ভরা সেদিনের সেই রেসকোর্স, তার মধ্যে স্থাপিত সেই মঞ্চ। শেখ মুজিব এলেন একটু বিলম্বে, তিনি উঠলেন মঞ্চে, চারদিকে দৃষ্টি ফেরালেন, দেখলেন লোকে লোকারণ্য, শুনলেন আকাশে জঙ্গী বিমানের গর্জন এবং সেই গর্জনকেও অতিক্রম করে উঠছে উদ্বেল লাখো মানুষের সংগ্রামী আওয়াজ। দেখলেন, লোক তখনো আসছে আর আসছে। আর এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে মুজিব বদলে যেতে লাগলেন নিজের অজান্তে। এমনি হয়। জনতার মধ্যে জন এমনিভাবে বদলায়। জনতার বাইরে জন তথা ব্যক্তির এক রূপ, ক্ষুদ্র, শঙ্কিত, সীমিত। জনতার অংশ হিসাবে জনতার মধ্যে তার অপর এক রূপ তেজে কম্পমান, শক্তিতে দুর্বার আর সম্ভাবনায় অসীম। এক জাতির উদয়।"

স্বাধীনতার সংগ্রাম আমরা করেছি বুলেটের সহায়তায়, এবার মুক্তির সংগ্রাম হবে ব্যালটের সহায়তায়। একজন এক ভোটের ভিত্তিতে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা হলো রাষ্ট্রবিপ্লব, একে জনগণের জন্যে কার্যকর করতে প্রয়োজন শাসন বিপ্লব। গণতান্ত্রিক প্রশাসন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের নেপথ্যে

কামাল হোসেন

৭ মার্চ জনসভার জন্য দলীয় অবস্থান বিবেচনার উদ্দেশ্যে ৬ মার্চ শেখ মুজিবের বাসভবনে আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির সদস্যদের বৈঠক ডাকা হল। সারাদেশে প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল যে, ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত ছাত্র ও যুবসমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত ছাত্র ও যুবসমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে, কেবল স্বাধীনতাই একটি গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য হতে পারে। এটা পরিষ্কার ছিল যে, ছাত্রসমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং রাজনীতি সচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্বের ভার ছিল শেখ মুজিব এবং দলের ওপরই ন্যস্ত। ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাব্য সার্বিক ফলাফল তাই সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার অর্থ দাঁড়াত সামরিক বাহিনীকে তার সব শক্তি নিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করা। এতে তারা যে কেবল শক্তি প্রয়োগের ছুতো খুঁজে পেত তাই নয়, বলপ্রয়োগে তাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে তারা সবকিছুর ওপর সব উপায়ে আঘাত হানত। কোনো নিরস্ত্র জনগোষ্ঠী কি ওই ধরনের হামলার আঘাত সহ্য করে বিজয়ী হতে পারে? বহির্বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়াই বা কী দাঁড়াবে? অন্যান্য দেশের সরকারগুলো কি স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে? একটি সুসংগঠিত সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন টিকে থাকতে পারবে তো? এসব প্রশ্ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর বিরাজমান বিভিন্নমুখী বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক স্বার্থসমূহের কারণে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের

অভ্যুদয়কে তারা মেনে নেবে এবং স্বীকৃতি দেবে তো? অজস্র প্রশ্নের মধ্যে এগুলো ছিল কয়েকটি, যা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হল। বৈঠকে শেখ মুজিব বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন মত শুনলেন, তবে নিজের অভিমত সংরক্ষিত রাখলেন। যাবতীয় মতামতই বৈঠকে প্রকাশিত হল। ওই বৈঠক যখন চলছিল তখন বেতারে ইয়াহিয়া খান আবির্ভূত হলেন এবং একটি বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিটি ছিল সুনির্দিষ্টভাবে উস্কানিমূলক এবং বাঙালি অনুভূতির প্রতি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য ইয়াহিয়ার বিবৃতিতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করা হল। প্রকারান্তরে ভীতি প্রদর্শনের স্বরে বিবৃতিতে বলা হল :

পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগ করে পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সক্ষম জানা সত্ত্বেও আমি বিশেষভাবে বিবেচনা করেই পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও খুনখারাবি থেকে আইন ভঙ্গকারীদের বিরত রাখতে শক্তি প্রয়োগ একেবারেই কমমাত্রায় করা হয়।

হম্বিতম্বিগুলো বাদ দিলে বার্তাটি ছিল এরকম, ইয়াহিয়া বিশ্বাস করেন পরিস্থিতির একটি সামরিক সমাধান সম্ভব এবং 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার' প্রয়োজনে তিনি যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার বিবেচনানুযায়ী প্রয়োজনীয় যে কোনো মাত্রার শক্তি প্রয়োগের জন্য নিজেকে যথাযোগ্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে করেন। ইয়াহিয়ার বার্তায় হুমকিটি ছিল পরিষ্কার। বেতার ঘোষণাটি শেষ হওয়ার পর শেখ মুজিব নির্বাহী কমিটির বৈঠক ওইদিন সন্ধ্যার পর পর্যন্ত মুলতবির নির্দেশ দিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে তিনি পরদিনের জন্য গ্রহণীয় কর্মপন্থার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছিল শেখ মুজিবের ওপর। তিনি শীর্ষস্থানীয় দলীয় নেতৃবৃন্দ তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানের পরামর্শ চাইলেন। আমাকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হল। খোলাখুলি স্বাধীনতা ঘোষণার ফলাফল সতর্কতার সঙ্গে হিসাব করে দেখা হল। সেনাবাহিনী একটি সামরিক হামলা চালানোর সুযোগ খুঁজছিল এবং এ ধরনের কোনো ঘোষণা যে তাদের সেই সুযোগটিই যোগাবে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। সিদ্ধান্ত হলে যে, ওই সুযোগ আপাতত তাদের দেয়া উচিত হবে না। একই সঙ্গে আন্দোলনের গতি অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইয়াহিয়ার ওপর চাপও বজায় রাখতে হবে। বিবেচনা করে দেখা হল, যদি আন্দোলনের জোয়ার ধরে রাখা এবং জনগণের ঐক্য জোরদার করা যায়, তা হলে ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ তাদের লক্ষ্য অর্জনে ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হল যে, পরদিন খোলাখুলি স্বাধীনতা ঘোষণার অবস্থান নেয়া হবে না। ইয়াহিয়ার

ওপর চাপ প্রয়োগ করতে স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হবে এবং ওইসব দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ওইসব দাবির মধ্যে থাকবে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আরও সৈন্য আনা বন্ধ করা এবং যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার তদন্ত করা। শেখ মুজিব নির্দেশ দিলেন, দুটি প্রধান দাবি জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। দাবি দুটি হল অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৭ মার্চের জনসভার পর সংবাদ মাধ্যমে দেয়ার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের অবস্থান তুলে ধরে আমাকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতির খসড়া তৈরি করতে বলা হল। যে ঘোষণা দেয়া হবে তার গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণের পরপরই সংবাদ মাধ্যমে দেয়ার জন্য ঘোষণার একটি লিখিত ভাষ্য প্রস্তুত রাখা উচিত। ওইদিনই সন্ধ্যার মধ্যে একটি খসড়া ভাষ্য তৈরি করা হল। ওই ভাষ্যে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি সুস্পষ্টভাবে উলেখ করে শেষ অনুচ্ছেদে বলা হল :

আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হল অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অসহযোগ আন্দোলন চলবেই।

শেখ মুজিব নির্দেশ দিলেন, প্রস্তুতকৃত ভাষ্যটি তাজউদ্দিন আহমদের হেফাজতে থাকবে এবং জনসভায় ভাষণটি প্রকৃতপক্ষে যেভাবে দেয়া হবে তার আলোকে যদি প্রয়োজন হয় সে অনুযায়ী সংশোধন করে তা প্রচারের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে তাজউদ্দিন আহমদই পালন করবেন।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল মাত্র ১৯ মিনিটের। ভাষণের মূল বাক্যটি ছিল : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট দাবিও তুলে ধরা হল। লিখিত ভাষ্যটি যথাযথভাবে পরিমার্জিত করে তাজউদ্দিন আহমদ তা প্রচারের জন্য সংবাদ মাধ্যমে পাঠালেন। কাজেই চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির হল 'স্বাধীনতা', কিন্তু শেখ মুজিব কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত রইলেন। কেননা এটা পরিষ্কার ছিল যে, সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে তারা অবস্থানও নিয়ে ফেলেছে যাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ তারা আক্রমণ শুরু করতে পারে।

সেই দিন, সেই ভাষণে! সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা

এ বি এম মুসা

একটি ভাষণের জন্য একটি দিন ইতিহাসের স্থান করে নিয়েছে—এমন উদাহরণ দ্বিতীয়টি নেই। একটি মাত্র ভাষণ একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, স্বাধীনতার ঘোষণার স্মারক হয়ে রয়েছে এমন নজিরও নেই। অনেকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই ভাষণ তথা ঘোষণার তুলনা করে। আমি মনে করি দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে। একটি গৃহযুদ্ধের জয়ের পর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন গেটিসবার্গ নামক স্থানে। জায়গাটি বিখ্যাত হয়ে আছে সে ভাষণের জন্য, দিনটি বা সন-তারিখ কারও মনে পড়ে না। তাছাড়া ৭ মার্চ ছিল একটি সূচনা, গেটিসবার্গে লিংকন একটি জাতীয় সংকটের পরিসমাপ্তি টেনেছিলেন। অপরদিকে উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বেতার ভাষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানটির তুলনা চলে। চার্চিল বলেছিলেন যুদ্ধে জেতার কথা, শত্রুকে ঠেকানোর কথা; বলেছিলেন 'আমরা স্থলে, জলে, আকাশে, সমুদ্রতীরে যুদ্ধ করব।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য। চার্চিলের রেডিও ভাষণের দিন-তারিখ অনেকেরই মনে নেই। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে দিনটি, ৭ মার্চ ১৯৭১ ভাস্বর হয়ে আছে। শুধু ভাষণটির জন্য নয়, সেই দিনটি ছিল একটি প্রত্যাশার দিন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই দিনটিতে রেসকোর্স ময়দানে হাজির হয়েছিলেন একটি চাওয়া-পাওয়া নিয়ে, সেই চাওয়াটি ছিল 'স্বাধীনতা'। সে দিন মনে হচ্ছিল, স্বাধীনতা নামক সূর্যটি তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেই সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আকাশ থেকে লাফ দিয়ে পেড়ে আনবে।

৪০ বছর পর ভাবতে বসেছি, কী ছিল সেদিনের জনতার প্রত্যাশা, কী পেয়েছিল তারা? আগের দিন বত্রিশ নম্বর থেকে ফিরছিলাম, প্রেসক্লাবের সামনে

দেখা হয়ে গেল এয়ার মার্শাল আসগর খানের সঙ্গে। পাকিস্তান তাহরিকে ইশতিকাল পার্টির প্রধান আসগর খান আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিলেন, আইয়ুবের জুলুমের শিকারও হয়েছেন। তাকে নিয়ে প্রেসক্লাবের নিচতলায় লাউঞ্জে বসলাম। আমায় জিজ্ঞেস করলেন মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এলাম কিনা, কী কথাবার্তা হলো ইত্যাদি। আসল প্রশ্নটি করলেন, 'সবার শেষে' 'হোয়াট উইল মুজিব টেল দি ন্যাশন টুমরো, কালকে তিনি কী বলবেন? আসগর একা নন সারা দুনিয়া প্রহর গুনছিল 'টুমরো' আগামীকালের জন্য।

কালকে মানে পরদিন ৭ মার্চ, ১৯৭১; যে দিনটি অপেক্ষায় রয়েছে সবাই এক সপ্তাহ ধরে। ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশন বাতিল করার পর উত্তাল বাংলাদেশ এই দিনটির দিকে তাকিয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, একাত্তরের প্রথমদিকে আমি ঢাকায় বা দেশে ছিলাম না। জানুয়ারিতে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে জেফারসন ফেলোশিপ নিয়ে চলে গিয়েছিলাম কয়েক মাসের জন্য। যাওয়ার আগে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম একদিন সন্ধ্যায়। যাওয়ার কথা বলতেই কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন 'যাবে'? তা যাও, কিন্তু খবর দিলে চলে এসো।' চলে আসতে বলার কারণটি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখন অবজারভারে কর্মরত থাকলেও বিবিসি, লন্ডন টাইমস, ইকোনমিস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলাম। সেই সুবাদে বিদেশি মাধ্যমের সঙ্গে আমিই ছিলাম মুজিব ভাই ও মওলানা ভাসানীর প্রধান যোগসূত্র। এছাড়া বৈদেশিক প্রচার-প্রচারণা কৌশলনীতির ব্যাপারে মুজিব ভাই আমার পরামর্শ নিতেন। এ কারণেই মনে হয়েছিল হয়তো তিনি আমার তখন বিদেশ যাওয়াটা পছন্দ করেননি, প্রকাশ্যে আপত্তিও জানাননি।

তবে মুজিব ভাইয়ের কথা ঠিক রইল, ১মার্চ ফেলোশিপ শেষ না করেই চলে এলাম, কেন এলাম সে কাহিনী আপাতত অনুক্তই থেকে যাক। ফেরার পর সকাল-বিকাল বত্রিশ নম্বরে হাজিরা দিতে থাকলাম। ঢাকায় তখন বিদেশি সাংবাদিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। বিবিসির ব্রাউন ব্যারন, লন্ডন টাইমসের পিটার হেজেলহার্স্ট, নিউইয়র্ক টাইমসের হেনরি শেনবাগ, ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজের হেনরি ব্র্যাডশায়ার, টেলিগ্রাফের সাইমন ড্রিং-সব বিখ্যাত ডাকসাইটে আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা। এদেরই কেউ কেউ আমার সঙ্গে যেতেন খবর আদান-প্রদান যতটা না হতো তার চেয়ে বেশি হতো মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা, আড্ডা ও গল্পগুজব। এরই ফাঁকে আসল খবর বের করে নিতে হতো। স্থানীয় সাংবাদিকদের কেউ কেউ থাকতেন সেই আড্ডায়। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার, আতাউস সামাদ, মর্নিং নিউজের শহিদুল হক, অবজারভারের আবদুর রহিম প্রমুখ কারও কারও আলাদা বৈঠকও হতো।

বঙ্গবন্ধু সারা জীবন অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন, অনেক জনসভায় হাজার হাজার মানুষ সেসব শুনেছে, উদ্বেলিত হয়েছে তার বক্তব্যে। যখন তিনি সর্বজনমান্য

নেতার আসনে আসীন হননি তার রাজনৈতিক জীবনের আদিপর্বের কথা না হয় বাদই দিলাম। ৭ মার্চের ভাষণের চেয়ে অনেক বেশি আবেগাপ্লুত বক্তব্য দিয়েছেন তিনি পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসে '৭২-এর ১০ জানুয়ারি। এ রেসকোর্সের মাঠেই তিনি ছয় দফা ব্যাখ্যা করে একটি বিশ্লেষণধর্মী ভাষণ দিয়েছেন। ৭ মার্চের অব্যবহিত পূর্বে রেসকোর্সে তিনি আরেকটি বিশাল জনসভায় অগ্নিঝরা ভাষণ দিয়েছিলেন। সত্তরের নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ গণপরিষদ সদস্যদের হুঁশিয়ারি দিয়ে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তা ছিল অনেক বেশি কঠোর। অনেকের হয়তো মনে নেই, রেসকোর্সের লক্ষাধিক জনগণের সামনে নির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পড়িয়ে তিনি বলেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের শোষণের অবসান ঘটাবেন। ছয় দফার পুনরুক্তি করে এই রেসকোর্স মাঠেই তিনি ছয়টি সাদা কবুতর উড়িয়েছিলেন। সেদিনও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, স্বাধিকার আদায়ের মাঝেই নিহিত রয়েছে এই দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মুক্তির উপায়।

এসব জনসভায় বক্তৃতা আর ৭ মার্চের ভাষণে অনেক পার্থক্য রয়েছে। শুধু বক্তব্যের বিভিন্নতা অথবা প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে নয়। পার্থক্য বা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ ধরনের একটি ভাষণ একজন নেতা জীবনে একবারই দিয়ে থাকেন। বক্তৃতাটির চিরঞ্জীব হওয়ার মূলে রয়েছে অনেক বিশেষত্ব, কিন্তু আমার কাছে স্মরণীয় তাঁর বলার বিশেষ ভঙ্গিটি, জলদগম্ভীর বাচন, প্রতিটি শব্দের চয়ন, স্বরের ওঠানামা, সর্বোপরি আবেদন ও আহ্বানের গূঢ় মর্মার্থ। প্রথমে ৭ মার্চের ভাষণের পটভূমিটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও এটি তুলনাহীন বলা যেতে পারে আর কোনো বক্তৃতা নিয়ে সেটি শোনার আগেই এত আলোচনা বা স্পেকুলেশন তথা অগ্রিম গবেষণা ও অনুমান, এমনকি তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়নি। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কী বলবেন তা নিয়ে কত উৎকণ্ঠা, আগ্রহ—জনগণ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও আশা-নিরাশায় দোল খেয়েছে। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, পাকিস্তানি জান্তার জেনারেলরা, নেতা ও নীতিনির্ধারকরা নানা সংশয় নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন কী বলতে যাচ্ছেন। তবে মানুষ যে একটি মাত্র শব্দ শুনতে হাজির হয়েছে, শব্দটি যে 'স্বাধীনতা' সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। তদুপরি লাখ লাখ মানুষ অপেক্ষা করছে বঙ্গবন্ধু আর আসেন না, ৩টার জায়গা ৫টা বেজে গেল নেতা কোথায়? ৩২ নম্বরের খবরটি তাই অতি তাড়াতাড়ি চাউর হয়ে গেল। সকাল থেকে যে জল্পনা চলছিল ভাষণের বক্তব্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আরেকটি জনশ্রুতি। জঙ্গি ছাত্রনেতারা নাকি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে ঘেরাও করে বসে আছে। তাদের চাপের খবরও এলো, 'বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেই হবে'। সে খবর সত্য কি মিথ্যা ছিল, তা নিয়ে পরবর্তী সময়ে কেউ কিছু বলেননি।

এদিকে স্লোগানে স্লোগানে রেসকোর্স প্রকম্পিত। অবশেষে নেতা এলেন এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ পরিবৃত হয়ে তিনি মঞ্চে উঠলেন। তুমুল উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে ধীরলয়ে জননন্দিত নেতা তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। জনতা স্থির হয়ে শুনেছে, মাঝে মাঝে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো জনতা নেতাকে শুনছে, আস্তে আস্তে তিনি তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ইতিহাস বললেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করলেন, সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ দিলেন, পটভূমি ব্যাখ্যা করলেন, কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে উঁচু মার্গে উঠছে। বক্তব্যের শেষাংশে এসে 'যার যা আছে তা নিয়ে' প্রস্তুত হতে বললেন। 'যদি আমি হুকুম দেবার নাও পারি'—জনতা দোদুল্যমানচিত্তে শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, কী হুকুম ও কিসের হুকুমের কথা বলছেন? কেন হুকুম দিতে পারবেন না, কোথায় থাকবেন? অবশেষে ক্লাইমেক্সে এলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পরবর্তীকালে যারা বারবার এ অনবদ্য বাক্য দুটি শুনেছেন তারা শিহরিত হয়েছেন। যারা নিজ কানে তার মুখনিঃসৃত কথা দুটি শোনেননি তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় কী জাদু ছিল এই আহ্বানে! তবে জনতা যে দ্বিধান্বিত হয়েছিল একেবারে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি, এই বাক্য দুটি নিয়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন কিনা বুঝে উঠতে পারছিল না, এ সত্যটুকু অস্বীকার করা যায়নি। জনতা কি সেদিন নিরাশ হয়েছিল, সরাসরি স্বাধীনতার আহ্বান, যুদ্ধের ডাক শুনতে না পেয়ে আমার মনে হয়েছে শেখ সাহেবের কাছে তারা চাঁছাছোলা কথা শুনতে না অভ্যস্ত ছিল, তাই পুরোপুরি বুঝে উঠতে অসুবিধা হচ্ছিল। সেই সময়ে, সেই অবস্থায় বিরাজমান পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে যে এভাবেই সব বলতে হয়েছিল তা পরবর্তীকালে বিশ্লেষকদের প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন। শব্দের মারপ্যাঁচ ছিল কি-না এ নিয়ে মতবিরোধ আছে, তবে এ যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল তা আমদের রাজনৈতিক সচেতন জনগণ অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন। 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছিল' কিংবা 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি' তা হলে যা করতে হতো, নয় মাস ধরে তারা তা-ই করেছে।

অনেকের ব্যাখ্যা হচ্ছে—সেদিন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করার ডাক দিয়েছিলেন, এমনটিই তখন মনে হয়েছিল। ছয় দফাকে তিনি এক দফায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি যেন বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা তোমাদের দিতে পারছি না, কারণ স্বাধীনতা সহজপ্রাপ্য বস্তু নয়, একটি ঘোষণা দিলেই তা হাতের মুঠোয় ধরা দেয় না। অনেক রক্ত দিতে হবে, ঘরে ঘরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে, যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হবে।' এই ব্যাখ্যাটি আমায় দিয়েছিলেন বন্ধু হেনরি ব্র্যাডশায়ার।

ময়দান থেকে ফিরে প্রেসক্লাবে আসগর খানের সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন তিনিও এ কথাই বললেন। পশ্চিমা শাসকরা কী বুঝেছিল সেদিন? তারা কি স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলেছিল, না ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিয়ে ছক কেটেছিল? আসগর খান আমায় অনেকদিন পরে, নব্বই সালে যখন আবার ঢাকায় দেখা হয়েছিল, সেদিন স্মৃতিচারণ করার সময় বলেছিলেন, 'সেদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সবগুলো কামান রেসকোর্সের দিকে তাক করা ছিল, সবগুলো হেলিকপ্টারে বারুদ মজুদ করা হয়েছিল। যদি সত্যিই তা হয়েছিল তবে আরও ১৮দিন পরে একটি রাতে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি যদি কৌশলী না হতো হয়তো ২৫ মার্চের সূচনা সেদিন সেই ৭ মার্চে হতো। কিংবা আরেকটি জালিয়ানওয়ালাবাগ হতো ঢাকার রেসকোর্স ময়দান।

আমার স্নেহাস্পদ সাংবাদিক শামসুদ্দিনের মতে, ৭ মার্চের ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দের বিশ্লেষণ প্রয়োজন, একেকটি বাক্যের সূত্র ধরে একটি করে থিসিস লেখা যায়। এই বিশেষত্ব ধর্তব্যে না নিয়ে আমি ভাষণটির বিষয়বস্তুর চেয়ে এর সংবেদনশীলতা, এই সম্মোহনী শক্তির কথা শুধু ভাবি। এই বিশ্বে অতীতে বা বর্তমানে কোনো নেতার কিংবা কোনো ধর্মগুরুর কোনো বক্তৃতা কি তার দেশের জনগণ, তার ভক্তরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হাজার হাজার বার লক্ষবার এমনিভাবে আনুষ্ঠানিকতায়, অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে বারবার শুনছে? আমার মনে হয়, ৭ মার্চের ভাষণের এ অনন্যতাই এর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিশেষত্ব। শুধু একটি ভাষণ একটি দিনকে চিরঞ্জীব করে রেখেছে—এমন উদাহরণ ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও বঙ্গবন্ধু

কে এম সোবহান

যারা মনে করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি আকস্মিক ঘটনা এবং কোনো একজনের ঘোষণার ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং ঘোষণার কারণেই মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তা হলে তা হবে ঐতিহাসিক ঘটনার অস্বীকৃতি। এই অস্বীকৃতির পিছনে একটি সচেতন মন কাজ করছে অত্যন্ত সূচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে। উদ্দেশ্য একটাই ইতিহাস অস্বীকার করে একজনকে সামনে আনা—যার অতীত জীবন কেটেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে এবং সম্ভবত বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই কথাগুলোতে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশের সংবিধানের '৭৫-পূর্ব প্রস্তাবনার সঙ্গে ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২য় তফসিল বলে সন্নিবেশিত অংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

'৭৮ এর সংবিধান সংশোধনের পূর্বে প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদ বলা হয় আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

এই অনুচ্ছেদটি '৭৮-এ সংশোধনের পর বলা হলো, আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

এই সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে কথাগুলো পরিবর্তন করে বলা হলো জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে।

এখানে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম কথাগুলো বাদ দিয়ে '৪৭-এর আগস্ট মাস থেকেই অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টি প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের গণমানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম করেছে নিরলসভাবে যে আত্মত্যাগ করেছে, যে আন্দোলন করেছে সব কিছুকে অস্বীকার করা হয়েছে। '৪৭-এ বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ৪৮ ও '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র সংবিধানে পূর্ববাংলা শব্দের পরিবর্তে পূর্বপাকিস্তান লেখার প্রতিবাদ হিসেবে গণপরিষদে আওয়ামী লীগ সদস্যদের সংবিধানে স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃতি '৬২ ও '৬৪ তো ছাত্রদের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে রক্তদান, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ৭০-এর নির্বাচনে ১লা থেকে মার্চ থেকে ২৫ মার্চ অর্থাৎ গণহত্যার আগে পর্যন্ত জনগণ যে রক্তাক্ত আন্দোলন করছিল যাতে এক লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবননাশ হয়েছিল (পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দপ্তর, পাকিস্তান সরকার ৫ আগস্ট ১৯৭১) তাকে অস্বীকার করা হলো। এই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে সিদ্দিক সালেকের 'উটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায়। এই শ্বেতপত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান সরকার প্রকাশ করেছিল।

সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম-এর পরিবর্তে '৭৮-এর সংশোধনে বলা হচ্ছে যে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে বলা হয়েছে। এই পরিবর্তন সাধন করেন জে. জিয়া, তার মুক্তি সংগ্রামে কোনো ভূমিকা না থাকার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করার জন্য।'৭০-এর নির্বাচনকে বঙ্গবন্ধু তার ছয় দফার রেফারেন্ডম বলে প্রচার চালিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে রায় চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। এই নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে যায়। এর ফলে সংবিধান তৈরির জন্য যে সংসদ অধিবেশন ঢাকায় ৩ তারিখ ডাকা হয় তা জে. ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে স্থগিত করে দেন। এই ঘোষণার সাথে সাথেই সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ মিছিল করা হয় ১ মার্চেই। ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত যেসব ঘটনা এই অঞ্চলে ঘটলো তাতে এদেশে পাকিস্তান সরকারের শাসনকে অস্বীকার করা হলো। পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হলো এবং বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে তার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা দেবেন বলে জানালেন।

৭ মার্চে রেসকোর্সের ময়দানে দশ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা দিলেন, আর বাংলাদেশের জন্যে বাঙালি জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। তার বক্তৃতা রেসকোর্স ময়দান থেকে রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক সরাসরি প্রচারের কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার তা করতে দেননি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে ৮ মার্চ থেকে কী করতে হবে এবং

হবে না তার নির্দেশ দিলেন এবং বাংলার মানুষকে পূর্বপাকিস্তান সরকারকে কী করতে হবে তাও বললেন। তিনি বললেন, কোনো ট্যাক্স আদায় করা চলবে না। বাংলাদেশের সমস্ত সরকারি বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতসমূহ হরতাল চালিয়ে যাবে। এভাবে তিনি ১০টি করণীয় কর্তব্য জানালেন। সর্বশেষে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর আগে তিনি জনগণকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন।

৮ মার্চ থেকে ওই নির্দেশ মতো কাজ চলতে থাকে। অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশের ডিফ্যাক্টো প্রধানমন্ত্রী হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ সরকার তার আদেশেই কাজ করতে থাকেন।

৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে তাকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধের কথাও বলা হয়েছে। এই ভাষণই প্রকৃতপক্ষে ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ভাষণ। এখানে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় তার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে এবং কীভাবে ধাপে ধাপে এই সংগ্রাম এগিয়েছে তাও বলেছেন। সংবিধানে যে চারটি মূলমন্ত্র রাখা হয়েছিল তার কথাও এই ভাষণে ছিল। তিনি বললেন এই বাংলার হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আছে এর মধ্যে জাতীয়বাদের কথা আছে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। তিনি বলেছেন, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তিনি এই ভাষণে পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ববাংলা শব্দটি ব্যবহার করেননি, তিনি পরিষ্কার বলেছেন, বাংলাদেশ-এর কথা অর্থাৎ পাকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তান-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো এই ভাষণে। এতেই ঘোষণা দেয়া হলো একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে যার ভৌগোলিক সীমার পূর্ববর্তী নাম ছিল পূর্বপাকিস্তান, তাকে স্বাধীন করে বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়ের জন্য যুদ্ধের ডাক দিলেন বাঙালিকে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। এই ধারাবাহিকতায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ, ১৯৭১-এ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বাংলাদেশের আক্রমণ করার সাথে সাথেই।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ

এম এ ওয়াজেদ মিয়া

সে সময়ে শেখ হাসিনা ও আমি বঙ্গবন্ধুর বাসাতেই থাকতাম। বঙ্গবন্ধু আমাদের সবাইকে নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন ৬ মার্চে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ টেপ করে রাখি। ৬ মার্চ বিকেলে বঙ্গবন্ধু নিজেও একটি ট্রানজিস্টার নিয়ে শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকলেন। ভাষণে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের একগুঁয়েমির জন্য ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে, ১০ মার্চ ঢাকায় গোল টেবিল সম্মেলন আয়োজন করে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তিনি পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবেন। উপরন্তু ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় ২৫শে মার্চ নির্ধারণ করেন। ভাষণ শোনার পর বাড়ির সবাই নিশ্চুপ হয়ে যাই। ঘণ্টাখানেক পর বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ হানিফকে আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমেদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও ড. কামাল হোসেনকে জরুরি তাঁর বাসায় আসার জন্য সংবাদ দিতে বলেন। নেতৃবৃন্দের আসার পর বঙ্গবন্ধু তাদেরকে নিয়ে লাইব্রেরি রুমে প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেন। শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান ও আমি—এই তিনজন মিলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে ছাত্রদের মতামত তাঁদেরকে জানাই। আলোচনা শেষে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি ইশতেহার প্রদান করা হয়। উক্ত ইশতেহারটি ছিল ইংরেজিতে এবং তাজউদ্দিন আহমেদ এটি ড. কামাল হোসেনের সহায়তায় তৈরি

করেছিলেন। এর শেষাংশে বলা হয়েছিলো, "শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাস্তার রক্ত এখনো শুকোয়নি। শহীদের পবিত্র রক্ত পদদলিত করে ১০ই মার্চ তারিখে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ যোগদান করতে পারে না।"

৭ মার্চ সকালে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আওয়ামী লীগের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ছাত্র নেতৃবৃন্দর ভরে যায়। উপস্থিত সবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশে পরিণত করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমেদ ও ড. কামাল হোসেন সাহেবদের সঙ্গে লাইব্রেরি রুমে দ্বার রুদ্ধ করে আলাপে বসেন। সুদীর্ঘ আলোচনার পর লাইব্রেরি কক্ষ থেকে বসার ঘরে অপেক্ষারত আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং ঐদিন বিকেল সাড়ে চার ঘটিকায় রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিব্য সভায় দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করে একটি চার দফার ঘোষণা দেয়া হবে। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তৎমর্মে জনাব কামরুজ্জামান, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ড. কামাল হোসেনকে নির্দেশ দিয়ে গোসল ও দুপুরের আহারের জন্য বাড়ির ওপর তলায় চলে যান। আহার শেষে বঙ্গবন্ধু যখন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে সময় এক ফাঁকে এসে ড. কামাল হোসেন তাঁকে প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখিয়ে নেন। ততক্ষণে আওয়ামী লীগের অপর পাঁচ নেতা নিজ নিজ বাসায় দুপুরের আহারের জন্য চলে গিয়েছিলেন। ড. কামাল হোসেন উপরোল্লিখিত ঘোষণাপত্রটি টাইপ করিয়ে নেয়ার জন্য নীচে চলে গেলে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন আমি যেন ঐ ঘোষণাপত্রটির টাইপড্ (চূড়ান্ত) কপিটি সেটির অনুমোদিত মূল খসড়াটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। ঘোষণাপত্রের খসড়াটি বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহকারী মোহাম্মদ হানিফকে টাইপ করার নির্দেশ দিয়ে ড. কামাল হোসেন আহারের জন্য তাঁর বাসায় চলে যান।

বিকেল তিনটার দিকে প্রথমে আসেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং এর একটু পরেই ড. কামাল হোসেন। আমি তখন ঘোষণাপত্রটির চূড়ান্ত কপিটি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া কপিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম। এক পর্যায়ে খন্দকার মোশতাক কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ইশতেহারে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা। তিনি বলেন যে, সামরিক শাসনের ক্ষমতাবলে জারিকৃত আইনগত কাঠামো (Legal Framework Order-LFO)-এর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হয়ে ঢাকায় বসে পাকিস্তানের অখণ্ডতা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার ব্যাপারটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং এই ব্যাপারটা এই ইশতেহারে লেখা হয়নি।

আমি ঐ ইশতেহার পড়ে দেখলাম যে, তাতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর যে সমস্ত আলাপ হয়েছে এবং ১লা মার্চ হতে গনআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে এবং বিরাজমান পরিস্থিতি ও ছাত্র-জনতার দাবি উল্লেখপূর্বক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতা হিসেবে চারটি দাবি উপস্থাপিত করেছেন। উক্ত ইশতেহারে ইয়াহিয়া খানের নিকট দাবি করা হয় : (১) সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (২) ১লা মার্চ হতে আন্দোলনে যে সমস্ত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে তদন্ত করে সে ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে, (৩) সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং (৪) অবিলম্বে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

ঠিক এ সময়ই বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে আয়োজিত জনসভায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে আরও দশ-পনেরজন ছাত্র ও আওয়ামী লীগ নেতা প্রবেশ করেন। বঙ্গবন্ধু উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বলেন, "আমি সভামঞ্চে পৌঁছার পূর্বেই তোমরা সভামঞ্চের চারদিকে উপস্থিত দেশী-বিদেশি সাংবাদিকবৃন্দের মধ্যে এই ইশতেহারের কপি বিতরণ করবে।" এ কথা বলে তিনি দোতলায় চলে যান। প্রায় আধ ঘণ্টা পর সাড়ে চারটার দিকে বঙ্গবন্ধুর সভায় যাওয়ার জন্য আয়োজন করতে বলেন। হাসিনা, রেহানা, এ. টি. এম. সৈয়দ হোসেন সাহেবের বড় মেয়ে শেলী ও শেখ শহীদের বোন জেলী আমার গাড়িতে উঠে বলে যে, তাদেরকেও রেসকোর্সের জনসভায় নিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু একটি ট্রাকে ওঠেন। উক্ত ট্রাকে ছিলেন সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা, শেখ ফজলুল হক মণি, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সহ-সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, ডাকসুর প্রাক্তন সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, সিরাজুল আলম খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মোস্তফা মহসীন মন্টু, কামরুল আলম খসরু, মহিউদ্দিন, আ. স. ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজসহ আরো কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা আর একটি ট্রাকে ছিলেন। নিরাপত্তার জন্য গাজী গোলাম মোস্তফা ড্রাইভারকে ৩২ নম্বর সড়কের পশ্চিম দিক দিয়ে যেতে বলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুসারী অন্য যানগুলো চলে যাওয়ার পর আমি হাসিনা ও শ্যালিকাদের নিয়ে মিরপুর রোড দিয়ে যাত্রা করি। সি এস আইআর এর মোড়ে পৌঁছে সায়েন্স ল্যাবরেটরি রোড ও আশেপাশের রাস্তাগুলোয় রেসকোর্স অভিগামী ছাত্র-জনতার মিছিলে পরিপূর্ণ থাকায় নিউ মার্কেট, ইডেন কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে হাইকোর্ট

এলাকা ঘুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের কাছাকাছি যাই। সেখানে পৌঁছে দেখি রেসকোর্স লাখ রাখ লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রায় সবার হাতে লাঠিসোটা। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গন ছিলো রায়ট পুলিশে ভর্তি।

সেদিন রেসকোর্স ময়দানে নৌকা আকৃতির সভামঞ্চটি স্থাপন করা হয়েছিলো বর্তমান শিশুপার্কের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। হাসিনার অনুরোধে আমি বহু কষ্টে সভামঞ্চের কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে যাই। বঙ্গবন্ধু তখনো সভামঞ্চে এসে পৌঁছাননি। এর প্রায় পনের মিনিট পর বঙ্গবন্ধু সদলবলে সেখানে পৌঁছান এবং মঞ্চে উঠে সবাইকে অভিবাদন জানান। হাসিনা আমাকে বলে, "বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখেছে, আব্বার আজকের সম্পূর্ণ বক্তৃতা রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।" সে আমাকে গাড়ির রেডিও অন করতে বলে। রেডিওতে তখন বারবার এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিলো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেডিও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। যা হোক, বঙ্গবন্ধু প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করেন এবং শেষ প্রান্তে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ... এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা লাঠিসোটা ঠোকাঠুকি করে বিজয় উল্লাসে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা শ্লোগান দিলে উপস্থিত জনতা জয় বাংলা শ্লোগান তুলে প্রত্যুত্তর দেন। বঙ্গবন্ধু আবার জয় বাংলা বললে জনতা জয় বাংলা ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। খোদা হাফেজ বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। সভা শেষে আমি হাসিনা ও শ্যালিকাদের নিয়ে একই রাস্তার ৩২ নম্বরে ফিরে আসি। বঙ্গবন্ধু প্রায় আধ ঘণ্টা পর বহু লোকজনসহ বাসায় ফিরে আসেন।

সেদিন রাত ৮টার দিকে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকাস্থ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৩২ নম্বরের বাসায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন জনপ্রিয় বাংলা সংবাদ পাঠক ও ছাত্র ফেডারেশনের ইকবাল বাহার চৌধুরী। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে জানান যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন সত্ত্বেও ঢাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর হাই কমান্ডের নির্দেশে সেদিন বক্তৃতা সম্প্রচার করতে না দেয়ায় তাঁরা প্রতিবাদস্বরূপ ৭ই মার্চ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণ পুনঃপ্রচার করার অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত ঢাকাস্থ রেডিও পাকিস্তান কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ও অফিসে উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঐ রাত থেকে পরদিন রাত পর্যন্ত ঢাকাস্থ রেডিও পাকিস্তানের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। ৮ই মার্চ সকাল ৮টায় হঠাৎ পাকিস্তান রেডিও ঢাকা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা হুবহু সকাল ৯টায় প্রচার করা হবে। আমি ৯ তারিখ সকালে অফিসে যাওয়ার পথে গাড়ির রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সম্পূর্ণ শুনেছিলাম।

৭ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু, হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, রেহানা, রাসেল, শেখ শহীদ, শাশুড়ি ও আমাকে নিয়ে খাওয়ার সময় গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার যা বলার ছিলো আজকের জনসভায় তা প্রকাশ্যে বলে ফেলেছি। সরকার এখন আমাকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার বা হত্যা করতে পারে। সেজন্য আজ থেকে তোমরা প্রতিদিন দু'বেলা আমার সঙ্গে একত্রে খাবে।" সেদিন থেকে এ নিয়ম আমরা ২৫শে মার্চ দুপুর পর্যন্ত পালন করেছি। কেবল ২৫শে মার্চ রাতে ব্যতিক্রম ঘটে। সে রাতে বঙ্গবন্ধু রাত এগারোটা পর্যন্ত বাড়ির নীচতলায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, যুবলীগ ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ফলে শাশুড়ি বাদে আমরা সবাই খেয়ে নিয়েছিলাম।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকে তাঁর নির্দেশে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন। তারপর থেকে তিনি কার্যত গোটা পূর্ব পাকিস্তানের শাষণভার গ্রহণ করেন। ৮ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাসহ সকল শহর-গঞ্জে সরকারি অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ করে দেয়। কেবল অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানমূলক প্রতিষ্ঠান-ব্যাংক-বীমা, পানি-বিদ্যুৎ হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিকেল ক্লিনিক খোলা রাখা হয়। লক্ষণীয় ছিলো যে, জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করায় সরকারের পুলিশ বাহিনী ও EPR এর বাঙালি সদস্যবৃন্দের অনেকে পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক, প্রকৌশলী, আইনজীবী ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোকজন, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সংগঠন বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে জয় বাংলা ধ্বনি তুলে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করতে থাকেন।

বঙ্গবন্ধু, ৭ মার্চ এবং সেই সময়

রবিউল হুসাইন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং অবশেষে স্বাধীনতার ঘটনা আমাদের মননে বিশ্বাসে চিরকাল প্রজ্জ্বলিত থাকবে। ইতিহাসের সুদূরতম পর্যায়ে এদেশের জনগোষ্ঠী স্বাধীন-সার্বভৌমত্বের খানিক স্পর্শ মাত্রও লাভ করেনি, বরং সবসময় বিদেশি শক্তিশালী-শাসকদের দ্বারা বিভিন্নকালে শাসিত হয়েছে। কেউ এখানে ভাগ্যান্বেষণে এসে চিরকালের জন্যে আবাসিত হয়েছে, কেউ লুণ্ঠন শেষে আপন বাসে ফেরত গেছে। সব জেনে এই প্রমাণিত হয় যে, এদেশ বিদেশিদের জন্য শোষণের একটি আদর্শ উৎসস্থল হিসেবে আমাদের দুর্বলতার সুযোগ সেইসময় ব্যবহৃত ও বিবেচিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাজার বছর পর এদেশের স্বাধীনতা অর্জন সামন্তযুগে নয়, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় যুগে একটি বিশাল ঘটনা। এবং গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে যে-ঘটনা বা যারা যারা জড়িত, ব্যক্তি বা দেশ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে-সবকিছুই আমাদের বোধে ও চেতনায় অতি যত্নের সঙ্গে গচ্ছিত রাখতে হবে। এসবই আমদের দেশের অতিউজ্জ্বল বৈদূর্য-মণিময় গৌরবচিহ্নজাত অতি আনন্দময় ইতিহাস। এসব আমাদের চিরকালের বোধ এবং অহংকার। এই বোধ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ নিজেদেরকে নিজেদের গর্ব অপমানিত করা, দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হওয়া।

আজ স্বাধীনতার এই দিনে অনেক দুঃখ ও অনুতাপের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করি এই গৌরবময় ইতিহাসের পরম্পরা এবং ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করার কাহিনি এক সাজানো চক্রান্ত। ইতিহাসের গণনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর যোগ্যতম স্থানে এই কীটদুষ্ট কাল স্থাপিত করতে চায় না। যে-রণধ্বনি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছিল সেই 'জয়বাংলা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে মানুষের জিহ্বা ও কণ্ঠ ব্যবহৃত হয় না। কেউ কেউ কী নিদারুণ স্পর্ধা, পবিত্র জাতীয় পতাকা এবং

জাতীয় সংগীতকে পর্যন্ত অবমাননা করার দুঃসাহস দেখায়। ইতিহাসের অনিবার্যতা যারা অস্বীকার করার পরিক্রমায় নেমকহারামি করে যাচ্ছে অবলীলায় তারা আবার এই দেশে রাজনীতি করে, সংসদ সদস্য হওয়ার দ্বিমুখীত্ব হীনতাচক্রে অংশ নিয়ে থাকে। এদেশের আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; খাওয়া-শোয়া-সবই করে যাচ্ছে, অথচ এদেশের স্বাভাবিক ও অবধারিত পরম্পরাকে স্বীকার করে না। অদ্ভুত এবং বিচিত্র এই অসততা ও অনীতিবোধ। একশ্রেণির দেশাবাসীর মনোমধ্যে একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও ইতিহাসবোধের বেলায় যদি এইরকম উগ্রতা পরিলক্ষিত হয় তাহলে সেই দেশের কীভাবে উন্নতি ঘটবে। এ কারণে দেশের কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক ও সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়ে চলেছে এবং তাই এই দেশটিকে খুব দুঃখ নিয়ে একটি প্রতিবন্ধী দেশ বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হই। সাম্প্রতিক এই দুঃখময় ভাবনার নীলবিষে আজ আমাদের অন্তর বিপর্যস্ত।

তবে আশার কথা, কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ইতিহাস চলে না। ইতিহাস নদীর মতো আপন মনে বয়ে যায়, বাজপাখির মতো অবধারিত নির্দিষ্টতায় ও প্রাকৃতিকতায় সত্যকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, বিষফোঁড়ার মতো সত্য একদিন ছিঁড়ে-ফুঁড়ে-ঠেলে উঠে আসে বেদনায়-স্বস্তিতে। এই স্বাভাবিকতাই আমাদের বিশ্বাস, ভরসা এবং যথার্থ বরাভয়।

যে কোনো জাতির কতকগুলো অর্জিত সূচকচিহ্ন থাকে যা সর্বদা উজ্জ্বল উৎসের সন্ধান দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য থেকে সেইসব চিহ্নমালা পরিচিহ্নত হয়ে থাকে, তা ব্যক্তিই হোক কিংবা ঘটনাবলিই হোক। আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সময়েও ওইসব চিহ্নাবলি অর্জিত হয়েছে এবং সেগুলোকে সঙ্কটে-বেদনায় সবার দ্বারা সবসময় আঁকড়ে ধরে থাকা প্রয়োজন। তা না হলে কিসের ভিত্তিতে এবং কোন মনোবলে সত্তা অটুট থাকবে। সেই নূন্যতম সূচক চিহ্নগুলোকে প্রতিটি দেশবাসীর জাতি-ধর্ম-শ্রেণি-গোষ্ঠী-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-দলবল নির্বিশেষ মনেপ্রাণে অবশ্য মান্য করা দরকার। একটি দেশের মধ্যে বাস করি অথচ এর ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা এবং নির্দিষ্ট উপাদানকে স্বীকার করবো না, তা তো হয় না। তা হলে তো সেই দেশের অস্তিত্বই থাকে না। এইখানে একটি যথার্থ প্রশ্ন আসে এবং সেটি হচ্ছে এই যে, এই বৈরী বোধ কেন একটি দেশের জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হলো।

কারা দায়ী এর জন্যে। ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেই ভুল-ভ্রান্তি খুঁজে বের করা দরকার এবং যারা এর জন্য দায়ী তাদেরও ইতিহাসের স্বচ্ছতা প্রমাণিত করার খাতিরে বর্তমান ও নতুন প্রজন্মকে এর ফলাফল জানানোর দায়িত্ব নেয়া প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে কেউ কোনোদিন আবার ভুল পথে চলতে না পারে। অবশ্যই তদানিন্তন শাসকগোষ্ঠীর সত্যের খাতিরে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করা আজ সময়ের ডাকে আশু প্রয়োজন। যদি ভুল হয়ে থাকে তবে তা স্বীকার করে তাদের মহত্ব প্রমাণ করা দরকার যাতে এটি একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে

দেশাবাসীর কাছে। তারা তখন দেশাবাসীকে সঠিকপথে পরিচালিত করে একটি সুনির্দিষ্ট দেশপ্রেম এবং দর্শনে চালিত করতে পারেননি এইটি স্বীকার করলেই বরং তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায় ও বুঝতে পারা যায় যে, তারা এই বিষয়ে সচেতন ও সজাগ। এই বিষয়ে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর কারো দ্বিধান্বিত প্রশ্ন থাকবে না। তবে এটাও ঠিক যে তদানিন্তন শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ইতিহাস-বিরোধিতার এমন আচরণও অচিন্ত্যনীয়। কীভাবে এবং কেন তারা দেশের প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে এমন আত্মঘাতী আচরণ করেন। এসব করে তারা যে ফায়দা অর্জন করতে চান, তা হয়ে ওঠে ক্ষণস্থায়ী যা কোনোদিন বৃহত্তর কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারে না এবং তা বুমেরাং হয়ে আবারো সেই যথাস্থানে ফিরে আসে, একথা প্রমাণিত হয়েছে। এইজন্য তাদেরও নতুনভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। একটি দেশে শুধু একটি মতবাদ বা দল থাকবে তা তো কারো কাম্য হতে পারে না। অবশ্যই শাসকগোষ্ঠীর বিপরীতে একটি বা ততোধিক শক্তিশালী বিরোধী দল থাকবে এবং তা সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্যে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তবে তা হতে হবে অবশ্যই দেশের ইতিহাস, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা অনুসারী। এইটিই একটি দেশের জন্যে ঐতহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা কিছু কিছু মানুষের জন্যে একধরনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা ঘোষণার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তার রাজনৈতিক জীবনের চূড়ান্তবিন্দু প্রকৃতপক্ষে সেই দিনই। তার কর্মময় সঙ্কটাকীর্ণ আপসহীন অসমসাহসী রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে নির্মিত অন্তর্দৃষ্টির কারণে ওইরকম একটি সুদূরপ্রসারী তেজোদীপ্ত এবং কৌশলগত ভাষণ দেয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু কোনো বিদ্রোহ করতে চাননি। তিনি বিদ্রোহী বা বিপ্লবী ছিলেন না যাতে করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চার এক নিবেদিত প্রাণ অনুসারী। সেই ১৯৪৭ সালের আগে থেকে ধাপে ধাপে ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬. ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও সর্বশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি-সর্বক্ষেত্রে শীর্ষবিন্দুর শীর্ষব্যক্তিত্ব হিসেবে অমোঘ সময় প্রবাহই তাকে নির্বাচিত করেছিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ইতিহাসের এমনই নিরপেক্ষ শক্তি। এসব থেকে কারো দ্বারা বিচ্যুতি ঘটানো অসম্ভব। দেশের আপামর জনাসাধারণ এবং রাজনৈতিক পথপরিক্রমায় বিভিন্ন জননেতার অবদান বঙ্গবন্ধুর সেই বেগবান রাজনৈতিক স্রোতকে আরো পরিপুষ্ট করে তুলে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে মাত্র, যেখানে তিনি হয়ে উঠছিলেন অপরিহার্য এবং বিশ্বস্ত। সেই আসনের কেউ কোনোদিন বিকল্প হতে পারে না—এই কথাটি সবারই স্বীকার করা ইতিহাসের খাতিরেই আজ বড্ড প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর ৭

মার্চের ভাষণটি এমনই একটি প্রকৃতিনির্ভর দেববাণীসুলভ ভাষণ যেটির দ্বারা তদানিন্তন পাকিস্তানি শাসকবর্গও তাদের বিরুদ্ধে তেমন অনিষ্টকর কিছু খুঁজে পায়নি। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদের ডাক দেননি। গণতান্ত্রিক উপায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তিনি শুধু সংগ্রামের এবং স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছেন। এটিই তার রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কৌশল ও প্রজ্ঞা যার দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। এটি না করে তিনি যদি সরাসরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ডাক দিতেন তাহলে তার রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি হতো বলে ধারণা করি এবং পাকিস্তানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি একটি সুদূরতম প্রয়াস হিসেবে পরিগণিত হতো। এই দূরদর্শী নানান চাপের মুখে স্থির ও অবিচল ভাষণের অন্তর্নিহিত বাণী যেমন জনগণের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, তেমনি পাকিস্তানি প্রতিপক্ষও তাদের হঠকারী সিদ্ধান্ত যা এতোদিন ধরে আমাদের দেশের ওপর একে একে চাপিয়ে যাচ্ছিলো তার শেষ চেষ্টা বলবৎ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো এবং এইভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। সেইদিন ৭ মার্চে যদি সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদের ডাক দিতেন, তাহলে তিনি গণতান্ত্রিক গণনেতা না হয়ে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী-নেতা হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিগণিত হতেন। পাকিস্তানিদের পক্ষে খুব সঙ্গত কারণেই তখন বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ওপর নির্বিশেষে বোমা বর্ষণের মতো ঘটনা ৭ মার্চের রেসকোর্সের জনসভায় অংশগ্রহণকারী আপামর লক্ষ লক্ষ জনগণের ওপর যে পুনরাবৃত্তি ঘটতো না, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এছাড়া এদেশ হচ্ছে সমতল ভূমি, বনজঙ্গল বা পাহাড়-পর্বত ঘেরা নয় যে দীর্ঘদিনের জন্যে গেরিলাযুদ্ধ করে সুবিধা পাওয়া যেতো। এ সমস্ত কারণে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি এমনই এক নিজগুণে ভাস্বর এবং উজ্জ্বল যে যুদ্ধ শুরুর পর তিনি সহজেই চিন ও আমেরিকার সমর্থন ছাড়াই আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তিনি যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার কট্টর অনুসারি ছিলেন, এ কারণে তার পক্ষে এইরূপ সুদূরপ্রসারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

সম্ভবত বিংশ শতাব্দীতে শেষ পাদে বঙ্গবন্ধুর মতো অন্যকোনো দেশের অন্যকোনো জননেতা এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দান করেননি। এইজন্যে তাঁকে আন্তর্জাতিকভাবে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এবং এই জন্যে তাকে বাঙালি জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়, যার নীতি ও কৌশলে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সূর্য এই পোড়া ও অবহেলিত দেশে যুগযুগ পর উদিত হয়। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়াতে দেশের সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন কেউ শারীরিকভাবে, কেউ মানসিকভাবে। তবে তা উভয়ত সদা-সর্বদা সরাসরি ছিল। তা না হলে তাঁর

একার পক্ষে এটি করা সম্ভবপর ছিল না যা কখনো হয় না এবং পারা যায় না। খুব কম সংখ্যক মানুষ এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিল। তা না হলে এই জনযুদ্ধ কখনো সফলকাম হতো না। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেল, এককোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিল, ৩০ লাখ আত্মহুতি দিল, ৩ লাখ মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারালেন। কোটি কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, রাস্তা-ঘাট-সেতু-বাড়িঘর-দালানকোঠা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো-এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত এবং রাশিয়ার সরাসরি যুদ্ধাস্ত্রসহ সৈন্য ও তাদের জাতিসংঘে অকুণ্ঠ নিঃস্বার্থ আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন, মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা এবং যাবতীয় সাহায্য এবং সর্বোপরি এদেশের মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধাদের বীরোচিত ভূমিকার মাধ্যমে এই দেশ বাংলাদেশ নামে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এখন এদের মধ্যে অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কায়দা আর ফায়দা লুটবার জন্যে কেউ কেউ যদি উচ্চাভিলাষী হয়ে ইতিহাসের চাকা অন্যদিকে ঘুরাতে চান, তাহলে সেটা দেশের জন্যে, তেমনি তাদের নিজেদের জন্যেই, অমঙ্গল হয়ে দেখা দেবে, হয়তো এতে সাময়িক প্রাপ্তি ও লাভ ঘটাতে পারে, কিন্তু কখনো তা স্থায়ী হবার নয়। তদানীন্তন সময়ে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এবং সেটি জনগণের কাছে প্রাণসঞ্চারী হয়ে দেখা দিয়েছিল, খুব ভালো কথা, কিন্তু তাই বলে বঙ্গবন্ধু যাঁর জন্যে এই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে উপস্থাপিত হলো, তাঁর সঙ্গে, প্রতিপক্ষে বা বিপরীতে কিংবা পাশাপাশি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে দাঁড় করানো—এ কী ধরনের হীনতম প্রয়াস। এসবে কী তাদের রাজনীতি কালের বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এবং আশঙ্কা সৃষ্টির মুখোমুখি হচ্ছে না। এবং এসবে তো তাদের প্রতিপক্ষই দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে—এসব কী তারা ভেবে দেখছেন না। তাহলে বলা যায়, মেজর জিয়ার চেয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকির অবদান আরো উজ্জ্বল, যেহেতু তিনি জিয়ার মতো একজন সামরিক বাহিনীর সদস্য না হয়ে সম্পূর্ণরূপে একজন অসামরিক ব্যক্তি হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ কর্মকাণ্ড করে মানুষের মনে তার চেয়েও বেশি উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন, তাই বলে কি কাদের সিদ্দিকীকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ ভাবতে হবে? এইসব দেখে মনে হয় সেইদিন বেশি দূরে নয় যেদিন এইরকম মানসিকতার ছিন্ন-উৎসের মানুষেরা হয়তো একদিন হঠাৎ করে ইন্দিরা গান্ধীকে কেন্দ্র করে একটি নতুন রাজনৈতিক দল করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এইসব কারণে স্বাধীনতার এই দিনে প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনকে নূন্যতম জাতীয় দিকনির্দেশনায় এক হতে হবে দেশের সার্বিক উন্নতির খাতিরে। সেগুলো মাত্র চারটি জাতীয় বিষয়। ১. বঙ্গবন্ধুকে দেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকার করা,

যদিও নৃশংভাবে আমরা এই অকৃতজ্ঞ বাঙালিরা পরিবার-পরিজনসহ তাঁকে হত্যা করেছি সেই দায়ভারকে স্বীকার করে তার স্বীকৃতিতে কিছুটা এর লাঘব হতে পারে, ২. এদেশের জাতীয় পতাকাকে পবিত্র জ্ঞান করে মান্য করা, ৩. এদেশের জাতীয় সংগীতকে মনেপ্রাণে অনুধাবন করা এবং ৪. এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও জনগণকে নিজের মনে করা এবং আমরা জাতিতে বাঙালি আর নাগরিকত্বকে বাংলাদেশী এই সাধারণ ও সত্যিকার যুক্তিকে মেনে নেয়া। এই চারটি ন্যূনতম জাতীয় বিষয় মেনে নিয়ে যদি যে-কোনো রাজনৈতিক দল তাদের রাজনীতির চর্চা করে যায়, তা হলে এদেশ অহেতুক ইতিহাসের ধূম্রজাল সৃষ্টির এই পতিত সময়ে এক নতুন আলোর দিক-নির্দেশনা পেয়ে ভবিষ্যতের দিকে দিনদিন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। এইসব মেনে নিয়েও বিরোধীদল করা যায় এবং তা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি। আর যারা প্রকৃত ইতিহাস জেনেও না জানার ভান করে অসুস্থ রাজনীতির সাহায্যে সেটিকে অন্যদিকে ঘোরানোর অপচেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি আব্দুল হাকিমের কবিতা একটু বদলিয়ে বলতে চাই এইভাবে :

যে-সব বঙ্গেত জন্মি না মানে ইতিহাস
সে-সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন আভাস
দেশি কৃষ্টি-সংস্কৃতি যার মন ন জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন তারা বিদেশ ন যায়।

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং আমাদের উপলব্ধির তারতম্য

সন্তোষ গুপ্ত

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রায় ১০ লাখ লোকের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি ঐতিহাসিক ভাষণে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কথাটা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক পটভূমি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ৭০-এর নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বাঙালিদের হাতে যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না, তা ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই তা অনুমান করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে তার দেয়া ৬ দফা কর্মসূচি তৎকালীন প্রগতিশীল রাজনেতিক দলগুলোর অনেকেই গ্রহণ করেনি। এমনকি আওয়ামী লীগের একাংশও তার বিরোধিতা করেছিল। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েমের পরই মনে প্রাণে বাঙালি শেখ মুজিব বুঝেছিলেন যে, পাকিস্তানের আদর্শ ও কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাংস্কৃতিক ও মানসিক মুক্তি লাভ সম্ভব নয়, তাই ১৯৬১ সালে তিনি আইযুব বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনাকালে কমিউনিস্ট কমরেড মনি সিং ও খোকা রায়কে বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্র ইত্যাদি বোঝে না, এ জন্যে চাই স্বাধীনতা। কর্মসূচির মধ্যে স্বাধীনতার কথাটা থাকা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী ওই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না, তবে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তিনি এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। কমরেড মনি সিংও বলেন যে, স্বাধীনতার কথা বলার সময় এখনও আসেনি। শেখ মুজিব তখন বলেছিলেন, আমার নেতা না

বলেছেন, আপনারাও আপত্তি করছেন, তাই আপাতত এটা স্থগিত রাখলাম। তবে আমার এক দফা কর্মসূচি আমি ত্যাগ করছি না। এরপর ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা মিলে একটি স্বাধনি বাংলা পরিষদ গড়ে তোলেন। এ সব থেকে বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন, আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পর ১৯৫৩ সালে এসে বলেন যে, সময় হলে আমার দলটি অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে, তবে আমরা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দলের নামে যাই থাক না কেন আমাদের কাছে মুসলিম, খ্রিস্টান বা হিন্দু সব সমান। সকলের মুক্তির জন্যে আমাদের আন্দোলন, কোনো রাজনৈতিক দল পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার কথা ভাবেননি। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার স্থলে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রতিবাদ তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব গণপরিষদে দাঁড়িয়ে করেছিলেন। তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় ১৯৪৮ সালে গণপরিষদে বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যদের ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটির সমালোচনা করেছিলেন। তিনিই বলেছিলেন যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে মাস্টার দা সূর্য সেনের অবদানের কথা কেউ বলেন না এ দেশে। পাছে সমালোচিত হতে হয় এই ভয়ে কারণ সূর্য সেন একজন হিন্দু। এরকম আরও বহু বিষয় উল্লেখ করে দেখানো যায় যে, শেখ মুজিব বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় কতখানি উজ্জীবিত ছিলেন।

শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবি শুধু চাকরি ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য ও অবিচার এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকারের জন্যেই উত্থাপন করেননি। তিনি বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার বিরুদ্ধে ভাষা ও ভূতাত্ত্বিক ভিত্তিক আধুনিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যেও এই ৬ দফা দিয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার এবং তৎকালীন যে জন বুদ্ধিজীবী এবং তাদের মত আরও ৪৭ জন সংগীত শিল্পীর রবীন্দ্র বিরোধিতার জবাবে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আমরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবোই। ৬ দফার প্রথম দফাটি ছিল মূলত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে তথা দ্বিজাতি তত্ত্ব হল গণতন্ত্র বিরোধী। কারণ, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবাধের চর্চাও এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ জন্যেই ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ বলা হয়। সমগ্র জনগণের আহৃত অভিজ্ঞতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই তিনি বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্যে ধীরে ধীরে দেশবাসীকে প্রস্তুত করেছিলেন। পূর্ব বাংলার আর কোনো জাতীয় নেতা বা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল এভাবে দেশবাসীকে প্রস্তুত করার জন্যে কাজ করেননি।

সময়ে সময়ে কিছু তরুণ আদর্শ ও ত্যাগে দীক্ষা নিয়ে পূর্ব বাংলা স্বাধীন করার কথা ভেবেছে, পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণে ক্ষুব্ধ মওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে, এভাবে চললে আমরা

'আসলাম আলাইকুম' বলে নিজেদের পথে চলবো। কিন্তু তা স্বাধীন হওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নয়, কারণ তার পিছনে কোনো প্রস্তুতি এবং দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা ছিল না, ১৯৬৮ সালে চরমপন্থী সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ শিকদার স্বাধীনার কথা বলেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে পূর্ব বাংলাকে শোষণের কারণে। দলটি ছোট এবং সামর্থ্য কম বলে তাদের আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। তারা শ্রেণীশত্রু খতমের নামেই স্বাধনিতার আদর্শ গড়ে তুলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের ভূমিকাই স্পষ্ট করেছে যে, তাদের বিপ্লবের ভাষাটা ধার করা। বাংলাদেশের জনগণের কথা নেই। কিছু কিছু কথিত বাম বুদ্ধিজীবী তাদের বক্তব্য এভাবে হাজির করার সময় ১৯৬২ সালে গঠিত ছাত্রলীগে স্বাধীন বাংলা পরিষদ গঠনের তথ্যটা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান। তাদের গায়ে মধ্যবিত্ত এবং বুর্জোয়া লেবেল এঁটে। লক্ষ্য একটাই—প্রচ্ছন্ন শেখ মুজিব বিরোধিতা এবং মুক্তিযুদ্ধে তার নেতৃত্বকে অস্বীকার করা।

শেখ মুজিব ৫-এর দশকেই স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ নিয়ে আওয়ামী লীগকে নতুন করে সংগঠিত করেন দলে ব্যাপকসংখ্যক তরুণদের এনে, তারা এসেছে ছাত্রসমাজ থেকে, কলেকারখানার শ্রমিক থেকে, কৃষক পরিবারের সন্তানদের মধ্য থেকে। এভাবেই তরুণদের সমাবেশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগে, তাই যখন তিনি ৬ দফা কর্মসূচি দিলেন, আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাকে সমর্থন করে। প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতারা হয় বিরোধিতা করলেন, কিংবা নিষ্ক্রিয় রইলেন। কারণ যারা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান এনেছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতা ও কর্মীরা তাদের পক্ষে এ আচরণ ছিল স্বাভাবিক। চিন্তা ও চেতনায় অসাম্প্রদায়িক হলেও পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে শতাধিক স্বায়ত্তশাসন, তাই দেখা গেল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে আবুল মনসুর আহমদের মত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক যিনি মুক্ত বুদ্ধির পক্ষে ছিলেন এবং কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতা যার ছিল না, তিনিও স্বাধীন বাংলাদেশকে লাহোর প্রস্তাবের পুনঃবাস্তবায়ন হিসেবে বিবেচনা করতেন। পাকিস্তান আমলেই এক সময় তিনি আওয়ামী লীগ থেকে সরে দাঁড়ান। এই প্রজন্মগত ব্যবধান অনেকে বিবেচনায় রাখেন না। তরুণ ছাত্রসমাজ ব্যতীত যে সব নেতা ৬ দফা সমর্থন করতেন, তারা ছিলেন শেখ মুজিবের সমসাময়িক। যেমন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব কামরুজ্জামান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা।

পাকিস্তান সামরিক জান্তা যখন পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখে, তখন স্বতঃস্ফূর্ত জনতা রাজপথে নেমে আসে। তাদের পিছনে ছিল সংগঠিত

ছাত্রসমাজ অর্থাৎ ছাত্রলীগ, এরা শেখ মুজিবের হাতে গড়া, বাংলাদেশের সর্বত্র তৃণমূল পর্যন্ত ছিল আওয়ামী লীগের সংগঠন বিস্তৃত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৬৯ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সেমিনারে বলেন যে, এখন থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল প্রদেশ 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হবে। ১৯৬৯ সালে ১৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে বলেন, 'এক ইউনিট বাতিল করার পরেও পূর্ব বাঙলার নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' অব্যাহত থাকবে। এরই প্রেক্ষাপটে ৫ ডিসেম্বর '৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সংগঠন শক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ৬ দফা কর্মসূচি বাংলার জনগণের কর্মসূচিতে পরিণত হয়। এ জন্যে তাঁকে সইতে হয়েছে জেল জুলুম, তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়েছিল কিন্তু বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসক শ্রেণীর ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে তাঁকে মুক্ত করে। তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে। তাই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হওয়ার পর শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা বাংলাদেশ গর্জে উঠল। ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল ঢাকা হলেও দেশের আরও কয়েকটা শহরে জনগণ হরতাল পালন করে। ২ মার্চে আহূত ছাত্রলীগের পল্টনের জনসভায় ৫টি গৃহীত প্রস্তাবের ৫ম প্রস্তাবে বলা হয়, 'এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধনিতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওযার আহ্বান জানাইতেছে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনগণকে সুশৃঙ্খলভাবে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন। ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ আধা বেলা হরতাল পালন করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সামরিক জান্তা কার্ফ্যু দিয়ে এবং গুলি চালিয়ে বহু লোক হতাহত করে, ইয়াহিয়া খান নেতাদের গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন ১০ মার্চ। বঙ্গবন্ধু সঙ্গীনের ছায়ায় গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। সেনাবাহিনীর গুলিতে এবং তাদের সহযোগী অবাঙালিরা বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র হামলা অব্যাহত রাখে। ৭ই মার্চ রেসকোর্সের (বর্তমান সোহরাওযার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণ দিলেন। তিনি ১৮ মিনিট ভাষণের উপসংহারে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি জনগণকে আহ্বান জানালেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার। নির্দেশ দিলেন

কর্মীদের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশের সর্বত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। অসহযোগ আন্দোলন আরও দুর্বার গতি পেল। তার এই ভাষণ সম্পর্কে তৎকালে যারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ৭ই মার্চ শেখ মুজিব (তারা বঙ্গবন্ধু বলেন না, পাছে তাদের বিপ্লবী ঝাঁজ কমে যায়) স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন বলে আশা করেছিলেন, তাদের কেউ কেউ এমন কথাও বলতেন যে, শেখ মুজিব সংগ্রামী দেশবাসীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। না, তখন তারা প্রকাশ্যে এ কথা বলেননি কোনো জনসভা আহ্বান করে। তারা এ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাদের অধৈর্য্য তারুণ্য নিয়ে এবং দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে। তাই যখন ২৫ মার্চের কালো রাতে সামরিক জান্তা বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে। তথা এই তরুণরাই গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল স্রোতের সাথে হাত মিলিয়ে। তাদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন, অনেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে অকথ্য নির্যাতন সয়ে প্রাণ দিয়েছেন, তবুও সঙ্গীদের নাম প্রকাশ করেননি। আবার নিয়মিত সেনাবাহিনীর কোনো অফিসার কিংবা তৎকালীন ইপিআর-এর অফিসার ২৫ মার্চ হানাদার বাহিনীর সর্বাত্মক অভিযান শুরুর মুখে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর পেয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে। তাদেরও অনেকের মনে এ প্রশ্ন রয়ে গেছে, যদি বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন, তাহলে সেটাই সঠিক হত। তাদের যুক্তি হল তাহলে রেসকোর্সে জমায়েত দশ লাখ মানুষ ক্যান্টনমেন্ট দখল করে পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারত। হয়তো তাতে কয়েক হাজার মানুষ সেদিন নিহত হতো। কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী তার একটি বইতে এ ধরনের অভিমত পোষণ করেছেন।

বর্তমান রাজনীতি এবং সামরিক অভিযান সম্পর্কে যারা এ ধরনের যুক্তি দেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এ সম্পর্কে দুটো যুক্তি দেয়া চলে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, ইপিআর এবং পুলিশসহ সশস্ত্র ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং তাদের কথায়ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের প্রথম দিকে সাফল্য অর্জন করলেও একটি নিয়মিত, সুসংগঠিত দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় তা কখনই পর্যাপ্ত ছিল না, অবশ্য আমাদের সুবিধা ছিল এটাই যে, দেশের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের শেখ মুজিবের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। এ গেল সামরিক বিজ্ঞানে সাধারণ রীতিনীতির কথা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অস্ত্র সরবরাহ নিয়মিত ও পর্যাপ্ত করার মতো কোনো লজিস্টিক ব্যবস্থা ছিল না। অন্যান্য রসদ, খাদ্য ইত্যাদির সরবরাহ লাইন অক্ষুণ্ন রাখার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশের ভিতরে সংগ্রামকারী তৎকালীন ইপিআর এবং সেনাবাহিনীকে অল্প সময়ের মধ্যেই এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ভারী অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে অপ্রতুল অস্ত্রশস্ত্র ও হালকা অস্ত্রের সাহায্যে মোকাবেলার পরিণতিতেই আমাদের পক্ষে সংগ্রামকারী বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র বাহিনীকে এক

পর্যায়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এটা ৭ই মার্চ পিছিয়ে দিলে তেমন গুণগত পরিবর্তন হত না। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহল আওয়ামী লীগ একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হন, সেই অর্থে শেখ মুজিব সমগ্র পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিত্বকারী নেতা। তিনি যদি ৭ই মার্চ এককভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন, তাহলে সহজেই তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয়া হতো এবং বিশ্ব রাজনীতিতে পক্ষে কোনো শক্তি দাঁড়াতো না। ফলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত হতো। আর রক্তপাতের মাধ্যমে তা দমন করার পথে কোনো নৈতিক সমর্থন ছিল না। অপর পক্ষে চীন ও আমেরিকা আরও প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারতো। সামরিক জান্তা প্রথম আঘাত হেনে প্রমাণ করেছে যে, তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করে, গায়ের জোরে বাংলাদেশ দখলে রাখতে চায়। ঠিক একই কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তার হাতে তুলে দিলে তিনি সেটা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ নিয়ে এ কাজটি না করা তার বিরুদ্ধে পক্ষ নয়, পরবর্তী সময়ে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গ্রুপটি এ ধরনের সমালোচনা শেখ মুজিবের করেছে। এর পিছনে কাজ করেছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ, রাজনেতিক প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। বঙ্গবন্ধু সমগ্র পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা হিসেবে তাই কখনও পাকিস্তানি বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন প্রতিদিন জনগণকে আরও সংকল্পবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করেছেন তারা ইস্পাত দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সামরিক বাহিনীর গুলি ও কার্ফ্যুর মোকাবেলা করেছে। আত্মাহুতি দিয়েছে অসংখ্য মানুষ। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এভাবেই একটা নিরস্ত্র জাতিকে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করেছে। এ জন্যেই একজন বিদেশী রিপোর্টার তাঁকে আখ্যা দিয়েছে 'poet of politics' বলে।

তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ৯ মার্চ (১৯৭১) মওলানা ভাসানী (প্রচারপত্র) সূত্রে মওলানা ভাসানীর এক আহ্বানে বলা হয়েছে : 'আসুন, আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, 'জয় বাংলা' রব তুলে নিপীড়িত কোটি কোটি বাঙালির ভোট তথা সমর্থন নিয়ে সেই শক্তির বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ও সামরিক শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে যেন তেন প্রকারের একটা আপস ও সমঝোতার সরকার গঠনপূর্বক শোষিত বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিধাহীন ও দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্বার বানচাল করার যে চক্রান্ত মুষ্টিমেয় বাঙালি শোষক ও তাদের হোতরা করে চলেছে, সেই হীন ষড়যন্ত্রকে আমরা গত ২৭ বছরে দেখে আসছি। তারা এবং তাদের অনুসারী কিছু ব্যক্তি শেখ মুজিবের নামের আগে বঙ্গবন্ধু বলাতে আপত্তি করেন এবং ২৫ মার্চের গভীর রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে তার গ্রেফতারকে তারা আত্মসমর্পণ বলে আজও প্রচার করে আসছেন।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ তথা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে শেখ মুজিবের সংগ্রাম আর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে আন্দোলন বা অতীতে সময়ে সময়ে উচ্চারণ এক নয়। প্রথমটি বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক (অর্থাৎ আধুনিক জাতীয়তাভিত্তিক) এবং দ্বিতীয়টি হল দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে বাঙালিকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বানে এ জন্যেই বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তার 'মুক্তির সংগ্রাম' কথাটার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সংগ্রামের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ মূঢ়তা থেকে মুক্তির আহ্বানও। ইদানীং আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে প্রথম ব্যাখ্যাটাই দিয়ে আসছি। মূঢ়তা থেকে মুক্তির কথাটা জোর গলায় বলি না।

লক্ষ্য করার বিষয় মওলানা ভাষানী (প্রচারপত্র) সূত্রে উপরে যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেই প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।' এখানে পুনরায় স্মরণ করা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার নাম এখন থেকে 'বাংলাদেশ' ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন মওলানা ভাসানী এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান তাকে সমর্থন জানান। এদিকে সামরিক জান্তা ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে সামরিক অভিযানের নকশা সম্পূর্ণ করে এবং ১ মার্চ '৭১ তারিখ গণপরিষদের স্থগিতের ঘোষণা ছিল সেই চক্রান্ত এগিয়ে নেওয়ার কর্মসূচি। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের বেসামরিক শাসন চালাবার উদ্যোগ নিজে হাতে নেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন যদি আমাদের বক্তব্য, বিবৃতি, আমাদের আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশ প্রচারের উপর ভিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। সে নির্দেশ আপনারা অংঘন করুন। ৭ই মার্চের ভাষণ তাৎক্ষণিক প্রচার করতে না দেয়ার প্রতিবাদে বেতার ও টেলিভিশনের বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী সেদিন কাজ করেননি। সামরিক শাসক টিক্কা খানকেও শেখ মুজিবের নির্দেশে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান। বেচারাকে 'পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হওয়ার জন্যে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর সমগ্র বাংলাদেশের বেসামরিক শাসন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পালিত হয়েছিল। বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুত করার এই আয়োজন কেউ যদি স্বীকার না করেন কিংবা তাৎপর্য না বুঝেন, তবে কিছু বলার নেই। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও চালিকাশক্তি এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পগাঁথা।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ও সিরাজদ্দৌলা

হাশেম খান

ঠিক এমনিই একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল। রমনার মাঠে ১৯৭১ সালে ৭ মার্চে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র মাঠে ঢুকেছেন। মঞ্চে উঠছেন। এতোক্ষণ আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা বক্তৃতা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সারা মাঠ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। ইয়াহিয়া-তোমার ঘোষণা মানিনা, মানিনা। বাঙালির ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দাও-ফিরিয়ে দাও-ফিরিয়ে দাও। সেনাবাহিনী-ব্যারাকে ফিরে যাও। আমাদের দাবি ছয় দফা ছয় দফা-জয়বাংলা'। এমনি সব উচ্চারণে জনতা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে-কেউবা সঙ্গে আনা লাঠি, বৈঠা, পোস্টার, পতাকা ইত্যাদি শূন্যে বারবার তুলে ধরছে। সেই সময় আমি বাংলা একাডেমী সোজা সামনের দিকে রমনার মাঠে। একটু বাইরের দিকেই, মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। ঘোড়দৌড় মাঠের চারপাশের রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। সেই স্লোগান মুখরিত সময়টুকুতে হঠাৎ দেখি অদূরে ১৫-১৬ বছরের এক কিশোর সাধ্যমতো গলায় আওয়াজ তুলে একটু ভিন্নরকম স্লোগান দিচ্ছে। 'বাংলাদেশ-বাংলাদেশ স্বাধীন করো স্বাধীন করো। জয়-বাংলা।'

এ রকম স্লোগানে সেই মুহূর্তে একটু অবাক হলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তখনো শুরু হয়নি। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর আগে বাংলাদেশ স্বাধীন করো এমন কথা শোনা যেতো না। কেউ কেউ আলাপচারিতায় উচ্চারণ করলেও রাস্তায় সভাসমিতিতে, মিছিলে, স্লোগানে তখনো সরাসরিভাবে স্বাধীনতার কথা আসে নি। আমার কাছে ব্যাপারটা আরো বেশি অবাক

লেগেছে—ছেলেটিকে আমি চিনি এবং তার হাতে লম্বা সরু বাঁশের মাথায় যে দুটি পতাকা তার একটিতে 'জয়বাংলা' লেখা—সেটা আমারই হাতের লেখা।

১৯৭১-এর মার্চে আমি গোপীবাগে থাকি। ২৫নং গোপীবাগ তৃতীয় গলি। পাঁচ বছর ধরে এই বাড়িতেই বসবাস করছি। স্লোগান দেওয়া ছেলেটিকে গোপীবাগেই প্রথম দেখেছি। রামকৃষ্ণ মিশন রোডে 'রাশেদ মেডিকেল স্টোরে'। আমার বড়ো ভাই ডা. সুলেমান খান এই ওষুধের দোকানে বিকাল-সন্ধ্যায় চিকিৎসার কাজে বসতেন, এলাকার অনেক মানুষই তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসতেন। একদিন দেখি ছেলেটির পা ধুয়ে পরিষ্কার করে বেশ যত্ন নিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছেন ডা. সুলেমান খান। ছেলেটি আমাকে দেখে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে সালাম দিয়ে বলে—আপনে ছবি আঁকেন—ডাক্তার স্যারের ভাই, আপনারে চিনি।

ডা. সুলেমানের কাছ থেকেই ছেলেটার বিষয়ে পরে জানি। ছেলেটির নাম সিরাজ। বাবা-মা, ভাইবোনসহ কমলাপুর রেলস্টেশনের কাছে একটা বস্তিতে বাস করে। বাবা রিকশা ভাড়া করে চালায়। মাঝে মাঝে হাঁপানিতে অসুস্থ হয়ে পড়লে সিরাজই রিকশা চালায়। তার বাবাকে নিয়েই ওষুধের জন্য ডাক্তারের কাছে এসেছিল। সেই থেকেই পরিচয়। সিরাজ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। অভাবের তাড়নায় পড়া বাদ দিয়ে বাবার কাজে সাহায্য করে। ডাক্তার সুলেমান আরো জানান—ছেলেটি বেশ মেধাবী, দেশের ও রাজনীতির অনেক খবর রাখে। পাক সামরিক শাসনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ঠকছে, বঞ্চিত হচ্ছে, চাকরি বাকরি পাচ্ছে না—এসব খবর সিরাজ জানে। সত্তরের নির্বাচনের সময় এই অল্প বয়সেও সে বড়দের মতো কাজ করেছে। আওয়ামী লীগে যাতে সবাই ভোট দেয় সে জন্য নিজের বস্তিতে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছে। মিটিঙে-মিছিলে স্লোগান দেওয়ায় তার ক্লান্তি নেই। সে পোস্টার লিখতে পারে।

গোপীবাগে কাঁচাবাজারে বা কখনো রাস্তায় সিরাজের সঙ্গে আমার প্রায়শ দেখা হয়। তার রিকশায় যাত্রী না থাকলে আমাকে দেখতে পেলেই সে রিকশায় তুলে নিতো। নানারকম খবরাখবর জানতে চাইতো। রাজনীতির খবর, সংগ্রামের খবর, মিটিং-মিছিল, হরতালের কথা জানতে চাইতো। নিজে কোথায় কোথায় কী দেখেছে জানাতো। সুযোগ পেলেই সে ডাক্তার সুলেমানের চেম্বারে গিয়ে বসে থাকতো। ডাক্তারের টুকটাক কাজ করে দিতো। ডা. সুলেমান খান রাজনীতির লোক ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। তার কাছে প্রায়শ অনেক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর আগমন ঘটতো। সিরাজ তন্ময় হয়ে তাদের আলাপ-আলোচনা শুনতো। সেসব আলোচনার যেগুলো বুঝতে পারতো না আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইতো-বুঝতে চাইতো।

একদিন বললো-স্যার আমার নামডা একটু পাল্টাইয়া রাখছি। বাবা-মারে কইছি আমার নাম এখন থিকা সিরাজদ্দৌলা। আমারে আর সিরাজ ডাইকো না।

আমি শুনতে থাকি সিরাজের কথা। একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করে—কিছু যে বললেন না স্যার।

—তুই বল, কেন তোর নাম সিরাজ থেকে সিরাজদ্দৌলা?

—স্বাধীন বাংলার নবাব আছিল সিরাজদ্দৌলা। ইংরেজগো লগে যুদ্ধ করছিল—শহীদ হইয়া গেছে।

স্বাধীনতা রাখতে পারে নাই। কিন্তুক খুব যুদ্ধ করছিল। আমিও দেশের জন্য যুদ্ধ করমু স্যার—যুদ্ধ ছাড়া আমাগো দেশ স্বাধীন অইবো না। দেশ স্বাধীন করতে অইলে পাকসৈন্যগো লগে যুদ্ধ করতো অইবো।

সেদিন ছিল ৪ মার্চ ১৯৭১।

১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা শুনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বাঙালিরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ভোটে জিতলেও পশ্চিম পাকিস্তানি ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব বাঙালির হাতে ক্ষমতা ছাড়বে না। ন্যায্য অধিকার তারা দেবে না।

সিরাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বায়তুল মোকাররমে। রিকশায় তুলে নিলো। গোপীবাগে বাসায় পৌঁছে দিতে দিতে তার কথাগুলো শুনে বিস্ময়ে আমি অভিভূত। বস্তিবাসী এক কিশোর রাজনীতিতে কতো সচেতন। দেশের প্রতি মমত্ববোধ অভাব-অনটনেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সিরাজ সে আন্দোলনে এক যোদ্ধা।

৭ মার্চ সকাল বেলা সিরাজদ্দৌলা আমার বাসায় হাজির। খুবই ব্যস্ত যেন সে। বললো স্যার, 'শক্ত কাগজ দিয়া একটা নিশান বানাইছি। আমার নিশানডায় বড়ো কইরা লেইখা দেন—জয়বাংলা, নিচে লেখেন ইয়াহিয়া তোমার কথা মানি না।'

ইতোমধ্যে সিরাজ ওরফে সিরাজদ্দৌলাকে আমরা পছন্দ করে ফেলেছি। সে আমাদেরই কাছের লোক। তাই তার আবদারটুকু সঙ্গে সঙ্গে পালন করি। বোর্ড কাগজের পতাকায় লিখে দিই জয়বাংলা, নিচে ইয়াহিয়া তোমার কথা মানি না।

সিরাজকে জিজ্ঞাস করে জানতে পারি এই পতাকা নিয়ে সে আজ রমনার মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনতে যাবে। বস্তিবাসীদের নিয়ে মিছিল করে যাবে। বেশ আস্থার সঙ্গেই বললো—'দেইখেন স্যার বঙ্গবন্ধু আজ স্বাধীনতা ঘোষণা কইরা দিবো।'

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ঠিক আগের মুহূর্তে রমনার মাঠে সকাল বেলার সেই নিশানটি দেখে আমি বিস্মিত। আমার লেখা 'জয়বাংলা' কথাটা ঠিক থাকলেও নিচের লেখাটা পাল্টে সে লিখে দিয়েছে-বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর সিরাজদ্দৌলার পতাকার লেখাটা আমাকে আরো ভাবিয়ে তুললো। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল 'বাঙালির মুক্তির অবিসংবাদিত নেতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনেতিক মেধা নিঃসৃত বাঙালির ২৩ বছরের সংগ্রাম শেষে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার শেষ ও সঠিক নির্দেশনা—'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

৭ মার্চ রমনার মাঠে পৌঁছে লাখ লাখ জনতা তথা সিরাজ ওরফে সিরাজদ্দৌলাদের মনের কথা, স্বাধীনতার জন্য আকুলতা—বঙ্গবন্ধু ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর তাই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মূল প্রতিপাদ্যই ছিল—স্বাধীনতার ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘোষণা।

০৩.০৩.২০০৫

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ছাত্র ইউনিয়ন

নূরুল ইসলাম নাহিদ

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির হাজার বছরের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের প্রজন্মের সৌভাগ্য যে, আমরা তখন ছিলাম তরুণ। তাই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিলাম। আমাদের দেশের তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমার আরেক সৌভাগ্য যে, আমি সেই ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম। সেজন্যেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করা এবং সক্রিয় অবদান রাখার সুযোগ হয়েছিল আমার।

তখন প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠন ছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। আমি ছাত্র ইউনিয়নের তখন সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। আমি মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেছিলাম। মার্চ মাস আমাদের জাতির জীবনে সবচেয়ে ঘটনাবহুল মাস। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছিল কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান শাষকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দেয়ার, এমনকি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে না ডাকার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এই ইস্যুতেই দেশে তখন চরম উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে এদেশের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার জন্যে বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ন্যাপের (ওয়ালি-মোজাফফর) নেতারা ঢাকায় এসেছেন। '৭১-এর ১লা মার্চ নিউমার্কেটের হকার্স মার্কেটের দোতলায় ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা চলছিল। আমরা ছিলাম মধুর

ক্যান্টিনে। দুপুর সাড়ে ১২টায় আমরা তিনজন; আমি, শামসুদ্দোহা ও 'সাংবাদিক'-এর বর্তমান সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত। সেখানে অবস্থান করা কালীন দুপুর ১টায় রেডিও পাকিস্তানের খবর শুনলাম। ঘোষণা করা হলো—জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। আর এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পরিস্থিতি আর স্বাভাবিক গতিতে চলবে না।

খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এর প্রতিবাদ মিছিল বের করার পরিকল্পনা নিয়ে ন্যাপ অফিস থেকে রওনা হলাম। জহুরুল হক হলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে হলে আর পৌঁছতে হয়নি। দেখলাম, রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকজন নেমে এসে স্লোগান দিচ্ছে। 'পাকিস্তানে লাথি মার, স্বাধীন বাংলা কায়েম কর'। শুরু হলো মিছিল-মিটিং। সবদিক থেকে মিছিল এলো পল্টন ময়দানে। মিটিং হলো, বক্তৃতা হলো। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। সমগ্র জাতির দৃষ্টি তখন বঙ্গবন্ধুর দিকে, তিনি কী ঘোষণা দেন? বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৭ই মার্চ জনসভাসহ কর্মসূচি ঘোষণা করলেন।

এই পটভূমিতে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। সে জনসভায় আমিও ছিলাম। ভাষণের আগে যেমন বঙ্গবন্ধু কী ঘোষণা দেন তা শোনার জন্যে অধীর আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিলাম, তেমনি বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ছিল জাতির মনের কথা ও প্রতিধ্বনি। তাঁর ভাষণের সাথে সমস্ত জনসভা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। একেকটি বাক্য শেষ, সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি। তিনি যখন ঘোষণা করলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন গোটা জাতিই তাঁর এই ঘোষণাকে প্রকৃতপক্ষেই স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে নিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকেই সকল আন্দোলন সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল ঠিক। তবে '৭১-এর মার্চ মাস ছিল চূড়ান্ত ও বাস্তব প্রস্তুতিপর্ব। পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে—বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে আমরা দিকনির্দেশনা পেয়েছিলাম। রাজনৈতিক ও মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্যে চূড়ান্ত প্রস্তুত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সশস্ত্রভাবে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি তখনো ছিল না। যার জন্যে তখন আমাদের দৃষ্টি বেশি করে দিতে হয়েছিল সেই ধরনের প্রস্তুতির দিকে।

স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে যে সকল তৎপরতা চালানো হয়েছিল আমি তার কিছু দিক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। একথা এখানে বলারই প্রয়োজন নেই যে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সবসময়, সকল আন্দোলনে ঐক্য ও সমঝোতা ছিল আমাদের ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা তখন পৃথক পৃথক ভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেও

দু'সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে ছিল গভীর যোগাযোগ ও সহযোগিতা। আর সবার ওপর ছিল বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনা ও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তবে ছাত্র ইউনিয়নের এসকল তৎপরতায় পেছন থেকে আরো যিনি ভূমিকা ও অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন প্রয়াত কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ। তৎকালীন পরিবেশে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে ছাত্র সমাজের সঙ্গে জনগণের মানসিক ও বাস্তব সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যেও কর্মসূচি গ্রহণ করি। ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায় সমস্ত নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে জনগণের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ সমাজকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া শুরু করি।

এ কথা সত্য যে, তখন আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে ছাত্রদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, যা আজকের প্রেক্ষাপটে অবাস্তবই মনে হবে। তাই ৭ই মার্চের পর থেকেই প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে কাঠের বন্দুক দিয়ে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন ছাত্র ও বর্তমান বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আবুল কাশেম মিয়া ছিলেন তার প্রশিক্ষক। প্রতিদিন সকালে ২ ঘণ্টা করে এই প্রশিক্ষণ চলতো। প্রায় ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতো। তবে এই প্রশিক্ষণ দেখার জন্যে হাজার হাজার মানুষ মাঠের চারপাশে এসে ভিড় করতেন। সেই সময়ে এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রভাব আজকের দিনে উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। মার্চ মাসের ২০ তারিখের দিকে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে রাজধানী ঢাকার রাজপথে আমরা রুট-মার্চও করেছিলাম। কাঁধে ছিল সেই কাঠের বন্দুক। এখানে বলে রাখা দরকার যে, ছাত্র ইউনিয়নের মতো ছাত্রলীগও একইভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। ওদের প্রশিক্ষণ চলতো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে।

এই প্রশিক্ষণ ও রুট-মার্চের সচিত্র প্রতিবেদন পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন ছাপা হতো। এর ফলে সমগ্র দেশে এর প্রভাব দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই প্রশিক্ষণকে অনুসরণ করে জেলা এমনকি থানা পর্যায়েও স্থানীয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। এর কারণেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় প্রভৃতি বিষয়গুলো সমগ্র জনগণের সামনে চলে এসেছিল।

তবে কাঠের বন্দুক দিয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সত্যিকার বন্দুক চালানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। 'আবু ভাই নামে প্রয়াত কমরেড ফরহাদের এক বন্ধু ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে ডেমরায় একটি এলাকায় সত্যিকার বন্দুক চালানোর প্রশিক্ষণ দিতেন। সেই আবু ভাইও আজ আর বেঁচে নেই।

৭ই মার্চের পর এমন উন্মুক্ত প্রশিক্ষণ ও রুট-মার্চ সম্ভব হয়েছিল কারণ তখন বাংলাদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতোই

সবকিছু পরিচালিত হতো। পাকিস্তানি শাসকদের বাস্তবে কোনো কর্তৃত্বই তখন এদেশে ছিল না।

দেশের সাধারণ মানুষকে এই প্রস্তুতিসহ সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে প্রতিদিন সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ হতো। লক্ষণীয় বিষয় ছিল, প্রতিদিনের এই সমাবেশে বিরাট জনসমাগম হতো। সেখানে আমরা বলতাম-আমাদের এখন কী করণীয়, পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে হামলা হলে কী করা উচিত, দেশে কী হচ্ছে ইত্যাদি সবকিছুই। অর্থাৎ ৭ই মার্চের পর থেকে সকালে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের পর ১১টায় সমাবেশ ও বিকেলে পাড়ায় পাড়ায় যোগাযোগ, সমাবেশ ও তরুণদের সংগঠিত করা এগুলো ছিল নিয়মিত কাজ।

ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ মূলত সাংগঠনিকভাবে অনেক আগে থেকেই স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতি চালিয়ে আসছিল। '৭১-এর জানুয়ারি মাসে ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ডেকে ঘোষণাপত্র পরিবর্তন করেছিল। সেই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল : 'আমরা প্রত্যেকটি প্রদেশের স্বাধীন হবার অধিকারসহ স্বায়ত্তশাসন চাই'। এরপর ২১ শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি সমাবেশ হয়েছিল। বর্তমান 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত তখন ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এখানে আরো একটি বিষয় উলেখ করা দরকার যে, ওই ফেব্রুয়ারি মাসেই চেকগ্লোভাকিয়ার ব্রাতিসলাভায় আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। আমি আমাদের দেশ থেকে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সেই কংগ্রেসে অংশ নিয়েছিলাম এবং ওই কংগ্রেসে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমার উদ্যোগেই সেই কংগ্রেসে বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ছাত্র সমাজের আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এর সুফলও পরবর্তীতে আমরা পেয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর প্রায় সাথে সাথেই বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন দিয়েছিল। ২৫ মার্চের আগে ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা এবং বিরাজমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার আর কোনোই বিকল্প নেই। তখন এরকম একটা ধারণাও আমাদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যে কোনো সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী জনগণের ওপর হামলা করতে পারে। এই হামলা হলে আমরা যাতে প্রতিরোধ করতে পারি তারও একটা চেষ্টা আমাদের ছিল। মধুর ক্যান্টিনের পেছনে গোপনে আমরা বোমা তৈরি শুরু করলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই বোমা দিয়ে কালভার্ট উড়িয়ে দেব, যাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চলাচল করতে না পারে। ইটের স্তূপের মধ্যে বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষাও করা হলো। সেই বোমার বিস্ফোরণে আমাদের বুক আশায় ভরে উঠলো,

যদিও বাস্তবে এটা ছিল খুবই নগণ্য, কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা সেই পরিস্থিতি আমাদের আবেগাপপ্লুত করে তুলেছিল। সবশেষে বলবো, '৭১-এর ১লা মার্চ থেকেই স্বাধীনতার পক্ষে সমগ্র জাতির যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল তারই প্রতিধ্বনি তুলে ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থে এটাই ছিল আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা। তাঁর সেই ঘোষণা ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেই পরবর্তীতে প্রতিদিন চলেছে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি।

সেই ৭ মার্চ

মুনতাসীর মামুন

মার্চ এলেই স্বপ্নেরা হানা দেয়। আমরা বন্ধুরা প্রতিবছর এ মাসেই ১৯৭১-এর মার্চে ফিরে যাই। ১৯৭১-এর পর আমাদের বয়সের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো অনেকগুলি বছর। তরুণ যুবা পরিণত হয়েছি মধ্যবয়সীতে, কিন্তু মার্চ এলেই মনে হয়, ফিরে গেলাম। ১৯৭১-এর সেই মার্চে। মার্চ এলেই আমি স্মৃতি জাগরূক করতে চাই, যে স্মৃতিকে গত দু-দশক শাসকরা মুছে দিতে চেয়েছে। দুঃশাসনের মূল স্ট্র্যাটেজিই স্মৃতি মুছে দেয়া।

মার্চ আমাদের জন্য স্বপ্ন দেখারও মাস। এ মাসেই আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ জয়ের। আর এই মার্চের অনেক ঘটনাবলি থেকেই শক্তি আহরণের চেষ্টা করি বর্তমানকে খুঁজবার জন্য। স্মৃতি জাগরূক রাখি আর দেখি, বর্তমানের প্রতিবন্ধকতা কিছু নয়, আমরা এগুচ্ছি জয়ের দিকে।

১ মার্চ ১৯৭১। ঢাকা স্টেডিয়াম খেলা চলছে বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের। ক্রিকেট খেলা। স্টেডিয়াম প্রায় ভর্তি। চাপা টেনশন থাকলেও শহর শান্ত। বেলা একটার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার-ভাষণ দিলেন যার মূল কথা ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত। বেতার ভাষণটি শেষ হতে-না-হতেই পুরো শহরটি বদলে যেতে লাগল। যেন আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে শহর। 'ইত্তেফাক' থেকে আমরা কজন বেরিয়েছি রাস্তায়। এরি মধ্যে বেরিয়ে গেছে ছোট ছোট মিছিল; যাচ্ছে গুলিস্তান, পল্টন, পূর্বাণী হোটেলের সামনে। মিছিল আর স্লোগান : জয়বাংলা...তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা—জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা...

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পণ্ড। খেলোয়াড়রা দৌড়ে আশ্রয় নিয়েছে ড্রেসিংরুমে। স্টেডিয়ামের রাস্তায় হোটেল পূর্বাণীর সামনে লোকে-লোকারণ্য।

বিকাল তিনটায় সেখানে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক। বঙ্গবন্ধু ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত হতে বলে দুদিনের কর্মসূচি দিলেন আর বললেন, ৭ মার্চ হবে জনসভা। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্য দেবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির স্থপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার পর বলেছিলেন, '১মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন।'

১ থেকে ৭ মার্চ প্রতিদিন কিছু-না-কিছু ঘটতে থাকে ঢাকা শহরে, সারাদেশ। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-জনতার সামনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ আর গগণবিদারী স্লোগান : 'জয় বাংলা', জ...য়...বা...ং...লা'। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফ্যু। মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর রাস্তায় নেমে; মানুষ বলে, 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা' আর কার্ফ্যু ভাঙে; মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর গুলি খায়। আবারও বলে 'জয় বাংলা' আবার গুলি খায়। হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে আর গভীর রাতে শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল হতে আপনারাও রেহাই পাবেন না। ...সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবিলা করবেন না।'

একাত্তরের ৩ মার্চ, আগের রাতের শহীদদের নিয়ে মিছিল বের হয়। পল্টনে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন : 'গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান তাহলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করব।' 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে পল্টনের চারদিক।

শেখ মুজিব বললেন, 'বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয়, রাষ্ট্র চালানোর জন্য—গুলি খাওয়ার জন্য নয়। গরীব বাঙালির টাকায় কেনা বুলেটের ঘায়ে কাপুরুষের মতো গণহত্যার বদলে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন। ...২৩ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে আবার বুকের রক্ত দেব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বীর শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করব না।' বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, 'ভায়েরা আমার, আমি বলছি আমি থাকি আর না-থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন। তাঁরাই নেতৃত্ব দেবেন। আর যদি কেউ না থাকে, তবু আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি বাঙালিকে নেতা হয়ে নির্ভয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।' চারদিকে থেকে গগনবিদারী গর্জন শোনা যায় : 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা'।

রাতে সারাদেশের মানুষ কার্ফ্যু ভেঙে নেমে আসে রাস্তায় আর বলে 'জয় বাংলা', খালি বলে 'জয় বাংলা'। ৭৫ জন লাশ হয়ে পড়ে থাকে রাস্তায়, অগণিত মানুষ কাতরায় গুলি খেয়ে, তবুও বলে 'জয় বাংলা'।

৭ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধু চিৎকার করে বলছে, 'জয় বাংলা', আর বদলে পেয়েছে গুলি। আমরা ভাবছি কী বলবেন শেখ মুজিব? তিনি কি বলবেন বাংলাদেশ হয়ে গেছে স্বাধীন? কিন্তু বলার আর বাকি কী? বরং তিনি যদি না বলেন, তাঁকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে মানুষ। ইতোমধ্যে উত্তোলিত হয়েছে স্বাধীনবাংলার পতাকা আর বাংলাদেশ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে সেই গগণবিদারী আওয়াজে—'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা'।

ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, ৭ মার্চ শেখ মুজিব কী বলবেন তা ঠিক করার জন্য ৬ মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা। 'সারা দেশে প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল যে, ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত, ছাত্র ও যুবসমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে, ছাত্রসমাজ, যুবসম্প্রদায় এবং রাজনীতি-সচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।'

সুতরাং দল ও দলীয় নেতা শেখ মুজিবের ওপর দায়িত্ব এসে পড়েছিল এমন কিছু না বলা, যা পাকিস্তানি পক্ষকে তখনই অজুহাত দেবে অপ্রস্তুত জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। আবার একই সঙ্গে চাঙ্গা রাখতে হবে আন্দোলন ও জনগণকে। এ ভারসাম্য বজায় রাখা নিতান্ত সহজ ছিল না। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে তখনও তাঁকে কাজ করতে হচ্ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে যেখানে তাঁর অবস্থান ছিল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এখন আমাদের কাছে ব্যাপারটি যত সহজ মনে হচ্ছে তখন নিশ্চয় তা ছিল না। এছাড়া ছিল তরুণ বিশেষ করে ছাত্রদের প্রবল চাপ। তারাই ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ফেলেছেন। আন্দোলনের তারাই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। তাদের বিরূপ করা সম্ভব ছিল না।

৬ মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটিতে আলোচনার পর, লিখেছেন ড. কামাল হোসেন : 'বিবেচনা করে দেখা হলো যে, যদি আন্দোলনের জোয়ার ধরে রাখা এবং জনগণের ঐক্য জোরদার করা যায়, তাহলে ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, পরদিন খোলাখুলি স্বাধীনতা ঘোষণার অবস্থান নেয়া হবে না। ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হবে এবং ওইসব দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।'

৭ মার্চ দুপুর থেকে ঢাকা শহরে মানুষ এগুতে থাকে রমনা রেসকোর্সের দিকে। মনে আছে রেসকোর্সের এককোণে আমি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রফিক নওশাদ বিক্রি করছি সারারাত ধরে ছাপা লেখকদের মূখপত্র 'প্রতিরোধ'। যার হেডলাইন : 'আপসের প্রস্তাব আগুনে জ্বালিয়ে দাও' এরকম একটা কিছু। পরে ৭ মার্চ সম্পর্কিত বিবিসির ভিডিও দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। রেসকোর্সের

একদিকে স্লোগান—'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' তো অন্যদিকে—'পাঞ্জাব না বাংলা-বাংলা বাংলা'। হয়তো মাঝখানে—'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। তো অন্য কোথাও 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'। মঞ্চের সামনে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' কিন্তু তখনই কেউ বলে ওঠে 'জয় বাংলা' তখনই নদীর ঢেউয়ের মতো সেই ধ্বনি ছড়িয়ে যেতে থাকে আর চারদিকে কাঁপিয়ে সেই অমোঘ শব্দটি উচ্চারিত হয়—'জয় বাংলা'।

দুপুর তিনটার মধ্যে লোকে-লোকারণ্য। রেডিও পাকিস্তানের ও পাকিস্তান টেলিভিশন এখনকার মতো তখনও ছিল সরকারি। শেখ মুজিব জেনেশুনেই বলেছিলেন—'মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমার কথা না শোনেন তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।'

রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারের বন্দোবস্ত করল। পাকিস্তানি সেনা-অফিসার সিদ্দিক সালিক লিখেছেন : 'রেডিওর ঘোষকরা আগে থেকেই রেসকোর্স থেকে ইস্পাত-দৃঢ় লক্ষ দর্শকের নজিরবিহীন উদ্দীপনার কথা প্রচার করতে শুরু করল।' সালিক আরো লিখেছেন, এই ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসকদের দপ্তর হস্তক্ষেপ করে এই 'বাজে ব্যাপারটি' বন্ধের নির্দেশ দিল। সালিকও তা রেডিও কর্তৃপক্ষকে জানালেন। আদেশটি শুনে টেলিফোনের অপরপ্রান্তে বাঙালি অফিসারটি বললেন, 'আমরা যদি সাড়ে ৭ কোটি জনগণের কণ্ঠ প্রচার করতে না পারি তাহলে আমরা কাজই করব না।' এই কথার সাথে সাথে বেতারকেন্দ্র নীরব হয়ে গেল। বাঙালি ওই সময় এ ধরনের সাহস দেখানোর ক্ষমতা দেখিয়েছিল। বারবার তারা শেখ মুজিবের ওপর এই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল যে তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না। রেডিওতে ভাষণটি অবশেষে প্রচারিত হয়েছিল।

শেখ মুজিব এসে মঞ্চে উঠলেন। সারা রেসকোর্সে ঝাঁপিয়ে ঝড়ো হওয়ার মতো সেই শব্দটি বয়ে গেল—'জয় বাংলা'। মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম লিখেছেন : "কী যেন জাদুমাখা ছিল এই স্লোগানে। এর ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিধি নিরূপণের ক্ষমতা বুঝি কারো নেই। গণঅভ্যুত্থানের সময় এবং যুদ্ধকালে এ স্লোগান বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। জীবন বাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এই উক্তি যে-উদ্দীপনা জোয়ার তার তুলনা নেই। তাই 'জয় বাংলা' জয়ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

ওই দিনের রেসকোর্সের জনসভার একটি চিত্রেও মানুষের আবেগের পরিচয় পাওয়া যায় রশীদ হায়দারের একটি বিবরণে। বিবরণটি খানিকটা দীর্ঘ কিন্তু যারা ৭ মার্চ দেখেনি তাদের বোঝার জন্য এটি প্রয়োজন :

'লাল সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত গাঢ় সবুজ রঙের পতাকা হাতে হাতে উড়ছে হাজার হাজার, বড় পতাকাটি উড়ছে বঙ্গবন্ধু যেখানে ভাষণ দেবেন ঠিক তার উপরে।'

এই সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে, বহুলোক এসেছেন তীরধনুক নিয়ে, যেন যুদ্ধ আসন্ন। মানুষ যতোটা মরিয়া হয়ে উঠেছে এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে-এই সময়ে প্ল্যান্ট প্রটেকশনের একটি বিমান জনসভার বেশ উপর দিয়ে উড়ে যায়। লোক ওটাতেই শত্রুসৈন্য আছে ভেবে কেউ কেউ লাঠি ছুঁড়ে মারে; কারও কারও অনুমান ওটাতে টিক্কা খান আছে।

দেখা গেল মেয়েদের ভিড় একজন অশিক্ষত মেয়ে মনোয়ারা বিবি নিজের রচিত গান গাইছে : 'মরি হায়রে হায়, দুঃখের সীমা নাই, সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরাণ ফাইটা যায়।' দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি গানও শোনায় মনোয়ারা বিবি। দেখা যায় গত কয়েকদিনের দুঃখজনক ঘটনা সম্বলিত হাতে-লেখা পত্রিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলেজের ছাত্র সৈয়দ আজিজুল হক, দেখা গেল বাপের কাঁধে দুই-তিন বছরের শিশু বিশাল জনসমাগম দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।'

বঙ্গবন্ধু মঞ্চে ওঠেন। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিবকোট পরনে। আমরা যারা টিএসসি'র মোড়ে তারা দূর থেকে ঝাপসা একটি অবয়ব দেখি। সভার কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। কালো ভারি ফ্রেমের চশমাটি খুলে রাখলেন ঢালু টেবিলের ওপর। শান্ত গভীরকণ্ঠে বললেন, 'ভায়েরা আমার! আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন।'

উনিশ মিনিটের ভাষণ লিখিত নয়। কিন্তু একবারও থামতে হয়নি। পরে বিবিসির ভিডিওতে ক্লোজআপে দেখেছি আবেগে কাঁপছে তাঁর মুখ, কিন্তু সমস্ত অবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ বোঝা যায় তিনি পিছুবেন না।

৭ মার্চ যিনি রেসকোর্সে ছিলেন না, তাকে বোঝানো যাবে না। ৭ মার্চ কী বাংলাদেশের জন্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ মাত্র-ই জানেন। এই ভাষণের প্রতিটি উক্তিই উদ্ধৃতিযোগ্য। কিন্তু মূল বক্তব্যটি ছিল—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

কঠিন সংকটে এত ভারসাম্যপূর্ণ অথচ আবেগময় বক্তৃতার সংখ্যা বিরল। কীভাবে তিনি তা পেরেছিলেন আজ ভাবতে অবাক লাগে। পাকিস্তানি সৈনিক সিদ্দিক সালিক লিখেছেন :

'বক্তৃতার শেষদিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে-জনতা সাগরের ঢেউয়ের মতো প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্স ভেঙে পড়েছিল-ভাটার টান ধরা জোয়ারের মতো তারা ঘরে ফিরে চলল। তাদেরকে ধর্মীয় কোনো সমাবেশ তথা মসজিদ কিংবা গির্জা থেকে ফিরে আসা জনতার ঢলের মতোই দেখাচ্ছিল। এবং ফিরে আসছে তারা সন্তুষ্টচিত্তে—ঐশীবাণী বুকে ধরে। তাদের ভেতরকার সেই আগুন যেন নিভে গেছে। ইচ্ছা করলে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেই আগুনকে ধাবিত করা যেতো। আমাদের অনেকেরই আশঙ্কা ছিল এরকমই। এই বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দফতরে স্বস্তির বাতাস

বইয়ে দিল। সদর দফতর থেকে টেলিফোনে কথোকপথনকালে একজন উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা জানান যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।'

অনেকে হতাশাও হয়েছিলেন। যেমন তৎকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন। ড. মোহাম্মদ হাননান কে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থায় থেকেও আমরা ওইদিন রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। সারা শহরে রটে গিয়েছিল যে, শেখ মুজিব আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এবং বড় ধরনের একটা ঘটনা আজ ঘটবে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়ে ফিরে আসি।'

তবে এ ধরনের হতাশ হওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল কম। কম-বেশি সবাই খুশি হয়েছিলেন। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এরকম-সামরিক জান্তা যদি দাবি মেনে নেয় ভালো, না হলে আমরা স্বাধীন হয়ে যাবো। এর কোনো বিকল্প নেই। মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য মানুষ প্রস্তুত হওয়ার সময় পেয়েছিল। চারদিকে প্রস্তুতিমূলক তৎপরতা শুরু হয়েছিল। আন্দোলন বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি এবং ভাষণ বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিএনপির স্বপ্নদ্রষ্ট জিয়াউর রহমান লিখেছেন : '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক 'গ্রিন সিগন্যাল' বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝে উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।'

মঈনুল হাসান লিখছেন : 'সম্ভবত তিন সপ্তাহধিককালের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় এমন এক মৌল রূপান্তর ঘটে যে পাকিস্তানিদের নৃশংস গণহত্যা শুরুর সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতাই তাদের জন্য অভিন্ন ও একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি আক্রমণের সাথে সাথে অধিকাংশ মানুষের কাছে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঘোষণা হয়ে ওঠে এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ।'

এ ভাষণের পর ঢাকা শহর, পুরো দেশটি বদলে যায়। বাষ্পে-ভরা পাত্রের মতো টগবগ করতে থাকে ৭ কোটি মানুষ। জোরদার হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। শেখ মুজিবের নির্দেশই হয়ে ওঠে সরকারি নির্দেশ। মানুষ তা মানতে থাকে। এমনকি সরকারি প্রশাসনও। লিখেছেন ড. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর : "১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো প্রত্যাখ্যান। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে এই প্রতিরোধের সূত্রপাত। শেখ মুজিবুর রহমান একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো প্রত্যাখ্যান, অন্যপক্ষে

অসহযোগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রবর্তনের সম্ভাবনা জনমতে সত্যকরে তোলা-এই রণকৌশল শেখ মুজিবুর রহমান ৩৫টি নির্দেশের মধ্য দিয়ে সম্ভব করে গেলেন।" তিনি আরো লিখেছেন : "এই বিভিন্ন নির্দেশনার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নীতিমালার নির্দেশ দেন। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জনসাধারণ, এই কর্তৃত্বের স্বরূপ সিভিল ও কর্তৃত্বের অন্তর্গত পুলিশ এবং মিলিটারি। শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনক-এ রূপান্তারিত হয়ে যান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এক্ষেত্রেই।"

এভাবে সৃষ্টি হয় একটি সমান্তরাল রাষ্ট্রের। সেদিন বিচার করলে ২৫ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি ফর্মাল ডিক্লারেশন মাত্র। আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের পত্তন হয় ৭ মার্চ। মহাত্মা গান্ধীও এতো স্বল্পসময়ে এতো পরিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন করতে পারেননি। যারা পিছিয়ে ছিল, এতোদিন ভুগছিল দোদুল্যমানতায়, তারাও এগিয়ে আসতে থাকে। কী জানি কাঁরাভা যদি তাদের ফেলে এগিয়ে যায়। এভাবেই বাংলাদেশ এগুতে থাকে ২৫ মার্চের দিকে। ওই যে যেদিন শেখ মুজিব আঙুল তুলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাঙালি তা মেনে নিয়েছিল। পরাধীন পাকিস্তানে আর তারা ফিরে আসেনি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

'৭১-এর ৭ মার্চ শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীর দৃষ্টি ছিল বঙ্গবন্ধুর ওপর। সারা পৃথিবী সেদিন অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতোটুকু আন্দোলিত করতে পারে। মানুষের মধ্যে কেমন তীব্র প্রণোদনা সৃষ্টি করতে পারে। সংগ্রামরত মানুষকে সেদিন এই ভাষণ স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছিল। বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যটি এই ভাষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

একটি ভাষণ একটি জাতির ইতিহাসে বড় রকমের বাঁক পরিবর্তনের সূচক হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। অনেকে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ এ্যাড্রেসের সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু অন্তত দুটো কারণে এই তুলনা অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। এক. আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণটি ছিল লিখিত, আর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল অলিখিত, স্বতস্ফূর্ত। দুই. তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের বিচারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল অনন্য।

স্মৃতির পথ ধরে পেছনে গিয়ে আজও যেন অবলোকন করি ৭ মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর বিলম্বিত উপস্থিতির জন্যে উৎকণ্ঠিত বিশাল জনসমুদ্র। উৎকণ্ঠা অনেক কিছু নিয়েই ছিলো। অনেক প্রশ্ন ছিল সেদিন রেসকোর্সে সমবেত মানুষের মনে। বঙ্গবন্ধু আসতে পারবেন তো? বঙ্গবন্ধুর জীবন সংশয় হবে না তো? বঙ্গবন্ধু কী বলবেন? তিনি কী সরাসরি স্বাধীনতার ডাক দেবেন? এমনি অসংখ্য প্রশ্নে আন্দোলিত ছিল মানুষের মন। তবে এটা সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, বাঙালি আর পেছনে ফিরে তাকাবে না, প্রস্তুত ছিল লড়াই করে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে, স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনার জন্যে। জনতার কাতার থেকে

উঠে আসা জননায়ক বঙ্গবন্ধু জনতার এ মানসিকতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন; এবং তারই প্রতিফলন ছিল ৭ মার্চের ভাষণে।

বঙ্গবন্ধু যখন অবশেষে এলেন, সরাসরি মঞ্চে উঠে অধীর আগ্রহে/উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান জনতার মুখোমুখি হলেন, তখন লক্ষ কণ্ঠের গগণবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো রেসকোর্সের ময়দান। শ্লোগানের ভাষাই বলে দিয়েছিল সেদিন বাঙালি কিসের জন্য প্রস্তুত ছিল : "জয় বাংলা, জয় বাংলা"/"আপোস না সংগ্রাম-সংগ্রাম, সংগ্রাম"/"তোমার দেশ, আমার দেশ—বাংলাদেশ, বাংলাদেশ"/বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। জনতার আর জননায়কের মানসিকতার মেলনবন্ধনের এক অপূর্ব প্রতিফলন হিসেবে উচ্চারিত হলো ৭ মার্চের ভাষণ।

সে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ। লক্ষণীয় ছিল ভাষণ আর ভাষক উভয়েই। ভাষণে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে সুগভীর এবং ব্যাপক বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সব মহলের কাছে। অলিখিত ১৯ মিনিটের এ ভাষণের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল যেন সুনিপুণ এক কথার কারিগরের মুখ থেকে। বার্তা ছিল নির্যাতিত ও সংগ্রামী বাঙালির জন্যে, বার্তা ছিল পাকিস্তানি শাসকচক্রের জন্যে, বার্তা ছিল বিশ্ববাসীর জন্যে। অপর দিকে ভাষকের অপূর্ব অভিব্যক্তি, অঙ্গসঞ্চালন বা যাকে বলে Body Language তার মধ্য দিয় ভাষণটি বঙ্গবন্ধুকে পরিণত করেছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকার এক অনতিক্রম্য দৃষ্টান্তে। অতীত প্রেক্ষাপটের সঠিক বিশ্লেষণ, বিরাজমান পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি—এসবই ছিল ভাষণটির বৈশিষ্ট্য। সংক্ষিপ্ত সময়ে এক উত্তাল প্রেক্ষাপটে প্রচণ্ড মানসিক ধৈর্য না থাকলে এমন একটি ভাষণের উচ্চারণ সম্ভব নয়।

ভাষণটির প্রতিটি শব্দ/বাক্য নিয়ে গবেষণা হতে পারে, উচ্চারণ করা যেতে পারে বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য। অবশ্য তার জন্যে প্রয়োজন বিস্তৃত পরিসর, যা এই লেখায় সম্ভব নয়। বিশেষ ক'টি অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে মাত্র।

ভাষণের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য : "আমার উপর বিশ্বাস আছে?" জনতা তখন বাঁশের লাঠি সমেত হাত শূন্যে তুলে কণ্ঠের আওয়াজ দিয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিল। সেই মুহূর্তে তাঁর মতো নেতার জন্যে এমন প্রশ্ন উচ্চারণের প্রয়োজন ছিল কী? যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণে এমন কোনো প্রয়োজন নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যখন এক চরম ক্রান্তিলগ্নে জনতার কাছে প্রশ্নটি রেখেছিলেন তখন তাঁর দুটো নিহিতার্থ ও তাৎপর্য নির্দেশ করা যায়। এক. তিনি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন তা দেবার অধিকার আছে কী না তা উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে দেয়া। দুই. সারা বিশ্বের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছিয়ে দেয়া যে, তিনিই

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর পেয়েই বঙ্গবন্ধু চরম সিদ্ধান্ত দিলেন : রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। অর্থাৎ বাঙালির আগামী কী হতে যাচ্ছে তা সেই মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গেল। তবে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে চূড়ান্ত কর্মসূচির পটভূমি হিসেবে নির্দেশ দিলেন সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের। অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সেনানায়ক শুরুতে কখনই তার চরম কৌশল ও অস্ত্র প্রয়োগ করেন না।

বাঙালির আসন্ন সংগ্রামের রূপরেখা ও কৌশলও তুলে ধরা হয়েছিল ভাষণে। সত্যি কথা বলতে কী বাঙালি তখনও একমাত্র ইস্পাতদৃঢ় ও রাজনৈতিক প্রণোদনা ব্যতীত আর কিছু নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন শত্রুকে "ভাতে ও পানিতে মারার"। অর্থাৎ তিনি ডাক দিয়েছিলেন জনযুদ্ধের, গেরিলা যুদ্ধের—Conventional War-এর নয়। কারণ তা ছিল অবাস্তব। আমাদের ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের কৌশলও ছিল তা-ই। যে কোনো জনযুদ্ধের সামরিক সংগঠন নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্ব। সেজন্যে এই ভাষণে নির্দেশ ছিলো সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হবার। তবে ভাষণে এই অংশের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণটি ছিল : "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা সব বন্ধ করে দেবে।" অবিস্মরণীয় এক দিব্য-দৃষ্টিতে যেন নেতা অবলোকন করেছিলেন চরম মুহূর্তে তাঁর অনুপস্থিতি; এবং সেই মুহূর্তে বাঙালির কী করণীয় তার নির্দেশ তিনি আগেই দিয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে বাস্তব পরিস্থিতি হয়েছিলও তাই।

স্বাধীনতার লক্ষ্য নির্ধারক বেশ কিছু বক্তব্য আছে এই ভাষণে। যেমন "সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।" এবং "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বা "এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ্।" এমনি সব উচ্চারণের বেশ কিছু দিক বিবেচ্য। তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা ঘোষণা বা Unilateral Delaration of Independence-এর জন্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর বেশ চাপ ছিল। অপরদিকে তা করলে তাৎক্ষণিক কী ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হতে পারতো তা-ও বঙ্গবন্ধু জানতেন। এমনি একটি কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যা বললেন তা সরাসরি ও তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও স্বাধীনতা ঘোষণার স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিলেন। সার্বিক পরিস্থিতি সম্যক অবহিত কোনো বাঙালি বা বিদেশির কাছে এই ভাষণের নিহিতার্থ দুর্বোধ্য থাকেনি সেদিন। আরো একটি লক্ষণীয় দিক হলো, প্রমিত বাংলা উচ্চারণের পাশাপাশি আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যবহার। দুটো ব্যাখ্যা হতে

পারে। এক. আবেগতাড়িত চরম মুহূর্তে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ। দুই. ভাষণের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আপামর জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য করার জন্যে তাদের ভাষা ব্যবহার।

ভাষণ শেষে ৭ মার্চের ভাষণ হয়ে উঠেছিল সংগ্রামী বাঙালির শাণিত চেতনার এক সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার। এই হাতিয়ার সেদিন সারা দেশের মানুষকে প্রণোদিত করেছিল স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ৭ মার্চের ভাষণে দুটো তাৎপর্য নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, নিকট আগামীর লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু দ্বিতীয়ত, সুদূর আগামীর লক্ষ্য ছিল মুক্তি। মুক্তি স্বাধীনতার চেয়েও ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। সে কারণেই মুক্তি উচ্চারিত হয়েছে প্রথম, স্বাধীনতা তার পর। অর্থাৎ শুধু স্বাধীনতা অর্জনই নয়, বরং সে দেশ গড়ারও দিকনির্দেশনা ছিল ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে।

কালোত্তীর্ণ ভাষণটি বাঙালি জাতির অনন্ত প্রেরণা

আবুল মোমেন

১

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণটি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে অনির্বাণ-শিখার মত। এর আলো আজও আমাদের পথ দেখায়। চল্লিশ বছরের ব্যবধানেও এটি আজও তাজা, প্রাসঙ্গিক এবং একইভাবে উদ্দীপনাময়।

এটি এমন এক অমর-কথা যার ভূমিকা ও অবদান জাতির জীবনে এখনও ফুরায় নি। যেন এটি এক কল্পতরু—জাতির প্রয়োজনে সংগ্রামের প্রেরণা-পুষ্টি জোগাতে সদাই প্রস্তুত, সদাই সক্ষম।

সেদিন লক্ষ মানুষের সমাবেশে কোটি প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে মহানায়ক মুজিব জাতিকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তাই এটি কোন সাধারণ বক্তৃতা নয়। এর তুলনা হতে পারে শিল্পের সাথে, নিটোল কোন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হবে এর উপযুক্ত তুলনা। বলা যায়, এটি আধুনিক শ্রুতিশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন।

উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায় অস্থির জাতির চেতনাকে, কুড়ি মিনিটের একটি ভাষণ, সেদিন প্রেরণা দিয়েছিল এবং আজও তার চেতনায় সংগ্রামের অনিঃশেষ প্রেরণা সঞ্চারিত করে চলেছে।

৭ মার্চ ১৯৭১ অপরাহ্নে তিনি যখন জনসভার মঞ্চে উঠছেন তখন তো জনসমুদ্র প্রবঞ্চক পাকিস্তানিদের প্রত্যাখ্যান করে নায়কের নির্দেশের অপেক্ষায় মাত্র—তারা তো জানে যুদ্ধ অনিবার্য, আসন্ন। নেতা লড়াইয়ের অগ্নিমন্ত্রে শানিয়ে দিলেন জনতার অন্তর। যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পথে এভাবেই রওয়ানা করিয়ে দিলেন জাতিকে ৭ই মার্চ অপরাহ্নে।

২

এই ভাষণটি শোনা যে কোন বাঙালির জীবনে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বাজি ধরে বলা যায়, যার মধ্যে বাঙালিত্বের ছিটেফোঁটা হলেও আছে, সে যে বয়সেরই হোক, এ ভাষণ তাকে আলোড়িত করবে, অনুপ্রাণিত করবে। দেশ, মানুষ এবং ইতিহাসের প্রতি তার অঙ্গীকারকে এ ভাষণ নবজীবন দেবে। আর তাই আজ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বলা যায় এটি কালোত্তীর্ণ মহান শিল্পকর্ম, যা আজও সমানভাবে প্রেরণাদায়ী।

এই শিল্পকর্মে কী আছে তার খোঁজ নেওয়া যাক। ভাষণটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক তারে বাঁধা ছিল, যেন বজ্রকণ্ঠের লক্ষ্যভেদী শব্দায়ুধ প্রতিপক্ষের সব বাধা ছিন্নভিন্ন করে জাতিকে স্বাধীনতার ঘাটে পৌঁছে দেবেই। এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাগ্মিতার জাদুতে—বক্তব্যে সমালোচনা, অভিযোগ, ক্ষোভের প্রকাশ তো ছিলই, কিন্তু তাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও চূড়ান্ত ঘোষণার গুরুত্ব চাপা পড়ে নি। বক্তৃতা মূল অভীষ্ট সাধনে ভুল হয় নি। উপস্থিত বক্তৃতার হওয়া সত্ত্বেও শব্দের হাতড়ানো, লাগসই শব্দ অভাবে যতি কিংবা যথার্থ বয়ানের ব্যর্থতায় বক্তব্য অস্পষ্ট বা জটিল হওয়ার মত কোন অঘটন ছাড়াই টানা বলে গেছেন তিনি। ঠিক যেন চয়িত শব্দফুলের মালা গাঁথলেন এক মহাকবি। মাঝে মাঝে বাঙাল শব্দের ব্যবহার—যেমন দাবায়ে রাখতে পারবা না—বক্তৃতাটিকে দিয়েছে দেশজ সৌরভ, এবং মুজিব-ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা। আর যখন আবেগের তোড়ে ধাবমান বেপরোয়া বাক্যকে অর্থের শাসনে সামলে নিতে হয়েছে তাও এই বাগশিল্পীর প্রতিভার ছোঁয়ায় মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। বক্তা যেমন তেমনি শ্রোতাও খেই হারায় নি কখনও, উভয়েরই মস্তিষ্ক ও হৃদয় একই প্রেরণায় যুগপৎ সক্রিয় থেকেছে সারাক্ষণ।

ভাষণটি কেবল বুদ্ধির নির্মাণ নয়, ভালোবাসার আবেগে জীবন্ত। এটির আবেদন যুগপৎ বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির কাছে। তাই অনুপ্রাণিত এক বক্তা সেদিন তাঁর মুখাপেক্ষী জনতাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত সাধনের আবাহন করছিলেন। তাঁর ডাক মানুষের অন্তরে পৌঁছেছিল। এমন মর্মভেদী, অন্তরস্পর্শী, দূরদর্শী বক্তৃতার দৃষ্টান্ত মেলে না ইতিহাসে।

এক তারে বাঁধা ভাষণটির পাঁচটি বাঁক ফেরা লক্ষ্য করা যাবে। শুরুটা করেছেন সারাদেশে মানুষের আত্মত্যাগ স্মরণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তাঁর ও বাঙালির সহজাত পক্ষপাতের কথা দিয়ে। তারপরেই কিন্তু সুর ছড়িয়ে পাকিস্তানি শাসকদের কাছে পাওয়া বঞ্চনা নির্যাতন প্রতারণার প্রসঙ্গ টেনে '৭০ এর নির্বাচনের পরেও তাঁর সমঝোতার ইচ্ছাকে উপেক্ষার কথা তুললেন। একই সূত্রে চলে এলো ভুট্টোর ভূমিকা, বিশেষত ষড়যন্ত্রকারী ভুট্টোকে ছেড়ে আওয়ামী লীগ, তিনি নিজে এবং বাংলাদেশের মানুষকে অভিযুক্ত করার জন্যে

পাক-সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে রাখলেন জনতার দরবারে। এরপরে ছোট্ট একটা বাঁক নিলেন—তিনি যাদের এবং তাঁর নিজের যারা ভরসা সেই জনমানুষের কাছে খুলে বললেন শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার আক্রমণাত্মক ভূমিকা ও ষড়যন্ত্রের কথা। জবাব দিলেন সব অভিযোগের আর প্রতিবাদ জানালেন হত্যা ও নির্যাতনের। নেতা ও জনতার ঐক্য তাতে যেন গাঢ় হয়ে উঠল। এবারে জননায়ক স্বৈরাচার ও ষড়যন্ত্রকারীদের পিছনে ফেলে আত্মবিশ্বাস ও সৎসাহসে ভর করে মুখোমুখি তাঁর দেশবাসীর। দ্বিধাহীন স্পষ্টভাষায় দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সরকারে জন্যে শর্ত, আর জনগণের জন্যে দিলেন নির্দেশনা। সরকারকে দিলেন হুঁশিয়ারি, জনগণকে করলেন সতর্ক। তারপর জনগণকে চরম সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি নিতে বললেন, নিজে নিলেন বিকল্প সরকারের ভূমিকা। করণীয় জানালেন, না করণীয় সম্পর্কে বলতেও ভুললেন না।

শেষে টানটান উত্তেজনার মধ্যে যেন জ্যা-মুক্ত করলে ধনুকের তীর—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

৩

এই ভাষণটিকে এবার আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখব, কারণ বঙ্গবন্ধু হয়ে কেউ যেমন জন্মান না তেমনি সাতই মার্চের ভাষণও কোন আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না।

ইতিহাসের উজান বেয়ে এক রাজনৈতিক কর্মীর উত্তরণ ঘটে। আর বাঁক বদলের কালে নেতার পরীক্ষা নেয় ইতিহাস—সাহসে, ত্যাগে, প্রেমে ও প্রজ্ঞায় পারবেন কি নেতা সময়োচিত কাজটি করতে? সাতই মার্চে তেমন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

কেমন করে নেতা ও ইতিহাসের মুখোমুখি হওয়ার এই ঘটনাটি ঘটেছিল তা আমরা ইতিহাসের চুম্বক-আলোচনা থেকে জেনে নিব।

পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বাঙালি-বিদ্বেষী রাষ্ট্রনীতি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিখণ্ডি রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পূর্ববাংলার মানুষকে পাক-সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। ভাষা আন্দোলন দিয়ে শুরু বাঙালির পাকিস্তান ও পাকিস্তানবাদী রাজনীতি-সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যানের। তরুণ মুজিব ইতিহাসের এই চড়াই-উৎরাই কেবল পাড়ি দেন নি, ক্রমশ এতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে সংগ্রামের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, রূপ দিয়েছেন। ছেষট্টিতে যখন ছয়দফা ঘোষণা করছেন তারও আগে তিনি স্বাধীনতার বীজটি পুঁতেছিলেন আমাদের রাজনীতিতে। স্বাধীনতা এমন একটি মন্ত্র যার কাছে রাজনীতির অন্য সব প্রত্যয় ও প্রপঞ্চ ম্লান হয়ে যায়। আর তাই দেখি পাক-সরকারের চূড়ান্ত প্রতারণা, নিপীড়ন এবং দূরভিসন্ধি আমাদের অন্যান্য অনেক নেতাদের,

সাময়িকভাবে হলেও দমাতে, ঠেকাতে, বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেও মুজিবের কাছে নিস্ফল মাথা কুটেছে। তাঁর সাহস সম্পর্কে মানুষ নিঃসন্দেহ ছিল, তাঁর ত্যাগ মানুষকে স্পর্শ করেছিল, তাঁর দায়িত্ব বইবার ক্ষমতায় মানুষ আস্থা পেয়েছিল, মানুষ ও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে খাঁটি তা নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না, আর তিনি যে সঠিক লক্ষ্যেই এগুচ্ছেন সে বিষয়ে মানুষের মনে কোন সংশয় ছিল না। এমন নেতা তো সবার চেয়ে আলাদা, সবার আগে থাকবেন, সবার চেয়ে প্রিয়, সবার চেয়ে শ্রেয়। সংগ্রামের আগুনে পুড়ে পুড়ে এমন খাঁটি নেতার জন্ম হয়েছে।

আর পাকিস্তানের ছলচাতুরি-ষড়যন্ত্র দুরভিসন্ধি শোষণ-নির্যাতনের সাথে লড়তে লড়তে অবশেষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মানুষ এর শেষ দেখতে চেয়েছে। একদিকে স্বাধীনতার আশায় বুক বেঁধে দাঁড়ানো বাঙালি আর অন্যদিকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় পাকবাহিনী। নেতার জন্যে যথার্থই অগ্নিপরীক্ষা। নেতা অগ্নিপরীক্ষার উত্তর দিলেন অগ্নিগর্ভ ভাষণে—যা আমাদের ইতিহাসে আর বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লিখিত থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

৪

এবার আমরা বুঝে নেই এই ভাষণ আমাদের কী দিয়েছে।

সাতই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে একটি জাতি জন্ম হয়েছে, আর সেই জাতি একজন অবিসংবাদী নেতাকে পেয়েছে।

মুক্তিপাগল যে জাতি স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল তারা এই ভাষণের মাধ্যমে সেই সংকেতটি পেয়েছিল।

এই ভাষণ ঘরকুনো নিতান্ত ছাপোকা বাঙালিকে রূপান্তরিত করেছিল বীরের জাতিকে। সর্বোচ্চ ত্যাগে অকুণ্ঠিত চিত্তে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিয়েছে।

এই ভাষণের পরে কারও মনের সামান্য দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল, স্বভাবত বিভক্ত, কলহপ্রিয় মানুষগুলো সব ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পেল এ থেকে। এই ঐক্য কোন সীমা মানে নি, জাত মানে নি—সকল বাংলা ভাষাভাষিকে এক করে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবন, সংসার, পরিবার, নিজেদের নৈমিত্তিক কাজগুলো বড্ড ছোট অকিঞ্চিৎকর মনে হতে থাকল। এই একটি ভাষণ সবার অন্তরের রুদ্ধ কপাটগুলো খুলে দিয়ে সকল ক্ষুদ্র ভাবনা দূর করে তাদের নিয়ে এল জাতীয় জীবনের ঘটমান ইতিহাসের মহা-রণাঙ্গণে। হঠাৎ করে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ভুলে সবাই বড় হয়ে উঠল, মহৎ কাজের প্রেরণায় সবাই উজ্জীবিত।

রমনার রেসকোর্সের ময়দানে সেদিন অপরাহ্নের এক অলৌকিক ভাষণে অবগাহন করে একটি জাতি নবজন্ম লাভ করেছিল।

সাতই মার্চের ভাষণটি ধর্মবর্ণ-বয়স-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল বাঙালিকে জয়বাংলার সৈনিকে রূপান্তরিত করেছিল।

বাঙালিকে এমন মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল এই ভাষণ, যে তার পক্ষে যুদ্ধ ও স্বাধীনতা এবং ত্যাগ ও বীরত্বের কমে আর কোন বিষয় নিয়ে ভাবা সম্ভব ছিল না।

একটি ভাষণ পুরো জাতিকে এক ধ্যানে মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত করেছিল।

নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধে জয়বাংলা ছিল রণধ্বনি, মুজিব ছিলেন মহানায়ক আর সাতই মার্চের ভাষণ ছিল অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস।

সাতই মার্চের ভাষণ কেবল অবিস্মরণীয় নয়, বাঙালির জন্যে অনিঃশেষ এর প্রেরণা। এটি রাজনীতির চিরায়ত এক ভাষ্য, ধ্রুপদী সৃষ্টি।

৫

বঙ্গবন্ধুকে একটু বোঝা দরকার—এই ভাষণের রূপকার বঙ্গবন্ধুকে।

কর্মী থেকেই তিনি নেতা হয়েছিলেন। কিন্তু নেতা হয়ে কর্মীদের থেকে দূরে সরেন নি। যে কোন পরিস্থিতি মাঠ-পর্যায়ে সরাসরি যুক্ত থেকে মোকাবেলা করেছেন, সহজাতভাবে সাহসী মানুষটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর ছিল পরিস্থিতি বোঝার গুণ, এবং প্রয়োজনে তা নিয়ন্ত্রণের ও তাতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা। রাজনীতি তাঁকে ক্ষমতার কাছাকাছি নিয়ে গেলেও পাকিস্তানে ক্ষমতাকে ঘিরে যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের চক্র ছিল তার যুগপৎ প্রলোভন ও নির্যাতনকে হেলায় জয় করেছেন। নিজেকে জনতার কাতারে রেখেছেন বরাবর আর রাজনীতি করেছেন গণমানুষের কল্যাণে। রাজনীতির প্রয়োজনে দেশের চিন্তাশীল সৃজনশীল মেধাবী মানুষদের সাথে সেতু তৈরি করেছেন, তাঁদের সাহায্য নিয়েছেন, কাজে লাগিয়েছেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে সমমনাদের সাথে মৈত্রী গড়েছেন।

ছয়দফা আন্দোলন শুরু হওয়ার পরে দেশব্যাপী বাঙালি জাতীয়তাবাদী যে জাগরণ ঘটে, জোয়ার সৃষ্টি হয় তাতে পুরোনো মতাদর্শের দুর্গগুলো ভেঙে পড়েছিল, রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল পরিবার থেকেও নবপ্রজন্ম তাঁর কাজে হাত লাগাতে এগিয়ে এলো। এভাবে ঐক্যের বাতাবরণ কেবল বিস্তৃততর হয়েছে। সবটা মিলে দলীয় গণ্ডি ছাপিয়ে জাতীয় রাজনীতির এক বিশাল মহাস্রোত তৈরি করেছিলেন তিনি। দলের গুরুত্ব ধরে রেখেই ঐক্যের এই বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

আর বিশেষভাবে বলব তাঁর রাজনৈতিক সৃজনশীলতার কথা। মুসলিম আওয়ামীলীগ ধর্মনিরপেক্ষ দল হল। মার্কিন-ঘেঁষা নীতি ছেড়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিল দেশের উপযোগী কার্যকর গণতান্ত্রিক পন্থা নিয়ে নিরীক্ষা করতে পিছপা হন নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তার ঐতিহ্যগত উদার অসাম্প্রদায়িক মানবতার আলোকেই গ্রহণ করলেন।

ক্ষমতার মোহ তাঁর ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন জনতার প্রতি দায়বদ্ধ। মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বরং মৃত্যুসহ

যে কোন ভয়ানক অনিশ্চিত বাস্তবতার সম্মুখীন হতে তাঁর আপত্তি ছিল না—মানুষ ও দেশের প্রয়োজনে।

সাতই মার্চে ইতিহাস তাঁর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল একটি জাতিকে মুক্তির বাণী শোনাতে আর স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার মন্ত্র দিতে।

সেদিন অপরাহ্নে রমনার ময়দানে লাখো মানুষের সামনে শেখ মুজিবের পক্ষে এই ভাষণটি দেওয়া ছাড়া আর কিছু সম্ভব ছিল না। আর এই ভাষণটি দেওয়ার জন্যে শেখ মুজিব ছাড়া আর কেই বা উপযুক্ত হতে পারতেন।

ইতিহাস ভুল করে না। নেতা জনতাকে ঠিকই মন্ত্র দিলেন বাগ্মিতার অসাধারণ এক দৃষ্টান্ত রচনা করে।

আরেকটি কথা। এই ভাষণ বঙ্গবন্ধুকে কেবল মহানায়ক করে নি, তাঁকে কিংবদন্তীর নায়কে উন্নীত করেছে। এই ভাষণের প্রেক্ষাপটে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামময় জীবন জনগণের মানসপটে সত্য হয়ে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠল। তাই আমরা দেখি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কত সার্থক ছড়া, কবিতা, গান রচিত হয়েছে, হয়ে চলেছে। না কাউকে ফরমায়েস করতে হয় নি, কারও কোন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এসবই সংবেদনশীল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিকর্ম। বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাঁর জীবন সৃজনশীলতার এক অফুরন্ত উৎস হয়েছে। মুজিব মহানায়ক, কিংবদন্তী, জাতির প্রেরণা, জীবন্ত ইতিহাস, জাগ্রত সত্তা।

৬

সাতই মার্চের ভাষণের পরে চারটি দশক অতিবাহিত হয়েছে। আজকের প্রেক্ষাপট থেকে একবার কি মূল্যায়ন করব না? বিশেষত এ ভাষণ উত্তরসুরীদের কাছে যে প্রত্যাশা তুলে ধরেছিল তা আমরা পূরণ করেছি কিনা তা তো আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রথমে বলি ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে মানবিক অবস্থান থেকে। হ্যাঁ স্বীকার করতে হবে সাতই মার্চের ভাষণের চেতনা-প্রেরণাকে আমরা একাত্তরের পরে আর এগিয়ে নিতে পারি নি।

এ ভাষণ একাত্তরে আমাদের মধ্যে আদর্শিক চেতনা জাগিয়েছিল কিন্তু সেটা বিজয়ের পরেও ধরে রাখতে পারিনি আমরা। পরিস্থিতির দাবির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে কেউ আদর্শিক চরমপন্থায় ঝুঁকলেন, কেউবা স্বার্থের গণ্ডিতে বাঁধা পড়লেন।

এ ভাষণ যে ত্যাগোদ্দীপ্ত বীরত্বের বীজ বপন করেছিল তা আমাদের ক্ষেত্রে যেন একফসলা শস্য হয়ে থাকল, বিজয়ী বীরের ভূমিকা ছেড়ে অচিরেই আমরা ভাগ-ভোগের ক্ষুদ্রতার বিকারে ভুগতে থাকলাম।

এই সুযোগে পরাজিত আদর্শের ষড়যন্ত্রী আর অনৈতিক ক্ষমতালিপ্সুর দল প্রত্যাঘাত হানতে পেরেছিল। আমরা ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে পারি নি।

এমনকী তাঁর রেখে যাওয়া অতুলনীয় সম্পদ এই ভাষণটির চর্চা করি নি, কেবল এটাকে ব্যবহার করে ফায়দা পেতে চেয়েছি, যখনতখন মাইক্রোফোনের ভোজে দিয়েছি, এর পবিত্রতা ও মহত্বের কথা না ভেবে।

কিন্তু এটির এমন প্রাণশক্তি যে এত অবহেলা ও অপব্যবহার সত্ত্বেও ঠিকই মানুষের চেতনা-প্রদীপের সলতেটি জ্বালাতে সক্ষম—অন্ধকারে আলোর উৎস আজও।

যদি ভাষণটিকে রাজনীতির আঙ্গিক থেকে বিচার করি তাহলে দেখব এই মহামূল্যবান মূলধন রাজনীতিতে আমরা খাটাতে পারি নি। ভিতরের ও বাইরের, সমকাল ও মহাকালের নানান চাপ ছিল সত্য, তবে সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দেখা দেয় রাজনীতিতে সামরিকতন্ত্রের বিকৃত আগ্রাসন। অসত্য ও জবরদস্তির ভিতর দিয়ে এসময় রূপকথার বাস্তবতাই তৈরি হয়, খলনায়কেরা ইতিহাসের ওপর অধিকার খাটানোর প্রাণান্ত চেষ্টায় লিপ্ত হয়। আমাদের সব অর্জনগুলো জব্দ করার চেষ্টা চলল, মহান সব উত্তরাধিকারের নগণ্যায়নে তৎপর থাকল এই অশান্তি। প্রলোভন, ভীতি-প্রদর্শন, জবরদস্তি, নির্যাতন এবং আদর্শ ও চরিত্র হননের ঢালাও ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে মূল্যবোধ ও আদর্শের বীজ উপড়ে ফেলা হল। এ সময় টিকে থাকাই ছিল মূল কাজ।

এখন, প্রায় চল্লিশ বছর পরে, বলা যাবে যে রাজনীতির অঙ্গনে পরিবর্তনের, দিন বদলের হাওয়া বইছে। এই প্রেক্ষাপটেই আমরা এবার সাতই মার্চের ভাষণ থেকে পাওয়ার ও নেওয়ার বিষয়টিকে নিয়ে ভাবব। ১৯৭০-এর পরে ২০০৮ সনের নির্বাচনে ক্ষমতা বদলের চেয়েও মূল আদর্শে প্রত্যাবর্তনের তাগিদ ছিল জোরালো। এই কথাটা আমাদের বুঝতে হবে।

'৭৫ এর পর থেকে দেশ হয়ে পড়েছিল ছন্নছাড়া, নানা অনাচারে যেন বখে যেতে বসেছিল। রাজনৈতিক অবক্ষয় এতটাই ঘটেছিল যে ১৯৯০ সনে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করেও ইতিহাসের মূল সড়কে ফেরা হচ্ছিল না। কিন্তু এবারে এই ২০০৮ সনে, মূলত তরুণ ভোটারদের আগ্রহে, দেশ তার মূল পথে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই আদর্শিক বিজয়কে যথাযথ মূল্য না দিয়ে কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে এ বিজয় তথা এ আদর্শকে ধরে রাখা কঠিন হবে।

একদিক থেকে বিচার করলে বর্তমান সময়টা একাত্তরের জানুয়ারি-মার্চের মতই—আজ বাঙালির রাষ্ট্রের আদর্শের জয়যাত্রা এগিয়ে নেওয়ার কাজ কাঁধে তুলে নিতে হবে। ষড়যন্ত্র থাকবে, বিভ্রান্তিও সব কাটবে না, আর সমকালের সমাজের নিত্যকার সংকট তো আছেই। হয়ত সেদিক থেকে বিচার করলে এবারে কাজটা একাত্তরের চেয়েও কঠিন। বলা যায় প্রায় চার দশক পরে ইতিহাস পিতার সূচিত কাজ সম্পাদনের দায় তুলে দিয়েছে কন্যার কাঁধে। স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত জাতিকে সাতই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধজয়ে যাত্রা করিয়েছিলেন। আজ নবপ্রজন্মের বাঙালি সেই চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত পথেই হাঁটতে চায়।

অলোকবাসী পিতা কন্যার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জাতির সেই অগ্রযাত্রার পথ চেয়ে আছেন।

স্বপ্নটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে—সাতই মার্চের ভাষণ আমাদের যে স্বপ্নে উদ্দীপ্ত করেছিল সেটি। যদি আমরা ভুল করি, ব্যর্থ হই, তবে শিখাটি নিভে যেতে পারে। অন্যভাবে, অন্য কোন পথে মহাকাল দিন বদলের কাজ করে নেবে।

তখন একাত্তরের সাতই মার্চের ভাষণ আকাশের কোন নক্ষত্রের মত নির্বাপিত হয়ে যাবে। এই জনপদে অন্ধকার নেমে আসবে।

৭

এমন সর্বনাশা পরিণতি আমরা হাত দেব না, এমনটা হওয়ার কথাও নয়। কারণ সাতই মার্চের ভাষণটিকে আমরা অঙ্গীকারের শিখা-অনির্বাণ হিসেবে চেতনায় ধারণ করি। তবে এই সর্বনাশের পথ চিরকালের মত বন্ধ করে একাত্তরের চেতনায় নতুন প্রভাতের সূচনার জন্যে সেই শিখাটি তুলে ধরার এখনই সময়। সাতই মার্চের ভাষণের পরিপূরক ভাষণটি আজ চাই—একই ধারাবাহিকতায় ঐক্যের, সংগ্রামের, গঠনের পথ-নির্দেশ চাই। ঠিক একইভাবে একতারে বাঁধা ভাষণে কয়েকটি বাঁক-বদল থাকবে। দেশ ও জাতিকে নিয়ে নির্মম ষড়যন্ত্র আর খলচরিত্রের নানা বিকারের কথর পরে আদর্শ ইতিহাস, রাষ্ট্র ছিনতাইয়ের কথা আসবে। খলচরিত্রগুলো উন্মোচন করে কীভাবে অস্ত্র ও অর্থের দূষণে রাজনীতিকে তারা বিষিয়ে তুলেছিল সে কথাও তুলে ধরতে হবে। বলতে হবে রাজনীতির নতুন উপসর্গ জঙ্গিবাদ ও ধর্মান্ধতার কথা। মানুষের কাছে খোলামনে বলতে হবে কঠিন দুঃসময়ে নিজেদের অপারগতা, ব্যর্থতা কিংবা ভুলের কথা। সেই সাথে গণমানুষের পাশে থাকার ঐতিহ্য ও অঙ্গীকার স্মরণ করতে হবে। আর সবশেষে আদর্শের লড়াইয়ে নিঃস্বার্থ দৃঢ়তায় ঐক্যের ডাক দিতে হবে। সবার প্রাণে দেশ-সেবার মন্ত্র দিতে হবে।

একাত্তরের মতই বিভাজন হোক—একদিকে দেশপ্রেমিক জনগণ থাকবে অন্যদিকে দেশচেতনাবিরোধী মুষ্টিমেয় মানুষ। শুধুমাত্র সাতই মার্চের সেই মহানায়কের সততা, দৃঢ়তা, সাহস, দূরদর্শিতা ও ঔদার্যের সমন্বয়েই সেই পথে আজ জাতিকে পথ দেখাতে পারেন কেউ।

মহানায়ক মুজিব, পুরো জাতি, আমাদের ইতিহাস তাকিয়ে আছে একজনের দিকে—তিনি নিশ্চয় অন্তরে সেই আবাহন উপলব্ধি করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাসের এক মহাকাব্য

কে বি এম মফিজুর রহমান খান

৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওযার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তাকে আমি দীর্ঘ ৪২ বছর পর কীভাবে মূল্যায়ন করবো? আমার কাছে মনে হয় এইতো সেদিনের কথা। লাখ লাখ লোক জড়ো হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, জনতা কে নেই সেদিন ময়দানে? সবার হাতে বাঁশের লাঠি। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আপামর জনতা। কখন নেতা আসবেন? কি বলবেন তিনি আজ জনতার উদ্দেশ্যে? লাখো জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা"। জয় বাংলা—জয় বঙ্গবন্ধু।

নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে তিনি এলেন। ধীর পায়ে মঞ্চে উঠলেন। লাখো জনতার দিকে তাকালেন। তারপর শুরু করলেন—"ভাইয়েরা আমার ..."। মাত্র ১৮ মিনিটের ভাষণ। শেষ করলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। কি বললেন তিনি এই ১৮ মিনিটে? একি ভাষণ? নাকি মহাকাব্য? প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উচ্চারণ মুক্তি পাগল মানুষকে উদ্ভাসিত করেছে তাঁর এই ভাষণ। অনুপ্রাণিত হয়েছে জনতা। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক দলিলকে। কেউ কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন অথবা ব্রিটেনের এককালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষণের সাথে তুলনা করেছেন।

তিনি কি বলবেন কারো জানা ছিল না। মঞ্চে আসার আগে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করলেও একমাত্র তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জানতেন তিনি কি বলবেন, কতটুকু বলবেন। কারণ ভাষণটি কোনো লিখিত ভাষণ ছিল না। শুধুমাত্র নিজের ভাষায় মন থেকে চলে আসা কথামালা দিয়ে তিনি সাজিয়ে

ছিলেন এই দলিল। যেন কবিতার পংক্তি মালা। কবিতার ছন্দে ছন্দে ছিল দিক নির্দেশনা। তিনি তাঁর ভাষণে তুলে ধরেছিলেন পঁচিশ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস। তুলে ধরেছিলেন বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্যাতনের কাহিনি। বলেছেন কীভাবে মুক্তি পাবে বাঙালি জাতি। আকাশে তখন হেলিকপ্টার উড়ছে। বঙ্গবন্ধু সব কিছুই বুঝতে পারছিলেন। তাই তিনি কৌশলী ভাষণ দিলেন। একদিকে তিনি শাসক চক্রের কাছে কিছু দাবি তুলে ধরলেন অন্যদিকে কী করতে হবে তা জনতাকে জানিয়ে দিলেন। তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বললেন। এতো গেরিলা যুদ্ধের দিক নির্দেশনা। তিনি কি গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন? কী ছিলেন না শেখ মুজিব! তিনি বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি বললেন "আমি যদি হুকুম দিতে নাও পারি ..."। অর্থাৎ তিনি আমাদের মাঝে না থাকলে কি করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। তাইতো তিনি যার যা আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়—তাদের অধিকার ফিরে পেতে চায়"। তাইতো চারণ কবি বলে দিয়েছেন—"মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি—রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্"।

তারপরেই তাঁর সেই সময়োপযোগী উচ্চারণ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তিনি খুব কৌশলে বক্তৃতা শেষ করলেন। তাঁর ভাষণে কারো কিছু বুঝবার বাকি ছিল না। অথচ তিনি সরাসরি যুদ্ধ শুরুর কথা বলেননি। তা হতো হঠকারী সিদ্ধান্ত। উক্ত জনসভায়ই তখন পাক হায়েনা ঝাপিয়ে পড়তো। তাই একদিকে তিনি মুক্তির আন্দোলনকে তরান্বিত করতে বললেন—অন্যদিকে বললেন স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। তারপর কখন কী করতে হবে, কখন যুদ্ধে যেতে হবে—কীভাবে রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে অতি সংক্ষেপে তিনি সব কিছু পরিস্কার করে দিয়েছেন। অথচ তাঁকে দোষারোপ করার সুযোগ ছিল না পাকিস্তানিদের। কারণ একদিকে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন তিনি। কোর্টকাচারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সকল সরকারি অফিস আদালত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার আহ্বান করলেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন চূড়ান্ত আঘাত আসুক শত্রু পক্ষ থেকে। তখনই বাঙালি গড়ে তুলবে প্রতিরোধ। কী দূরদর্শিতা ছিল তাঁর। হয়েছেও ঠিক তাই। ২৫ মার্চের কালো রাতে যখন পাক বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের উপর ট্যাংক কামান নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে, চালায় ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ, ঠিক তখনই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন।

তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন এমন কাজ আমরা যেন না করি যাতে আমাদের বদনাম হয়। অর্থাৎ আমাদের যেন কেউ আক্রমণকারী না ভাবে।

বলেছিলেন আঘাত এলে যেন প্রতিঘাত করি। তিনি উষ্কানীর মুখে ধৈর্য ধরতে বললেন। অবাঙালির প্রতি যেন কোনো অন্যায় করা না হয়। বলেছেন তারা আমাদের ভাই। কতবড় মানবিক গুণ থাকলে কত বড় মহৎ হলে এমনভাবে কেউ বলতে পারেন।

তিনি তাঁর ভাষণে শাসকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। বলেছেন "তোমরা আর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি বাঙালিকে আর দাবায়ে রাখতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল অত্যন্ত পরিমার্জিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে খুব সচেতন ছিলেন। যাতে তাঁর মুখ থেকে কোনো অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে না আসে।

তারপরেও যারা সচেতন নাগরিক, দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য যারা জীবন বাজী রেখে ছিল, মুক্তি পাগল এসব বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের "গ্রীন সিগন্যাল" হিসাবেই ধরে নিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ৭ মার্চের পর থেকেই একদিকে অসহযোগ আন্দোলন অন্যদিকে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ চলছিল।

তাই বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মাঝে যে দিকনির্দেশনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেছে তার সাথে অন্য কোনো বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ভাষণের সাথে তুলনা চলে না। তাঁর ভাষণ ছিল তুলনাহীন। ইতিহাসের এক মহাকাব্য। তিনি সেদিন যে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন তারই পথ ধরে ধীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তান বাহিনীর মতো একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছিল মুক্তিযোদ্ধারা।

তিনি তাঁর ভাষণে গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে বলেছিলেন। সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে যাতে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করা যায় তারই জন্য এই আহ্বান। তাইতো তাঁর ভাষণের পরপরই টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত গণজাগরণ শুরু হয়ে যায়। প্রতিটি গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়নে শুরু হয়ে যায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে একদিকে শহরের ছাত্র জনতা ডামি রাইফেল নিয়ে ট্রেনিংয়ের মহড়া দিতে থাকে অন্যদিকে গ্রামের মানুষ বাঁশের লাঠি, দা, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

এমননিভাবে ৭ মার্চের ভাষণ দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে আলোড়িত করেছিল। উজ্জীবিত করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। তাইতো ৭ মার্চের ভাষণ শুধু একটি বক্তৃতা নয়—এ ভাষণ ইতিহাসের এক মহাকাব্য।

৭ মার্চ, আরেক 'মনুম্যান্ট'

হারুন হাবীব

ইতিহাসের একটি শরীর আছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। ইতিহাস বোবা নয়, বধির নয়। এমনিতে বড্ড বেশি নীরব সে। কদাচিৎ মুখ ফুটে কথা বলে। বড্ড বেশি বাধ্য না হলে অচলায়তন পাহাড়ের মতো শুধুই সে দেখে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর। শুধু দেখে যায়।

ভূ-তত্ত্ববিদরা যেমন জানেন পাহাড়ের ক্ষোভ ফুটে বেরোয় কখনো না কখনো, ইতিহাসবিদরাও জানেন ইতিহাসের ক্ষোভ ফেটে বেরোয় সময়ে, প্রয়োজনে। পাহাড় যেমন বিস্ফোরিত হয় পুঞ্জীভূত জ্বালায়, ক্ষোভে, ইতিহাসও তেমন সরব হয় তার দেহ, শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ক্রমাগত আঘাত করার প্রতিশোধে। পাহাড়ের অগ্ন্যুৎপাতে, আগ্নেয়গিরির আগুনে, লাভায় যেমন জনপদ ধ্বংস হয়, জীবজগৎ পিষ্ট হয়, ইতিহাসের প্রতিশোধেও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অকৃতজ্ঞ জনপদ, ঘাতক জনগোষ্ঠী।

আমাদের এ গাঙ্গেয় সমতলে পাহাড় তেমন নেই। আগ্নেয়গিরি নেই। কিন্তু ইতিহাসের পাহাড় আছে। এই সব পাহাড় গড়ে ওঠেছে হাজার লক্ষ বাঙালির রক্তে, অবদানে, আশা আর আকাঙ্ক্ষায় এবং আমার ধারণা, এই সুবিশাল পাহাড়গুলোর বুকে বছরে বছরে জমানো ক্ষোভগুলো দ্রুত সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠছে। আজ হোক কাল হোক বিস্ফোরিত হবে সেই আগ্নেয়গিরি। আজ হোক কাল হোক সে বিস্ফোরণের তপ্ত লাভা প্লাবিত করে দেবে অকৃতজ্ঞ জনপদ, ঘাতক জনগোষ্ঠী।

বাঙালি জাতির এ যাবৎকালের সময়ে অনেকগুলো হিমালয় আকাশ ছুঁয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই হিমালয় সুবিশাল। দাঁড়িয়েছে একুশে

ফেব্রুয়ারি, দাঁড়িয়েছে শহীদ মিনার, দাঁড়িয়েছে ২৬ মার্চ, দাঁড়িয়েছে ৭ মার্চ, দাঁড়িয়েছে ১৬ ডিসেম্বর আর দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজী সুভাষ বসু, মাষ্টার দা সূর্য সেন, সুকান্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শেরে বাঙলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সত্যজিত রায়। বাঙালি যদি একটি দেহ হয় সে দেহের স্তম্ভ এঁরা, সে শরীরের বল এঁরা, প্রতীক এঁরা। কিন্তু ইতিহাসের এ শরীরকে আঘাত করে চলেছি আমরা ক্রমাগত। শহীদ মিনারের বেদীতে আঘাত করার শুরুটা এ-যাবৎকালে হয় নি। কিন্তু একচল্লিশ বছর পর হলেও বাঙালির অস্তিত্বে আঘাতকারীরা সফল হয়েছে। শহীদ মিনারে হামলা হয়েছে। এই একটি জায়গা বাদ ছিলো, সেখানেও আঘাত হলো।

অর্থাৎ বাঙালির সকল চেতনা আর স্তম্ভের গৃহগুলোকে আঘাতে আঘাতে বিনাশ করতে চায় ওরা। বাঙালির প্রতিটি অহঙকারে হামলা করে বাঙালিকে পরজীবী তৃণতে পরিণত করতে চায়। রবীন্দ্রনাথে ওদের আঘাত ক্রমাগত। যে নজরুলকে জীবদ্দশায় ওরা কাফের বলে শাসিয়েছে, সেই নজরুলকে এখন জাত বিভাজনের তলোয়ার বানিয়েছে ওঁরা। যে ২৬ মার্চ বাঙালির জাতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছে, সে ২৬ মার্চকে ওরা এখন বদলাতে চায়। যে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ঘটেছিলো তিরান্নব্বই হাজার হানাদার, বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যের পরাজয়ের মাঝ দিয়ে, সেই ১৬ ডিসেম্বরের নাম আর স্মৃতিকে আজ ওরা পাল্টে দিতে চায়।

ওদের টার্গেট পরিষ্কার। ইতিহাসের যে স্তম্ভগুলো বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাত-চেতনা শানিত করে, স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করে, তাকে ধ্বংস করে দাও। যে স্তম্ভগুলো বাঙালিকে শেখায় তুমি হিন্দু নও, তুমি মুসলিম নও, বৌদ্ধ নও, খ্রিস্টান নও, তুমি মানুষ, তুমি বাঙালি, তাকে গুড়িয়ে দাও।

আজ ৭ মার্চ। এই ৭ মার্চ বাঙালির ইতিহাস, শরীরের একটি বৃহৎ অঙ্গ। এই ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিয়েছিলেন বাঙালিকে রমনার রেসকোর্স ময়দানে, মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে ওঠার মাত্র ১৫ দিন আগে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সকাল থেকে অপেক্ষা করেছিলো আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। নেতা আসবেন, নেতা নির্দেশ দেবেন, কী করতে হবে এখন। গোটা পূর্ববাংলা বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে। দেশের যততত্র সেনাবাহিনী গুলি করে মারছে বাঙালি। ইয়াহিয়া খান আর জুলফিকার আলী ভুট্টোদের চক্রান্ত ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। বাঙালিদের হাতে ওরা যে কোনোকালেই পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দেবে না, স্পষ্ট সব ষড়যন্ত্র বোঝা যাচ্ছে।

আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র। চব্বিশ বছরের পাকিস্তান বাঙালির স্বাধীন জাত-অহংকারের জন্যে কতটুকুন সাঁড়াশি, তা আমরা মর্মে মর্মে জানি। একটি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সংখ্যালঘিষ্ঠের হাতে নিষ্পেষণের নজির আছে।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের শোষণ-নির্যাতন উপনিবেশবাদী বর্বরতাকেও ছাড়িয়েছে। জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ অর্জিত হবে পূর্ববাংলায় কিন্তু উন্নয়নের নব্বই ভাগ হবে পশ্চিম পাকিস্তানে। বাঙালি যেনো পাকিস্তানের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। অচ্ছুৎ প্রাণী। সেনাবাহিনী, সরকারি চাকরি, মিল-কারখানা এবং রাজনীতি—সব ক্ষেত্রে বাঙালি পাকিস্তানি উপনিবেশবাদীদের শিকার। এরপর আছে বাঙালিদের 'খাঁটি মুসলমান' বানাবার নিত্যনতুন বৈরী সাংস্কৃতিক কৌশল। কখনো ভাষার ওপর আঘাত, কখনো বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে নেয়ার কসরৎ, আবার কখনো একশ্রেণীর বাঙালি দালালদের দিয়ে শিল্প-সাহিত্যকে বিকৃত করে বাঙালিকে জাতচ্যুত করার চেষ্টা।

বাঙালির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই ষড়যন্ত্র বুঝেছিলেন শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। বুঝেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জননেতা মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ভাসানী ও শেখ মুজিবের বিদ্রোহ ছিলো প্রত্যক্ষ এবং প্রচণ্ড। বিশেষত নেতৃত্বের যোগ্যতায় এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে গোটা বাঙালি জনগোষ্ঠীকে সত্তরের নির্বাচনে নিজ দল আওয়ামী লীগের পতাকাতলে এনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে বিরল যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন মুজিব-তা তাকে সকল যুগের সকল বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতার শীর্ষে স্থান দিয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

কিন্তু একজন বাঙালির হাতে ইসলামিক (!) পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দেয়া যায় কী করে! অতএব আবারও ষড়যন্ত্র। নির্বাচনের রায় যে মানা হবে না তার সকল প্রস্তুতি নিচ্ছে ইয়াহিয়া খান, পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর জুলফিকার আলী ভুট্টো। বাঙালির মুক্তির ইচ্ছেকে তারা বুলেট-বেয়নেটে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। গণরায়কে তারা বুটের তলায় মিশিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে দাঁড়াতে পারে নি ওরা। পরাজয় মানতে হয়েছে। মাথা অবনত করে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

সংকটময় সেই সময়ে রমনা রেসকোর্সে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির নেতা মুজিব। ৭ মার্চ, ১৯৭১। জাতীয় মহাদুর্দিনে গোটা জনসমষ্টিকে দিক-নির্দেশনা দিতে হবে তাঁকে। নেতৃত্বের আজ কঠোর পরীক্ষা। যে-কোনো হঠকারী ঘোষণা তাঁকে পরিহার করতে হবে। বিক্ষুব্ধ জাগ্রত দেশ তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায়। তাদের বলতে হবে, কী তাদের করণীয়। বঙ্গবন্ধু যা বলবেন-তাই হবে আইন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, ভয়াবহ সেই জাতীয় দুর্দিনে যে ভাষণ তিনি রেখেছিলেন সে ভাষণ একমাত্র শেখ মুজিব বলেই বোধকরি সম্ভব হয়েছিলো। আজ, প্রায় দুই যুগ পর যখন ভাবতে চেষ্টা করি, মনে হয়, ঐ মানুষটির জন্ম না হলে বাঙালি কি তার জাতীয় ইতিহাসের প্রথম স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশ গড়তে পারতো কখনো?

ভাইয়েরা আমার

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণের সেই টেপটি আজ বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের সম্পদ। শুধু ৭ মার্চ এলেই এই টেপ আজ বেজে ওঠে না, এই টেপ বেজে ওঠে যখন বাঙালির রক্তার্জিত স্বাধীনতা, জাত-স্বাতন্ত্র্য আর অধিকার আবারও সেই পুরনো ষড়যন্ত্রকারীদের নতুন বংশধরদের হাতে আক্রান্ত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে শহীদ মিনার যেমন, মেহেরপুরের মুজিবনগর যেমন, সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ যেমন, বাঙালির ইতিহাসের তেমনি আরেক মন্যুমেন্ট আজ রমনা রেসকোর্সের সেই ভাষণ, সেই স্থান।

"আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জর্জ কোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়। আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে, সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা সব বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।"

৭ মার্চের সেই ভাষণ জাতীয়তাবাদী এই রাজনৈতিক প্রবাদপুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ। এই ভাষণটিকে থাকবে, যদ্দিন বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহা টিকে থাকবে, যদ্দিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে। ইতিহাস সত্যের স্বার্থেই, নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতাবিরোধীদের সচেতন ইতিহাস বিকৃতি থেকে রক্ষা করার স্বার্থেই, এই ভাষণ যত বেশি সম্ভব প্রচার হওয়া উচিত। নতুনদের, নতুন নাগরিকদের জানা উচিত, তার স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ছাত্র-কর্মী হিসেবে আমরা ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে উপস্থিত থেকেছিলাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ে জায়গা করে নিয়েছিলাম আমরা সেদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ শুনতে। সেদিন বড্ড বেশি বিমর্ষ দেখাচ্ছিলো বাঙালির জাতীয় নেতাকে। কিন্তু বক্তব্যে তাঁর একবিন্দু জড়তা ছিলো না। সিদ্ধান্তে তার এতটুকুন অস্পষ্টতা ছিলো না। করতালি, জয়বাংলা শ্লোগান স্বাধীনতার, আর বিদ্রোহের হুংকারে ফেটে পড়ছিলো লক্ষ লক্ষ জনতা রমনার রেসকোর্সে। শোনা যাচ্ছে ইয়াহিয়া, ভুট্টো ঢাকায় আসবেন বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলতে। অন্যদিকে গোটা দেশে সেনাবাহিনীর চলাচল শুরু হয়েছে। এ মহূর্তে জাতিকে কি নির্দেশ, কি দিক-নির্দেশনা দেবেন স্বাধীনতাকামী সাড়ে ৭ কোটি মানুষের নেতা? সেই সংকট-সংকুল সময়ে বললেন বঙ্গবন্ধু "কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে ক্ষতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধে বাংলাদেশকে মুক্ত, স্বাধীন করার প্রথম প্রত্যক্ষ ঘোষণা। বাঙালির স্বাধীনতার প্রথম প্রকাশ্য উচ্চারণ। এই ভাষণের পর থেকেই গ্রামগঞ্জে, শহরবন্দরে প্রতিরোধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মানুষ সম্ভাব্য পাকিস্তানি হামলা প্রতিরোধে। কর্তব্য স্থির করে নেয় দেশপ্রেমিক বাঙালি সেনাবাহিনী, ইপিআর। কেউ কেউ ইদানীং এও আবার বলা শুরু করেছেন যে, সেদিন ভাষণের শেষ টানতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলেছিলেন! এই ধরনের সচেতন মিথ্যাচার, বিকৃতিগুলো জাতির স্বার্থেই পরিহার করা মঙ্গল। কারণ রাজনীতি বা দলীয় রাজনীতিকে চালিত করতে এমন অন্তত কদর্য ইতিহাস বিকৃতির প্রয়োজন পড়ে না। আর এ ধরনের বিকৃতি অব্যাহত থাকলে তা যে অবশ্যই আগ্নেয়গিরি হয়ে বিস্ফোরিত হবে একদিন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ইতিহাস বিকৃতির এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে ক'দিন আগে শোনা শ্রদ্ধেয় ডক্টর আনিসুজ্জামানের বলা একটি গল্প মনে পড়ে। বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলেছিলেন

গল্পটা এক অনুষ্ঠানে। একবার এক বাঁদর ছেলে ইতিহাস বিষয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে শূন্য পাবার যোগ্যতা নিয়ে পরীক্ষার হলে বসেছিলো। বলাই বাহুল্য, মন তার ভীষণ খারাপ। খারাপ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলে বাবা স্বাভাবিকভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হলো পরীক্ষা? কিন্তু ছেলে একদম মাথা তুলে না। কোনো উত্তরও দেয় না। এই পরিস্থিতিতে মা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, কী করে ভালো হবে পরীক্ষা? বাঁদর মাস্টারগুলো যদি ছেলের জন্মের আগের কাহিনী লিখতে বলে তাহলে ছেলে আমার পারবে কেন? ওর কি দোষ!

সেই আর্তনাদের ইতিহাস

সৈয়দ শামসুল হক

আমার সৌভাগ্য, ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ আমি উপস্থিত থেকে শুনেছি। আজ স্বীকার করবো, যখন সে বিশাল সভায় উপস্থিত ছিলাম, প্রায় দশলক্ষ মানুষের ভেতরে আমিও বসেছিলাম, তখন এ ভাষণের গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য ভাল করে ধরতে পারিনি। আজ যত দিন যাচ্ছে, যত এ ভাষণের টেপ শুনছি ভাষণের লিখিত বিবরণ পড়ছি এবং কল্পনায় ফিরে যাচ্ছি সেইদিন দুঃসহ দুপুরে, আবিষ্কার করছি এবং প্রতিটি বাক্যের পেছনে মানুষের এক মহান নেতার উপলব্ধি এবং মানুষের আলিঙ্গন করার আকুতি।

এ আকুতি ফুটে উঠেছে প্রথম বাক্যেই যেখানে বঙ্গবন্ধু শুরু করেছেন এই বলে যে, 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন দিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।' তাঁর আর কোনো বক্তৃতা এ রকম একটি উচ্চারণ দিয়ে শুরু হয়নি। শেখ মুজিবের বক্তৃতা আমি পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকেই শুনে আসছি—আর্মানিটোলা ময়দানে, ভিকটোরিয়া পার্ক, রমনায়, পল্টনে; আমি তাঁকে দেখেছি। তাঁর সেই তরুণ দিনে, তিনি মূল বক্তার আগে সভায় আগত মানুষের মনে সুর বেঁধে দেবার দায়িত্বে থাকতেন। চলতি কথায় যাকে বলে আসর গরম করা, তিনি আসর গরম করতেন; সেই পর্যায়ে থেকে এগিয়ে তিনি যখন প্রথম সারির জাতীয় নেতায় পরিণত হলেন, তখনও তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, সভায় উপস্থিত থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সে সভায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়, সে দিনের তাঁর ভাষণ তো ভুলবার নয়, কত মর্মস্পর্শী ছিল সেই ভাষণ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে

সদ্যমুক্ত শেখ মুজিব কি আবেগ নিয়ে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন তাঁকে গ্রেফতার এবং তাঁর ওপর নির্যাতন এবং বাংলাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের ইতিহাস; কিন্তু কোনো বক্তৃতাই একাত্তর সালের সাতই মার্চ তারিখের বক্তৃতার মতো তিনি শুরু করেননি।

এ বক্তৃতার দ্বিতীয় বাক্য তিনি উচ্চারণ করেন, 'আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন'। খুব ছোট একটি বাক্য; বক্তৃতা থেকে সরিয়ে নিলে মনে হতে পারে, খুবই সাধারণ একটি বাক্য কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি একাত্তরের সেই দিনগুলোর কথা যখন নির্বাচন হয়ে গেছে, অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বাধা দেয়া হচ্ছে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে, যখন সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে, বাংলার মাটি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কামারশালার লোহার মতো এবং রাজনেতিক পরিস্থিতি এমন একটি পর্যায়ে গেছে যখন মানুষ, বাংলার মানুষ, শুনতে চায় স্বাধীনতার ঘোষণা, তখন বঙ্গবন্ধুর এ বাক্য 'আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন' আর সাধারণ একটি বাক্য হয়ে থাকে না; এ বাক্য একটি আলিঙ্গন হয়ে যায়, এ বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে নেতা তাঁর মানুষের ভেতরে নিজেকে সর্বাংশে বিলিয়ে দেন; তিনি জনতার হয়ে যান, তাঁর হয়ে যায় এবং এ বাক্যের পেছনে যেন শুনতে পাওয়া যায় এ কথাটি, যে, অতঃপর আমাদের পথ কি, সেটা আমরা সকলেই এখন বুঝতে পারছি। এরপর সমর্থন পাওয়া যায় পরের বাক্যে—'আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি' অর্থাৎ চেষ্টা করবার বাকী আর কিছু নেই। এখন আমাদের সম্পূর্ণ অন্যপথ অবলম্বন করতে হবে; অর্থাৎ এতদিন আমরা সংসদীয় সংগ্রাম কেরছি, এবার অন্য ধরনের সংগ্রাম করতে হবে; বলাবাহুল্য, এ সংগ্রাম একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম, এ ভিন্ন আর কিছু নয়।

সশস্ত্র সংগ্রামের সরাসরি ডাক দেবার আগে, রক্তের পথে মানুষকে আহ্বান করবার আগে নেতা আমাদের কানে এবং কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে তুলে দেন একটি শব্দ 'রক্ত'। তিনি উচ্চারণ করেন, 'কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।' নিপুণ একজন ভাষাশিল্পীর মতো, তুখোড় একজন নাট্যকারের মতো বঙ্গবন্ধু সম্মুখের সংগ্রামের জন্য মানুষকে তৈরি করবার উদ্দেশ্য 'রক্ত' শব্দটি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবার আগে খুব সংক্ষেপে ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেন। আবারও তিনি ফিরে যান 'রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত' করবার কথায়। বঙ্গবন্ধু এভাবে বলেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় আমরা করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলার মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং দেশকে গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে

বলতে হয়, তেইশ বছরের করুণ ইতিহাস-বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।'

আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, বঙ্গবন্ধু এ কথাগুলো উচ্চারণ করবার সময় তখনকার গোটা পাকিস্তানকে আর ভাবছেন না, তিনি বাংলাদেশের কথা বলছেন, বাংলাদেশের মানুষের কথা বলছেন, 'এ দেশের' কথা বলছেন এবং আমরা এটাও লক্ষ্য না করে পারি না যে, তিনি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা ভাবছেন, অর্থাৎ এই ভূ-খণ্ডের সার্বিক মুক্তি তথা স্বাধীনতার কথা তাঁর মনে কাজ করছে। এ স্বাধীনতার কথা তাঁর ভেতরে কাজ করছে কলেই তিনি ভুলে যাচ্ছেন না, এ সংগ্রাম হবে রক্তাক্ত আর তাই রক্তের প্রসঙ্গে তিনি ফিরে যাচ্ছেন আবার।

রক্তের প্রসঙ্গে তিনি ফিরে যাচ্ছেন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, তাই তিনি অতঃপর বলছেন, '১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি'।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন বঙ্গবন্ধু যখন বলেছিলেন, বাঙলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস—জনতার ভেতরে শত শত মাইকে যখন ধ্বনিত হচ্ছিল এ কথা, আমরা প্রত্যেকেই ভেতরে অনুভব করি অসামান্য এ প্রেরণা এবং মুহূর্তে হয়ে যাই সৈনিক।

বঙ্গবন্ধুর এ বক্তৃতার এ অংশটুকুই আমাদের এমনভাবে মুহূর্তে বদলে দিয়ে যায় যে, আমি এখন বুঝতে পারি, সেদিন কেন সভা শেষে জনতা হতাশ বোধ করেছিল, জনতা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, পারলে তক্ষুণি তারা ক্যান্টনমেন্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেদিন।

কিন্তু সংগ্রামের পুরোভাগে যিনি আছেন, সংগ্রামের পথে জনগণকে যিনি নিয়ে যাচ্ছেন তাঁকে অনেক দিক বিবেচনা করে পা ফেলতে হয়, সময় যে এখনও আসেনি তাঁর ইঙ্গিত তিনি বক্তৃতার শেষ মিনিটে রেখেছেন এই বলে যে, 'বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন।' তিনি বলছেন 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' অর্থাৎ এখনও কিছুটা বাকি আছে, এখন কেবল তীব্র, দ্রুত, চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাল। এ সংগ্রামই যে হবে চূড়ান্ত সংগ্রাম, সেটাও আর গোপন থাকে না যখন নেতা শেষবারের মতো রক্তের প্রসঙ্গে ফিরে যান এবং ডাক দেন এই বলে যে, 'রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা যে তিনি কিছুক্ষণ আগে উচ্চারণ করেছিলেন, আসলে তা যে স্বাধীনতার কথা, সেটাই তিনি স্পষ্ট করে দিয়ে যান বক্তৃতার শেষবাক্যে এবং দু'হাত তুলে, এ প্রথম বারের মতো তিনি রণহুংকারের স্বরে গর্জে ওঠেন, 'জয় বাংলা।'

সেই 'জয় বাংলা' কণ্ঠে তুলে নিয়েই এদেশের মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেই 'জয় বাংলা' আজ জাতীয় জীবন থেকে নির্বাসিত। বঙ্গবন্ধু যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা বলেছেন, তাও আজ সেদিনের মতোই সুদূরে। বর্তমান পরিস্থিতি এই যে, বাইরের প্রভুর আসনে বসেছে ঘরের প্রভু এবং জনতা এখনও আর্তনাদ করছে। বঙ্গবন্ধু ভাষায়, আমাদের ইতিহাস এখনো 'মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদেরই ইতিহাস।'

কিন্তু আরও একটি সংগ্রামের জন্য আমাদের তৈরি করবে কে? আমি অত্যন্ত আশা নিয়ে তাকিয়ে আছি।

৭ মার্চের কবিতা

মহাদেব সাহা

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই লাবণ্যমোড়ানো দুপুর, সেই দীপ্ত, উজ্জ্বল ঝলকিত মধ্যাহ্ন, অশ্বক্ষুরধ্বনিতে যে ময়দান থাকত মুখরিত সেই মার্চ মানুষের পদশব্দে প্রকম্পিত, মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরও উদ্দীপ্ত আলোকিত সেই প্রান্তরে, লোকে লোকারণ্য, লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত জয়বাংলা; আমার চোখে ভাসে সেই ইতিহাসের দীপ্ত ভাস্বর পৃষ্ঠাগুলি, মানবসমুদ্র, এ এক অভূতপূর্ব অলোকসামান্য দৃশ্য, চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে দিলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় মানবেতিহাসের এক অসাধারণ মুহূর্ত, তুলনারহিত, অনন্য। মনে হয় এই দিনটির জন্য এই অপরূপ অপরাহ্নের জন্য একটি জাতি হাজার বছর অপেক্ষা করেছে। এই দিনটির নাম ৭ মার্চ, বাঙালির স্বাধীনতার জন্মদিন। এই দিন আকাশ নেমে আসে মাটিতে, বারোশত নদী কলোলিত হয়ে ওঠে এই ভূখণ্ডের মানচিত্রে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন আলো ছড়াতে থাকে অবিরল ধারায়, আমি মুগ্ধ হয়ে সেই আকাশপ্লাবিত আলোকধারার মধ্যে ডুবে থাকি যেন মহাকালের কণ্ঠ শুনতে পাই। এই দৃশ্যের, এই বিশাল বিপুল চিত্রনাট্যের, মানুষের নবজাগরণের এই চিত্রময় মহাকব্যের বর্ণনা সাধ্যাহীত, শুধু তার প্রান্ত স্পর্শ করা যায়, সেই মহাসাগরের তীর স্পর্শ করা যায়। আমিও তাই করতে চেষ্টা করেছিলাম, এই অনিঃশ্বেষ অন্তহীন ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে কেবল প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলাম তার উচ্চতা, তার বিশালত্ব, তার ব্যঞ্জনা। বহু বছর বহু শতাব্দী পর একটি জাতির জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, সে দেখতে পায় তার সব গান মুক্তির গান, সব কবিতা মুক্তির কবিতা, সেই গৌরবের, সেই শৌর্যের, সেই নবউত্থানের একেকটি পৃষ্ঠা সহসা খুলে দিতে থাকে তার চোখের সম্মুখে। আমাদেরও তা-ই হচ্ছিল। আমরা দেখেছিলাম সেই মহানায়কের কণ্ঠে সেই ইতিহাসপুরুষের উচ্চারণে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল আমাদের

জীবনে সেই প্রথম শোনা শব্দ স্বাধীনতা, কীভাবে ইথারে বায়ুমণ্ডলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই শব্দ, স্বাধীনতা। আমি স্বাধীনতার এই জন্মমুহূর্ত দেখেছিলাম, শিহরিত রোমাঞ্চিত অভিভূত হয়েছিলাম। এ আমার মানবজন্মের এক শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, স্বাধীনতার জন্মদিন, স্বাধীনতার মহানায়কের জন্মদিন; আমি বিস্মিত হই কীভাবে এই স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। দুটি দিনই এই মার্চে। একি শুধুই কাকতালীয় না পূর্বনির্দিষ্ট, ইতিহাসপরম্পরা? ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম হয়েছিল প্রবাদপুরুষ শেখ মুজিবের, বলা কি যায় না যে সেদিনই নির্দিষ্ট হয়েছিল একটি নতুন দেশের স্বাধীনতা, এতো মিথ্যা নয় যে, তাঁরই জীবনে লভিয়া জন্ম জাগিল সকল দেশ। বিধাতাপুরুষ সেদিনই মহাকালের খাতায় ৭ মার্চের কথা লিখে রেখেছিলেন যেদিন টুঙ্গিপাড়ার এই নবজাতক শেখ মুজিবের কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হবে বাঙালির প্রিয় স্বাধীনতা, তাঁরই মনের পাতায় লেখা হবে সেই স্বতঃস্ফূর্ত স্বতোৎসারিত অমর কাব্য, অসাধারণ পংক্তি, যার অন্ত্যমিল, ধ্বনি-ব্যঞ্জনা, শব্দ-ঝংকার যুগ যুগ ধরে মোহিত আবেগায়িত বিমুগ্ধ করবে, পৌঁছে দেবে এক মহত্তর বোধে, সে এক তুলনাহীন শব্দচয়ন স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় লেখা অনবদ্য কবিতা, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। মাত্রা, ছন্দে, শব্দগঠনে এ এক অসামান্য কবিতা, এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার মুহূর্তেই আবহমান বাংলা ও বাঙালির জীবন যেন স্পন্দিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, জেগে ওঠে তার হাজার বছরের ইতিহাস, সভ্যতা, তার মনোজগৎ, এক সঙ্গে গেয়ে ওঠে বাংলার সব পাখি, প্রস্ফূটিত হয়ে ওঠে সব ফুল, ভরে ওঠে সব নদী, আমরা মহাসাগরের কলধ্বনি শুনতে পাই, আমাদের সাহসে, শৌর্যে, শক্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয় সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক কর্তব্যবোধের পুরোভাগে, বাঙালির গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের পরম ত্যাগ ও বীরত্বের মুখে, আমরা আমাদের চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠি। এই কবিতা যিনি রচনা করেন, এই স্বাধীনতা যিনি রচনা করেন, যিনি রচনা করেন বাঙালির এই মহাকাব্য তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

কবিই তিনি, রবীন্দ্রনাথ যেমন নজরুল যেমন। এই দিন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি অন্য এক মানুষ, কবি, ধ্যানী, দ্রোহী, প্রেমিক, দার্শনিক, বাঙালির আজন্মলালিত স্বপ্নের রূপকার। আমি যখন তাঁকে দেখি সেই গণমঞ্চের উদ্যানে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে চারিদিক, মুহুর্মুহু করতালি আর গগনবিদারী জয়ধ্বনি, যেন এক অমর্ত্যলোকের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই সবুজ প্রান্তরে, শত সহস্র বছরের জলকল্লোল যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠেছে দুই পংক্তির এই কবিতার মধ্য দিয়ে, সেই উদার প্রকৃতির কোলে মাথার উপর দিয়ে প্রদক্ষিণরত দস্যুদানবদের ভয়াল ভ্রুকুটি ও নখদন্ত উপেক্ষা করে জনসমুদ্রের গর্জন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছে, বঙ্গবন্ধু মঞ্চে ওঠে এলেন, আমি দেখলাম তাঁর চোখেমুখে এক অপূর্ব আলো

বিচ্ছুরিত হয়ে, হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আমার সোনার বাংলা, এমন আশ্চর্য জীবন্ত কবিতা আমি আর কখনো দেখিনি, তিনি আমাদের জাগিয়ে দিলেন, অভয়মন্ত্রে উজ্জীবিত প্রাণিত করে তুললেন, আমরা দেখতে পেলাম একটি সবুজ স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি স্বাধীন মানচিত্র, একটি স্বাধীন পতাকা।

আর কোথাও, কোনো কালে, কোনো পুরাণে, ইতহাসে কোনো জাতির এমন স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা ও আনন্দ আছে বলে জানি না, এমন ভাষণ, এমন কবিত্বময় শব্দযোজনা, এমন আহ্বান, এমন মুক্তির গান কেউ কোনোদিন উন্মুক্ত প্রান্তরে লক্ষ জনতার সমাবেশে শুনেছে বলে মনে হয় না, পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্র বা জননেতার, আর কোনো মনীষী বা মহানায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বলার উপায় নেই, এ ভাষণ একক, অনন্য, অভূতপূর্ব। এই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীনতার ডাক, ছন্দে, দ্যোতনায়, অন্ত্যমিলে, ব্যঞ্জনায় পৃথিবীর আর কোনো জননেতার ভাষণের সঙ্গে যার তুলনা চলে না, অদ্বিতীয়, তুলনাহীন, এ এক রাজনীতির কবির অন্তর্দৃষ্টি, ভাব ও ব্যঞ্জনার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ, স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক রচনা। এই ভাষণকে আমি বলতে চাই বাঙালির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার কবিতা। এই কবিতা নিজের অন্তরে, মর্মমূলে ধারণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমি এই কণ্ঠ যখন শুনি তখন মহাসাগরের কলধ্বনি শুনতে পাই, আকাশ ও প্রকৃতির অন্তর্প্রদেশের গভীরতম ব্যঞ্জনা শুনতে পাই, মানুষের মুক্তির গান শুনতে পাই। ৭ মার্চের ভাষণ একই সঙ্গে আমাদের শাশ্বত ইতিহাস, আমাদের শাশ্বত কবিতা।

৭ মার্চ, '৭১ ও বঙ্গবন্ধু

ম. হামিদ

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিতকারী বেতার ভাষণ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে, আমি দেখেছি জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে লাঠিসোটা নিয়ে। তাদের মুখে স্লোগান ছিল—আমাদের শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। এইভাবে সাধারণ মানুষ হাতে লাঠিসোটা, বাঁশ, সাধারণ অস্ত্র নিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল করতে করতে রাস্তায় নেমে গেল। প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

পূর্ববাংলার মানুষের প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে তখন বঙ্গবন্ধু। সবাই তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি কী বলবেন, কোন আহ্বান জানান—সেটা জানার জন্যই মানুষের অধীর অপেক্ষা।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হল। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের ইশতেহার ঘোষণা করা হল। ঘোষণা হল ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে, বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সার্কুলার জারি হতে থাকল, কীভাবে দেশ চলবে এবং কীভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার নির্দেশ দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা পুরোপুরিই বঙ্গবন্ধুর হাতে। সকল সরকারি অফিস-আদালত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাকল। তিনি অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন আগেই। সেই অসহযোগের পাশাপাশি চলছে বিক্ষোভ, আন্দোলন, সংগ্রাম। সেই বিক্ষোভ

দমনে আর্মি, পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। মারা যাচ্ছে মানুষ। এতে করে আন্দোলন আরো তুঙ্গে উঠতে থাকে।

৭ মার্চ নিয়ে সৃষ্টি হল পরম আগ্রহ। বঙ্গবন্ধু সেদিন কী বলবেন তা নিয়ে চলছে জল্পনা, কল্পনা। পুরো জাতিই তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। সেই মুহূর্তে মানুষের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হচ্ছে স্বাধীনতাকে ঘিরে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আর নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া দলের নেতা হিসেবে পুরো পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কাছে হস্তান্তর করার কথা সেটা তারা করল না। উল্টো তারা ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল। আক্রমণ করতে শুরু করল। তাই মানুষের দাবি কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল স্বাধীনতার দিকে।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। তিনি তখন আর শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নেতা নন, পুরো পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁরই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। একদিকে তিনি আওয়ামী লীগের নেতা, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়লাভকারী। সুতরাং তাঁকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় অবশ্যই দিতে হবে। এই যখন পরিস্থিতি তখন তিনি কী বলবেন—এটাই সর্বমহলের আলোচনা ও গবেষণার বিষয়।

আমরা ষাটের দশকে যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছি, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং সেই আন্দোলন-প্রসূত চেতনার আলোকে নিজেদের মনকে শাণিত করেছি—সেই আমাদের মধ্যেও চরম কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধু কী বলবেন তা নিয়ে। যদি তিনি স্বাধনিতা ঘোষণা করেন, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বিমান আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে। সেনাবাহিনীও শুরু করবে নির্বিচার গণহত্যা। স্বাধীনতার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার তা আমাদের আছে কিনা, আমরা ওই মুহূর্তের জন্য তৈরি কিনা তা নিয়ে দ্বিধা। দ্বিধা ছিল তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন কিনা তা নিয়েও। তিনি যদি স্বাধনিতা ঘোষণা না করেন তাহলে সেটা হবে আশাভঙ্গের সামিল। কারণ, আমরা ছাত্ররা, আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলাম যে, স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্পের জন্য আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত নই। এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার গোষণা না এলে এই উন্মাতাল ছাত্র-শক্তি কোন অবস্থান নেবে তা নিয়েও ছিল শঙ্কা।

আমি পরে শুনেছি, বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দিতে আসার টিক আগে বেগম মুজিব তাঁকে আধ ঘণ্টার জন্য শয়নকক্ষে নিয়ে যান বিশ্রামের জন্য। এর আগে বিভিন্নজন গিয়ে তাঁকে নানা ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বেগম মুজিব শয়নকক্ষে স্বামীকে বলেছিলেন, "সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। তোমার সামনে লাঠি, পেছনে বন্ধুক।" এ কথা মানে হল, দেশের জনগণ সামনে লাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর্মি বন্দুক নিয়ে। "এই পরিস্থিতিতে তোমাকে চরম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। এখন তুমি ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নাও কি বলবে। এখান থেকে সরাসরি

তুমি মাঠে যাবে। সেখানে তুমি ভাষণ দেবে। মনে রাখবে, সিদ্ধান্ত তোমাকেই দিতে হবে এখন। জাতির সমস্ত চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে দিতে হবে এ সিদ্ধান্ত।'

এ সাক্ষাৎকারের এ কথাটি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা—আমারই প্রযোজনায় নির্মিত এবং বিটিভিতে প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে।

১৯৭১-এর ৭ মার্চ আমরা নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলাম। সংশয়, দ্বিধা, শঙ্কা, আশা—বিপ্রতীপ নানা আবেগ তখন আমাদের মধ্যে কাজ করছিল। মনে চরম কৌতূহল—কী বলবেন বঙ্গবন্ধু। এমন উভয়সঙ্কট পরিস্থিতি তিনি কীভাবে মোকাবেলা করবেন? আমরা কি খুশি হয়ে ফিরে যাব? নাকি আশাভঙ্গ হব? ফিরতে হবে ক্ষুব্ধতা নিয়ে? আমরা কি এখান থেকেই একটি যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ব? জানি না। উন্মুখ হয়ে বসে আছি—কী বলেন তা শোনার অপেক্ষায়।

বঙ্গবন্ধু মঞ্চে ওঠার পর চারদিক থেকে মুহুর্মুহু স্লোগানে আকাশ-বাতাস যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি যখন ভাষণ শুরু করলেন তখন সব থেমে গেল। বঙ্গবন্ধু শুরু করলেন—"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।" কী চমৎকার একটি সূচনা! শুরুতেই বিশাল জনসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ এবং উন্মুখ মানুষদের তিনি তাদের প্রজ্ঞার জায়গায় স্বীকৃতি দিলেন। অর্থাৎ, মানুষের ওপর তিনি পুরো আস্থা স্থাপন করলেন প্রথমেই। এমন একটি অসাধারণ সূচনা যে হতে পারে তা কারো কল্পনাতেও ছিল না। তারপর তিনি সংক্ষেপে পূর্ব বাংলার মানুষের বঞ্চনার কথা বললেন। কতো আন্দোলন, সংগ্রামের পথ পেরিয়েও বাঙালি যে নিজের অধিকার আদায় করতে পারেনি সে কথা বললেন। তারপর এলেন নির্বাচনের জায়গায়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল হয়েও আওয়ামী লীগকে যে ক্ষমতা দেয়া হল না সেজন্যে দায়ী করলেন ইয়াহিয়া ও ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক ভুট্টোকে। পাকিস্তানের পুরো ইতিহাস জুড়ে যে বৈষম্য, যে ষড়যন্ত্র এবং পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনার কাহিনী তিনি সেই বক্তব্যের মধ্যে সংক্ষেপে তুলে ধরলেন। ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্যতার কথা যেমন ঘোষণা করলেন, তেমনি পাকিস্তান সরকারকে শেষ সুযোগটাও দিলেন। জানিয়ে দিলেন, এখনো সময় আছে। যদি এই কাজগুলো করো তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে, আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব কিনা। চারটি দাবি উত্থাপন করলেন সেই জনসভায়—১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, ২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, ৩. যেসব মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সেসব হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হবে এবং ৪. জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি এই দাবিগুলো উত্থাপন করে শেষবারের মতো পাকিস্তান সরকারকে একটি সুযোগ দিলেন—পরিস্থিতি স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে দেয়ার। অন্যদিকে স্বাধনিতার

অনিবার্যতা ঘোষণার পাশাপাশি তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন এরপর কি কি করতে হবে, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। বক্তৃতা শেষ করলেন সেই অমোঘ বাণী দিয়ে—"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এ এক অসাধারণ বক্তৃতা। আমার নিজেকেও ভাগ্যবান মনে হয় যে, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সরাসরি উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। সেইদনি আমরা এতো তৃপ্ত হয়েছিলাম, এতো আশ্চর্য হয়েছিলাম যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমরা যা যা চেয়েছিলাম তিনি তার সবটুকুই দিয়েছিলেন। স্বাধনিতা ঘোষণা করলে কি হতে পারে তা নিয়ে যে আশঙ্কা করেছিলাম সেই আশঙ্কার দরজাও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানিদের সুযোগ দেননি আক্রমণ করার। অথচ আমাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, তোমরা সামনের দিকে যাও। তোমাদের এই এই কাজগুলো করতে হবে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ৭ মার্চেই হয়ে গেছে। শুধুমাত্র পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির কাছে একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। যদি তোমাদের শুভ ইচ্ছা থাকে তাহলে সুযোগটি তোমরা নিতে পারো। সেটি অবশ্য তারা নেয়নি। যা অনিবার্য তাই ঘটেছে।

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ আমাদের জাতির জীবনে একটি মাইলফলক হয়ে আছে। এই ভাষণের প্রতিটি লাইন বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রতিটি উক্তি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক-একটি পর্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হয়ে আছে। তাঁর ভাষার ব্যবহারও এখানে উল্লেখযোগ্য। শুদ্ধ ভাষার সঙ্গে মাঝে মাঝেই তিনি আঞ্চলিক শব্দের সমন্বয় ঘটিয়েছেন চমৎকারভাবে। এখানে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রাণের কথাগুলো তার মতো করে, তার নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বক্তৃতা আমার মতে পাঠ্য হওয়া উচিত এবং এ বক্তৃতার বিশ্লেষণও থাকা উচিত। বলাবাহুল্য, বক্তৃতার চেয়ে অনেক বড় হবে এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। কারণ এর প্রতিটি ছত্রে জড়িয়ে আছে বাংলার ইতিহাস।

এইরকম একজন বড়মাপের মানুষ যিনি শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন—সেই বঙ্গবন্ধু কখনোই শোষক শ্রেণির রোষাণল থেকে রেহাই পাননি। আসলে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, আবেগটাই বঙ্গবন্ধুর প্রতি ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষেপিয়ে তোলে। চরম দুঃখজনক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় তাঁকে। কতো বড়মাপের মানুষ ছিলেন তিনি, তা কিন্তু আমরা আজো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। একটি রাষ্ট্রের মূল কাঠামোগত যে কাজগুলো প্রয়োজন সেরকম অনেক কাজের ভিত্তি তাঁর সময়ে রচিত হয়েছিল। স্বল্পতম সময়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন তিনি। যে শিশুঅধিকার আইনের কথা আজ বলা হয় বঙ্গবন্ধু সেই আইনের কথা অনেক আগেই বলেছেন। আজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়। বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই যুদ্ধাপরাধের জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং বিচারের কাজ শুরু

করেছিলেন। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে প্রচলিত আইনের সহায়তা নিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী আইনের কাঠামো তৈরি হয়েছিল। শিল্পকলা একাডেমীর স্বপ্ন তাঁর মধ্যে লালিত ছিল। তা তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। তারও আগে, পাকিস্তান আমলে তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি স্বপ্ন দেখতে জানতেন এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপগুলো খুব দ্রুত তিনি নিতে পারতেন। তাঁকে হারানোর মানে এখনো বোঝা হয়নি। বাঙালি এখনো বুঝতেই পারেনি, কাকে হারিয়েছে। তিনি যে কতো দ্রুত দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন তা কল্পনাতেও আসবে না অনেকেরই। আমরা আজো বুঝতে পারি না তাঁর গতিশীলতা কতো প্রখর আর কতো দৃঢ় ছিল। ইতিহাস যদি তাঁর কর্ম দিয়ে তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তাহলে আমরা অনেক আধুনিক ও গতিশীল শেখ মুজিবুর রহমানকে আবিষ্কার করতে পারব।

তিনি বঙ্গবন্ধু। তিনি জাতির পিতা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, গতিশীল নেতা যাঁর সমস্ত কল্পনা জুড়ে ছিল আমাদের এই দেশ আর মানুষ।

৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন

এ কে এম শাহনাওয়াজ

একটি জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক থাকে। নানা ঘটনার ঘনঘটা এই বাঁকগুলোকে স্মৃতিময় করে রাখে। নতুন প্রজন্মের জন্য ছড়িয়ে দেয় প্রেরণা। ইতিহাসের পাতায় অনন্য সংযোজন হয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলার ইতিহাস সোনালি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। এই ঐতিহ্যের প্রেরণা কোটি জাতিকে নতুনভাবে জাগিয়ে দিতে পারে। এগিয়ে নিতে পারে সুন্দর সম্ভাবনার দিকে। তবে এর জন্য চাই যোগ্য কাণ্ডারি অর্থাৎ নেতৃত্ব। এ জায়গাটিতেই বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে। আমাদের প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে দুর্বৃত্ত রাজনীতি। না হলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এর ঐতিহাসিকতা প্রজন্মের জন্য সঠিক আলোকবর্তিকা হতে পারে। কিন্তু একে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। কিন্তু ইতিহাসের সত্য ফিরে আসেই। মুর্খরাই শুধু ইতিহাসকে অস্বীকার করে।

৭ মার্চের ভাষণ ছিল সমকালীন রাজনীতির এক অনিবার্য পরিণতি। বাংলার ইতিহাসের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা জানেন এ মাটি পরাভব মানেনি কোনোকালে। খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দে বাংলার মানুষ—অস্ট্রিক, নিষাদ, সাঁওতালরা আর্য আগ্রাসনকে থামিয়ে দিয়েছিল। আর্য গ্রন্থ এ মর্মজ্বালা ভুলতে পারেনি। ভারত গ্রাস করে বাংলার প্রতিরোধে থমকে যাবে—এমনটি ভাবা খুব কঠিন ছিল। তাই মুখ রক্ষার জন্য গল্প ফেঁদেছে। বলেছে অস্পৃশ্য বর্বর দেশ বাংলা। এখানে মানুষ পাখির মতো কিচিরমিচির করে কথা বলে। নীল রক্তের ধারক আর্যরা তাই ইচ্ছে করেই প্রবেশ করেনি বাংলায়। এ ধরনের ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যে প্রভুত্ব করার বাসনা সুপ্ত থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেমন তরুণ সমাজকে শেখাতো বাঙালিকে ঘৃণা করতে। নিকৃষ্ট জাত হিসেবে বিবেচনা করতে।

এসব শাসক-পাকিস্তানিদের প্রেতাত্মরা এখন চেষ্টা চালায় বাঙালির গৌরবের দিনগুলো ধোঁয়াচ্ছন্ন করে দিতে। সেদিন যেমন বাংলার মানুষের বীরত্বগাঁথাকে আড়াল করতে চেয়েছিলো আর্যরা তেমনি ৭ মার্চের ভাষণের মহিমা ভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়ার কসরৎ কম হয়নি এদেশের রাজনীতিতে।

বাংলার ইতিহাসে যেসব গৌরবগাঁথা প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে ৭ মার্চের ভাষণকে তা থেকে বিযুক্ত করার উপায় নেই। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাধারণ সূত্র বলবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধের আর কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না। অন্যদিকে ৭ মার্চের ভাষণটিও হঠাৎ কোনো বিস্ফোরণ ছিল না। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতাই জন্ম দিয়েছিল ৭ মার্চের।

বাঙালি—বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষার ভেতর থেকেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। হাত মে বিড়ি মে পান/লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, বাঙালির প্রিয় স্লোগান ছিল। কিন্তু ক'জন ভাবতে পেরেছিল দ্রুত স্বপ্নভঙ্গ হবে তাদের। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র ইংরেজদের মতো মেধাবী ঔপনিবেশিক শাসক হতে পারলো না। চরিত্র পেলো প্রাচীন বাংলার নিকৃষ্ট মানসিকতার ব্রাহ্মণ সেন শাসকদের মতো। ইংরেজরা ভারতবর্ষের রাজত্ব হাতে নিয়ে বুঝতে পেরেছিল বহু ভাষা আর সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের দেশ ভারতে শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হলে এখানকার ধ্রুপদী সাহিত্য অধ্যয়ন করা জরুরি। ভারতে ইতিহাস ঐতিহ্য অধ্যয়ন করে ভারতবাসীর মনস্তাত্ত্বিক দিকের খোঁজ করেছে শাসকগোষ্ঠী। মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি না করে প্রায় একশ বছর অর্থাৎ ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফার্সিকেই রেখেছে রাজভাষা। আর পাকিস্তান সৃষ্টি ক্ষণেই ভাষা প্রশ্ন বিতর্ক তুলে ফেলেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা। তাই ওই স্থূল মেধার পাকিস্তানি শাসকরা সন্দেহের দোলাচলে ফেলে দিয়েছিল বাঙালি সচেতন বিবেককে। বাঙালির এই আত্মোপোলব্ধির সময় এক সচেতন সৈনিক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু শুরু থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো চিন্তা বাঙালির রাজনীতিতে জায়গা করে নেয়নি। সময়ের প্রয়োজন অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইংরেজ সাহেব এলেন অক্সেভিয়ান হিউম যেদিন নিখিল ভারত কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন সেদিন কংগ্রেসকে কেউ সাম্প্রদায়িক সংগঠন মনে করেনি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজনীতিকদের সমাবেশ ঘটেছিল কংগ্রেসে। সন্দেহের বীজ উপ্ত হলো ১৯০৫ সালে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর। মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ববাংলার উন্নয়নের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল বঙ্গভঙ্গ। কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর প্রবল চাপ এবং কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতা মুসলমান নেতৃত্বকে সন্দিহান করে তোলে। তাই আত্মো-অধিকারের প্রশ্নেই মুসলমান নেতৃত্বে মুসলিম লীগের জন্ম দেয়।

এইভাবে শোষণ বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগসহ বাঙালির নানা সংগঠন স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু বাঙালির ন্যায্য দাবির প্রতি কোনো

সম্মান দেখায়নি পাকিস্তানি শাসকচক্র। আইয়ুব খান সামরিক শাসনের যাঁতাকলে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল বাঙালির প্রতিবাদী কণ্ঠ। বঙ্গবন্ধু ততোদিন বাঙালি নেতৃত্বের পুরোধা হয়ে উঠেছেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা তিনি। আত্মো-অধিকারের প্রশ্নে ছয়দফা নিয়ে এলেন। পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল এক অনিবার্য পরিণতি। বিপুল জনসমর্থন ছয়দফা আন্দোলনকে শাণিত করে তুললো। পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস পড়ে দেখার প্রাজ্ঞ আচরণ করতে পারলো না। দমননীতির ভুলের পথেই পা বাড়ালো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি নিয়ে এলো। কিন্তু ততোক্ষণ বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে গেছে। পরীক্ষিত হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব। গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে ভেসে যেতে হলো আইয়ুব খানকে। এ সময় পর্যন্ত কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শাণিত হয়নি। তাই ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এ নির্বাচন দিলে এদেশের মানুষ বিপুল উৎসাহে নির্বাচনে অংশ নেয়। নিরঙ্কুশ বিজয় আসে আওয়ামী লীগের পক্ষে। তাই আওয়ামী লীগসহ বাঙালির মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্ন তখনও স্পষ্ট হয়নি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে যখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই স্বাধীকারের আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বাঙালি মানসিকভাবে পরিত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার অপেক্ষায় অস্থির প্রহর গুনে বাঙালি। ৭ মার্চে সে সময়ের রেসকোর্স ময়দানের প্রতি সবার দৃষ্টি আর মন আছড়ে পড়ে। সংগ্রামী বাঙালির মিছিল জড় হয়ে রেসকোর্স ছাড়িয়ে প্রায় পুরো ঢাকা সয়লাব হয়ে যায়। দৃঢ়চিত্ত বঙ্গবন্ধু বজ্র কঠিন অথচ কাব্যময়তার মধ্যদিয়ে তার অসাধারণ ভাষণটি দিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার আর কি কিছু বাকি থাকে তখন। শব্দ চয়নে ছিল প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের বিচক্ষণতা। কোনো হঠকারী সিদ্ধান্তকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। বোঝা গেছে পাকিস্তানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধার দিন শেষ হয়ে গেছে। তবে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চাই। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। সবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে সকল জল্পনার অবসান করে দিলেন।

বর্তমানে দুর্নীতির দায়ে বিধ্বস্ত বিএনপি নেতৃত্ব তাদের নেতা জিয়াউর রহমানকে অপমান করে ইতিহাসের সত্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্বাধীনতার ঘোষক বানিয়েছিলেন। অথচ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলায় সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান স্মৃতিচারণমূলক এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, 'সম্ভবত ৪ মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নিই।... আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। ...৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল মনে হলো।'

এভাবে ৭ মার্চের ভাষণ সকল পক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ম্যাসেজ পৌঁছে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় প্রশাসন চলছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। এই ভাষণের পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালি। শ্রমিকরা চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে পূর্ব-পাকিস্তানের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। গ্রাম-গঞ্জে পাড়ায়-মহল্লায় যুবকরা ৭ মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

সুতরাং ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রেখে মুক্তিযুদ্ধেরই ডাক দিয়েছিলেন। তা বাঙালির মনে মর্মভেদী হয়েই প্রবেশ করেছিল। এই ভাষণের পর স্বাধীনতা ঘোষণার আর কি প্রয়োজন ছিল? এভাবে ৭ মার্চের ভাষণ বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন হয়ে রইলো।

যোগাযোগ বিজ্ঞান

যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : ৭ মার্চের ভাষণ—সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ

যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : ৭ মার্চের ভাষণ
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ থেকে আটত্রিশ বৎসর পূর্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়ম-কানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণে।

প্রতিমিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচারতত্ত্বে প্রতিমিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। একহাজার একশত সাতটি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই—আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।

ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে—'There is nothing like a good beginning for a speech'। বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগতত্ত্বে যা বলা হয় (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এ যুগান্তকারী ভাষণে।

বন্ধুবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা—যা পুরো বক্তৃতার মূলভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতাকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে।

পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ মার্চের এ বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধশ্লোগান। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত এ বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে বক্তৃতা সাড়ে সাতকোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণই ছিল কার্যত (de facto) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

জনযোগাযোগে যেসব speech idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে বক্তৃতায়। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলার জনগণের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ এই বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ সাবলীল ভাষায় তাৎক্ষণিক রচিত এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সূচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি। 'কি অন্যায় করেছিলাম? কি পেলাম আমরা? কিসের আর.টি.সি.? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধন সৃষ্টিতে 'ask question and then answer' পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। পুরো ভাষণে বর্তমানকালের যৌক্তিক ব্যবহার বক্তৃতাটিকে সজীবতা দিয়েছে। আবার কথোপকথনের ধারার স্বার্থে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এ বক্তৃতায়।

বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বহু গবেষণার পর যোগাযোগতাত্ত্বিকদের declarative বাক সংক্ষিপ্ত করার বর্তমান নির্দেশিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যথাযথ প্রতিফলিত। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, "২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না।"

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিতি করানোই নয়, বরং

তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তাঁর এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহমূলক বক্তব্য—"তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।" সাড়ে সাতকোটি বাঙালি এ বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিক উদারতার কোনো হেরফের কখনও যে ঘটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ই মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্মমৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি "আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব" বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন—"তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।" কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান উদর–হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যথাযথ তথ্য চয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর তীক্ষ্ণ যুক্তিবিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনাসঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়—"যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য—আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর গুলি হচ্ছে। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।" সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এক সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় আজকাল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যরকমভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, "তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।"

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গেলেও বঙ্গবন্ধু 'put up the attribution first'-এর নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করে তারপর তার মন্তব্য/বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। যেমন—"ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না" কিংবা "ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম"

ইত্যাদি। সার্বজনীন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ (agenda setting function) যা বঙ্গবন্ধুর এ বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে বারবার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদানকালেও বঙ্গবন্ধুর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির (humanistic approach) যে কোন তারতম্য ঘটত না—তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য : "আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, ফৌজদারি আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল, কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। কিন্তু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো-ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না।"

জনযোগাযোগ ব্যক্তি বা ঘটনার মর্যাদা আরোপণ (status conferral function) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশে এ বিধানের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—তিনি বলেছেন, "আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন"—"কিংবা "আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব।"

সার্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপনের—(posing a challenge) সর্বজনবিদিত একটি পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষপর্যায়ে এসে যখন বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শালাহ"—তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগবিদ্যার শিল্পকুশল প্রণালীতে পরম দক্ষতায় কীভাবে শ্রোতাদের বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন।

যে কোন বক্তৃতার সংজ্ঞানির্ধারণী অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষবাক্য "এবারের সংগ্রাম-আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম—স্বাধীনতার সংগ্রাম" অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা—যা ৭ মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসাবে স্বীকৃত। যে প্রক্রিয়ায় তিনি ভাষণ শেষ করেছেন তা যোগাযোগবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সাথে হুবহু মিলে যায়। যেখানে বলা হয় 'Don't drag out your conclusion'। আমরা প্রায়ই 'পরিশেষে বলছি' 'একটি কথা বলেই শেষ করছি' বা 'পরিশেষে এ কথাটি না বললেই নয়' ইত্যাদি ভূমিকা করে বক্তব্য শেষ করি। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি

speech definition-এ প্রবেশ করেছেন—যা আধুনিক তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ এবং যা ছিল আটত্রিশ বৎসর পূর্বে অকল্পনীয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪০ সালের ৪ জুন তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, "We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender" এখানে 'we shall fight' ছিল বক্তৃতার সংজ্ঞা।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সংজ্ঞা অংশ ছিল 'I have a dream'। উক্ত বক্তৃতার একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ : "I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal, I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character".

আমরা জানি যে, বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হয়। একাত্তরের ৭ মার্চ তারিখে প্রদত্ত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তট-অতিক্রমী ভাষণ তেজস্বী বক্তৃতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল—তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বরসংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল—তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। সার্বজনিক বক্তৃতাবিশারদ, গবেষক ও যোগাযোগবিদদের জন্য এ ঐতিহাসিক ভাষণ একটি আবশ্যিক পাঠক্রম হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। আমাদের প্রাত্যাহিক চিন্তা চেতনা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলিত ও স্বচ্ছ উপস্থাপনা সার্বজনিক সম্ভাষণ বা ঢ়ঁনষরপ ধফফৎবংং-এ অন্যতম শর্ত।

এ প্রসঙ্গে ডেল কার্নেগীর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'The best argument is that which seems merely an explanation' অর্থাৎ সর্বোত্তম যুক্তি হচ্ছে শুধুই সঠিক ব্যাখ্যা। তৎসময়ের ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এ ভাষণটিকে সব সময়ের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দচয়ন মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোন টীকা বা নোট ব্যতিরেকে মেদহীনভাবে এমন নির্মেদ ও

নির্দেশনামূলক ও একই সাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইক তখনই বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধে। এ বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। শব্দের এমন সুপ্রযুক্ত ব্যবহার সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) বিখ্যাত উক্তি 'the most valuable of all talents is that of never using two words when one will do' আমাদের স্মরণে আসে। ৭ মার্চ একাত্তরের এ ভাষণ বাংলা ভাষায় শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, পৃথিবীর এটি একটি অন্যতম ভাষণ। কারণ এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা।

এ ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত রাখবে, জীবনসত্য অনুধাবনে পথ দেখাবে ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলনকে দেবে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা।

নৃতত্ত্ব ও জাতীয়তা

একটি ভাষণের বিনির্মাণ : নির্দেশ থেকে দেশ

একটি ভাষণের বিনির্মাণ : নির্দেশ থেকে দেশ

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

যে-কোনো জনগোষ্ঠীই স্বয়ংক্রিয় স্বাভাবিকতায় জাতি হিসেবে পরিগণিত হয় না। লক্ষ-লক্ষ কিংবা কোটি-কোটি মানুষের সমারহই অবলীলায় জাতি গড়ে তোলে না। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে পরম্পরাক্রমে যারা বসবাসরত, একইরকম সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মিক-মানসিক সংহতির প্রেষণায় যারা যূথবদ্ধ এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রন্থিমান দেখার মানসসংগঠন যাদের মধ্যে সঞ্জাত ও ক্রমবিকশিত, তারাই সম্ভবত একসময় জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জাতি সংগঠনের নানাবিধ প্রক্রিয়ার বিশদ বিশ্লেষণ করে থাকেন, তবে যে-বস্তুটি একক সাধারণ গুণনীয়কের মতো বিরাজমান থাকে তা হলো জাতির যৌথ নির্জ্ঞানের মধ্যে আলাদা, স্বয়ম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর তথা স্বাধীন হওয়া আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাটি ফলের অভ্যন্তরের বীজের মতো গুপ্ত থাকে, ক্রমপরিণতি পায় এবং ইতিহাস-ভূগোল-সমাজবাস্তবতার ত্রয়ীপিস্টনে ঘূর্ণ্যমান হয়ে একসময় রূপ নেয় জাতীয়তাবাদের। জাতির এক ক্রান্তি মুহূর্তে, যেনবা দৈববশেই, আবির্ভাব ঘটে এক কিংবা একাধিক জননায়কের, যিনি বা যাঁরা জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সংহত ও শাণিত বর্শামুখ করে তোলেন, এবং সকল বিরুদ্ধতা ও বৈরিতার বিপরীতে চালিত করেন। একটি জাতির জীবনে স্বাধীনতার অভিলাষটি ক্রমেই কল্পস্বর্গীয় আশাবাদ থেকে নেমে আসে বাস্তবসংগ্রামের রূঢ়-কঠিন মাটিতে। দীর্ঘ সংগ্রাম চলতে শুরু করে অতঃপর, এবং একসময় কোনো এক যুগনায়ক আবির্ভূত হন, যিনি টালমাটাল জনসমুদ্রের সামনে উদ্ধত বর্শাফলক হাতে ঘোড়সওয়ারের মতো নেতৃত্ব দেন। কবি বিষ্ণু দে-র এই পঙক্তিগুলো কি আভাস দিয়েছিল তেমনি কোনো এক ঘোড়সওয়ারের আবির্ভাবের, বাঙালি জাতির মধ্যে :

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার ,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?...

হালকা হাওয়ায় বলম উঁচু ধরো।
৭সমুদ্র চৌদ্দনদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

২

বাঙালি জাতির ইতিহাসের তত্ত্বতালাশ যাঁরা করেছেন সেইসব ইতিহাসবিদ মোটামুটি একমত যে প্রায় হাজার খানেক বছর আগে এই জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় দানা বাঁধতে শুরু করে, মূলত জায়মান বাংলা ভাষা এবং তদ্ধৃত সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। এর আগেও এই ভূখণ্ডে নিশ্চয়ই জনবসতি ছিল, কিন্তু তাদের আত্মপরিচয়ের সীমা-সরহদ্দ তখনকার অধিবাসীদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহঠ্ঠ-র হট্টরোলের মধ্য থেকে যখন আদি বাংলা ভাষার স্বরূপটি দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, তখনই সূত্রপাত হয়েছিল এই ভাষিক জনজাতির। চর্যাপদের কূটাভাসী গীতবিতানের মধ্যে আদি বাঙালির জীবন ও জগৎভাবনা, তার সমাজ-অর্থনীতির ইঙ্গিত থেকে গেল। সন্ধ্যাভাষার আলো-আঁধারির মধ্যেও অস্পষ্ট থাকল না বাঙালি যে নিরন্নতা ও দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করেছে সেই কালেও, একালের মতো : গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ সম্ভবত তার ইচ্ছাপূরণের কল্পগল্পমাত্র :

টালত ঘর মোর নাহি পরবেষী
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী

বাঙালির বাঙালি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া এবং বাঙালি চেতনার প্রগ্রসরণ নিয়ে ইতিহাস অবকাশ এবং প্রয়োজন কোনোটাই এখানে নেই। হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতিসত্তাটি যে ক্রমে জাতীয়তাবাদের পরিণতির দিকে অগ্রসরমান হলো এবং একসময় অনিবার্যভাবে জাতিরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল সেই ঘটনাটি শুধু আমরা সাগ্রহে লক্ষ করবো। উপনিবেশী কালের ঘটনাক্রমও আমাদের জানা; আমরা এ-ও জানি কী করে ব্রিটিশ শাসকদের বিভেদপন্থী নীতি কিয়ৎকালের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল বাঙালির চেতনাকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি জাতির ইতিহাসের বিপরীতমুখী এক টান। পাকিস্তান নামক এক অদ্ভূত রাষ্ট্রের ভেতরে এই ভূখণ্ডের মানুষেরা নিজেদের বিলীন করে দিয়েছিল সানন্দে—কুয়াশায় আত্মপরিচয় আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু সেই ঘোর

থেকে জাগিয়ে দিয়েছিল একটি ঘটনা, এবং তাৎপর্যপূর্ণ, সেটি ভাষাকে ঘিরেই। বাঙালি সব ছেড়ে, সব স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তানি হয়েছিল, কিন্তু যখন তার প্রাণভোমরাকে ধরে টান দিল পশ্চিমী বিভাষী শাসকরা, তখন তারা তা সহ্য করলো না। আহত বিক্ষত জাতিসত্তা জেগে উঠল নিদ্রা ভেঙে, দাবি জানালো বাংলা ভাষার অধিকারের, মূলত বাঙালি জাতিসত্তার স্বতন্ত্রতার। বাঙলাভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতির যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজন সেটি উপলব্ধ হলো। এই সেই ক্রান্তিলগ্ন, ইতিহাসের এক নাভিকেন্দ্র যেখান থেকে কুহারের মতো জেগে উঠলো ভবিষ্যতের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভিকাঙ্ক্ষাটি। ইতিহাস ইতোমধ্যে তার নায়ককে খুঁজে নিচ্ছে হাজারো মুখের ভিড় থেকে; জনসমুদ্রের জোয়ার উঠবে অচিরকালের মধ্যে, সেই জোয়ারের অগ্রভাগে তীব্র-তীক্ষ্ণ জাতীয় চেতনার বর্শা হাতে এগিয়ে যাবেন একজন মহানায়ক। ইতিহাসের একটি স্বতঃনির্বাচনী প্রক্রিয়া রয়েছে, যেই প্রক্রিয়ায় ধীরে-ধীরে পশ্চাৎবর্তী হতে থাকলেন বেশ কিছু দেশপ্রেমী মেধাবী নেতাও, কারণ চূড়ান্ত পরীক্ষায়, ধৈর্যে, সাহসে, একাগ্রতায় ও মরণপণ প্রতিজ্ঞায় দুর্মর হয়ে উঠছেন তখন একজন মহানায়ক, বামন নেতাদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী এক পুরুষ, বজ্র যার কণ্ঠস্বরে, যার চোখে শুধু স্বদেশের মুক্তির চিত্র, হৃদয়ে যার স্বদেশের জন্য অপার ভালোবাসা। ইতিহাস মুজিবকে গড়েছে ধীরে ধীরে নিজ হাতে; এবার তিনিই নিজ হাতে গড়বেন ইতিহাস।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষমানুষের উপস্থিতিতে তিনি যে-ভাষণটি দিলেন তাই চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দিল বাঙালির ইতিহাসকে যেমন, তেমনি একটি অক্ষয় সিলমোহর দেগে দিল একটি নামের ওপর, শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ইতিহাসের সন্তান ও জনক একই সাথে; তিনি যুগপৎ ইতিহাসকে ভাঙলেন এক হাতে, অন্য হাতে গড়লেন এক নবতর ভবিষ্যতের ইতিহাস। যখন তিনি ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", তখন একদিকে সমাপ্তি ঘোষণা করলেন এযাবতকালের চলমান রক্তপাত, বঞ্চনা, দীর্ঘশ্বাস ও শোষণের ইতিহাসের, এবং যবনিকা ওঠালেন নতুনতর ইতিহাস-নির্মাণের। ১৯৪৮, ৫২, ৬২, ৬৯-এর সংগ্রামগুলো ছিল যেন খণ্ডিত, তাৎক্ষণিক, সীমিত লক্ষ্যের আন্দোলন; এবার শুরু হচ্ছে যথার্থ সংগ্রাম, যার লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা তো বটেই, তারও চেয়ে বেশি—বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক মুক্তির সংগ্রাম। ৭ মার্চের ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উত্তোলিত তর্জনী দিগন্তের দিকে প্রসারিত, যে-পূর্ব দিগন্তে অচিরেই সূর্য উঠবে রক্তলাল, এবং অশ্রু ও গন্ধকের নদী আর রক্তের সমুদ্র পায়ে হেঁটে পার হবে বাঙালি জাতি। ৭ মার্চের ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধুকে আমার কবিমানসে মনে হয় একজন মোজেসের মতো, যার হাতে ঐ লোহিতদরিয়ার পরপারের সবুজনিসর্গস্পন্দিত, শষ্যদোলায়িত

ক্ষুধামুক্ত প্রতিশ্রুত এক স্বদেশের নকশা। তিনি সে-মুহূর্তে তাঁর সমকাল ও পরিপার্শ্বকেও ছাপিয়ে উঠে যান দেবদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের মতো।

ইতিহাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতির নানা পটপরিবর্তন, উত্থান উন্মন্থনের ভেতর দিয়ে। ১৯৪৭-এ যখন ভারত বিভক্ত হলো, তখন তিনি তরুণ ছাত্রনেতা। দেশভাগের বিশাল কর্মযজ্ঞ ও নতুন একটি ভূখণ্ড অর্থাৎ পাকিস্তানের সৃষ্টি এ অঞ্চলের মানুষের মনে যে আশাবাদ ও উদ্দীপনার জোয়ার এনেছিল তিনি ছিলেন তার অংশীদার। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে আশাভঙ্গের বেদনা ও হতাশা যখন গ্রাস করতে থাকলো মানুষের মন, প্রধানত বাংলাভাষার স্থলে ভিন্নভাষাকে চাপিয়ে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভ এবং জায়মান প্রতিবাদ বঙ্গবন্ধুকে ভেতর থেকে পাল্টে দিয়েছিল প্রায় রাতারাতি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, উপনিবেশবাদের এক অজগর সাগরপারে প্রত্যাবৃত্ত হলেও আরেক সূতাশঙ্খিনী বাংলার লোহার বাসরঘরে প্রবেশ করেছে। ৪৮-এর প্রথম ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাহান্নর ফেব্রুয়ারির মধ্যেই মুজিবের ভবিষ্যৎ রাজনীতির মানসচিত্র অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে বাঙালিরা নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতায় স্থিত হতে পারেনি। এইসব সংক্ষোভ জমা ছিল বঙ্গবন্ধুর মনে। ৭ মার্চের ভাষণে আমরা লক্ষ করবো তিনি সেই প্রবঞ্চনার কথা বলছেন দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে। ১৯৫৪-এর প্রবঞ্চনাকে সংযুক্ত করছেন ৭১-এর বঞ্চনার সাথে। উচ্চারণ করছেন বেদনাদীর্ণ একটি প্রশ্ন : "কী অন্যায় করেছিলাম?" ঐ দুই সময়প্রান্তের মাঝখানে আরো অনেক রক্তপাত, শোষণ আর প্রতারণার ইতিহাসকে তিনি গ্রথিত করলেন একসূত্রে :

> ...আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদর গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

এরপরই তিনি চলে এলেন বর্তমান সংকটের প্রেক্ষাপটে। সত্তরের নির্বাচনে তাঁর দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল, এবং তিনি নির্বাচিত হলেন মেজরিটি পার্টির নেতা। তিনি ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি এসেম্বলির অধিবেশন দিতে, কিন্তু "তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।" এসেম্বলির অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া হলো, আর অন্তরালে চলতে থাকলো ষড়যন্ত্রের খেলা। জননায়ক ভাষণের শুরুতেই অবশ্য জনগণকে আস্থায় নিয়ে নিয়েছেন এই কথা বলে—"আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।" তাঁর আস্থাভাজন

জনতাকে তিনি বর্তমান সংকটের স্বরূপটি বোঝালেন সংক্ষেপে, কিন্তু খুব প্রাঞ্জলভাবে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে এসেম্বলির নির্ধারিত তারিখ তিনি মেনে নিয়েছিলেন, প্রস্তুত ছিলেন সবার সাথে আলোচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈয়ার করার জন্য। বললেন, কী করে ভুট্টো সাহেবের গোয়ার্তুমিতে ভেস্তে গেল সব। পরিষদের অধিবেশনের তারিখ বাতিল করা হলো এবং দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে; বললেন কীভাবে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল, কীভাবে নেতার নির্দেশে পালিত হলো হরতাল, শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন।

ভাষণের এই পর্যায়ে দেখি বঙ্গবন্ধু আবার আরেকটি বেদনার্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করছেন, তাঁর কণ্ঠে হাহাকার করে উঠছে বাংলার নদী-ঘাট-মাঠ, বঞ্চিত মানুষের পাঁজরা ও কপাল : "কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি।" আবার ইতিহাসের পুনশ্চারণ গভীর বেদনার সাথে; আয়রনিসঞ্জাত পরিস্থিতির কারুণ্য তখন ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে আহত জাতিসত্তার হৃৎপিণ্ড থেকে : "আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছেন।"

এভাবে ক্রমাগত ইতিহাসের সামনে ও পেছনে যাচ্ছেন মুজিব। সবিস্ময়ে লক্ষ করি ভাষণটি যেন একটি নাটকের ক্ল্যাসিকাল সংহতি তার অবয়বে ধারণ করছে। ভাষণের শুরু গভীর বেদনাবোধ দিয়ে, শেষ ইতিহাসের এক অনুমিত ট্রাজিক উলম্নাসের ভেতর, যেখানে বাংলার জয় সূচিত হবে, কেননা, তাঁর বলদৃপ্ত অনুভাবনা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি : "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশালস্নাহ।" বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের নানারকম বিশ্লেষণ সম্ভব। ইতোমধ্যে কেউ কেউ তা করেছেনও। বহুমাত্রিক এই ভাষণটি যেমন কাব্যিক ছন্দোময়তায় গঠিত, তেমনি বেদনা, আক্ষেপ, অহংকার, হুংকার, নির্দেশ, স্বপ্ন, বাস্তব পরিকল্পনা এবং নাটকীয় নানা তরঙ্গবিভঙ্গে উচ্চকিত। করুণ রসের সাথে বীর রস, অতীত থেকে নিমেষে বর্তমানে আসা, আবার ভবিষ্যতের রূপরেখা অঙ্কন করা, হতাশা-বেদনা-আশা-স্বপ্ন এবং আশংকা—নানা বিবাদী-সংবাদী স্বরের এক অর্কেস্ট্রা গড়ে ওঠে উনিশ মিনিটের এই ভাষণে। বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তের রূপকার তিনি; তিনিই এর পশ্চাৎপটনির্মাতা, নাট্যকার, সংলাপরচয়িতা ও অভিনেতা। বাঙালির হাজার বছরের জাতিরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাকে তিন সূচিমুখ করে ছুড়ে দিলেন বিশ্বজনের কানে: মুক্তির ও স্বাধীনতার চরম মুহূর্তের ঘণ্টাটি তিনি বাজিয়ে দিলেন এক অলৌকিক মুহূর্তে। চিরকালের জন্য ফ্রিজ হয়ে গেল তাঁর উত্তোলিত তর্জনী। ইতিহাসের সেই মুহূর্তটিকেই আজ আমরা এখানে পুনরুদ্‌যাপন করছি অমিত গৌরবে আর গভীর ভালোবাসায়।

৩

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব, কীভাবে লোকভাষার প্রাত্যহিক উচ্চারণভঙ্গি সহজ স্বাভাবিকতায় জনসমুদ্রের শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্জনিত ও মর্মরিত হলো, কীভাবে বাংলার লোকজীবনের মরমিয়া রসে সিক্ত ভাষার মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাথে সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশার ভাষা ইনশাল্লাহ পর্যন্ত অবলীলায় উচ্চারিত হলো, এ সবই গভীর অভিনিবেশের সাথে বিশ্লেষণ করা চলে। বিশিষ্ট লোকতত্ত্ববিদ এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষক জনাব শামসুজ্জামান খান ৭ মার্চের ভাষণের ভাষাগত ব্যাঞ্জনা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন :

> "বাংলাদেশের মানুষের একটা স্বকীয় সত্তা ও নিজস্ব চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য আছে। লৌকিক ভাষাভঙ্গি ও বাক্প্রতিমায় তার চমৎকার ও লাগসই প্রকাশ ঘটে। এই বিশিষ্ট সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চারিত্র্যিক দার্ঢ্য, বিদ্রোহের মানসিকতা এবং কোনো অবস্থাতেই মাথা নত না করা। বাংলার পৌরাণিক চরিত্র চাঁদ সওদাগর, সাহিত্যের চরিত্র হানিফ গাজী ও তোরাপ, কাব্যস্রষ্টা কবি নজরুল এবং মানবিক ও রাজনৈতিক চরিত্র শেখ মুজিবে আমরা এই বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় পাই। বাঙালি চরিত্রের এই বিশিষ্ট রূপের স্পর্শে ৭ মার্চের ভাষণে যুক্ত হয়েছে অনন্য বৈভব। বঙ্গবন্ধু তাঁর আপোসহীনতা ও চারিত্র্যিক দার্ঢ্যের পরিচয় মুদ্রিত করেছেন লৌকিক বাগভঙ্গির বিশিষ্ট বুলির সংযোজনের মাধ্যমে। প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত এইসব মণিমুক্তাসদৃশ শব্দ বাঙালির ব্যবহারিক জীবন থেকে নেয়া। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর শিকড়সম্পৃক্ত বুলিসমৃদ্ধ এরকম একটি লাইন হল : 'সাড়ে ৭ কোটি মানুষেরে দাবায়ে রাখতে পারবা না।"

আমার নিজের ধারণা, সম্পূর্ণ ভাষণটিতেই পাওয়া যাবে লোকজ ভাষাভঙ্গির ছোঁয়া, যা বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের লোকজীবনসম্পৃক্তি এবং তৃণমূল মানুষের মুখের ও মনের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা থেকে সঞ্জাত। ভাষণটি যে পূর্বলিখিত নয়, এমনকি তাঁর হাতেও কোনো নোটসম্বলিত চিরকুট ধৃত দেখি না, অথচ অবলীলায়, ধীরোদাত্ত স্বরক্ষেপণে তিনি উচ্চারণ করে গেলেন তাঁর ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আদেশ-নির্দেশনা, এবং সেই মুহূর্তে সমগ্র জাতি কান পেতে রয়েছিল যা শোনার সেই স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইঙ্গিতপূর্ণ ঘোষণা। "শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আর টি সি-তে মুজিবুর রহমান যোগ দিতে পারে না", "আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই", "আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা", "তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল"; "আমি যদি যদি হুকুম দেবার নাও পারি"—ইত্যাকার উচ্চারণগুলির গ্রামীণ ও লোকজ প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের শব্দবিষয়ক আচার ও ক্রিয়ারূপের ছুঁৎমার্গ উড়ে যায় প্রবল আবেগ আর ঐকান্তিকতার ফুৎকারে, এবং সেই মুহূর্তে পূর্ববাংলার মানুষের মুখের বুলির ভবিষ্যৎ স্বীকৃতিরও একটি মুক্তিসনদ যেন রচিত হয়ে যায়।

এই বিষয়টি নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে অচিরেই একটি বিতর্ক ও আলোড়ন তৈরি হবে বলে ধারণা করি, যে, বাংলাদেশের বাংলাভাষাটি তৎসময়নের চিরাচরিত ও স্বীকৃত পথ ছেড়ে তন্তুবায়নে তথা লৌকিকায়নের পথে কতদূর যাবে। এ বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ এটি নয়, তবে, বাংলাদেশের মানুষের অবলম্বিত বাংলাভাষার একটি স্বতন্ত্র, অন্তত স্বাতন্ত্র্য-অভিসারী ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক আদর্শ গড়ে উঠেছে কিনা গত পঞ্চাশ বছরে, সেটি নিয়ে একটি আলোচনার পরিসর ক্রমেই সৃষ্টি হচ্ছে। অনাগত সেই আলোচনার দিনে বঙ্গবন্ধুর লোকজবানমিশ্রিত ভাষণটি একধরনের দিশারী হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমার ধারণা।

৪

৭ মার্চের ভাষণের স্পষ্ট দুটো ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগটিতে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করছেন এবং বর্তমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করছেন। তিনি ইয়াহিয়া-আহূত রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যাবেন না, কেননা "আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে... আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে।" এই সূত্রে তাঁর ব্যথাদীর্ণ প্রশ্ন : "কিসের আর টি সি, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সংগে বসব?"

দ্বিতীয় ভাগটি শুরু হচ্ছে 'ভাইয়েরা আমার' সম্বোধনের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে। এই পর্বে বঙ্গবন্ধু শাসকদের জন্য দিচ্ছেন কিছু শর্ত, এবং জাতির জন্য তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা। শর্তগুলো যথাযথ এবং দৃঢ়তাপূর্ণ যদিও তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন সেগুলি মান্য হবে না, এবং বাঙালিদের শেষপর্যন্ত শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে প্রতিরোধ প্রস্তুতির মাধ্যমে। শর্তগুলো স্মরণ করা যাক :

১. "সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে।"
২. "সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরৎ নিতে হবে।"
৩. "যেভাবে হত্যা প্রতিনিধির করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।"
৪. "জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।"

এবং তারপরেই তার দৃপ্ত ঘোষণা, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।'

এ পর্যায়ে আমরা উপনীত হই ভাষণের সবচেয়ে দিকনির্দেশনামূলক ও বৈপ-বিক অংশে। আসে কয়েকটি নির্দেশ এবং সবশেষে একটি স্মারকসম্বলিত সঙ্কল্প। নির্দেশগুলো এরূপ :

১. "আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। ...২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।"

২. "আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।"

৩. "জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

৪. "আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ... যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।"

৫. "সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত এই আমার দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হল। কেউ দেবে না।"

৬. "এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।"

৭. "যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।"

৮. "দুই ঘণ্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।"

৯. "যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।"

১০. "প্রত্যেক গ্রামে, মহলস্নায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।"

১০. "মনে রাখবা : রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।"

ভাষণের শেষ পঙক্তিটিই সেই তীব্র-তীক্ষ্ণ বর্শাফলক, ক্রমস্ফুটমান নাটকের ক্লাইমেক্স, এতক্ষণ ধরে তিনি যেসব নির্দেশনা দিচ্ছিলেন তার লক্ষ্যবিন্দু এবং সারাৎসার : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

দুই পঙক্তির এই অজর কবিতা ও অবিনাশী গান যেন বিষ্ণু দে-র কবিতার সেই 'সংহত গেসিয়ার'। সামান্য আবেগের অতিরেক, একটি শব্দের স্থানচ্যুতি কিংবা সামান্যতম অতিশায়নে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত গেসিয়ার এবং অনিরুদ্ধ প্রবল জনরোষের সৃষ্টি করতে পারত যাতে ঘোড়সওয়ারের হাতের লাগামটি হয়ে যেত ছিন্ন। যে-জনতার জোয়ারকে তিনি নেতৃত্বের প্রখর লাগাম ধরে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, ঐ মুহূর্তে তা স্খলিত হলে ভেস্তে যেত সব। শত্রু তখন আক্রমণের

সুযোগ সন্ধানী; সামান্যতম উস্কানিতে তারা ঝাপিয়ে পড়ত নিরস্ত্র জনতার ওপর; পুনরাভিনীত হত কয়েক সহস্র জালিয়ানওয়ালাবাগ। বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই শিরা ও শোণিতের, অগ্নি ও তুষারের এক অবিশ্বাস্য সমীকরণের মহড়া দিয়ে রেখেছিলেন মনে মনে; না হলে জনসমুদ্রের স্বাধীনতার উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছাত্রনেতাদের প্রবল চাপ, অন্যদিকে একপাক্ষিক স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত বিপদের সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি ইতিহাসের তুঙ্গতম মুহূর্তে পৌঁছার হিরন্ময় সুযোগের হাতছানি, সবকিছুর মধ্যে একটি ফাইন ব্যালেন্স তিনি যেভাবে ঘটালেন তা এককথায় বিস্মিত ও শিহরিত হওয়ার মতো ঘটনা। তিনি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে শত্রুকে সুযোগ দিলেন না, আবার একই সাথে যা করলেন তা স্বাধীনতা ঘোষণারই অন্য নাম। যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ আসলে সশস্ত্র হওয়ার নির্দেশ, প্রাণপণ প্রতিরোধ ও সম্ভাব্য রক্তবন্যার ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির তীরে পৌঁছানোর নির্দেশ। এই নির্দেশ সফলভাবে পালন করেই বাঙালি অর্জন করতে পেরেছে দেশ। 'নির্দেশ' কথাটির একটি অর্থ হতে পারে দেশহীনতাও : সেই অর্থে নির্দেশ থেকে দেশে উত্তরণের যে পথ তারই মানচিত্র ও দিগদর্শন ৭ মার্চের ভাষণ।

তুলনামূলক আলোচনা

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠত্ব : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ১৮



বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠত্ব : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

জালাল ফিরোজ

আমাদের আগে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ' বা 'জগৎশ্রেষ্ঠ' ভাষণ বলা হয়েছে।[১] কিন্তু এ-বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয় নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলো থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা-ও আলোচিত হয় নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলো বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রবন্ধে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পেরিক্লিস থেকে ওবামা পর্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণই শ্রেষ্ঠ; এটিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ।

এই প্রবন্ধের চারটি প্রধান অংশ। প্রথম অংশে খ্রি. পূ. ৪৩১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ৩১টি ভাষণের পরিচিতি, পটভূমি এবং মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ৩১টি ভাষণের মধ্য থেকে অনেকের বিবেচনায় 'সর্বশ্রেষ্ঠ', এ-রকম চারটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তৃতীয় অংশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর তুলনায় উৎকৃষ্ট তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষ অংশে ৭ই মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কেন প্রয়োজন তা আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা অনেক তথ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

---

১. দেখুন, হাসনাত আবদুল হাই, "সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা", তপন কুমার দে (সম্পাদিত), *৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ*, তাম্রলিপি, ঢাকা ২০১০ এবং শামসুজ্জামান খান, "ঐতিহাসিক ৭ মার্চ : তার প্রেক্ষাপট ও শিখর চূড়া", তপন কুমার দে (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*।

১

প্রাচীন যুগের যে ভাষণের উল্লেখ প্রথম করা যায় সেটি প্রদান করেন গ্রিক রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস (খ্রি.পূ. ৪৯৫-৪২৯) খ্রি. পূ. ৪৩১ সালে। তখন এথেন্সে নিহত বীর যোদ্ধাদের স্মরণে বার্ষিক শোকমিছিল ও শোক-বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। পেরিক্লিসের বক্তৃতা ছিল অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী। তাঁর বক্তৃতা 'Funeral Oration' নামে খ্যাত। এই ভাষণে পেরিক্লিস এথেন্সের বীরযোদ্ধাদের প্রশংসা করেন। এথেন্স নগরীর ঐতিহ্য তুলে ধরেন এবং এথেন্সের জন্য যুদ্ধে যেতে নগরবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। পেরিক্লিস বলেন, 'Therefore, having judged that to be happy means to be free, and to be free means to be brave, do not shy away from the risks of war.' তারপরের বিখ্যাত ভাষণটি সক্রেটিসের। খ্রি. পূ. ৩৯৯ সালে সক্রেটিস এই ভাষণ দেন। প্লেটো (খ্রি. পূ. ৪২৮-৩৪৭)-র মাধ্যমে এই ভাষণ 'The Apology of Socrates' নামে পরিচিতি পায়। আদালতে বিচারকদের সামনে প্রদত্ত এই ভাষণে সক্রেটিস তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'এথেন্সের যুবকদের চরিত্র নষ্টের অভিযোগ' অস্বীকার করেন। জবানবন্দির মাধ্যমে সক্রেটিস তাঁর বিচারকদের একটা বড়ো অংশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। আমরা জানি, ২৮০ জন বিচারক সক্রেটিসের বিরুদ্ধে রায় দিলেও তাঁর পক্ষেও ছিলেন ২২৬ জন।[২] আদালতে বিচারকদের উদ্দেশ্যে সক্রেটিস বলেন, 'আপনারা একথা নিশ্চিত জেনে রাখুন, আমাকে হত্যা করে আমার ক্ষতি সাধনের চেয়ে আপনারা আপনাদেরই অধিক ক্ষতির কারণ হবেন। ... আমাকে আপনারা বিধিদত্ত একটা দান হিসাবেই জানবেন। আমাকে হত্যা করে বিধাতাকে অমান্য করার অপরাধেই আপনারা অপরাধী হবেন, কেননা, আমাকে হত্যা করলে আপনারা সহজে আমার স্থান পূরণ করার ন্যায় উত্তরাধিকারী কাউকে পাবেন না।'[৩] গ্রিক বাগ্মী ডিমোস্থিনিস (Demosthenes, খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) খ্রি. পূ. ৩৩০ সালে দেয়া ভাষণে গ্রিকের গৌরবময় রাজনীতির বিশদ বর্ণনা দেন। এই ভাষণের শিরোনাম 'On the Crown'. *এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* 'On the Crown' বক্তৃতাকে 'the greatest speech of the greatest orator in the world' বলে গণ্য করে। রোমের সরকার উৎখাতে ক্যাটিলিনা (Lucius Sergius Catilina, খ্রি. পূ. ১০৮-৬২) এবং তাঁর সহযোগিরা ষড়যন্ত্র করছেন, এ-অভিযোগ তুলে রোমের কনসাল সিসেরো (Marcus Tullius Cicero, খ্রি. পূ. ১০৬-৪৩) সিনেটে পরপর চারটি ভাষণ দেন। খ্রি. পূ. ৬৩ সালে দেয়া এসব ভাষণ 'Catiline Orations' নামে পরিচিত। তখন সিসেরো ও ক্যাটিলিনা-র মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব চলছিল। ক্যাটিলিনা

২. জালাল ফিরোজ, "সক্রেটিসের বিষের পেয়ালা", *লেভিয়াথান*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা ২০১২, পৃ. ৩৪

৩. সরদার ফজলুল করিম, *প্লেটোর সংলাপ*, প্যাপিরাস, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৩৩-৩৪

বারবার অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সিসেরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করতে থাকেন। সিনেটে দেয়া সিসেরোর প্রথম ভাষণের শুরুর কথাগুলো ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সিসেরো বলেন, 'How long, O Catiline, will you abuse our patience? And for how long will that madness of yours mock us? To what end will your unbridled audacity hurl itself?'[৪]

উনিশ শতকের আগের উল্লেখযোগ্য ভাষণগুলোর মধ্যে রয়েছে 'Sermon on the Mount' নামে খ্রিষ্টিয় ৩০ সালে সংকলিত যিশু খ্রিস্টের শ্রেষ্ঠ বাণীসমূহ। এসব বাণীতে যিশুর মূল নৈতিক শিক্ষাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। ৬৩২ সালে হযরত মুহাম্মদ (স.) যে ভাষণ দেন তা 'বিদায় হজের ভাষণ' বা 'The Farewell Sermon' নামে বিখ্যাত। আরাফাতের ময়দানে লাখো অনুসারীর সামনে তিনি এই ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ধর্ম হিসেবে ইসলামকে পরিপূর্ণতা দেয়া হয়েছে বলে জানান। ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ (১৫৩৩-১৬০৩) স্প্যানিশ আক্রমণের আশঙ্কায় ১৫৮৮ সালে নিজ দেশের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। উদ্দীপনামূলক এই ভাষণ 'Speech to the Troops at Tilbury' নামে খ্যাত। ধর্মগুরু জোনাথন এডওয়ার্ড (১৭০৩-৫৮) 'Sinners in the Hands of an Angry God' শীর্ষক বক্তৃতায় ষোড়শ শতকের ধর্মীয় জাগরণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ১৭৪১ সালে এই ভাষণ প্রদান করা হয়। মার্কিন স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্যাট্রিক হেনরি (১৭৩৬-১৭৯৯) ১৭৭৫ সালে এক অসাধারণ ভাষণ দেন। 'Give Me Liberty or Give Me Death' শিরোনামের এই ভাষণ তিনি 'ভার্জিনিয়া হাউস অব বার্গেস'-এ প্রদান করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়ান উইলিয়াম উইলবারফোর্স (১৭৫৯-১৮৩৩) ১৭৯১ সালে কমন্সসভায় চার ঘণ্টার এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। 'Abolish the Slave Trade' শীর্ষক এই ভাষণে তিনি দাস প্রথা বিলোপের পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ১৮৫২ সালে দেয়া ফ্রেডারিখ ডগলাস-এর বক্তৃতার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। 'The Hypocrisy of American Slavery' নামের এই বক্তৃতায় ডগলাস দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ঘোষণা করেন।

উনিশ শতকের অনেক ভাষণ ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও-র 'উইমেনস কনভেনশন ইন এক্রন'-এ ১৮৫১ সালে সজর্নার ট্রুথ (১৭৯৭-১৮৮৩) এক ভাষণে নারী অধিকার নিয়ে যুগান্তকারী বক্তব্য রাখেন। এই ভাষণের শিরোনাম 'Ain't I A Woman?' ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-১৮৬৫) ঐতিহাসিক 'Gettysburg Address' প্রদান করেন। গেটিসবার্গে স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এই ভাষণ দেন। পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার জন্য এই ভাষণ ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে। যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার

৪. http://en.wikipedia.org/wiki/Catiline_orations

প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখেন সুসান বি এন্থনি (১৮২০-১৯০৬)। ১৮৭৩ সালে 'Is it a Crime for a Citizen of the United States to Vote?' শিরোনামের ভাষণে তিনি নারীর ভোটাধিকার অস্বীকার করে কেবল পুরুষের ভোট প্রদান এক ধরনের অপরাধ বলে মত দেন। ১৮৯৩ সালে বাঙালি পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো-তে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অব রিলিজিওন্স'-এ এক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ভারতের ধর্মীয় মত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সারকথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি সকল ধর্মের মূল বক্তব্যের অভিন্নতা ও সব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সমন্বয়ের উপর জোর দেন।

বিশ শতকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে অসাধারণ কিছু ভাষণের জন্ম হয়। আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিক পিয়ার্স (১৮৭৯-১৯১৬) ১৯১৫ সালে তাঁদের আন্দোলনের কৌশল ও লক্ষ্য বর্ণনা করে দিকনির্দেশনামূলক এক ভাষণ দেন। এই ভাষণের শিরোনাম 'Ireland Unfree Shall Never Be at Peace'. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপনী ঘোষণা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইড্রো উইলসন (১৮৫৬-১৯২৪) ১৯১৮ সালে 'Fourteen Points' শীর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফায় উল্লেখ করেন যে, অনেক দেশ যেখানে বিশ্বাস করে স্ব-দেশের স্বার্থই হবে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি সেখানে গণতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি হবে morality and ethics.[৫] ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) ১৯৩৩ সালে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে কংগ্রেসে 'The Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৯৪০ সালে ফরাসি নেতা চার্লস দ্য গল (১৮৯০-১৯৭০) লন্ডনের রেডিও-তে এক ভাষণ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি এই ভাষণে আহ্বান জানান। দ্য গলের এই ভাষণ 'Appeal of 18 June' নামে বিখ্যাত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫) অক্ষশক্তির কাছে কোনোক্রমে আত্মসমর্পণ না-করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে কমন্সসভায় এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। 'We Shall Fight on the Beaches' শীর্ষক এই ভাষণে চার্চিল আত্মসমর্পণ নয়, বরং শেষবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ১৯৪২ সালে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়ো' বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণের শিরোনাম 'A Tryst

৫. Melvin I. Urofsky, *Basic Readings in U. S. Democracy*, United States Information Agency, Washington 1994, p. 306

with Destiny'. ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন সংবিধান পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে উপনিবেশবাদ বিরোধী দীর্ঘ সংগ্রাম, স্বাধীনতার তাৎপর্য, পরিষদ-সদস্যদের কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে আবেগময় কণ্ঠে নেহেরু বক্তব্য রাখেন। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিডেল কাস্ট্রো (১৯২৬-) ১৯৫৩ সালে আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে চার ঘণ্টার এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। 'History Will Absolve Me' শিরোনামের এই ভাষণে তিনি কিউবান সামরিক ব্যারাকে আক্রমণের অভিযোগ অস্বীকার করেন। স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৮৯৪-১৯৭১) ১৯৫৬ সালে 'On the Personality Cult and its Consequences' শীর্ষক এক ভাষণে স্টালিনের তীব্র সমালোচনা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে এই ভাষণ প্রদান করা হয় বলে এটি 'Secret Speech' নামেও পরিচিত। ১৯৬১ সালে জন এফ. কেনেডি (১৯১৭-৬৩) নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে, 'Ask Not What Your Country Can Do For You' শিরোনামে এক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি তাঁর 'fellow American'-দের রাষ্ট্রের কাছে সুবিধাদি না চেয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-) বিচারের সম্মুখীন হন। আদালতে তিনি 'I Am Prepared to Die' শিরোনামে তাঁর বক্তব্য রাখেন। এই বক্তৃতায় তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনের সহিংস-কৌশলের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্ট লিংকন মেমোরিয়ালের কাছে দুই লাখ লোক 'jobs and freedom'-এর দাবিতে সমবেত হয়। আরও অনেকের সঙ্গে মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রও (১৯২৯-৬৮) এখানে বক্তৃতা করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান (১৯১১-) ১৯৮৭ সালে পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানির সীমান্তবর্তী Brandenburg Gate-এ এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা উভয় জার্মানির লোকেদের শোনার সুযোগ ছিল। রিগান সোভিয়েট নেতা মিখাইল গর্বাচেভ (১৯৩১-)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি স্বাধীনতা ও উন্নতি চান তাহলে বার্লিন দেয়াল ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেন। এই কথা থেকে তাঁর বক্তৃতা 'Tear Down This Wall' নামে পরিচিতি পায়। ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট Thabo Mbeki দেশের জন্য নতুন সংবিধান প্রবর্তন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। 'I Am an African' নামে এই বক্তৃতা খ্যাতি পায়। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা (১৯৬১-) ২০০৯ সালে মিসরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামি বিশ্বের সম্পর্ক বিষয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন। 'A New Beginning' শিরোনামের এই ভাষণে ওবামা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামি বিশ্বের মধ্যকার তিক্ততা ও বিভেদ দূরীকরণের উপায় নির্দেশ করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড (১৯৬১-) ২০১২ সালের ৯ই অক্টোবর বিরোধী দলের

নেতা টনি আবট (Tony Abbott, ১৯৫৭-) উত্থাপিত নারী-বিদ্বেষ বিষয়ক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 'Sexism and Misogyny' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।[৬]

সারণী ১: চারটি ভাষণের তুলনা—সময়-শব্দ-শ্রোতা

ক্রমিক	ভাষণ	ব্যয়িত সময়	শব্দ	শ্রোতা-সংখ্যা (আনুমানিক)
১	গেটিসবার্গ এড্রেস (১৮৬৩)	২ মি.	২৭২	১৫,০০০—২০,০০০
২	উই শ্যাল ফাইট অন দি বিচেস (১৯৪০)	১২.১৬ মি.	৩৭৬৮	৬০০ (কমন্সসভা)
৩	এ ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি (১৯৪৭)	৫.০৯ মি.	৭৫৫	৫০০ (সংবিধান পরিষদ)
৪	আই হ্যাভ এ ড্রিম (১৯৬৩)	১৭ মি.	১৬৬৬	২,০০,০০০ (দুই লাখ)
৫	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯৭১)	১৯ মি.	১১০৭	১০,০০,০০০ (দশ লাখ)

উৎস: লেখক কর্তৃক সারণীকৃত

২

২.১ গেটিসবার্গ এড্রেস : আব্রাহাম লিংকন

আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট (১৯৬১-৬৫) ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে। গৃহযুদ্ধে আমেরিকা যখন রক্তাক্ত তখন লিংকন এই জাতির নেতৃত্ব দেন।[৭] গৃহযুদ্ধের দুই পক্ষ ইউনিয়নপন্থী (উত্তর) ও কনফেডারাইটদের (দক্ষিণ) মধ্যে গেটিসবার্গে ১৯৬৩ সালের ১-৩ জুলাই সাংঘাতিক এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'টার্নিং পয়েন্ট'। যুদ্ধে দুইপক্ষে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে তবে শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নপন্থীরা বিজয়ী হয়। ইউনিয়নপন্থী সৈনিকদের স্মরণে গেটিসবার্গে এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এই স্মৃতিসৌধের ফলক উন্মোচনের জন্য ১৯৬৩

৬. গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_speeches

৭. আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল সে-সময় পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। যুদ্ধে দুইপক্ষের কমপক্ষে ৭ লাখ ৫০ হাজার সৈন্যের মৃত্যু ঘটে।

সালের ১৯শে নভেম্বর সেখানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন এডওয়ার্ড এভারেট (Edward Everett)| প্রেসিডেন্ট লিংকনের দায়িত্ব ছিল নিহত সৈনিকদের স্মরণে কেবল উৎসর্গ-মন্তব্য (dedicatory remarks) করা। এভারেট সেদিন দুই ঘণ্টা সময় নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এভারেটের পর লিংকন ২৭২টি শব্দ ব্যবহার করে মাত্র দুই মিনিটে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এই ভাষণই পরবর্তীকালে 'গেটিসবার্গ এড্রেস' নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য লিংকন ওয়াশিংটন থেকে ট্রেনে গেটিসবার্গ যান। ট্রেন ভ্রমণের ফলে লিংকন ক্লান্ত ছিলেন এবং তাঁর শরীরও খারাপ ছিল। প্রচণ্ড মাথাব্যথা এবং সামান্য জ্বর ছিল। ওয়াশিংটন ফিরে আসার পর লিংকন গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন। লিংকন যখন বক্তৃতা শেষ করেন তখন শ্রোতাদের অনেকে বুঝতেই পারেন নি তিনি কখন শুরু করেছেন এবং কীভাবে সমাপ্তি টেনেছেন। শ্রোতাদের একজন সারাহ কুক (Sarah Cooke) তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে পরে লিখেন, 'I was close to the President and heard all of the Address, but it seemed short. Then there was an impressive silence like our Menallen Friends Meeting. There was no applause when he stopped speaking.'[৮] উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকে ঐদিন মুগ্ধ না-হলেও কেউ কেউ তখনই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। লিংকনের আগে যিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই এভারেট পরের দিন প্রেসিডেন্টকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'I should be glad if I could be flatter myself that I came near to the central idea of the occasion, in two hours, as you did in two minutes.' এই চিঠির উত্তরে লিংকন লিখেন, 'glad to know that the speech was not a total failure.'[৯] লিংকনের এই ভাষণের প্রতি সংবাদপত্রগুলোর মূল্যায়ন ছিল পার্টি লাইন অনুযায়ী বিভক্ত। ডেমোক্রেটিক দলের অনুসারী *Chicago Times* মন্তব্য করে, 'The cheek of every American must tingle with shame as he reads the silly, flat and dishwatery utterances of the man who has to be pointed out to intelligent foreigners as the President of the United States.' অন্যদিকে রিপাবলিকানপন্থী *Springfield Republican* এই ভাষণকে 'a perfect gem' that was 'deep in feeling, compact in thought and expression, and tasteful and elegant in every word and comma' বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। Republican ভবিষৎ বাণী করে যে, 'Lincoln's brief remarks would 'repay further study as the model speech.' কেবল মডেল ভাষণ নয়, পববর্তীকালে

৮. http://en.wikipedia.org/wiki/Gettysburg.Address

৯. *Ibid.*

এটি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণের মর্যাদা পায়। এটাকে বলা হয়েছে 'one of the finest examples of English public oratory'.[১০] শ্রেষ্ঠ ভাষণ নিয়ে যত গবেষণা ও মূল্যায়ন হয়েছে সেগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই লিংকনের এই ভাষণকে এক থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে।

ভাষণের শুরুতে লিংকন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কথা স্মরণ করেন। ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আমেরিকায় একটি নতুন জাতির উদ্ভব ঘটেছিল এবং সেই জাতি সকলের ব্যক্তিক-স্বাধীনতা এবং সকল মানুষ সমান এটা মেনে নিয়েছিল। লিংকন বলেন, 'Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.'[১১] এরপর লিংকন আমেরিকাকে কেন গৃহযুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করে বীর যোদ্ধারা আবার এই জাতির টিকে থাকা ও ভবিষৎ নির্মাণে কীভাবে অবদান রাখবেন তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে বীরেরা এখানে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের সম্মানে আমরা কী বলি তা হয়ত পৃথিবী এক সময় মনে রাখবে না। কিন্তু তাঁরা যা করেছেন তা মানুষ কোনদিন ভুলবে না। এতসব আত্মদান, এতসব মৃত্যু বৃথা যাবে না। কারণ, এই জাতি, ইশ্বরের কৃপায়, স্বাধীনতার জন্য নবজন্ম লাভ করেছে এবং '...government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.'[১২]

লিংকন যখন ভাষণ দেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনে এই ভাষণের খুব প্রভাব পড়ে নি। সমসাময়িক রাজনীতিতেও এই ভাষণ নীতি নির্ধারণী কোনো ভূমিকা পালন করে নি। তবে পরবর্তীকালে এই ভাষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে গণতন্ত্রের চিরন্তনী সংজ্ঞা হিসেবে লিংকনের এই ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ লাইনটি সর্বত্র উদ্ধৃত হতে থাকে।

২.২ উই শ্যাল ফাইট অন দি বিচেস : উইনস্টন চার্চিল

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন ১৯৪০ সালের ১০ই মে। ১৩ই মে থেকে ১৮ই জুনের মধ্যে চার্চিল ব্রিটিশ কমন্সসভায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৩ই মে দেয়া প্রথম ভাষণের শিরোনাম 'Blood, Toil, Tears and Sweat'. ১৮ই মে দেয়া হয় তৃতীয় ভাষণটি। এটির শিরোনাম 'This Was Their Finest Hour'. সবচেয়ে আলোচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিতীয় ভাষণ দেন ৪ঠা জুন। এটি 'We Shall Fight on the

১০. *Ibid.*
১১. Melvin I. Urofsky, *op. cit.*, p. 163
১২. http://en.wikipedia.org/wiki/Gettysburg.Address

Beaches' নামে খ্যাত। তিনটি ভাষণকে একত্রে চার্চিলের 'No Surrender' বক্তৃতামালা বলা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বিশেষ পর্যায়ে চার্চিল জাতি ও বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর নিজের, সরকারের, ব্রিটিশ জাতির এবং মিত্রপক্ষের অবস্থান তুলে ধরেন। জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রা তখন অব্যাহত। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গের পতন ঘটেছে। ডানকার্কের (Dunkirk) যুদ্ধে ফরাসি বাহিনী প্রচণ্ড মার খেয়েছে। বিপুলসংখ্যক ফরাসি সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফরাসিরা ব্রিটেনের কাছে যুদ্ধ বিমান চেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার আগে 'নিজের দেশের নিরাপত্তা' এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবছে। অন্যদিকে ফরাসিরা যুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করবে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রিটিশ-জনমনেও যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। অনেকে ভাবছেন যে, 'This is not our war—this is a war of the high-up people who use long words and have different feelings'. এ-রকম পরিস্থিতিতে চার্চিল কমন্সসভায় তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। তাঁকে একদিকে যুদ্ধ সম্পর্কে সত্য তথ্য তুলে ধরা অন্যদিকে দেশবাসীর মনোবল চাঙা রাখার প্রতি মনযোগ দিতে হচ্ছিল। ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই অথচ যুদ্ধ-পরিস্থিতি ক্রমেই প্রতিকূলে যাচ্ছে। প্রথম ভাষণে চার্চিল বলেন, 'You ask, what is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, land, and air, with all our might and with all the strength that God can give us; to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be.' যুদ্ধ প্রলম্বিত হতে পারে। আবার ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে সরে আসতে পারে। এ-অবস্থায় চার্চিল ৪ঠা জানুয়ারির ভাষণে বলেন, আমরা সবাই যার যার দায়িত্ব পালন করলে নিজের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব। তবে স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটাতে আমরা 'if necessary for years, if necessary alone' যুদ্ধ চালিয়া যাব। এই ভাষণে চার্চিল সামরিক ঘটনাবলির বিস্তৃত বর্ণনা দেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ফ্রান্স রিপাবলিক যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। এরপর উচ্চারণ করেন এই ভাষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাবলি। তিনি নাজি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানোর কৌশল ব্যক্ত করেন এভাবে, 'We shall go on to the end, ... we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire

beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.'[১৩]

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণের ইতিহাসে চার্চিলের এই বক্তৃতা সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। এ-পর্যন্ত ঐতিহাসিক ভাষণগুলোর যতসব শীর্ষ তালিকা তৈরি হয়েছে সেগুলোর সবটিতে এই ভাষণ প্রথম দশটির মধ্যে অবশ্যই রয়েছে। ১২.১৬ মিনিটের ভাষণে চার্চিল মোট ৩৭৬৮টি শব্দ ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এই ভাষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

২.৩ এ ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি : জওহরলাল নেহেরু

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে নেহেরু এই ভাষণ প্রদান করেন। ভারতীয় সংবিধান পরিষদে এক আবেগঘন পরিবেশে নেহেরু ভাষণ দেন। নেহেরুর এই ভাষণ ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা বলে স্বীকৃত। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পটভূমিতে ভারত ভাগ হয় এবং একই সঙ্গে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে জর্জরিত হয়ে সারাদেশে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বাস্তুত্যাগী মানুষের মিছিল তখন চারদিকে। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, শত বছরের আন্দোলন সফল হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ভবিষৎ কী, রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, উত্তেজক-পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে, রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব কী হবে—এসব বিষয়ে দেশবাসীকে দিকনির্দেশনা এবং সারাবিশ্বকে আশ্বস্ত করার ঐতিহাসিক কর্তব্য তখন স্বাধীন-ভারতের নেতা হিসেবে নেহেরুর সামনে। নেহেরুর এই ভাষণ ছিল স্বাধীন-ভারতের কোন নেতার প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তব্য।

'এ ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি' ছিল একটি পরিকল্পিত ও লিখিত ভাষণ। এই ভাষণ প্রদানে নেহেরু ৫.০৯ মিনিট সময় ব্যয় করেন। উচ্চারিত মোট শব্দ মাত্র ৭৫৫টি। অপেক্ষাকৃত ছোটো এই ভাষণে নেহেরু ঐ সময়ে প্রয়োজনীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তুলে ধরেন। নেহেরু যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন তখন পরিষদ-কক্ষে উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নেহেরুর বক্তৃতার শুরুটা ছিল নাটকীয় ও দৃঢ়। বক্তা উদাত্ত ও কম্পিত কণ্ঠে কথা বলা আরম্ভ করেন এভাবে—'Long years ago we made a tryst with destiny...' শুরুতেই সবার

১৩. http://www.winstonchurchill.org/learn/speeches/speeches-of-winston-churchill/1940-finest-hour/128-we-shall-fight-on-the-beaches

মনযোগ আকৃষ্ট হয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলি তাঁর সঙ্গে একাত্ত হয়। সে-সময়ের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে পরিষদ-সদস্য বালকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলেন, 'I still remember, I was in Parliament on the midnight of Aug 14. There was a huge gathering in the hall and we were jostling for space. When Pandit Neheru uttered the words 'long years ago, we made a tryst with destiny...' there was not a single person in the hall who didn't have tears in his eyes.'[১৪] শুরুটা যেমন আকর্ষণীয় ছিল তেমনি ছিল বিষয় বৈচিত্র্য। সংক্ষিপ্ত ভাষণে নেহেরু ভারতের ইতিহাস, স্বাধীনতা কীভাবে ভারতে নতুন যুগের সূচনা করবে এবং স্বাধীনতা কীভাবে সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। নেহেরু বলেন, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements that await us.'[১৫] তিনি বলেন, স্বাধীন দেশে এখন আমাদের দায়িত্ব দেশের সেবা করা। আর দেশের সেবা মানে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি করা। তাঁদের দারিদ্র, অজ্ঞতা, রোগ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি দেয়া। তাঁর ভাষায়—'The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye.'[১৬] ভারতের মহান ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেহেরু নতুন-ভারতের নাগরিকদের কেন সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠতে হবে তার উপর জোর দেন। নেহেরু বলেন, 'We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action.'[১৭] গণতন্ত্র, বিশ্বশান্তি এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর উন্নয়নে ভারতের দায়িত্বপূর্ণ অবদান রাখার কথাও নেহেরু তুলে ধরেন।

১৪. দেখুন, http://www.deccanherald.com/content/88811/bal-krishna-still remembers-nehrus.html

১৫. http://www.guardian.co.uk/theguardian/2007/may/01/greatspeeches

১৬. *Ibid.*

১৭. *Ibid.*

নেহেরুর এই ভাষণ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার না-করলেও ভারতের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে এক অসাধারণ সংযোজন বলে স্বীকৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা নেহেরুর এই ভাষণকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি ভাষণের একটি বলে মূল্যায়ন করেছে।[১৮] ভারতের বিভিন্ন জনপ্রিয় মাধ্যম যেমন, সিনেমা, নাটক ও উপন্যাসে এই ভাষণের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণভাবে এসেছে।

২.৪ আই হ্যাভ এ ড্রিম : মার্টিন লুথার কিং

মার্টিন লুথার কিং এবং আরও অনেকে দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে আসছিলেন। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বর্ণবাদ নির্মূল করা এবং মার্কিন সমাজে নিগ্রোদের সম-অধিকার নিশ্চিত করা। ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্ট আন্দোলনকারী ২০টি সংগঠনের নেতৃত্বে ওয়াশিংটনের লিংকন মেমোরিয়ালের সামনে এক গণজমায়েতের আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট কেনেডির সরকার তখন নাগরিক অধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গণজমায়েতের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের উদ্যোগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা। সেজন্য শুরু থেকে উদ্যোক্তাদের চেষ্টা ছিল অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণ রাখা এবং বক্তৃতায় যেন কোনো উত্তেজনা না-ছড়ায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া।

আরও অনেক বক্তার সঙ্গে মার্টিন লুথার কিং-ও এখানে বক্তৃতা করেন। কিং-এর ভাষণ ছিল লিখিত। একজন সহকারীর সাহায্যে কিং এই বক্তৃতা প্রস্তুত করেন। দুই লাখের অধিক শ্রোতার সামনে কিং যখন তাঁর বক্তৃতা প্রায় শেষ করে আনছিলেন তখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মাহালিয়া জ্যাকসন চিৎকার করে তাঁকে অনুরোধ করেন 'মার্টিন তোমার স্বপ্নের কথা বলো'। এরপর কিং বক্তৃতা বাড়িয়ে আমেরিকাকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। ১৭ মিনিটের এই ভাষণে কিং ১৬৬৬টি শব্দ ব্যবহার করেন। বক্তৃতার এই অংশ শোনে শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলি যেমন এই বক্তৃতা শোনার সুযোগ পান তেমনি টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে এই ভাষণের খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয়। এই বক্তৃতা পরবর্তীকালে 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৯৯ সালে গণ-বক্তৃতার উপর পরিচালিত এক জরিপে 'আই হ্যাভ এ ড্রিম'-কে বিশ শতকের আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ভাষণ বলে উল্লেখ করা হয়। অনেকে এটিকে 'masterpiece of rhetoric' বলে প্রশংসা করেছেন। কিং ভাষণে প্রধানত স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলেন। কিং ভাষণ শুরু করেন গেটিসবার্গে দেয়া লিংকনের বক্তৃতার অনুকরণে। লিংকন শুরু করেছিলেন 'Four score and seven

১৮. http://www.guardian.co.uk/theguardian/2007/may/01/greatspeeches

years ago our fathers brought forth...' এই কথা দিয়ে। কিং, 'Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today...' এই কথাগুলো বলে আরম্ভ করেন। কিং আমেরিকার 'Declaration of Independence', 'Emancipation Proclamation' এবং মার্কিন সংবিধানের প্রসঙ্গ এনে কীভাবে নিগ্রো জনগোষ্ঠীর প্রতি অব্যাহতভাবে অবিচার করা হচ্ছে তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমেরিকা নিগ্রোদের 'bad check' দিয়েছে, কিন্তু আজ আমরা সমবেত হয়েছি 'to cash this check'. কিং বলেন, নিগ্রোদের বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেসব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নি। তিনি আমেরিকার সমাজে সকল মানুষের সম-অধিকার ও সমান মর্যাদা দাবি করেন। তারপর তিনি আমেরিকাকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। কিং বলেন, 'I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.'[১৯] তিনি বলেন, I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.'[২০]

২.৫ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম : শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই রাষ্ট্রে প্রধান দুটি ভৌগলিক ভাগ, একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান অন্যদিকে বারশত মাইল দূরে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হতে থাকে যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অবহেলিত ও শোষিত হচ্ছেন। পশ্চিম পাকিস্তান তথা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে আস্তে আস্তে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার পর স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দলের নেতা থেকে জাতীয় নেতা এবং বাঙালিদের প্রিয় 'বঙ্গবন্ধু'তে পরিণত হন।

১৯. Melvin I. Urofsky, *op. cit.*, p. 231

২০. *Ibid.*

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা থেকে বিরত থাকে। এ-অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও অস্ত্রের সমাবেশ ও মজুত বাড়াতে থাকে। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে জনতার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। হতাহতের ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ-অবস্থায় রেডিকাল ছাত্র-যুবকদের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুর উপর চাপ আসতে থাকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ব্যর্থ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র তখন মানুষের মনে দুঃখ, ক্ষোভ, উত্তেজনা ও আতঙ্ক। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বাঙালিদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি চলে। এই পটভূমিতে বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ বলেন যে, ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

৭ই মার্চের কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার পর ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে, ৩রা মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করে। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কী বলবেন? দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এ-প্রশ্ন উঠতে থাকে। তিনি কী এককভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন? তিনি কী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো আপসরফার ইঙ্গিত দেবেন? ৭ই মার্চের জনসভা কী শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকবে? উজ্জীবিত জনতা কী ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবে? আওয়ামী লীগের নেতারা ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কী বলবেন তা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর উপরই ভাষণের বিষয় ঠিক করার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

একদিকে কোটি মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার জন্য রেডিকালপন্থীদের চাপ, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি বিশ্বজনমতের প্রবল আগ্রহ এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা ঘোষিত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের আশঙ্কা, এ-রকম বহুমাত্রিক জটিল ও স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেন। সকাল থেকে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হতে থাকে। শুধু সমাবেশ স্থল নয় সারা শহরের প্রায় সকল সড়কেই মানুষের ঢল নামে। বিশ্ব ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টিকারী ১০ লাখেরও বেশি লোকের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু ভাষণ প্রদান করেন। ১৯ মিনিটের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু ১১০৭টি শব্দ ব্যবহার করেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল অলিখিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। মূল বিষয় দিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। প্রথম বাক্যে নিজের মনের অবস্থা উল্লেখ করে শ্রোতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি শুরু করেন, 'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।' এরপর কোন্ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি হাজির হয়েছেন তা ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ উপর থেকে নিচে এক তালে অগ্রসর হয় নি। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আবার নিজে উত্তর দিয়ে শ্রোতাকে তাঁর পক্ষের যুক্তি তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো।... কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।' বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর কথা মতো সংসদের অধিবেশন ডাকছেন না। তিনি শুনছেন লঘিষ্ঠ দলের নেতা ভূট্টোর কথা। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু বলছেন সংখ্যায় কম হলেও প্রতিপক্ষ ন্যায্য কথা বললে তাদের শোনা হবে। তাঁর ভাষায়, 'আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে [প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে] অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। ...আমি বললাম এসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেয়া হলো।' তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। শাসকগোষ্ঠী তাঁর দাবি মানে নি অর্থাৎ সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং এসেমব্লি বা আলোচনায় বসার পরিবেশ তৈরি হয় নি। অতএব অসহযোগ চালিয়ে যেতে হবে, 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিষগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে

আসবেন।' কিন্তু তিনি এ-ও জানেন পাকিস্তানিরা এসব মেনে নিবে না। প্রত্যাঘাত করবে। তখন বাঙালিরা কী করবে? এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন পরের বাক্যে, '...আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' শুধু প্রতিরোধ গড়ে তোলা নয়, কেবল দুর্গ গড়া নয়। সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণের কৌশলের উল্লেখ করেন। সে কৌশল রূপক ও গেরিলা—'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।' রূপকভাবে আক্রমণের কথা বললেও পরক্ষণেই সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি ভারসাম্যের আহ্বান জানাচ্ছেন—'তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।' আবার হুশিয়ার করে দিচ্ছেন--'কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালানোর চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।' লিংকন এবং চার্চিলের মতো বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মূল বক্তব্যটি এসেছে বক্তৃতার সব শেষ অংশে। বঙ্গবন্ধুর সামনে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন নাকি কোনো ফর্মুলার কথা বলবেন। এখানেও তিনি মূল ঘোষণাটি দিয়েছেন, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে। তিনি বলেন, '... তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

৩
৭ই মার্চের ভাষণ এবং অন্যান্য ভাষণ : তুলনা

আলোচিত ৫টি ভাষণ প্রদান করা হয় ৫টি দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটভূমিতে। যাঁরা ভাষণগুলো দিয়েছেন তাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক এবং সমাজ-সংস্কারক। এঁরা সবাই রাষ্ট্র ও রাজনীতির ইতিহাস নির্মাণে মৌলিক অবদান রেখেছেন এবং বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করেছেন। এ-দিক থেকে দেখলে এঁদের অবদান এবং কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা ভাষণের মধ্যে তুলনা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়নে তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতিও একটি স্বীকৃত উপায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে মানুষ কী কী ধরনের সংকট মোকাবেলা করেছে, কীভাবে সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করেছে এবং এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির/নেতৃত্বের ভূমিকা কেমন ছিল তা জানা সহজ হয়। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে

তুলনা করে বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ নির্বাচনের একটি রীতি চলমান রয়েছে। অনেকেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেষ্ঠ ভাষণের তালিকা/গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ-বিষয়ে আগ্রহী এবং সত্য-অনুসন্ধানী সকল মানুষের কাছেই মনে হবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব-ভাষণ-ইতিহাসে যথাযথভাবে বিবেচিত ও মূল্যায়িত হয় নি। এজন্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচিত ৫ জন বক্তা যখন স্ব স্ব ভাষণ দেন তখন তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করা প্রয়োজন। তখন লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, চার্চিল যুক্তরাজ্যের এবং নেহেরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে তাঁদের অবস্থান। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা। তাঁর অবস্থান ক্ষমতার কেন্দ্রে না-থাকলেও যে-সময় তিনি 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' ভাষণ দেন তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডির সরকার তাঁর সমর্থক ছিল। নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা তখন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিলেন। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল ক্ষমতা-কেন্দ্রের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। কেবল তাই নয়, উগ্র শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীসহ সকল 'ক্ষমতাবান' প্রতিষ্ঠান তাঁকে তখন তাদের প্রধান শত্রু বিবেচনা করত। তবে তাঁর পক্ষে ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, বাঙালিদের পূর্ণ সমর্থন। জনতার সমর্থন নিয়ে শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক প্রতিপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেন। আলোচিত ৫টি ভাষণের রাজনৈতিক পটভূমি বিবেচনায় দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল সবচেয়ে সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত পরিস্থিতিতে চার্চিলের ভাষণের সময়ও ছিল সংকটময়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একই সময়ে ও বিশ্বযুদ্ধের প্রায় একই অবস্থায় আরও দুইটি ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন। আলোচিত ভাষণটির জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে কিংবা তাঁর দেশ বা মিত্রশক্তিকে বাড়তি কোনো ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয় নি। অথচ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন নিজের, তাঁর দলের এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকা না-থাকার প্রশ্ন মাথায় নিয়ে। ভাষণে উচ্চারিত একটি অসতর্ক বক্তব্য তাঁকে এবং বাঙালিদের আন্দোলনকে বিপথগামী এবং প্রতিপক্ষের হাতে বাঙালিদের উপর অন্যায় আক্রমণের সুযোগ করে দিতে পারত। এজন্য রাজনৈতিক পটভূমি ও প্রতিপক্ষের অবস্থান বিবেচনায় ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করা হয় এক চরম জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে।

শ্রেষ্ঠ ভাষণের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে টেড সরেনসেন (Ted Sorensen) বলেন, 'Speeches are great when they reflect great decisions.' লিংকন গেটিসবার্গে কোন নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেবেন এটা কেউ প্রত্যাশা করেন নি। তিনি প্রধানত নিহত সৈনিকদের প্রতি সম্মান জানান এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আমেরিকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। চার্চিলের ভাষণ ছিল উদ্দীপনামূলক।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসীকে জানানো এবং বৃটিশ জাতির মনোবল বৃদ্ধি করাই ছিল তাঁর ভাষণের লক্ষ্য। নেহেরু তাঁর ভাষণে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য স্বাধীন দেশের ভবিষৎ সম্পর্কে আদর্শিক অবস্থান তুলে ধরেন। কিং আমেরিকার সমাজজীবন থেকে বর্ণবাদী বৈষম্য দূর করতে তাঁর চলমান সামাজিক আন্দোলনের মূলবাণী প্রচার করেন। আমেরিকা অতীতে কীভাবে নিগ্রোদের প্রতি অবিচার করেছে তা এবং সাদা ও কালো মিলে কীভাবে আমেরিকাকে সাম্য ও সমতার নীতিতে এগিয়ে নিবে সে-সম্পর্কে তাঁর স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। এসব ভাষণের তাত্ত্বিক, আদর্শিক এবং সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এসব দিক ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তাৎক্ষণিক নীতি নির্ধারণী গুরুত্ব ছিল অতুলনীয়। ৭ কোটি বাঙালির উন্মুখ অপেক্ষা ছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য—নেতা কী সিদ্ধান্ত দিবেন। পাকিস্তানিরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোষণা করে প্রত্যাঘাত করার। বিশ্ব জনমতের বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের আগ্রহ ছিল এটা জানা যে, মুজিব Unilateral Declaration of Independence দেন নাকি নিজেই সংবিধান পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন।[২১] পক্ষশক্তি, প্রতিপক্ষ এবং বাইরের নিরপেক্ষ জনমত সকল পর্যায় থেকে অধীর আগ্রহ ছিল ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতি। বঙ্গবন্ধু আবেগ ও যুক্তির আশ্চর্য প্রয়োগ ঘটিয়ে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে সকলের কাছে তাঁর সিদ্ধান্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা বুঝতে পেরেছিল বঙ্গবন্ধু পরোক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি শর্ত দিয়েছিলেন—সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং বাঙালিদের হত্যার তদন্ত করতে হবে। বিশ্ববাসী জানতে পেরেছিল নির্বাচিত নেতা হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় না এবং বাঙালিদের প্রতি অন্যায় আচরণের কারণে বাংলাদেশ দ্রুতই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতি যে-রকম বহুপাক্ষিক আগ্রহ ছিল তা বিশ্বের অন্য কোন ভাষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় নি। মানুষের আগ্রহের প্রতিফলন ঘটেছে সংবাদ মাধ্যমে ৭ই মার্চের খবর অতুলনীয় গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারের মধ্যদিয়ে। লিংকন, চার্চিল, কিং কিংবা নেহেরুর ভাষণের খবরও সংবাদপত্রে ও অন্যান্য মাধমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মতো এতো গুরুত্ব পায় নি। একটি ভাষণের মাধ্যমে একটি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার কাব্যিক এ-রকম ঘোষণা সত্যিই বিশ্ব ইতিহাসে বিরল ও অতুলনীয়।

---

২১. বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতি আন্তর্জাতিক জনমত ও সংবাদ মাধ্যমের আগ্রহ সম্পর্কে জানতে পড়ুন, ড. হারুন-অর-রশিদ, "বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য", তপন কুমার দে (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*।

কেবল তাৎক্ষণিক প্রয়োজন নয়, ৭ই মার্চের ভাষণে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবিক ঔদার্য্য, সামরিক কৌশল এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিরকালীন ও সর্বজনীন স্বীকৃতিও লাভ করতে পারে। আমরা জানি, বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন থেকে বাঙালিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এক অতুলনীয় উচ্চতায় স্থাপিত হয়। তাঁর নির্দেশে সারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, প্রশাসন, সরকারি সকল বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি ইয়াহিয়ার সরকারের প্রতি কোনো ভয় বা হুংকার প্রদর্শন করেন নি বরং জনগণের পক্ষে সকল অন্যায় আচরণ থেকে মুক্তি কামনা করেন। সরকারের প্রতি অনুরোধ করেন : তাঁর মানুষকে যেন আর অত্যাচার ও নিষ্পেষণ না-করা হয়। আবেগময় কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান, 'জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।' গণতন্ত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সবসময় পূর্ণ আস্থা ছিল। তাঁর কাছে গণতন্ত্র মানে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসন নয়। তিনি মনে করতেন গণতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ এমনকি একজনও যদি যুক্তিপূর্ণ কথা বলে তাহলে তার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বাঙালিরা পাকিস্তানে সংখ্যায় গরিষ্ঠ, সংখ্যায় বেশি বলে বাঙালিদের দাবি মানতে হবে এ-কথা তিনি কখনো বলেন নি। বাঙালিদের দাবির যৌক্তিকতা তিনি সব সময় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৭ই মার্চের ভাষণে তাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়, '... যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' সংগ্রামের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করেন। অফিস-আদালত-ব্যবসা-দোকান বন্ধের কথা বলেন। কিন্তু আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষের যাতে কোন কষ্ট না-হয় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। এজন্যই বলেন, 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। ... ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।' বঙ্গবন্ধুর মানবিক ঔদার্য্যের পরিচয় মিলে অবাঙালি সাধারণ মানুষের প্রতি যাতে কোনো অবিচার না-হয় সে আহ্বানের মধ্যে। তখন ঢাকায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের অনেক জায়গায় অনেক অবাঙালি মানুষের বাস ছিল। এরা সাধারণত বাঙালিদের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। উত্তেজনার বশে বাঙালিরা যাতে তাদের প্রতি

বিরূপ আচরণ না-করে সেজন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তিনি, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।' ঐ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ছয়টি শব্দের একটি ইঙ্গিতময় বাক্য, 'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।' এর ঠিক আগের বাক্যে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন আমি যদি হুকুম নাও দিতে পারি তবে তোমরা রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেবে। এর আগের বাক্যে বলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।' অর্থাৎ রাস্তাঘাট বন্ধ করে অসহযোগিতা করতে হবে এবং প্রতিরোধের জন্য দুর্গ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু ওরা যদি যুদ্ধ শুরু করে তাহলে আমরাও ওদের মারবো। তবে সশস্ত্র পন্থায় নয়, ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। বঙ্গবন্ধু জানেন বাংলার সকল মানুষ মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে। প্রতিপক্ষ সমরাস্ত্রে যত শক্তিশালীই হোক জনগণ এবং সমগ্র দেশবাসী যদি চায় তবে ওদের পরাস্ত করা যাবে। এখানে তিনি ইঙ্গিত করছেন দেশের সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে যে সেনাবাহিনী বাংলার মানুষ তাদের খাদ্যের সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দেবে। নদীমাতৃক বাংলায় তাদের কেউ পথ দেখাবে না। তারা চারদিকে বাংলার মানুষের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। খাবার পাবে না, পথ খোঁজে পাবে না। সকল দেশে সকল সময়ের জন্যই এই কৌশল জন-প্রতিরোধের উত্তম পন্থা বিবেচিত হতে পারে। বঙ্গবন্ধু এখানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জনগণের সহায়তা ও সক্রিয় অংশগ্রণের মাধ্যমে কীভাবে সফল করা যায় সে-বিষয়ে চিরন্তন ও সর্বজনীন কৌশল নির্দেশ করেছেন। জনগণের এত বিপুল সমর্থন, এত ভালোবাসা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সৃষ্টিকর্তার কৃপার কথা ভুলছেন না। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে চার্চিলের বক্তৃতার সেই অংশের কথা যেখানে তিনি বলেন, 'It is to wage war, by sea, land, and air, with all our might and with all the strength that God can give us...' এবং বঙ্গবন্ধু বলেন, 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।' বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন সবচেয়ে অর্থবহ, সবচেয়ে সুন্দর, অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় এবং উপস্থিত সকলের প্রত্যাশিত বাক্য দিয়ে। লিংকন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করেছিলেন, '...government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.' এই বাক্য দিয়ে। এই বাক্যের জন্য গেটিসবার্গ বক্তৃতা পরবর্তীকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুও ভাষণের শেষ বাক্যটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি উচ্চারণ করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই বাক্য উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনসমুদ্র গর্জে উঠে। জনতা তাদের নেতার মুখ থেকে অমোঘ নির্দেশ পেয়ে যায়। বাংলা ভাষার এক শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন, এই

বাক্য উচ্চারিত হওয়ার পর 'স্বাধীনতা' শব্দটি বাঙালির হয়।[২২] লক্ষ্যণীয়, বঙ্গবন্ধু প্রথমে বাঙালির মুক্তির কথা বলেছেন। এই মুক্তি কেবল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শৃঙ্খল থেকে বাঙালির রাজনৈতিক মুক্তি নয়, সকল অন্যায় অবিচার থেকেও সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তি। লিংকন তাঁর ভাষণে আমেরিকা থেকে জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সৃষ্ট সরকার এবং জনগণের জন্য যে সরকার তা কোনোদিন হারিয়ে যাবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। আমেরিকা প্রসঙ্গে লিংকন তাঁর বক্তব্য রাখলেও সময়ের পরিক্রমায় তা সারা বিশ্বের সকল যুগের মানুষের কাছে গণতন্ত্রের অব্যর্থ সংজ্ঞা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। একইভাবে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উচ্চারণ করলেও এই বাক্য সারা বিশ্বের সকল যুগের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে অমর ও অক্ষয় বাণীতে পরিণত হতে পারে। এখন এবং অনাগত ভবিষ্যতেও মানুষ যখন জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলন করবে তখন বঙ্গবন্ধুর এই ব্যঞ্জনাময় বাক্য তাদের অনুপ্রাণিত করবে।

অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষণের তুলনায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আরেকটি অসাধারণ দিক হলো এর নিখাদ মৌলিকত্ব। গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞার জন্য লিংকনের ভাষণ অমর সেটির ধারণা তিনি পান থিওডোর পার্কার (Theodore Parker) থেকে। লিংকনের বন্ধু উইলিয়াম হার্নডন (William Herndon) লিখেছেন, তিনি পার্কারের 'The Effect of Slavery on the American People' প্রবন্ধটি লিংকনকে পড়তে দিয়েছিলেন। এটি পড়ে লিংকনের ভালো লেগেছিল। একটি অংশ তাঁর বিশেষভাবে পছন্দ হয়েছিল এবং সেটিতে তিনি পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন। এই অংশে বর্ণিত ধারণাই তিনি গেটিসবার্গ বক্তৃতায় ব্যবহার করেন। পার্কার লিখেছিলেন, 'Democracy is direct self-government, over all the people, for all the people, by all the people.' ক্রেইগ আর স্মিথ (Craig R. Smith) লিখেছেন, লিংকন সরকার সম্পর্কে যে ধারণা গেটিসবার্গে ব্যক্ত করেন সেটি সিনেটর ডেনিয়েল ওয়েবস্টার (Daniel Webster)-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৮৮০ সালে এক বক্তৃতায় ওয়েবস্টার মার্কিন ফেডারেল সরকারকে 'made for the people, made by the people, and answerable to the people' বলে উল্লেখ করেছিলেন। চার্চিল তাঁর 'We shall Fight on the Beaches' ভাষণে যেসব ধারণা প্রকাশ এবং উদ্দীপনামূলক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেন তা এই বক্তৃতায়ই প্রথম প্রয়োগ করেন এমনটি নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার্চিল তখন এই বিষয়ে বেশ ক'টি ভাষণ দেন। ৪ঠা জুনের ভাষণের আগে এবং

---

২২. নির্মলেন্দু গুণ, "স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো", *সচিত্র বাংলাদেশ*, মার্চ, ঢাকা ২০১১, পৃ. ৭৭

পরও তিনি এসব ধারণা ব্যক্ত করেন। আমেরিকায় নিগ্রোদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মার্টিন লুথার কিং-এর যত আন্দোলন সেসবের মূল প্রেরণা তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 'Declaration of Independence' এবং 'Emancipation Proclamation' থেকে লাভ করেন। তাঁর 'I Have a Dream' বক্তৃতায়ও এসবের প্রভাব রয়েছে। এছাড়া ভাষণের শুরু, গাঁথুনি এবং একই শব্দগুচ্ছের বারবার ব্যবহারের স্টাইল এসব ক্ষেত্রে তিনি অন্যদের থেকে ধারণা নেন। কিং তাঁর ভাষণ শুরু করেন প্রায় লিংকনের মতই। লিংকন আরম্ভ করেন 'Four score and seven years ago our fathers...' এই কথা দিয়ে। আর কিং শুরুতেই উচ্চারণ করেন, 'Five score years ago, a great American,...' এই কথাগুলো। কিং যে 'I Have a Dream' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন সেটি তিনি প্রাথিয়া হল (Prathia Hall)-এর এক বক্তৃতা থেকে নিয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। এই নারী নেত্রী ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে জর্জিয়ায় দেয়া এক ভাষণে এই কথাগুলো বার বার ব্যবহার করেন। এছাড়া, কিং নিজেও ১৯৬০ সাল থেকে আমেরিকাকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা বলে আসছিলেন এবং এসব ধারণা ও প্রভাবেরই প্রাঞ্জল ও আবেগময় প্রকাশ ঘটে ঐ বক্তৃতায়। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে যেসব ধারণা, স্টাইল, আবেগ ও ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা একান্তই তাঁর উদ্ভাবন এবং মৌলিকতার পরিচায়ক। আমরা জানি, বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ বিনির্মাণে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নেতাজি সুভাষ বসু এবং মহাত্মা গান্ধির বিশেষ প্রভাব রয়েছে।[২৩] কিন্তু বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দেয়া ভাষণে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা ছিল তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত। এটা সবার জানা যে, ৭ই মার্চের আগে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দীর্ঘ বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠক থেকে বঙ্গবন্ধু নিশ্চয় অন্য নেতাদের চিন্তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুই ঠিক করেছিলেন তিনি কী বলবেন এবং কীভাবে বলবেন। ভাষণে উচ্চারিত ও উত্থাপিত প্রতিটি বাক্য, চিত্রকল্প, দাবি ও কর্মসূচির তিনিই ছিলেন একক প্রণেতা। পুরো ভাষণের নির্যাস তিনি তুলে ধরেন সর্বশেষ বাক্যটিতে। এই বাক্যে ৫টি শব্দ ব্যবহার করা হয় ৯ বার। এখানে 'সংগ্রাম' শব্দটি ৪ বার, 'এবারের' শব্দটি ২ বার এবং 'মুক্তি', 'স্বাধীনতা' ও 'আমাদের' এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে ১ বার করে। কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া লাখ লাখ মানুষের সামনে এ-রকম একটি কাব্যিক এবং সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বাক্য নির্মাণ ও উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ বঙ্গবন্ধুর বিরল প্রতিভার পরিচায়ক। কেবল এই বাক্য গঠন, উচ্চারণ ও সার্থক প্রয়োগের জন্যই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ জগতের সকল ভাষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

---

২৩. বঙ্গবন্ধুর মানস ও জীবনাদর্শ জানতে দেখুন, মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

কোনো লিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থে ভাব প্রকাশ এবং ভাষণে ভাব প্রকাশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রচিত হয় শ্রোতার উপস্থিতির কারণে। ভাষণের সময় বক্তাকে শ্রোতার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় এবং শ্রোতার উপস্থিতি তাকে প্রভাবিত (ইতিবাচক/নেতিবাচক) করতেও পারে। আলোচিত ৫টি ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শ্রোতার সামনে তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন। ৭ই মার্চের সভায় ১০ লাখেরও বেশি[২৪] মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। কেবল অন্য চারজন বক্তার তুলনায় নয় বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ দেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক জনসভায় (সারণী-১ দ্র.)। এখন পর্যন্ত এত বড় জনসভা কখনো কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নি। দশ লাখ মানুষ, যাঁরা ছিলেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি চরম বিক্ষুব্ধ, তাঁরা আবার ছিলেন নেতার নির্দেশে সম্পূর্ণত সুসংবদ্ধ, শান্ত ও ঐক্যবদ্ধ। এই জনসভার উপর ৮ই মার্চ প্রকাশিত একটি রিপোর্টের একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে যেখানে বলা হয়েছে, 'গতকাল (রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীকাকারী বাঙালির ঢল নামিয়াছিল। আকারের বিশালতা, অভিনবত্বের অনন্য মহিমা, আর সংগ্রামী চেতনার অতুল বৈভবে এই জনসমুদ্র ছিল নজিরবিহীন। আর এই বিশাল জনসমুদ্রের আরেকটি লক্ষ্যণীয় দিক ছিল বাঁশের লাঠি—কাষ্ঠে প্রলয় রাত্তির বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগরের সঘন গর্জন।'[২৫] লাখ লাখ মানুষ হাতে লাঠি এবং মনে ক্ষোভের আগুন নিয়ে জনসভায় এসেছিলেন কিন্তু তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কঠিন সংগ্রামের অঙ্গীকার নিয়ে। বিশাল বিক্ষুব্ধ এই জনসমুদ্রের সুশৃঙ্খলিত প্রস্থান বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ভাষণের সম্মোহিত ও জাদুকরী প্রভাবেরই ফল। যোগাযোগ তত্ত্বে ভাষণের মান বিশ্লেষণে বক্তার ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দ শ্রোতার সঙ্গে যোগাযোগে কতটুকু সহায়ক তা পরীক্ষা করা হয়।[২৬] নেহেরু 'A Tryst with Destin' ভাষণটি দিয়েছিলেন সংবিধান পরিষদে এবং তাঁর ভাষা ছিল ইংরেজি। শ্রোতাদের অনেকে ইংরাজি ভাষায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কঠিন ইংরেজির কারণে ভাষণের মর্মার্থ তখন বুঝতে পারেন নি যদিও বক্তা তাঁর দৃঢ়তা, ভঙ্গি ও আবেগ দিয়ে উপস্থিত সবাইকে মোহিত ও উদ্দীপ্ত করেছিলেন। অন্যদিকে, চার্চিলের ভাষা ও শব্দ ছিল খুবই সহজ ও সরল। ভাষার সহজবোধ্যতা এবং সারল্য ছিল চার্চিলের বক্তৃতা-শৈলির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এজন্য একজন গবেষক বলেছেন, 'His (Churchill's) ability of incorporating

---

২৪. দেখুন, তোফায়েল আহমেদ, "বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে জেগে উঠলো বাংলার মানুষ", তপন কুমার দে (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০

২৫. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭১

২৬. যোগাযোগ তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উপর আলোচনার জন্য দেখুন, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, "সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ", তপন কুমার দে (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*।

simplicity in his speaking is a true mastery...'.[২৭] চার্চিলের চেয়েও বঙ্গবন্ধুর ভাষা ছিল তাঁর শ্রোতার সঙ্গে বেশি যোগাযোগ-সহায়ক। সহজ সরল এবং কখনো আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার, ভরাট গলা, যুক্তির পারম্পর্য, আবেগময় কণ্ঠের মাত্রাবদ্ধ উঠানামা সবমিলে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটের এমন এক ভাষণ-কাব্য পরিবেশন করেন যা লাখ লাখ শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এক সঙ্গে এত মানুষের এত আবেগ এবং এত আগ্রহ নিয়ে কোনো রাজনৈতিক ভাষণ শোনার ইতিহাসও বিরল।

৪
উপসংহার : ৭ই মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে বিস্তৃত ও গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা হয় নি। পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তো আরও হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে চারটি প্রধান ভাষণের সঙ্গে ৭ই মার্চের ভাষণের উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, কোনো একটি বিশেষ দিক বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনায় অন্য কোনো ভাষণে উজ্জ্বলভাবে থাকলেও সামগ্রিক বিচারে ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ; লিংকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতা এবং মার্টিন লুথার কিং-এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' থেকেও শ্রেষ্ঠ। ভাষণ প্রদানের সময় বক্তার রাজনৈতিক/রাষ্ট্রীয় অবস্থান, ক্ষমতা-কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর কর্তৃত্ব, জনসভা/অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা, শ্রোতার সঙ্গে বক্তার সম্মোহনী-সম্পর্ক, ভাষণের যোগাযোগ-সক্ষমতা, বিষয় ও উপস্থাপনা স্টাইলের মৌলিকত্ব, বক্তব্যের স্পষ্ট ও ইঙ্গিতময় প্রকাশ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ভাষণের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রাসারী প্রভাব এবং বক্তব্যের চিরকালীন ও সর্বজনীন আবেদন সবমিলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অন্য সকল ভাষণের চেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সকল বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এই ভাষণের অন্য একটি দিক হলো ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি এবং ঐ দিন ঐ ভাষণ উচ্চারণের অপরিহার্যতা। গেটিসবার্গে লিংকন মূল বক্তা ছিলেন না, তিনি অসুস্থ ছিলেন, ওখানে না-গেলেও পারতেন বা গেলেও ভাষণ না-দিলে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নষ্ট হতো কিন্তু অনুষ্ঠান চলত। মার্টিন লুথার কিং আরও অনেক বক্তার একজন ছিলেন। চার্চিল বা নেহেরুর জায়গায় অন্য কোনো নেতা ভাষণ দিতে পারতেন। কিন্তু ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ছিলেন একমাত্র ও অনিবার্য বক্তা। বঙ্গবন্ধুর

---

২৭. Mark Gregory, "Churchill's Use of Language and Literary Devices in the Speech "We Shall Fight on the Beaches", visit, http://voices.yahoo.com/churchills-language-literary-devices-in-3180761.html

জন্যই লাখ লাখ মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর কথা শুনেই জনসমুদ্র ফিরে এসেছিল এবং তাঁর নির্দেশেই জনতা ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত শোনার জন্যই বিশ্ববাসী অপেক্ষা করছিল। একটা বিশাল জনসভায় একজন জননন্দিত নেতার উপস্থিতির এ-রকম অনিবার্যতাও ইতিহাসে বিরল। ৭ই মার্চের ভাষণের উপর বিস্তৃত গবেষণা ও বিশ্লেষণে এর বহুমাত্রিক বিশিষ্টতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

একটা ভাষণ থেকে অন্য ভাষণ 'ছোটো' বা 'বড়ো' এটা প্রমাণ করা আমাদের লক্ষ্য নয়। সব উত্তম ভাষণই সর্বজনীন এবং এগুলো থেকে সকল যুগের মানুষের শিক্ষণীয় রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণও একটি ঐতিহাসিক ভাষণ এবং এটি অধ্যয়ন এবং এ থেকে শিক্ষা নেয়ার অধিকার সকল দেশের মানুষের আছে। কিন্তু লক্ষণীয়, ৭ই মার্চের ভাষণের কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ১০টি, ২০টি এমনকি ৩৫টি ভাষণের তালিকায়ও এই ভাষণ স্থান পায় নি। এর প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয় নি। এমনকি বাংলাদেশে এবং বাংলাভাষী অঞ্চলেও এই ভাষণ নিয়ে উন্নত মৌলিক গবেষণা হয় নি বলে এর সর্বজনীন ও সর্বকালীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা পায় নি। অথচ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাংলাদেশের সম্পদ, বাঙালির সম্পদ এবং বিশ্বেরও সম্পদ। এটি বাংলার ও বাঙালির এবং বিশ্বসভ্যতা ও ঐতিহ্য (heritage)-এর অপরিহার্য অংশ। একদিন এই বাংলার মানুষ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল। এটি জেনে বিশ্ববাসী অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং এর স্বীকৃতিও দিয়েছে। এজন্যই এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একদিন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান এই বাংলার এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে অতুলনীয় কণ্ঠে ও গভীর আবেগে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তাঁর ভাষণ-কাব্য পরিবেশন করেছিলেন। মানবসভ্যতা, মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতায় এই ভাষণের তাৎপর্য বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারলে এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবেই। এখন আমাদের দায়িত্ব ৭ই মার্চের ভাষণের বহুমাত্রিক দিক নিয়ে গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনা এবং বিশ্ববাসীর সামনে এই ভাষণের চিরকালীন ও সর্বজনীন গুরুত্ব তুলে ধরা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. দে, তপন কুমার (সম্পাদিত, ২০১০): *৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ*, তাম্রলিপি, ঢাকা
২. মতীন, হাসিনা (১৯৯৪): *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকান স্টাডিজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩. রহমান, মোহাম্মদ মতিউর (সংকলিত, ২০০৪): *বাংলা একাডেমী ঐতিহাসিক অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৪. সানি, আসলাম (সম্পাদিত, ২০১২) : *ঐতিহাসিক ৭ মার্চ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

৫. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার (২০০০) : *বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
৬. Kashyap, Subhash C. (1991): *History of Parliamentary Democracy*, Shipra, Delhi
৭. Palmer, Alan (2003): *Who's Who in World Politics : From 1860 to the Present Day*, Routledge, London
৮. Shafritz, Jay M. (1992): *Dictionary of American Government and Politics*, Harperperennial, New York
৯. Urofsky, Melvin I. (1994): *Basic Readings in U.S. Democracy*, United States Information Agency, Washington

ফোকলোর বা লোকজ উপাদান

৭ মার্চের ভাষণ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা
জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণ : একটি অনুপুঙ্খ পাঠ
আর দাবায়ে রাখবার পারবা না
৭ মার্চ : অবিনাশী কথামালার জন্মদিন
সর্বকালের সেরা বাঙালি বঙ্গবন্ধু ও ৭ মার্চের ভাষণ
৭ মার্চের ভাষণের লোকায়তিক মাত্রা
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিল
যে ভাষণে বাংলাদেশ
বাংলার লোকদর্শন : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের লোকউপাদান
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে লোকজ বৈশিষ্ট্য
৭ মার্চের ভাষণে লোকউপাদান : অন্বিষ্ট সেমিনারের অভিজ্ঞতা

৭ মার্চের ভাষণ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

আবদুল খালেক

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রমনার রেসকোর্স ময়দানে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণটি এতই প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় যে, ৭ মার্চ বললে আর কোনো সালের উল্লেখ করবার প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারে ৭ মার্চ মানে ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। ঐ দিন বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটি শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। বিশ্বের ইতিহাসে ৭ মার্চের এই ভাষণটিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০ টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচারণতত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। এক হাজার একশত ৭টি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই। কোনো বাহুল্য নেই—আছে শুধু সার কথা। ভাষণটি যখন বাজানো হয়, বাংলা ভাষা-ভাষি প্রতিটি মানুষ এখনও শিহরিত এবং উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবিচ্ছিন্ন। জাতির সামনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ না থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আদৌ অর্জিত হতো কি না, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। ২৬ মার্চকে আমরা জাতীয়ভাবে মহান স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি, কারণ ঐ দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ২৫ মার্চের গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হবার আগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যতদূর জানা যায় যুদ্ধের কারণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীবদ্ধ টেপটি

সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নি, যে কারণে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ৭ মার্চের ভাষণটি যত পরিচিত, বঙ্গবন্ধুর দেয়া ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ততটা পরিচিত নয়। ১৯৭১ সালে এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ যুদ্ধ করেছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটিকে সামনে রেখে। ৭ মার্চের ভাষণটি শুনলেই উপলব্ধি করা যায় বঙ্গবন্ধু কত বড় মাপের নেতা ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু কত অসাধারণ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তান সরকার তাঁর বজ্রকণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেবে। কণ্ঠ রুদ্ধ হবার আগেই তিনি জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি ৭ মার্চের ভাষণে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শব্দ উচচারণ করেছিলেন। ভাষণের প্রতিটি শব্দ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে এর গভীরে প্রবেশ করা অপরিহার্য। মূল ভাষণটির দিকে এবার একটু দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।—বক্তৃতার শুরুটা এ রকম :

"ভাইয়েরা আমার,আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ...অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর করুণ আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ...১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ূব খাঁ মার্শাল-ল জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৯ সালে আয়ূব খাঁর পতনের পর ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।"

অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণা—যা পুরো বক্তৃতার মূল ভিত্তি তৈরি করেছে যা শ্রোতাদেরকে সম্মোহিত করেছে। শ্রোতারা ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে উঠতে থাকে এবং একই সাথে শ্রোতাদের মধ্যে উত্তেজনাও বাড়তে থাকে। পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের

তদানিন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের এ বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের কাছে যুদ্ধশ্লোগান বা বজ্রকণ্ঠ। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত এ বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে বক্তৃতা সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করে নি, তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ারমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণেই ছিল কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলার জনগণের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ এই বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ ও সাবলিল ভাষায় তাৎক্ষণিক রচিত এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বক্তৃতায় সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি যেমন—১. কি অন্যায় করেছিলাম? ২. কি পেলাম আমরা? ৩. কিসের আর টি সি? ৪. কার সঙ্গে বসবো? ৫. যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো?

বক্তৃতার যে সব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন সে সব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। "২৮ তারিখে কর্মচারিরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। সরকারি কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যেপর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল, কেউ দেবে না।"

রাষ্ট্রনায়কোচিত কর্তৃত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিত করানোই নয়, বরং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তাঁর এ বক্তৃতার মাধ্যমে। "তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।" সে দিনের সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্যকে হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে গ্রহণ করেছিল।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিকউদারতার কোন হেরফের কখনও যে ঘটে নি, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্মমৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি—'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো' বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন—'তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ

তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।' কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান উদার-হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝিতে এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তি যা গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যরকমভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝিতে এসে বলেন, "তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।"

৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় যে উপস্থিতি, হিসেব করলে দেখা যাবে নব্বই ভাগ মানুষ গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া কৃষক, মজুর, শ্রমিক, কামার, কুমার, মাঝি-মাল্লা প্রমুখ। বক্তৃতাটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে বোধগম্য করার লক্ষ্যে তিনি ব্যাপক আঞ্চলিক তথা লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক ভাষায় আপনি এবং তুমি একই সাথে ব্যবহারে কোনো বাধা নেই। উদাহরণ—*'ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে, কোন্ দিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাও কইয়া যাও রে।'* বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উল্লেখ আছে : "বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব—এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।" এখানে একদিকে যেমন তিনি ভাষা ব্যবহারে লোকরীতি ব্যবহার করেছেন, অপর দিকে 'ইনশাআল্লাহ' শব্দের ব্যবহার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মনিরপেক্ষতার বলিষ্ঠ প্রকাশ। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের জগত ইসলাম, এ কথা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। এর ফলে মৌলবাদী গোষ্ঠী যারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল, তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে।

যে কোনো বক্তৃতার চূড়ান্ত বাণী বা মেসেজ অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগ শাস্ত্র বিশারদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষ বাক্য— 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম-জয় বাংলা।' অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা—যা ৭ মার্চের বক্তৃতার শেষ মেসেজ হিসেবে স্বীকৃত।

বঙ্গবন্ধুর এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যখন বিচার বিশ্লেষণ করা যায়, তখন এর ব্যাপকতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যখন এই ভাষণের ব্যাখ্যা দিতে বসেন, তখন তিনি উচ্চারণ করতে বাধ্য হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর এ ভাষণে অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন মনোস্তত্ত্ববিদ যখন এই ভাষণটিকে

পর্যালোচনা করতে বসেন, তিনি বলতে বাধ্য হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একজন অসাধারণ মনোস্তত্ত্ববিদ ছিলেন। দার্শনিক যারা, তাঁরা এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে আবিষ্কার করেছেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক হিসাবে, সমাজবিজ্ঞানী যারা, তাঁরা এই ভাষণ ব্যাখ্যা করে বলতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী। যোগাযোগ বিজ্ঞানীরা বলেন ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। কবি সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।

কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় :

"শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মত দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে লাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা।
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি
শোনালেন তাঁর অমর কবিতা খানি :
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।"

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাংলাদেশের আকাশ, মাটি, মানুষ থাকবে, ততদিন ৭ মার্চের ভাষণের মৃত্যু নেই। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণ : একটি অনুপুঙ্খ পাঠ

শামসুজ্জামান খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ১৯৭১-এর ইতিহাসে অনন্য ভাষণটি অধিকারবঞ্চিত বাঙালির শত সহস্র বছরের সংগুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উচ্চারণে সমৃদ্ধ। মাত্র ১৯ মিনিটের ওই ভাষণে তিনি এত কথা অমন অমোঘ তীক্ষ্ণতা, সাবলীল ভঙ্গি, বাহুল্যবর্জিত কিন্তু গভীরভাবে অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া ভাষায় কেমন করে বলতে পারলেন সে এক বিস্ময় বটে! ভাষণের মূলকথা যদি খুঁজি তাহলে দেখা যায়, পূর্ববাংলার মানুষের বঞ্চনার ইতিহাসও অধিকারহীনতার বিষয় এতে দীপ্র হয়ে উঠেছে; এবং পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমেই এ অবস্থা থেকে বাঙালির সার্বিক মুক্তি সম্ভব—এই বক্তব্যই বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতাশৈলীর অতুলনীয় ভঙ্গিতে কখনো আবেগ, কখনো যুক্তি, কখনো প্রশ্ন বা ইচ্ছাকৃত জোরালো পুনরুক্তির মাধ্যমে সোচ্চার করে তুলেছেন; কিংবা বিশেষ স্পর্শকতার ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই কৌশলময় ভাষা বা ইঙ্গিতে শ্রোতাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

কোনো দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবর্তন—প্রক্রিয়ার বিপুল মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার চাপ ও বিদ্যমান ঘটনা প্রবাহের মিথস্ক্রিয়া কোনো দূরদর্শী গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাকে মূলধারার মুখপাত্র বা মুখ্য চরিত্র করে তোলে; অথবা কোনো দমিত, দলিত, নিঃগৃহীত জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্যারিশমাটিক মূল নেতাই জনগণের মানস-চেতনার স্তর ও বাস্তবিক ভেতর তাগিদের সঙ্গে নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস-ধারণা-বিবেচনা ও সময় জ্ঞানকে অন্বিত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছিল।

দুঃখ-দারিদ্রপীড়িত, চিন্তাচেতনায় পশ্চাৎপদ, এককালের ব্রিটিশ-ভারতের হিন্টারল্যান্ড এবং পরে ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের কলোনিপ্রতিম পূর্ববাংলার মানুষের মনে বাঙালির অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ, মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন ও নানা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাগৃতি ও জাতীয় ঐক্যের বীজমন্ত্র রোপিত হচ্ছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত কৃষকেরই আন্দোলন। আর তাতে কৃষকের সমস্যা আর তার ভাষার অধিকার প্রাধান্য পায়। কৃষিভিত্তিক পূর্ববাংলায়ও তাই নবজাগৃতির বাহন হয়েছিল বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির চেতনা এবং এক নতুন ও শক্তিশালী বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তার বিশিষ্ট রূপ, এমনকি ভবিষ্যৎ পথরেখা সম্পর্কে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের জনপ্রিয় বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে দেয়া তাঁর ভাষণে। তাতে তিনি বলেন, Sir you will see that want to place the word. 'East has a tradition of its own,' তবে তিনি শুধু ঐতিহ্য-গর্বের প্রকাশ ঘটাননি, তার মধ্যে এনেছেন যুক্তি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা। তাই পরের লাইনেই বলেছেন, 'you can change it only after the people have been consulted (Speeches of Sheikh Mujib is Pakistan parliament complied by Ziaur Rahman [Ziaur Rahman Shahiar Iqbal], vol, 1, p. 12-17, March 1990).

বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশধারার সঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য প্রণীত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নীতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অভিযানের প্রতিক্রিয়া বাঙালিদের মনে যে নতুন জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়, তারই ফলে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন। এই আন্দোলনের কর্মী-সংগঠক, সমর্থক, বিশেষ করে এর নেতৃপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জনসমর্থন ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে পূর্ববাংলায় সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ স্বশাসনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক-মৌলবাদীচক্র এবং তাদের সহযোগী সামরিক ও ছদ্ম-সামরিক স্বৈরশাসকরা গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে বানচাল করার লক্ষ্যে বার বার সামরিক শাসন জারি করে পূর্ববাংলায় বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও তাদের স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশকে ধ্বংস করার প্রয়াস পায়। এই লক্ষ্যে তারা ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পূর্ব-বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েম করে। পাকিস্তানি শাসকদের এই হীনকৌশল উপলব্ধি করেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০-এই এক যুগ ধরে বাঙালি জাতির আপোসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬০-৬১ সাল থেকেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যেসব পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বন করে

জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তার সফল পরিসমাপ্তির রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশলের এক চমৎকার রূপরেখা তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। এই ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত করার কৌশল এবং তাতে সাফল্য লাভের দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্বপাকিস্তান বিপুল বিজয় অর্জন করার পর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো নানা কূটকৌশল, শঠতা ও স্বৈরাচারী পন্থায় সংখ্যাগুরু বাঙালির এই নির্বাচনী বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের অধিকারকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়; এবং এই অগণতান্ত্রিক ও ঘৃণ্য কাজের জন্য তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালিকে চিরতরে দাবিয়ে দেবার পাঁয়তারা শুরু করে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা, এর আদেশ-নির্দেশের পরিপূর্ণতা, এর বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং এর পেছনে বাংলার সকল মানুষের সমর্থন একে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে সরকার ও দেশ পরিচালনার এক জনপ্রিয় সনদে পরিণত করে। ফলে গোটা পূর্ববাংলার পাকিস্তানি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক সরকার-কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও নেতৃত্বে কার্যত (De-facto) একটি বিকল্প নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এর মধ্য দিয়ে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই নতুন রাষ্ট্রের নৈতিক, আদর্শিক এবং গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যরা ৩৫টি নির্দেশমালা জারি করেন। বঙ্গবন্ধুর এই অসহযোগ আন্দোলন এবং রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার নির্দেশমালার গুরুত্ব এখানে যে গোটা বাংলাদেশের মানুষ বিপুলভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল, এর মাধ্যমে সরকারি প্রশাসন চলছিল এবং বাংলার জনগণ অঙ্গীকারদীপ্ত প্রত্যয়ে এর জন্যে জানবাজি রেখেছিল। উল্লেখ্য যে, এর আগে ইংরেজ আমলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলন জনসমর্থন পেলেও প্রকৃতিতে ছিল নিষ্ক্রিয় এবং তার সাফল্য ছিল পরোক্ষ ও আংশিক। কারণ তিনি সরকার পরিচালনা করতে পারেননি। এমনকি দেশীয় আমলাদেরও ইংরেজদের আনুগত্য ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্যে আনতে পারেননি। এর সঙ্গে তুলনায় বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ পাকিস্তানি শাসকচক্রের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্য ছিল এক চূড়ান্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের পেছনে জনগণের নির্বাচনী ম্যান্ডেট ছিল, মহাত্মা গান্ধীর তা ছিল না। তাই তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল দুর্বল; এবং তাই তা স্বশাসনের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ স্বশাসনের স্তরে পৌঁছেছিল।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টির বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের তখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বিচার করলে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এই ঘোষণা দেবার বৈধ অধিকারী ছিলেন। কারণ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তার নির্বাচনী বৈধতা ও জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার ম্যান্ডেট ছিল। দ্বিতীয়ত, ৩মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বঙ্গবন্ধু যে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল। পূর্ববাংলায় শুধু ক্যান্টনমেন্ট সমূহেই পাকিস্তানের কিছুটা কর্তৃত্ব টিকে ছিল। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্বের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। পূর্ববাংলার সরকারি প্রশাসন, উচ্চ আদালত, ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, সেবাখাত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এমনিক ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশ নিয়ে তাদের দৈনন্দিন কার্মকাণ্ড চালিয়েছেন। অন্য কারও এই আইনগত ভিত্তি (জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা) ও জনগণের দেয়া নির্বাচনী বৈধতা ছিল না। তাই অন্যদের ঘোষণার কোনো আইনগত বা রাষ্ট্রগঠনগত তাৎপর্য নাই।

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন : 'আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো।' এইসব নির্দেশমূলক কথা বলার নৈতিক শক্তি, আইনগত ভিত্তি কোনো ঘোষকের ছিল না। তিনি আরো বলেছিলেন 'দু'ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ মাইনাপত্র নেবার পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।'

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি শত শত বছর ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে, অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে এবং তার ফলে স্বাধীনতার যে প্রত্যাশটি উন্মুখ হয়ে উঠছে তাকে ভাষা দিয়েছেন এবং এই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই নিয়ে বাঙালি জাতির স্রষ্টা এবং এই সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও অসাধারণত্ব বহুমাত্রিক। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও ভাষণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। কেউ কেউ এ ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ এ্যাড্রেস (১৮৬৩) বা মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' (১৯৬৩) ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেন। এই তুলনাকে যথাযথ মনে হয় না। ওই দুটি ভাষণের প্রেক্ষাপট আলাদা; বঙ্গবন্ধুর মতো বিপুল মানুষের আকাশ ছোঁয়া প্রত্যাশার চাপ এবং প্রবল শত্রুপক্ষের মারণাস্ত্র নিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে তাঁদের ওই ভাষণ দিতে হয়নি। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উইনস্টোন চার্চিলের একটি ভাষণের সঙ্গেই শুধু বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছুটা তুলনা চলতে পারে। তবে সেখানেও চার্চিল শত্রুপক্ষকে আকাশে, মাটিতে এবং জলরাশিতে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন মিত্রশক্তির প্রবল শক্তিশালী অবস্থান থেকে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু, 'আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব' কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর জনসভাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সর্বাধুনিক অস্ত্র, যুদ্ধ-প্রযুক্তি ও উন্নত' কৌশলসমৃদ্ধ পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে। তাঁর অবস্থা ছিল নিরস্ত্র, কিন্তু বিপুল জনসমর্থনধন্য জননেতার অসম-অবস্থান। তবে জনশক্তি যেহেতু যে-কোনো মারণাস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী—বঙ্গবন্ধু সেই শক্তির অবস্থান থেকেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। স্পষ্টতই, বঙ্গবন্ধু শত্রুর মোকাবেলা করতে বলেছিলেন। তাই চার্চিলের এবং বঙ্গবন্ধুর শত্রুর মোকাবেলা উদ্দেশ্য এক হলেও পথ ছিল ভিন্ন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ওইসব ভাষণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর সঙ্গে একটা জাতিগঠন প্রক্রিয়ার পূর্ণতা এবং জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ও বিপুল আত্মত্যাগের ইতিহাস যুক্ত রয়েছে। দার্শনিক হেগেল মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বলেই বলি, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতির পিতা। এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচারে এই ভাষণ গোটা বিশ্বেই তুলনারহিত।

এক কঠিন সংকট মুহূর্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভয়-ত্রাস এবং আশা ও সম্ভাবনায় উদ্বেল সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে মাত্র ১৯ মিনিটের এক জাদুকরি ভাষণে রাজনৈতিক চেতনার একই উত্তুঙ্গ স্তরে এনে স্বাধীনতার জন্য মরণপথ অঙ্গীকারদীপ্ত মুক্তিসেনানীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ইতিহাসে এমন ঘটনার নজির মেলা ভার। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' নেতাজি সফল হননি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'—উক্তিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, কিশোর বয়সে তিনি সুভাষ বসুর বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে সুভাষ বসুর চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির কথা তাঁর অবশ্যই মনে পড়ে থাকবে। শুধু মনে পড়ে নয়, কিশোর বয়সে মেন্টর (Mentor)-কে ছাড়িয়ে যাবার বাসনাও তাঁর মনে ছিল নিশ্চয়ই। বঙ্গবন্ধু বিপুল পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। বহু রাজনৈতিক মনীষীর জীবন ও কর্মের তিনি ছিলেন অনুরাগী পাঠক। তাই তাঁর চার্চিল-চর্চাও স্বাভাবিক ঘটনা। ফলে ৭ মার্চের ভাষণকে অবশ্যই স্মরণ করে থাকতে পারেন। তবে ৭ মার্চের

অনন্যসাধারণ ভাষণ, তাঁর এবং শুধু তাঁরই এক চিরকালীন মাস্টারপিস। তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ একান্ত সাক্ষাৎকার আমাকে বলেন : 'আগের দিন রাত ৪টা পর্যন্ত জেগে আমরা তাঁর জন্য ৭ মার্চের ভাষণ ও তার ইংরেজি তরজমা করলাম। কিন্তু ভাষণ দেয়ার সময় দেখা গেল আমাদের প্রস্তুত করা খসড়া তাঁর সামনে নেই। এবং যে ভাষণ দিলেন তার সঙ্গে আমাদের খসড়ার কোনো কোনো পয়েন্ট ছাড়া আর কোনো মিলই নেই।'

ইতোপূর্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটি থেকে দু-একটি অংশ প্রাসঙ্গিকতার কারণে উল্লেখ করেছি। এবার আমরা মূল ভাষণে প্রবেশ করব। কী নেই সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণে? বাঙালি জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ধারাবাহিক করুণ ইতিহাস আছে, তা বর্ণনা করার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া আছে আবেগ, মুক্তিপাগল বাঙালির রক্তঝরানোর নির্মম স্মৃতি এবং তাদের গণতান্ত্রিক আশা-প্রত্যাশার ন্যায্যতা; আছে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং যুক্তির জোরালো উপস্থিতি। এইসব মিলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি মানবিক বোধের শ্রেষ্ঠত্ব, গণতান্ত্রিক চেতনার উজ্জ্বলতা এবং নিপীড়িত মানুষের স্বাধিকার অর্জন ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির এক অনন্য দলিল হয়ে উঠেছে। এসব গুণের জন্য এই ভাষণ শুধু বাঙালি নয়, গোটা বিশ্ববাসীকে 'বাংলাদেশ পরিস্থিতি'র প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সহানুভূতিশীল করেছে।

ভাষণটি গঠনে কৌশল, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস থেকে নেয়া শিক্ষা, সময়জ্ঞান ও শব্দচয়নের মুন্সিয়ানা আছে। বাঙালিকে 'আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষ', 'আমার মানুষ' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পূর্ববাংলার অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য আজীবন আপোসহীন সংগ্রাম, জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে জনগণের একেবারে হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে যাওয়া তাঁর মতো নেতার পক্ষেই এই ভাষায় শ্রোতাদের সম্বোধন করা সম্ভব।

মানুষকে জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং তীব্র অধিকারসচেতন ও লড়াকু মানসিকতাসম্পন্ন করার জন্য বাগ্মীরা কতগুলো কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তা করেছেন পরিচ্ছন্ন দক্ষতা ও সুগভীর আন্তরিকতায়। মার্কিন সাময়িকী নিউজ উইকের ভাষায় 'রাজনীতির' এই 'কবি' আন্তরিক আবেগ, প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বাংলার মানুষের ওপর নানা অত্যাচার-নির্যাতন-শোষণের নির্মমতা এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হাতিয়ারপ্রতিম, 'কীওয়ার্ড' গুলো বার বার ব্যবহার করে নতুন ব্যঞ্জনা এবং মানুষের রক্তে বিদ্রোহের গতিবেগ সৃষ্টি করেছেন। এসব মূল কথাগুলোকে বারংবার সামনে আনায় শ্রোতাদের মনে তা স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে 'মুক্তি' ও 'মুক্ত' শব্দ দুটি বেশি গুরুত্বে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ মানুষ দুস্থ ও দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই তিনি তাঁর ভাষণের চতুর্থ লাইনেই বলেছেন : 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়', এবং অষ্টম লাইনে আবার 'মুক্তি'

শব্দটি এসেছে এভাবে : 'এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।' আবার বলেছেন :'যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে', এবং 'এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'। তবে এই ঐতিহাসিক ভাষণের সারকথা। যে-বাক্যটিতে উচ্চারিত হয়েছে 'মুক্তির' কথা তাতে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার স্বাধীনতা চাননি, বাঙালির মুক্তিও চেয়েছেন। ফলে এ ভাষণ একই সঙ্গে হয়েছে কালজ ও কালোত্তর।

বাংলার মানুষকে একাত্ম করার জন্য এবং নিজ ক্যারিশমানুযায়ী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অভিভাবক হিসাবে নিজ কাঁধে নেবার জন্য বঙ্গবন্ধু 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে, 'আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।', 'আমার' শব্দটিকে বারংবার ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ : 'ভাইয়েরা আমার,' 'আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে,—তাঁর বুকের ওপর হচ্ছে গুলি, 'আমার গরিবের উপর, 'আমার বাংলার মানুষের', 'আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, 'আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, 'আমার মানুষ কষ্ট না করে', 'আমার লোককে হত্যা করা হয়' ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার' বলে এবং শুরুতে বলেছিলেন আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন'। এবং ভাষণের শেষাংশে আসতে আসতে তাঁর কম্যুনিকেট করার আত্মীয়সুলভ ভঙ্গিতে তিনি এমন স্তরে পৌঁছে গেছেন যে তাদের সহজেই 'তুমি' সম্বোধন করতে পারছেন। এতে শ্রোতার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে এবং তাঁর বক্তব্যের আবেদন বেড়েছে। এতে বক্তা এবং শ্রোতা একাত্মা হয়েছেন। ভাষণের কেন্দ্রবিন্দুটি ঠিক রেখে তিনি নানা অপরিহার্য উপাদানকে গ্রথিত করেছেন। তবে ভাষণের ধারাবাহিকতাকে কখনও ক্ষুণ্ন হতে দেননি। এবং কোনো পয়েন্টই মূল বক্তব্যকে শিথিল করেনি। বরং ওইসব আনুষঙ্গিক উপাদান মূল বক্তব্যকে সংহত ও জোরালো করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের একটা স্বকীয় সত্তা ও নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। লৌকিক ভাষা-ভঙ্গি ও বাকপ্রতিমায় তাঁর চমৎকার ও লাগসই প্রকাশ ঘটে। এই বিশিষ্ট সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক দার্ঢ্য, বিদ্রোহের মানসিকতা' এবং কোনো অবস্থাতেই মাথা নত না করা। বাংলার পৌরাণিক চরিত্র চাঁদ সওদাগর, সাহিত্যের চরিত্র হানিফ গাজী ও তোরাপ কাব্যস্রষ্টা কবি নজরুল এবং মানবিক ও রাজনৈতিক চরিত্র শেখ মুজিবে আমরা এই বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় পাই। বাঙালি চরিত্রের এই বিশিষ্টরূপের স্পর্শ পেয়ে ৭ ই মার্চের ভাষণে যুক্ত হয়েছে অনন্য বৈভব। বঙ্গবন্ধু তাঁর আপসহীনতা ও চারিত্রিক দার্ঢ্যের পরিচয় মুদ্রিত করেছেন লৌকিক ভাবভঙ্গির বিশিষ্ট বুলির সংযোজন। প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত এইসব মণিমুক্তসদৃশ কিছু শব্দ বাঙালির ব্যবহারিক জীবন থেকে নেয়া। ওই ভাষণে

বঙ্গবন্ধুর শিকড়সম্পৃক্ত বুলিসমৃদ্ধ এ রকম একটি লাইন লেখা হলো : 'সাড়ে ৭ কোটি মানুষেরে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

বঙ্গবন্ধু এই ভাষণকে কখনো কখনো শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্ন করে করে সত্য যাচাইয়ের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। যেমন, 'কী অন্যায় করেছিলাম? কী পেলাম আমরা?' এইসব প্রশ্ন যেন বঞ্চনার অমোঘ উদাহরণকে তুলে ধরেছে। এই ভাষণে যুক্তি ও মানবিক আবেগের নিপুণ সমন্বয় আছে। তেমনি ভাষণটিতে রাজনীতির কবির ওজনগুণসম্পন্ন, স্পন্দনযুক্ত চমৎকার রেটরিকস (Rhetorics) আছে। যুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া একটি বাক্য : 'যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতির অন্তঃসার ব্যক্ত হয়েছে এই ভাষায়; 'এই বাংলার হিন্দু-মুসলমান বাঙালি ননবেঙ্গলি যারা আছেন তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।' ইতিহাস, আবেগ ও রেটরিক্যাল ভঙ্গির আর একটি উদাহরণ : 'আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষ্য নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথে রঞ্জিত করার ইতিহাস।'

জনগণের প্রবল চাপ ও প্রত্যাশা ছিল বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। বঙ্গবন্ধু যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন তখন জনমত সৃষ্টির দায়িত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রলীগের ওপর দেয়া হতো। অগ্রগামী দল হিসেবে যেমন 'জয় বাংলা' 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়ো, মুক্তিবাহিনী গঠন করো,' শ্লোগান স্বাধীনতার পতাকা, জাতীয় সংগীত প্রভৃতি ও সুপরিকল্পিতভাবে ছাত্রলীগকে দিয়ে প্রথম মাঠে ছাড়েন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের তৎকালীন ক'জন বিশিষ্ট নেতাকে নিয়ে ১৯৬১ সালেই একটি গোপন নিউক্লিয়াস গঠন করেন। এঁদের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের এইসব উপাদান জনসমক্ষে আনা হয়। ১৯৭১-এর ৭ মার্চে নিউক্লিয়াসের তৈরি এবং স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে প্রচারিত ইস্তেহারে বাংলাদেশের নাম, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, মুক্তিবাহিনী গঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, সামরিক প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করা হয়। অতএব যারা বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রস্তুতি না নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তারা হয় তা অজ্ঞাতপ্রসূতভাবে বলেন অথবা মিথ্যাচার করেন। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্রদের ঐ বিস্তৃত ইস্তেহারই বঙ্গবন্ধুর সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিন্ন ভিন্ন অংশ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল। এ সময়ে তিনি শুধু

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-শুভানুধ্যায়ী রাখতেন। এভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বস্তরে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। ১৯৬৫ সালে বায়াফ্রার Unilateral Declaration of Independence (UDI)-এর কথা তাঁর মনে ছিল। তাই তিনি অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাষণে বললেন : 'অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল ল' Withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না।'

বঙ্গবন্ধুর এই চারটি শর্তকে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ রণকৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আমাদের বিবেচনায় মাস্টার স্ট্রোকসমৃদ্ধ এই চারটি শর্তে তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে : এক স্বাধীনতা ঘোষণা শোনার জন্য পাগলপারা উত্তাল জনসমুদ্র একটু থমকে গেছে, তবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি। তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে যে বঙ্গবন্ধু অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই একটি কৌশলগত ধাপ হিসেবে এই কঠিন চারটি শর্তকে সামনে নিয়ে এসেছেন; দুই. দৃশ্যতা নেতা গণতন্ত্রসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক পথেই আছেন এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর এই শর্তসমূহ যৌক্তিক—বহির্বিশ্বকে এমন ধারণা দেয়া। এই শর্ত দেয়া না হলে : তার 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এই বাক্যকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা (UDI) বলে গণ্য করা হতো। তাতে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত হতেন। ফলে আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্ব জনমত দুইই তাঁর বিপক্ষে চলে যেত। তাই রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও মেধাবী কৌশলবিদ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েও তা কার্যকারিতাকে তিনি শর্তসাপেক্ষ করে রাখলেন; তিন. আমাদের ধারণা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তান শাসকচক্র ট্যাংক, মেশিনগান ও বিমান আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। এতে বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতাই নিহত হতেন। স্বাধীনতার ঘোষণার শর্তযুক্ত বার্তাবরণ পাকশাসকদের সেই পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুরধার রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ইয়াহিয়া-ভূট্টোরা ক্রোধান্ধ বুনো শুয়োরের মতো নিজেরাই একতরফা ক্র্যাকডাউনে গিয়ে গণহত্যা শুরু করায়। বঙ্গবন্ধুর চার শর্ত বাতিল হয়ে গিয়ে ২৬ শে মার্চ থেকে তার ঘোষণা কার্যকর হয়। ২৬শে মার্চ মধ্যরাতে তাঁর স্বাধীনতার নতুন ঘোষণাটি ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

আসলে চারটি শর্ত দিয়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর ৭ মার্চের আক্রমণকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। ওরা ওইদিন বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যা করে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে

চেয়েছিল। তা না হওয়ার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ করার জন্য ইয়াহিয়া, ভূট্টো আলোচনার ছলনাময় অধ্যায়টির সূত্রপাত করেন। ফলে পরিস্থিতি কী হবে তা কি বঙ্গবন্ধু জানতেন না? অবশ্যই জানতেন এবং তাঁরও কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি আলোচনা চালালেন কিন্তু জানতেন এ হবে নিষ্ফলা। সেজন্যই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হলেও তিনি বুঝেছিলেন, পাকিস্তানি চক্রান্তকারীরা তাঁকে এই ক্ষমতা দেবে না। তাই তিনি ওই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।...২৮তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।' এই বক্তব্যে তিনি 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবং বলে দিয়েছেন তিনি 'প্রধানমন্ত্রী' অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে, যে জন্য কোনো অফিস বন্ধ থাকবে তা যেমন বলছেন তেমনি ২৮ তারিখে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বলেছেন। এই বক্তব্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আছে। তবে তা বাস্তবায়নের জন্যই আবার বলেছেন 'তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই—আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' পাকিস্তানি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই বক্তব্যে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ। দিব্যচোখে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েই যেন আবার স্মরণ দেবার জন্যে বললেন, 'তোমাদের যা-কিছু তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' আবার সামনে আনলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

আর দাবায়ে রাখবার পারবা না

সেলিনা হোসেন

প্রখ্যাত মনীষী এস. ওয়াজেদ আলী তাঁর বাংলা অভিভাষণে বলেছিলেন, 'বাঙালির, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভবিষ্যৎ আশার কেন্দ্র হচ্ছে পূর্ববঙ্গ। যথাসময়ে প্রকৃত বাঙালি রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবন পূর্ববঙ্গের উর্বর ভূমিতেই মূর্ত হয়ে উঠবে তা স্পষ্টতই বোঝা যায়।' ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয় এস. ওয়াজেদ আলীর 'ভবিষ্যতের বাঙালি' গ্রন্থ। এ বইয়ে তিনি লিখেছেন, প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষ যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে, তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ অন্যতম। ... আমাদের মনে হয়, প্রকৃতি দেবী নিত্য-নতুনের সৃষ্টিতেই যাঁর প্রধান আনন্দ—ভারতের এই পূর্ব ভূখণ্ডে নতুন এক জাতির, নতুন এক সভ্যতার, নতুন এক জীবনধারার, নতুন এক কৃষ্টির, নতুন এক আদর্শের সৃষ্টি প্রয়াসে নিয়ত আছেন। ... এই বাঙালি জাতিও তেমনি ভবিষ্যৎ গৌরবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত তার চেতনায় পেয়ে এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতি অনুভব করছে ... বাঙালি ভবিষ্যতের পূর্ণতর রাজনীতির জন্য প্রতীক্ষা করছে ... একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের ও পূর্ণতম বিকাশের জন্য যেন বাঙালি এখনও প্রতীক্ষা করছে ... অদূরভবিষ্যতে সেই সহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, সেই অপরূপ ছবি তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠবেই, আর তার ফলে বাঙালি এক অভিনব জীবনের আস্বাদ পাবে; এবং সেই শুভ দিন যখন আসছে, তখন বাঙালি কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য-ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রথপ্রদর্শক হবে—সত্য, সুন্দর, শুভ জীবন পথের। বাঙালি এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন—ভাগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন।'

চল্লিশের দশকে একজন মনীষী এমন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন—বলেছিলেন 'এই জাতি একজন মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে'। কি গভীর অর্থবহ কথা! আশাটা কি বেশি করা হয়েছিলো যে, বাঙালি শুধু ভারতবর্ষের নয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক হবে? অথচ কি আশ্চর্য, চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক—মাত্র দু'দশক সময়ের ব্যবধানে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এস. ওয়াজেদ আলীর এই লেখাটি তিনি পড়েছিলেন কিনা আমরা জানি না। হয়তো পড়েছেন, হয়তো পড়েননি। পড়ে থাকলে তিনি এই লেখাটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এমন রাজনীতি শুরু করেছিলেন এ কথা ধোপে টেকে না। তিনি তাঁর জাতির প্রতি দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন নিজস্ব আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং ভালোবাসার সমন্বয়ে। বাঙালির প্রতি তাঁর আবেগ ছিল সীমাহীন; বাঙালিকে কেন্দ্র করে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল মৃত্তিকা সংলগ্ন এবং সমুদ্র-সমান ভালোবাসা দিয়ে এ জাতিকে গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবার স্বপ্নে তৈরি করেছিলেন নিজের সবটুকু।

তিনি হয়তো ভেবেছিলেন একটি ভাষাগত এবং জাতিগত রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে তা এ সময়ের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে যদি অনেক রাষ্ট্রের জন্ম হয় তাহলে আর কোনো বৃহৎ শক্তি থাকবে না। কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব করবে না। শান্তি ও কল্যাণের রাষ্ট্র হবে সেগুলো। আগামী দিনের ছেলেমেয়েরা জানবে না বিশ্বযুদ্ধ কি। বাংলাদেশের মতো একটি একটি করে গড়ে উঠবে হাজারো রাষ্ট্র।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ তাঁর সেই অসাধারণ ভাষণে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন একটি অলৌকিক বাক্য। তিনি তর্জনী তুলে পরিষ্কার বলেছিলেন 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না'। বাক্যটি ভেবে দেখতে হবে। তিনি যদি প্রমিত বাংলা ব্যবহার করতেন তাহলে বলতেন 'আর দাবিয়ে রাখতে পারবে না'। তিনি প্রমিত বাংলা ব্যবহার করেননি। আঞ্চলিক শব্দ সহযোগে আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে তিনি মুহূর্তের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার হৃদয়ের এ বিশাল দরজা খুলে দিয়েছেন, যে দরজা পথে বেরিয়ে এসেছে বাঙালি চরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য।

এই ছোট্ট বাক্যটি সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছে এস. ওয়াজেদ আলীর একটি দীর্ঘ বাক্যের সঙ্গে যেখানে তিনি বলেছেন বাঙালি এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে। যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন—ভগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন। পার্থক্য এই যে তাঁকে দীর্ঘ অর্থবহ বাক্য রচনা করতে হয়নি, তিনি রচনা করেছেন ছোট অথচ তীক্ষ্ণ, অপ্রমিত অথচ গভীর অর্থবহ বাক্য। একজন প্রাজ্ঞ সাহিত্যে, আর একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিতে। দু'জনেরই অঙ্গীকার জাতির কাছে, জীবনের কাছে। দু'জনেরই যাত্রা অসীম জীবনের সন্ধানে। কেউ কাউকে দেখেননি, অথচ একজন অন্যজনের পরিপূরক

হয়ে উঠেছিলেন। দু'জনের অজান্তে রচিত হয়েছিলো ইতিহাসে অলিখিত সত্য। একজন সাহিত্যের ভেতর দিয়ে রাজনীতির কথা বলেছেন, অন্যজন রাজনীতির ভেতর দিয়ে সাহিত্যের কথা বলেছেন। দু'টোই জীবন সম্পৃক্ত; মানুষ সম্পৃক্ত।

৭ মার্চের বক্তৃতায় সেদিন তিনি সেই বাক্যটির পরে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' লক্ষণীয় বিষয় যে, এই বাক্যটি তিনি প্রমিত বাংলায় বলেছেন। এখানেও এস. ওয়াজেদ আলীর আর একটি বাক্যের সঙ্গে সংযোগ-সেতু রচিত হয়। যেখানে তিনি বলেছেন ... 'এখন বাঙালি কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য-ভুখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক হবে—সত্য, সুন্দর, শুভ জীবন-পথের। কি আশ্চর্যভাবে, তিনি জাতীয় পটভূমি থেকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় উন্নীত হয়েছেন—মুক্তির সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রতিটি দেশের জন্য সার্বজনীন সত্য। মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধনিতার সংগ্রাম এককভাবে হয় না, এর জন্য প্রয়োজন হয় আন্তর্জাতিক সমর্থন, সাহায্য এবং সহযোগিতা। তাই বাক্যটি উচ্চারিত হয় প্রমিত বাংলায়। বাঙালি জাতিসত্তার উর্ধ্বে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধনের প্রত্যাশায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম। সেদিনের বক্তৃতায় তাঁর উত্থিত সেই অমিত বিক্রম তর্জনীর সঙ্গে কণ্ঠস্বর যখন একই সমান্তরালে পৌঁছে যায় তখনই বাঙালির অভিনব জীবন আস্বাদের স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে।

'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না'—এই পংক্তিটির চিত্রকল্প কল্পনা করলে কেমন দাঁড়াবে? ধরে নেয়া যায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি জনগোষ্ঠী। তার ঘাড়ের ওপর শোষকের পা—নিংড়ে নিতে চায় তার জীবনের নির্যাস। কিন্তু কতোদিন পা দাবিয়ে রাখবে? একে-দুয়ে মাথা ওঠাতে থাকে। সেই পা অস্বীকার করে উঁচু হয়ে উঠতে থাকে মাথা। ঘাড় উঁচু করে তাকাতে শুরু করে আকাশের দিকে। শাসকের দুই পা দু'হাতে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। ভেবে নেয়া যায় যে, এমন অজস্র উঁচু হয়ে উঠা মাথার চিত্রকল্প নিয়েই রচিত হয়েছিলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বল বীর চির উন্নত মম শির'—কি আশ্চর্য মেলবন্ধন। এভাবেই বুঝি কবিতার ভাষার সঙ্গে রাজনীতি এক হয়। মুখোমুখি দাঁড়ায় কবি ও রাজনীতিবিদ। মনে হয় না কি 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না' পংক্তিটিও একটি কালজয়ী কবিতার পংক্তি?

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে আশা করেছিলেন এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত দেশে এক পরিত্রাণকর্তার দেখা পাবেন, যিনি মানুষকে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা শোনাবেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলো বলেন, সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু এই কথাও আমাকে বঙ্গবন্ধুর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের যেভাবে বাঁচাতে

চেয়েছিলেন, মানুষ হিসেবে মানুষকে যে আশ্বাসের কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, এ দেশে এমন আর কে চেয়েছেন।

ইতিহাসে তিনিই অমর যিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন—ইতিহাস তাঁরই পক্ষে যিনি সময়ের বিচারে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন। এ সংজ্ঞায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহামানব সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কে নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন। যিনি কঠিন স্বরে নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিলেন সর্বকালের উপযোগী এবং সব দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি অমর পংক্তি 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না'।

৭ মার্চ : অবিনাশী কথামালার জন্মদিন

যতীন সরকার

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে—কবি জীবনানন্দ দাশের জননী কুসুম কুমারীর একটি কবিতার এই ছত্র দুটোকে ছেলেবেলাতেই আমাদের মনে গেঁথে দেয়া হয়েছিল। বাঙালিরা যে কথা বলতেই পটু, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—এমন কথাকেও আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। কথার বদলে আমাদের সবাইকেই কাজের মানুষ হয়ে উঠতে হবে- এমন অনুজ্ঞারও আমরা বিরোধিতা করিনি।

কিন্তু পরিণত বয়সে আমার মনে হয়েছে যে কথা ও কাজের এ রকম জল-অচল বিভাজন করে দেয়া মোটেই ঠিক নয়। অন্তত কথার কথা ও কাজের কথার পার্থক্যটি সম্পর্কে আমাদের চেতন থাকতেই হবে। কথার কথা জলবুদ্ধদের মতোই ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু কাজের কথা বর্তমানকে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার বিভা ছড়িয়ে যেতে থাকে।

কথার কথা বলা হয় নিতান্তই অভ্যাসের বশে, এর পেছনে কোনো সচেতন ভাবনা বা দায়িত্ববোধ থাকে না। এ রকম কথাসর্বস্ব মানুষ যারা, তাদেরকেই বলে বাচাল। বাচালরা সবারই ধিক্কারের পাত্র। কবি কুসুম কুমারীও কথায় বড় বাচালদের ধিক্কার জানিয়ে একান্ত মনে কামনা করেছেন যে, দেশে কাজে বড় মানুষ বা কাজের মানুষদের আবির্ভাব ঘটুক।

কিন্তু যাদের মুখে কথা নেই তারাই হলো কাজের মানুষ—এমন কথাও মোটেই ঠিক নয়। বাচালরাও যেমন ধিক্কারের পাত্র, তেমনই সবসময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে যে মানুষ সে মানুষও প্রশংসায় ভূষিত হতে পারে না। কাজ করতে হলে তো অবশ্যই চিন্তা করতে হয় এবং সেই মূর্তিহীন চিন্তাই কথার মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, কথার সেই মূর্তিগুলোই প্রাণ পায় কাজের মধ্যে। কথার

আধারে কাজের লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার পরিকল্পনাকে সূত্রবদ্ধ করে না নিয়ে সত্যিকার কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। কথা আসে চিন্তা থেকে, কথার আধারেই চিন্তা আশ্রয় নেয়, সেই চিন্তাই কথা হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তখন সেই কথাকেই রূপ দিতে হয় কাজে। এরকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়ে কোনো ব্যক্তিই কাজের মানুষ হতে পারে না। এ কথাটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই সত্য সমষ্টি তথা যে কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও। জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই বরং কথাটি অনেক বেশি সত্য। অনেক অনেক ব্যক্তির সমবায়েই তো গড়ে ওঠে একেকটি জনগোষ্ঠী। পৃথক পৃথক ব্যক্তির ভাব-ভাবনাগুলো সম্মিলিত হয়েই পরিণত হয় সমষ্টিবদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভাবনায়। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভাবনাতেই থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা হওয়ার আকুল আকুতি। সেই আকুতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত রূপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। গোষ্ঠীর সেই আকুতিটি সুনির্দিষ্ট ও সংহত কথার মধ্যে রূপ পেতে চায়। কিন্তু সেই চাওয়াটি খুব সহজে পাওয়ায় পরিণত হয় না। সেই কাঙ্ক্ষিত কলাটির জন্ম হওয়ার জন্য শত শত বছরও লেগে যেতে পারে। তারপর কোনো এক শুভ দিনে গণমনে যুগ যুগ লালিত সেই আকুতিটি অস্ফুট ভাবনার নির্মোক ভেঙে পরিস্ফূট ভাষা হয়ে বেরিয়ে আসে, জন্ম নেয় অসীম শক্তিধর অবিনাশী এককথা বা কথামালা। সমগ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর মথিত সেই কথা বা কথামালা নিঃসৃত হয় যার মুখ থেকে, তিনি শুধু তখন একজন কথাকার হয়ে থাকেন না, হয়ে ওঠেন সেই জনগোষ্ঠীর পরিত্রাতা ও ভয়ত্রাতা।

এরকমটি হয়তো সর্বত্রই ঘটে, তবে সর্বত্র একইভাবে ঘটে না। অন্তত বাংলাদেশে যেভাবে ঘটেছে, এমনভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে জনগণ কাঙ্ক্ষিত কথামালার জন্ম বোধহয় কোনো দেশেই ঘটেনি, কোনো দেশের মানুষেরই সম্ভবত এমন কথামালার জন্মদিন পালনের সৌভাগ্য হয়নি। এদেশের মানুষের বহুযুগ লালিত বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষাটি মূর্ত কথামালা হয়ে জন্ম নিয়েছে যে বিশেষ দিনে, সে দিনটিই ৭ মার্চ। বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট একটি দিন—একটি অসাধারণ কথামালার জন্মদিন। কথামালার এই জন্মদিনটি যেমন অবিস্মরণীয় তেমনই অবিস্মরণীয় এই কথামালার জন্মদাতা শেখ মুজিবুর রহমান। বঞ্চিত বঙ্গজনের পরিত্রাতা ও ভয়ত্রাতা রূপেই যিনি বঙ্গবন্ধু।

হাজার বছর ধরে এদশের লোকসাধারণ স্বাধীকার বঞ্চিত হয়ে থেকেছে, নানা ধরনের অধীতনতার বাঁধন তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সেই বঞ্চনা থেকে, বাঁধন থেকে মুক্তির স্পৃহা তাদের ভেতরে গুমড়ে গুমড়ে মরেছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তির পথ তারা খুঁজে পায়নি। তা বলে খোঁজার প্রয়াস থেকে তারা বিরতও থাকেনি। তাদের অবিরাম প্রয়াসে অনেক রক্ত ঝরেছে, সে প্রয়াস অনেক খণ্ড খণ্ড সার্থকতার জন্ম দিয়েছে, কিন্তু সার্থকতার শীর্ষবিন্দুটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তাদের চাওয়ার বিষয়টিও নিজেদের কাছে ছিল একান্ত ধোয়াটে; তাদের ভাবনা ছিল, কিন্তু সেই ভাবনা তাদের চিত্তলোকে কোনো মূর্তি পরিগ্রহ

করতে পারেনি; তাদের বিমূর্ত বিক্ষিপ্ত ভাবনা বা চিন্তা সুনির্দিষ্ট কথামালার মূর্ত ও সংহত হয়ে উঠতে পারেনি। আবহমান বাংলার লোক-সাধারণের এ রকম ভাবনাই সব অস্পষ্টতা ও অমূর্ততার কুয়াশা ভেদ করে একাত্তরের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে জন্ম নিল কাঙ্ক্ষিত ও সংহত কথামালা। সে কথামালার প্রাণজীবকে ধারণ করে এর শেষ বাক্যগুলো :

রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব/এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

হ্যাঁ, অবশ্যই শেখ মুজিবের মতো বিশেষ একজন মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত ছিল এই কথামালা। তবু কিন্তু এই কথামালা কোনো ব্যক্তি মুজিবের নয়, সব মুক্তিকামী বঙ্গজনের। অতীতের হাজার বছরের অগণিত বঙ্গজনের অমূর্ত ভাবনাই মূর্ত ভাষার রূপ ধারণ করে এই কথামালার সেদিন জন্ম হয়েছিল। তাই দেখি মুজিবের যারা কট্টর বিরোধী বা কঠোর সমালোচক ছিলেন, অথচ অন্তর গভীরে লালন করতেন মুক্তির আকুতি, তারাও সেদিন মুজিবের বজ্রকণ্ঠের আহ্বানেই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে প্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা যাদের কাম্য ছিল না, সেই স্বদেশদ্রোহী স্বজাতিবিদ্বেষী কুলাঙ্গাররাও সেদিন এই আহ্বানের প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। এমনকি সেদিনকার পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোও অনেক নরম সুরে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল। মুজিব কথিত মুক্তির সংগ্রাম-এর সোজাসুজি বিরোধিতা না করে পূর্বপাকিস্তান জামায়াত ইসলামীর আমীর গোলাম আযমও সেদিন ধূর্ত উদারতার (!) সঙ্গে অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এভাবেই বর্তমান সংকট থেকে জাতির উত্তরণ ঘটতে পারে।

আসলে জাতির উত্তরণ নয়, মুক্তি সংগ্রামীদের রোষের হাত থেকে নিজেদের চামড়া বাঁচানোই তখন অনেকের জন্য আশু প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ তারা দেখতে পেরেছিল যে ৭ মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যা উচ্চারিত হয়েছে তা মোটেই 'কথার কথা' নয়, জাতির হৃদয়-নিংড়ানো 'কাজের কথা' এবং এই কাজের কথার মাধ্যমে পুরো দেশের মানুষই কথায় না বড় হয়ে কবি কাঙ্ক্ষিত কাজে বড় হয়ে উঠেছে। সেই মানুষেরা বুঝে ফেলেছে যে, কেউ তাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। তাই যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে তারা শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাদের সবার জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্যু চিত্ত ভাবনাহীন হয়ে গেছে। কবি নির্মলেন্দু গুণ যে ৭ মার্চের কথামালাকে কবিতা ও তার কথাকারকে কবি আখ্যা দিয়েছেন তাতে একটুও অতিকথন নেই। কবিতা ও কবি সম্পর্কে যেসব গতানুগতিক ধারণা পোষণে আমরা অভ্যস্ত, সেসব ধারণার মানদণ্ডে ৭ মার্চের কবিতা ও কবির মূল্যায়ন মোটেই সম্ভব নয়। অভ্যস্ত ধারণার বৃত্ত থেকে

বেরিয়ে আসতে না পারলে ওই কবিতাটির অসাধারণত্ব কোনো মতেই শনাক্ত করা যাবে না, চেনা যাবে না এর কবিকেও।

তবে একাত্তরের বঙ্গজনদের মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেয়ার লক্ষ্যে শত্রুর পদলেহী কুকুরের মতো আচরণ করেছিল যেসব জাতিদ্রোহী কুলাঙ্গার, তারা ৭ মার্চের কবিতাটির মর্মবাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারণ ওই জ্ঞানপাপীরা তো পারজিত হয়েছিল এই কবিতাটির অসীম শক্তিতে শক্তিমান মুক্তিসংগ্রামীদের হাতেই। তাই পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে জ্ঞানপাপীরা আজ তাদের সব আক্রোশ ঢেলে দিচ্ছে ওই কবিতা ও তার কবির ওপর। ওরা ইতিহাস-বিকৃতির উপকরণ সংগ্রহ করছে কবিতাটির বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষা থেকে এবং সেই বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষা দিয়েই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কবির চরিত্র হননের। নানাভাবে মানুষকে ওরা বোঝাতে চাইছে : শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোনো কথাই ছিল না, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন ছাব্বিশে মার্চে জিয়াউর রহমান, শেখ মুজিব পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি...।

অথচ সবাই জানেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক জিয়াউর রহমান নিজেই একটি প্রবন্ধে (একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ ১৯৭২ এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২) লিখেছিলেন :

> ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিণ সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।

৭ মার্চের সেই কথামালার অনেক স্পষ্ট কথা যেমন ছিল তেমনই এমন অনেক ইঙ্গিত ছিল যা স্পষ্ট কথার চেয়েও অনেক বেশি ব্যঞ্জনাবহ। ওইসব ব্যঞ্জনাই ওই কথামালাটিকে অবিস্মরণীয় কবিতায় পরিণত করেছিল। এ যেন কথাকে অর্থের বন্ধন হতে ভাবের স্বাধীন লোকে পৌঁছিয়ে দেয়া। কবিতার এরকম ব্যঞ্জনাময় রাজনৈতিক কৌশলের কাছে সেদিন চূড়ান্ত মার খেয়েছিল পাকিস্তানি জেনারেলদের রণকৌশল। ১৯৭২ সালে মার্কিন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু তো স্পষ্ট করেই বলেছিলেন :

> ৭ মার্চ যখন আমি ঢাকা রেসকোর্স মাঠে আমার শেষ মিটিং করি ওই মিটিংয়ে উপস্থিত দশ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানকে স্যালুট জানায় এবং ওই সময়ই আমাদের জাতীয় সংগীত চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়ে যায়।...
>
> আমি চেয়েছিলাম, তারাই (অর্থাৎ পাকিস্তানি, সেনাবাহিনী) প্রথম আমাদের আঘাত করুক। আমার জনগণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত। তবু সব কিছুর পরও, জ্ঞানপাপীদের বাচালতা থামবে না। এসব বাচালতায় কান না দিলেও আমাদের চলবে।

তবে আশঙ্কার কথাটা হচ্ছে, আমরা নিজেরাও এখন আর আগের মতো নেই। ৭ মার্চের কথামালা নিয়ে আমরা কেবলই কথার বুদবুদ সৃষ্টি করে চলছি, সেই কথামালার প্রাণশক্তিকে অন্তরে ধারণ করছি না, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি না। আমরা ভুলে গেছি যে স্বাধীনতার সংগ্রাম-এ জয় লাভ করেও মুক্তির সংগ্রাম-এ জয় আমাদের অনায়ত্তই থেকে গেছে।

৭ মার্চে সেই অসীম শক্তিধর অবিনাশী কথামালার জন্মদিনটি হোক আমাদের অপহৃত জয়কে ফিরিয়ে আনার এবং কাঙ্ক্ষিত মুক্তির সংগ্রাম সর্বশক্তি নিয়োগ করার বজ্র শপথ গ্রহণের দিন।

সর্বকালের সেরা বাঙালি বঙ্গবন্ধু ও ৭ মার্চের ভাষণ

মুহম্মদ আবদুল জলিল

জন্ম যার বঙ্গে, মাতৃভাষা যার বাংলা, সেই বাঙালি। আমরা যদি এর প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে বিচার করি, তাহলে বলতে পারি তাঁর জন্ম হয়েছিল বঙ্গে, মাতৃভাষা ছিল বাংলা; তাই তিনি খাঁটি বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর কাছে বাংলা নামক দেশ, বাংলা নামক ভাষাও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা।

১৯৭১ সালে ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যে ঐতিহাসিক ভাষণ উপস্থাপন করেন তা ছিল নাতিদীর্ঘ। মাত্র এক হাজার আটাত্তর শব্দের মধ্যে এর ব্যাপ্তি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষণটির গভীরতা ছিল মহাসমুদ্রের মতো, ভাবাবেগের দিক থেকে গীতিকবিতাসদৃশ। যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, এ ভাষণ ছিল বাংলার জাতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকবে ততোদিন অম্লান থাকবে ৭ মার্চের ভাষণ। ভাষণটি বিশ্লেষণ করলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অনেক মূল্যবান দিকের পরিচয় ভাস্বর হয়ে ওঠে। সমগ্র ভাষণে তিনি দেশ ও জাতি বোঝাতে 'বাংলাদেশ' দু'বার 'বাংলা' ন'বার 'পূর্ববাংলা' দু'বার আর বাঙালি জাতিবাচক শব্দটি পাঁচবার ব্যবহার করেছিলেন। ভাষণের শেষ বাক্যটি ছিল দু'টো শব্দের 'জয় বাংলা'। শেষোক্ত শব্দ দু'টো দিয়ে তিনি বাংলাদেশের জয়, বাংলা ভাষার জয়, বাঙালি জাতির জয় বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি দেশ ও জাতিবাচক শব্দগুলো কিরূপ প্রাণাবেগ ও ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন কতিপয় বাক্যের দৃষ্টান্ত থেকে তা অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন : নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার প্রসঙ্গে উলেখ করেছেন বাংলার ইতিহাস '২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস'। পূর্ববাংলার প্রসঙ্গ টেনেছেন এভাবে—'পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে।' বাঙালিদের দায়িত্ব সচেতন করে বলেছেন—'কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবে না যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবে না'।

বঙ্গবন্ধু অতি সতর্কতার সঙ্গে 'পূর্বপাকিস্তান' শব্দটি পরিহার করেন। তিনি বাঙালির হৃদয় থেকে চিরদিনের জন্য শব্দটির শেকড় উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত লাখো লাখো বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ভাবাবেগ তাড়িত ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করেছিল, মুহূর্তে মুহূর্তে 'জয় বাংলা' শ্লোগান ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। একটি ভাষণ কীভাবে একটি জাতিকে মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে, কীভাবে স্বাধীকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উজ্জীবিত করতে পারে, ৭ মার্চের ভাষণ যথার্থভাবে উপলব্ধি ছাড়া তার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা উজ্জীবনে বঙ্গবন্ধু যে অত্যুচ্চ সাফল্যের তোরণে উপনীত হতে সক্ষম হন অতীতের সহস্রাধিক বছরে আর কোনো বাঙালির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন বেদ-পুরাণ-উপনিষদ, কাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদিতে বঙ্গ ও বাঙ্গাল নামক জনপদের পরিচয় যত্র-তত্র পরিলক্ষিত হলেও বাঙালি এই জাতিবাচক শব্দটির কোথাও উলেখ ছিল না। এ সম্পর্কে প্রথম দালিলিক প্রমাণের দাবিদার বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'। ভুসুকু পাদ নামক একজন পদকারের একটি পদে 'বাঙ্গাল' নামক জনপদ ও 'বাঙ্গালি' নামক জাতিবাচক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ দুটো বিষয় দুটো চরণে স্পষ্টভাবে স্থান পেয়েছে।

(ক) 'আদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ'
(খ) আজি ভুসুকু বঙ্গালি ভইলি।

অর্থাৎ অদ্বয় রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করলাম।
আজি ভুসুক বাঙ্গালি হলো।

জাতি বাচক 'বাঙালি' শব্দটি তুচ্ছার্থে নাকি গৌরবার্থে হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তিনি যদি অষ্টম শতাব্দীর পদকার হয়ে থাকেন তা হলে তিনি আদিতে বাঙালি ছিলেন না। কিন্তু তাকে যদি একাদশ শতাব্দীর পদকার হিসেবে স্বীকার করা যায় তাহলে তিনি গৌরবার্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কারণ তাঁর জন্ম হয়েছিল বঙ্গে, তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন বঙ্গের

কৃতীসন্তান দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান। যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক না জনপদভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা যে লোকমানসে প্রবহমান ছিল এ থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ তরান্বিত হয়ে থাকে মূলত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে। প্রাচীন যুগের পাল বংশের শাসকেরা যদি এ দেশের ভূমিজ সন্তান না হতেন, তাহলে প্রাকৃতজনের ভাষায় চর্যাপদ রচনা সম্ভব হতো না। যেমনটা সম্ভব হতো না সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন সেন বংশের রাজাদের আনুকূল্য ছাড়া।

মুসলিম শাসনামলের প্রথম দেড়শ বছর (১২০৩/০৪-১৩৩৮ খ্রি.) বিপর্যস্ত রাজনৈতিক অবস্থায় বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন তমাছন্ন ছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধ্যায়কেই 'অন্ধকার যুগ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। লক্ষ্য করবার বিষয় মুসলিম বিদ্বিষ্ট একশ্রেণির গবেষক অন্ধকার যুগের পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির সকল কলঙ্ক মুসলিম শাসকদের ওপর বর্তীয়ে আত্মপ্রসাদ ঢেকুর তুলতে চান, যেটা মোটেই সম্ভব নয়। অন্ধকার যুগ সৃষ্টির জন্য যদি কাউকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই হয় তাহলে তা হলো হিন্দু সমাজের অভিজাত শ্রেণি। তারা সেন বংশের পতনে শোকাভিভূত হয়ে পড়ে, তদুপরি বাংলা ভাষায় ধর্ম কথা বলা পাপকর্ম হিসেবে বিবেচনা করে। অনুরূপ মুসলিম অভিজাত শ্রেণির মন-মানসিকতায়ও অভিন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারাও স্বর্গীয় ভাষা আরবির পরিবর্তে বাংলা তথা হিন্দুয়ানি ভাষায় কোরআন-হাদিস, নবী-রাসূলের কথা ব্যক্ত করা অধর্মের কাজ বলে মনে করে। এতদসত্ত্বেও বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের মুসলিম শাসকদের এদেশীয় ভাষা সাহিত্য ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যুগান্তর ঘটে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণির সাহিত্যিকদের যৌথ সাধনায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ স্বর্ণ যুগে উন্নীত হয়। তবে অভিজাত এবং অনভিজাত শ্রেণি সংঘাত যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও প্রভাবিত করে, বাংলা ভাষা সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণির সংকীর্ণ মনোভাব থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রীয় শ্রেণির সাহিত্যিকেরা বাংলা ভাষার প্রতি এতই অশ্রদ্ধেয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন যে, তারা বাংলা ভাষাকে 'প্রাকৃত ভাষা', 'লোকভাষা', 'লৌকিক ভাষা' ইত্যাদি নামে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে দ্বিধা করেননি। অনুরূপ, মুসলিম শ্রেণির সাহিত্যিকদের কাছে বাংলা ভাষা ছিল 'হিন্দুয়ানি ভাষা'। বাংলা ভাষার প্রতি এই যদি অভিজাত শ্রেণির মনোভাব হয়ে থাকে, তাদের কাছ থেকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা মোটেই প্রত্যাশা করা যায় না।

তবে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চেতনা বহু মানুষের হৃদয়কেই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করতে থাকে। তৎকালীন বাংলার একশ্রেণির জাতীয়তাবোধসম্পন্ন সাহিত্যিকের লেখনীতে এর পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। যে সব মুসলিম সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় ধর্ম কথা বলায় দ্বিধান্বিত তাদের উদ্দেশ্য করে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আব্দুল হাকিম প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে বলেছিলেন :

'যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সেব সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরেক বিখ্যাত মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতান বঙ্গে জন্ম লাভ করাকে দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর কথায় :

'কর্ম দোষে বঙ্গে বাঙালি উৎপন
না বুঝে বাঙালি সবে আরবি বচন'।

কবি বাঙালিদের অশ্রদ্ধা করেননি দুঃখ প্রকাশ করেছেন আরবি ভাষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতায়।

কবি আব্দুল হাকিম ও সৈয়দ সুলতানের লেখনীতে বঙ্গভাষাপ্রীতি ও বাঙালি জাতি পরিচয় যে ভাবেই উঠে আসুক না কেন, এ থেকে মুসলিম অভিজাত শ্রেণির সাহিত্যিকদের হৃদয়ে যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল সে সত্যটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৭৫৭ খ্রি.) মুসলিম রাজত্বের অবসান এবং ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে ব্রিটিশ রাজত্ব কালের দু'শ বছরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। যা ছিল জনপদ ও ভাষাভিত্তিক; মুহূর্তে তা রূপান্তরিত হয় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধে হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিষবৃক্ষ রোপণ করেন। তাঁর কাছে বাঙালি মানে হিন্দু, হিন্দু মানেই বাঙালি। এর ফলে বঙ্গভাষী মুসলমান, বঙ্গভাষী বৌদ্ধ, বঙ্গভাষী খ্রিষ্টান বাঙালি নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিই তৎকালীন মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু সমাজ স্বাগত জানায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম অচিরেই হিন্দু সমাজে ঋষি বঙ্কিমে সুভাষিত হয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্যবহৃত 'বন্দে মাতেরম' ত সুধাপানে দেশপ্রেমিক হিন্দু তরুণ সম্প্রদায় বিমোহিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে উগ্র সাম্প্রদায়িক 'শিব সেনা' ও 'হিন্দু মহাসভা'র মতো সংগঠনগুলো বঙ্কিমী হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা বাস্তবায়নে আত্মনিবেদিত হয়।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, একটি অন্যায় আরেকটি অন্যায়ের জন্ম দেয়। বঙ্কিম সমকালেই যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'

উপাখ্যানের বিপরীতে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী তাঁর 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সমুচিত জবাব দেয়ার চেষ্টা করেন। তবে বঙ্কিম প্রতিভার পাশে ইসমাইল হোসেন শিরাজীর প্রতিভা ক্ষীণ প্রদীপের মতো নিস্প্রভ ছিল বলেই সমাজ মানসে ততোটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। বঙ্কিম-সমকালীন অনন্য প্রতিভার অধিকারী অপর মুসলিম সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন সংঘাতের পথ পরিহার করে হিন্দু মুসলিম সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন। তাঁর 'গো-জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থখানি যার বিশেষ দৃষ্টান্ত। গ্রন্থখানি রচনার কারণে তিনি রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন শুধু সামাজিক সম্প্রীতির প্রতিই দৃষ্টি দেননি সুকৌশলে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রাখার চেষ্টা করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম জগতের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণে আত্মনিবেদিত হন। তাঁর উপন্যাস—'বিষাদ-সিন্ধু', 'ইসলামের জয়'; কাব্য—'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হযরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ', 'হযরত হামযার ধর্মজীবন লাভ', 'হযরত বেলালের জীবনী', 'মদীনার গৌরব', 'মোসলেম বীরত্ব', 'মৌলূদ শরীফ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় যার বিশেষ পরিচয় মেলে। এর ফলে একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু জাতীয়তাবাদী অপরদিকে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও মীর মশাররফ মুসলিম ঐতিহ্যবাদী চিন্তায় বাংলার সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হতে শুরু করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মতো রাজনৈতিক অঙ্গনও এই দ্বিধা বিভক্তির শিকার হয়। হিন্দুর জন্য 'কংগ্রেস' মুসলমানদের জন্য 'মুসলিম লীগ' রাজনৈতিক সংগঠন দুটো যার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনের অংশবিশেষ এই দ্বিধান্বিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের ভারত বিভক্তি, হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দু'ভূখণ্ডের সমন্বয়ে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র, অতঃপর পূর্ববাংলা পূর্বপাকিস্তান নামে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা, বাংলাদেশের মানুষের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণ যে ভাবেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব না ঘটলে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বঙ্গবন্ধু ও সর্বকালের সেরা বাঙালি হয়ে ওঠা সম্ভব হতো না।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র পরিকল্পনা যে যথার্থ ছিল না পাকিস্তান ও ভারতীয় অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদেরা তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কারণ—ভাষা, খাদ্য, বস্ত্র, জীবনাচার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল দু'অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। শুধু ধর্মীয় চেতনা দিয়ে ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙ্গে সুরম্য প্রাসাদ গড়া সম্ভব হয় না। যদি তাই হতো তবে সমগ্র আরব জাহান নিয়ে একটি রাষ্ট্র করা যেত। এই দিকটার প্রতি লক্ষ্য ছিল বলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী পূর্ববঙ্গের মানুষের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিয়ে বাংলা

ভাষার নিধন প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ উন্মাদ হয়ে পড়েছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের একজন উদ্বাস্তু নাগরিক। তার জন্ম ছিল বোম্বে, মাতৃভাষা ছিল উর্দু। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পরিকল্পনায় শুধু যে পশ্চিমাঞ্চলের নেতৃবৃন্দই সক্রিয় ছিলেন একথা বলা যাবে না, এর সঙ্গে পূর্ববাংলার কতিপয় নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উর্দু ভাষী মুসলিমলীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন, কিশোরগঞ্জের নূরুল আমিন প্রমূখ। বঙ্গবন্ধু শুরু থেকেই ছিলেন এই পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী। রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বের সাথে তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ সম্পৃক্ততা।

লক্ষ্য করবার বিষয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা আন্দোলনে ঢাকার রাজপথে যারা হতাহত হন তাঁরা সবাই ছিলেন নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম কৃষক পরিবারের সন্তান। উচ্চবিত্তের অভিজাত পরিবারের কোনো সন্তান এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভাষা আন্দোলনের নায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র আব্দুল মতিনের কথা যিনি উঠে এসেছেন সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানার অন্তর্গত এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার থেকে। বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এর ব্যতিক্রম ছিল না, তিনিও উঠে এসেছিলেন টুঙ্গীপাড়ার এক মুসলিম পরিবার থেকে। সুচিন্তিত, ন্যায়সঙ্গত ও সুসংহত আন্দোলনের কাছে রাষ্ট্রীয়শক্তির পরাভব যে অবশ্যম্ভাবী '৫২-র ভাষা আন্দোলনে জনতার জয় তার বিশেষ দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন ছিল স্বাধিকার আন্দোলনের মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধু গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে প্রতিটি ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করেন এবং পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনে কীভাবে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায় সে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর পরিকল্পনায় যে ত্রুটি ছিল না তার প্রমাণ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয়দফা আন্দোলন, '৬৯-র গণআন্দোলন এবং '৭০-র জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন।

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য নেতৃত্বে অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয় '৭১ এর ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ গ্রেপ্তার বরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। পূর্ব ঘোষিত ৩ মার্চের পার্লামেন্ট অধিবেশন বাতিল ঘোষিত হওয়ায় পাকিস্তানি রাজনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ জটিল রূপ ধারণ করে। সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঢাকায় সংলাপের অন্তরালে সমরাস্ত্র আনয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলার মানুষের উপর ঘৃণ্যতম নির্যাতনের লক্ষ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কসাই নামে পরিচিত টিক্কা খানকে ৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর করে আনা হয়।

আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ভূট্টো ও ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যায়। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন জাতীয় জীবনে নেমে আসছে গভীর অমানিশা। ২৫

মার্চ গভীর রাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশেই চট্টগ্রামে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পঠিত হয়। সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহর থেকে শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। পিলখানার ই. পি. আর. ক্যাম্প, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসসহ ঘুমন্ত পথচারীদের উপর সেনাবাহিনীর গুলি চলতে থাকে, তাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ সংহার ঘটে। সশস্ত্র পাকিস্তানি পশুদের সঙ্গে নিরস্ত্র বাঙালি প্রতিরোধের সংগ্রাম উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও শুট্টোর ধারণা ছিল, একদিকে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর হত্যা, অপরদিকে বঙ্গবন্ধুকে কারান্তরালে ভয়ভীতি অথবা প্রলোভন দেখিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা সম্ভব হবে, আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু বন্দি অবস্থায় দেশ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেন নি, বাঙালিরাও বুকের রক্ত থাকা পর্যন্ত মাথা নত করে নি। ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতি আর দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙালির মহা বিজয়। সারা বিশ্বে উড্ডীয়মান হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রক্তরাঙা পতাকা।

বঙ্গবন্ধু হত্যা অথবা পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রাখা ভুট্টোর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে তিনি বাধ্য হন। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি তাঁর মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। শুরু হয় তাঁর জীবনের আরেক অগ্নিপরীক্ষা। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুটো বিষয় তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। একটি হল হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার হাত থেকে যুদ্ধাস্ত্র জমা নেওয়া, আর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অতিসত্ত্বর ফিরিয়ে দেওয়া। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র ফেরত দেয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধি তিন মাসের মধ্যে তাঁর দেশের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেন। বঙ্গবন্ধু ছাড়া এই অভাবনীয় কাজ আর কারও পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সে বিচারের ভার ইতিহাসের ওপর।

বঙ্গবন্ধু অতঃপর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে আত্মনিবেদিত হলেন, আর তখন থেকেই শুরু হয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুদের, ষড়যন্ত্রের মহাপরিকল্পনা। সে পরিকল্পনায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামস, ক্যাডার সার্ভিস ও পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাবাহিনীর কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিলেও আলবদর, রাজাকার আলসামস একটি অস্ত্রও জমা দেয় নি; ক্যাডার সার্ভিসে পাকিস্তান অনুরাগী কর্মকর্তাদের পাকিস্তান প্রীতি ক্ষুণ্ন হয় নি। মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের দ্রুত পদোন্নতি আত্মীকরণকৃত সেনা কর্মকর্তাদের মনোপুত হয় নি। এর ফলে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক অগ্রগতির রথচক্র

মন্থর হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় আ. স. ম. আব্দুর রব আর মেজর জলিলের নেতৃত্বাধীন গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আত্মপ্রকাশ, সারা দেশে তাদের কর্মীদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাস; ক্ষমতালিপ্সু আওয়ামী লীগের কিছু প্রথম সারির নেতার বঙ্গবন্ধু বিরোধী মনোভাব, যার নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় বিশ্বাসঘাতক, বাংলার দ্বিতীয় মীরজাফর খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আভ্যন্তরিণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে গঠিত রক্ষী বাহিনীর মানবতা বিরোধী কিছু কর্মকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুর কাছে কোনো ঘটনাই অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ইচ্ছে করলেই এদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, কারণ তাঁর ছিল বিশাল হৃদয়, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি। বঙ্গবন্ধু চরিত্রের এই অতুলনীয় গুণাবলীকেই কোনো কোনো সমালোচক চারিত্রিক দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

বঙ্গবন্ধু আভ্যন্তরিণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও যে ব্যর্থতার শিকার হয়েছিলেন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি সাফল্যের তুঙ্গে উপনীত হয়েছিলেন। আমেরিকা ও চীনের বারবার ভেটো সত্ত্বেও বাংলাদেশে জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ, জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা, বিশ্বনেতৃবৃন্দ কর্তৃক ভূয়সি প্রশংসা, কতিপয় বন্ধু রাষ্ট্রের পরামর্শ উপেক্ষা করে ইসলামি ঐক্যজোটে যোগদান ও পাকিস্তানসহ কতিপয় ইসলাম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যেরই নিদর্শন।

এত গৌরব এত অর্জনের পরেও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে কতিপয় বিপথগামী সৈনিক ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকার স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মুহূর্তে বিশ্বরাজনীতির মহাকাশ থেকে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটে। সে পতন দেখে বিশ্ববিবেক অকস্মাৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পঁয়ত্রিশ বছর পরে আজ ১৫ আগস্টের এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে মুজিব, বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক, বাঙালির নয়নমণি, সর্বকালের সেরা বাঙালির মৃত্যু হয় নি, তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। তাঁর মৃত্যু হবে না। তাঁর মৃত্যু মানেই বাঙালি জাতির মৃত্যু, তাঁর মৃত্যু মানেই স্বাধীনতার মৃত্যু, এটা প্রত্যাশিত হতে পারে না। তিনি বেঁচে আছেন, তিনি বেঁচে থাকবেন, বাঙালির হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চিরদিন অম্লান থাকবেন।

৭ মার্চের ভাষণের লোকায়তিক মাত্রা

মফিদুল হক

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন রেসকোর্স ময়দানের বিশাল সমাবেশের মঞ্চে এসে দঁড়ালেন তখন জাতীয় জীবনে টানটান উত্তেজনার গভীরতম যে সংকটের পটভূমিতে তাঁর অবস্থান সেটা নানা সময়ে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে জাতীয় চেতনায় উদ্বেলিত ও ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের এমন এক সন্ধিক্ষণে তিনি নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে বর্বর সামরিক শক্তির মুখোমুখি হয়ে আগামীর পথে অগ্রসর হওয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পূর্ণই নির্ভর করছিল তাঁর ওপর। একদিকে ছিল স্বাধীনতার জন্য অধীর বিপুল শক্তিধর বিশাল জনতা, বাংলার মানুষকে যে শক্তির জোগান তিনিই দিয়েছিলেন। আরেকদিকে ছিল অস্ত্রের আঘাতে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চিরতরে নস্যাৎ করতে উদ্যত পাক সামরিক চক্র, সামান্য ভ্রান্তি কিংবা শৈথিল্যের দেখা পেলে হিংস্র পশুর মতো যারা ঝাঁপিয়ে পড়বে এদেশের মানুষের ওপর। আমরা জানি বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক দায় কীভাবে মোচন করেছিলেন এবং অবিস্মরণীয় এক ভাষণের মধ্যদিয়ে কীভাবে মুক্তিপথে এমন সংহত করে দাঁড় করিয়ে দিলেন বাংলার মানুষকে, যার ফলে সামনের দিনগুলোতে যা-ই ঘটুক না কেন অনন্য দৃঢ়তায় ঐক্যবদ্ধ জাতি তা মোকাবিলায় হয়ে উঠেছিল ক্ষমতাবান। এই ভাষণের তাৎপর্য বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, বহুভাবে গুণীজন সেই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তারপরও এর ঐতিহাসিকতা আরো নানা কোণ থেকে পর্যালোচনা করা সম্ভব।

ধর্মকে হীন স্বার্থে ব্যবহার যে তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছিল সেখানে জাতীয়তাবোধে বাঙালি জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তিনি। জনতাকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত তাঁর সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ প্রদানের জন্য তিনি যখন সভামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন তখন শ্রোতামণ্ডলির কাছে বড়ো হয়েছিল আশু সংকটময়তা, গণতান্ত্রিক রায় পদদলনকারী পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্তির জন্য কী হবে চূড়ান্ত পদক্ষেপ তা জানতে সবাই ছিলেন উদগ্রীব। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ছত্রে ছত্রে সেই জাতীয় কর্তব্যের রূপরেখা মেলে ধরা হয়েছিল। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভবিষ্যতমুখী আন্তর্জাতিক মাত্রা ও গ্রহণযোগ্যতা জুগিয়েছিলেন উচ্চকণ্ঠে সংগ্রামের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দাবি উত্থাপন করে। তিনি কথা বলেছিলন কেবল বাংলার প্রতিনিধি হয়ে নয়, পাকিস্তানের ইতিহাসের ২৩ বছরে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতা হিসেবে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে (ইয়াহিয়া খানকে) অনুরোধ করলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না'। আরেকবার তিনি বলেছিলেন, 'আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে'। গণতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের প্রত্যয় ব্যক্ত করেই বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন সম্ভাব্য সশস্ত্র আঘাত মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার। অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে তাঁর এমনি ঘোষণায়, যার ফলে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম স্নায়ুযুদ্ধপীড়িত বিশ্বে কোনো এক পক্ষের সংগ্রাম না হয়ে অর্জন করে সার্বজনীন সমর্থন, যে সমর্থনের জীবন নিহিত ছিল ৭ মার্চের ভাষণে। তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এমনি সমর্থন সরকারিভাবে প্রদানের কোনো সুযোগ ছিল না, কিন্তু দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ বাংলাদেশের পক্ষে ছিল সোচ্চার, আর এর প্রভাব পড়েছিল অনেক দেশের সরকারের ওপর।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের লোকায়তিক দিক আমরা বিবেচনায় নিতে চাই। আমরা এটাও স্মরণ করি আন্তর্জাতিক ও লোকায়তিক এই দুইয়ের সমন্বিত বিচারের মধ্যদিয়ে এ ভাষণের গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিচয় আমরা পেতে পারি। লোকজীবন সঞ্জাত যে দর্শন ও শিল্প প্রকাশের পরিচয় আমরা পাই তাকে আধুনিক ফোকলোর চর্চায় লোকায়তিক অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। রূপগতভাবে এর রয়েছে প্রকৃত চরিত্র, প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে সংলগ্ন থেকে লোকায়তিক এসব প্রকাশ কোনো জড়বৎ ধারণা নয়, আধুনিক জীনজিজ্ঞাসার মোকাবিলায় নিশ্চিতভাবে সক্রিয় ও সক্ষম কিন্তু সেই রূপ সনাতনকে চিহ্নিত করতে অনেক সময় আমরা ব্যর্থ হই। তার একটি বড়ো কারণ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে শিক্ষিত নাগরিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রোথিত সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, বিশেষভাবে যেসব প্রপঞ্চ ব্যবহার করে তারা সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প বিশ্লেষণের চেষ্টা নেন, অনেক ক্ষেত্রে তা আরো বেশি করে তাদের সমাজ-বিযুক্ত করে ফেলে।

এই সংকট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম যুগের প্রবক্তারা অনেকেই শিক্ষাগ্রহণ করেছেন পশ্চিমা দুনিয়ায়, রপ্ত করেছেন ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ও জীবনরীতি, পরে হতাশ ও পীড়িত হয়েছেন বাস্তবের রূঢ়তায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনে প্রতিফলিত স্বাধীনতা ও মানবতার বাণী এবং ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্ঠুর বাস্তবতার দ্বন্দ্বে তারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

৭ মার্চের ভাষণে প্রতিরোধ আন্দোলনের এই লোকায়ত রূপ মেলে ৭ মার্চের পাশাপাশি প্রত্যাঘাতের ডাক এমন এক লোকভাষায় ব্যক্ত করলেন বঙ্গবন্ধু যে তিনি উন্নীত হলেন অনন্য লোকনায়কের ভূমিকায়, যার তুলনীয় নেতৃত্ব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কাফেলায় বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাংলার লোকঐতিহ্য ও জীবনধারার গভীর থেকে উঠে আসা ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতৃ ভূমিকায়। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তিনি যে কতটা সার্থকনামা হয়ে উঠেছিলেন তার পরিস্ফুটন ঘটেছিল সংকটময় মার্চ মাসে তার অবস্থান ও ভূমিকা এবং ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে। তিনি বক্তব্যে যেমন গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী, তেমনি আন্দোলনের স্বাদেশিক রীতির নবরূপায়ণ প্রেসার ঘটালেন সার্বিক ও সক্রিয় অসহযোগের ডাক দিয়ে, যে অসহযোগে শামিল ছিল ব্যাপক জনতা এবং সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণের আবেদন উপচে পড়েছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোতে সামরিক-আধা সামরিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব বাঙালি সদস্যের ওপর এবং এর প্রতিফলন জাতি লাভ করল মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই। বক্তৃতার রূপ হিসেবেও প্রচলিত রাজনৈতিক ভাষণের কাঠামো সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে বঙ্গবন্ধু এমন এক সৃজনশীলতার পরিচয় দিলেন যা দেশের মাটির গভীরে শেকড় জড়িত করা ও গণসংগ্রামের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া অনন্য নেতার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

তিনি বক্তৃতা শুরু করেছিলেন 'ভাইয়েরা আমার' সম্বোধন দিয়ে, সব রকম পোশাকি রীতি ও আড়ম্বর বর্জন করে লাখো মানুষের মুখোমুখি হয়ে এমন অন্তরঙ্গ, প্রায় ব্যক্তিগত সম্বোধন যে সম্ভব, তা কে কখন ভাবতে পেরেছিল। ভাষণের প্রথম বাক্যটিও একান্ত ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে বলা, যেন ঘনিষ্ঠজনের কাছে মনের নিবিড়তম অনুভূতির প্রকাশ, 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'। এরপর তিন যখন বাংলার মানুষের আত্মদানের কথা বললেন, তাদের মুক্তি-আকুতির প্রকাশ ঘটালেন, তখন সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গি রূপ পেল জনসভার ভাষণের, কিন্তু তারপরও হারাল না বিষয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্তি। তিনি বললেন, 'আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'।

এ অনন্য সূচনা বোধে দিয়েছিল বক্তৃতার সুর, তিনি সত্যোচ্চারণ করলেন অন্তরের সবটুকু আকুতি ঢেলে এবং নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে, যেন তাঁর রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃপ্রতিম সবাই, একাত্ম করে তুললেন। গভীর প্রেমভাব উৎসারিত এই একাত্মতা নেতা ও জনতার মধ্যে আর কোনো ফারাক রাখল না। দেখা গেল ভাষণে যখনই বলেছেন মানুষের কথা সেখানে আর কোনো নৈর্ব্যক্তিকতার অবকাশ থাকে নি, এই মানুষেরা যে তারই মানুষ, একান্ত আপনজন। বুকভরা ভালোবাসা ও বেদনা নিয়ে তিনি বলেছেন, '৭ জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে'। 'আমার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুখী, আর্তমানুষের মধ্যে, তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি'। 'কার সঙ্গে বসব, যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব'? 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে'। 'আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়.'—এভাবে বারবার তিনি উচ্চারণ করেছেন আমার মানুষ, আমার দেশের গরিব-দুখী, আমার লোক। এসব উচ্চারণ উৎসারিত হয়েছে মানুষের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতার মধ্যদিয়ে এবং প্রায় তিন দশকের দীর্ঘ ও কঠিন গণসংগ্রামের পথ বেয়ে বঙ্গবন্ধু অর্জন করেছিলেন গণমানুষের সঙ্গে এই বিশেষ সম্পৃক্ততা। নিবিড় প্রেমভাব থেকে স্রষ্টা অথবা দেশমাতার সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রকাশ ঘটাতে বাংলার লোকমানসে সম্বোধনের পরিবর্তনময়তা আমরা লক্ষ্য করি, স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা নিবেদনে লোকসমাজে যেমন আপনি, তুমি বা তুই ব্যবহৃত হয়, অনুভূতির স্তর অথবা তীব্রতার প্রকাশক হিসেবে, তেমনি বঙ্গবন্ধুও ভাষণের উচ্চকিত মুহূর্তে আপনি থেকে অনায়াসে চলে গেছেন তুমি বা তোমরা সম্বোধনে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা', যা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রিয় এক গান এবং ১৯৫৪ সালে সাহিত্য সম্মেলনে সনজিদা খাতুনকে যে গান গাওয়ার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন, সেখানেও আমরা দেখি গানের কথায় সম্বোধনসূচক সর্বনামে এমনি পরিবর্তন ঘটে যাওয়া। স্বদেশকে তুমি সম্বোধন করে যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তা এক পর্যায়ে হয়ে ওঠে তুই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই, তোমার রাখাল, তোমার চাষী/ওমা তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে'। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয় এখানে কেবল সম্বোধনের পরিবর্তনময়তা নয়, বক্তব্য বিচারেও ৭ মার্চের ভাষণের অনুরণন যেন খুঁজে পাওয়া যায়।

বক্তৃতার একেবারে শেষে, বাংলার লোকায়ত ইসলামে সুফিবাদের প্রভাবে যে উপাসনা পদ্ধতি বিশেষ স্থান পেয়েছে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলনে যে ফানা বা পরম উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়, যে নিবিড় সম্পৃক্তি-আকাঙ্ক্ষা লৌকিক ধর্মে আরো নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনিভাবে নেতা ও জনতা একীভূত হয়ে পড়েন

বক্তৃতাকালে, উপলব্ধির নিবিড়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝি অন্তরের কোষে কোষে, রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে অনুভব করেছিলেন নেতা ও জনতার একাত্ম হয়ে ওঠার গভীর ব্যঞ্জনা, তাই তো অসাধারণ ও অনন্য বাক্যবন্ধ রচনা করে তিনি বলেন, 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ'। এখানে কেবল সম্বোধনের রূপ বদল নয়, ঘটে যায় সত্তার রূপান্তর, মনে রাখার আহ্বান নিশ্চয়ই জনতাকে জানিয়েছেন নেতা, কিন্তু পরবর্তী উচ্চারণ 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব', এটা নেতা ও জনতার সম্মিলিত উচ্চারণ, উভয়ের সত্তা একীভূত হয়ে যায় যেখানে, তারপর আবার ফিরে আসে নেতৃরূপ, ঘোষিত হয় প্রত্যয়, 'এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব'। একই নিশ্বাসে ভবিষ্যৎবাদী প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার মহিমাকীর্তন করে তিনি উচ্চারণ করেন 'ইনশাআল্লাহ', লোকধর্ম ও লোকরীতি সহজাত প্রকাশ পায় তার উচ্চকিত রাজনৈতিক ভাষণে। এমন অসাধারণ বাক্য কেউ শিখে-পড়ে-লিখে বা বক্তৃতার পয়েন্ট হিসেবে নিয়ে আসতে পারে না, জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যদিয়ে এমন বাক্যোচ্চারণের মুক্তি অর্জন করতে হয়। আর তাই বক্তৃতার শেষে অমোঘ ঘোষণার মধ্যদিয়ে ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষ আহ্বান জানানোর দৃশ্যকেও সেভাবে চিহ্নিত করে বলা যায়, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশ হয়ে গেল স্বাধীন, যদিও আইনগত ও বস্তুগত ভিত্তি রচনা তখনও ছিল বাকি। তবে সর্বজনের মানসলোকে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে সেই পথ তো উন্মোচন করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

ব্যতিক্রমী লেখক আহমদ ছফা বঙ্গবন্ধুকে বলতেন বাংলার ভীম, মধ্যযুগের বাংলার লোকায়ত যে নেতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীন রাজ্যপাট নির্মাণ করেছিলেন মাটির দুর্গ, ভেতর গড়ে যে দুর্গ প্রাচীর এখানো দেখতে পাওয়া যায়, মাটির হলেও পাথরের মতো শক্ত। বাংলার ইতিহাসের এমন অনন্য নির্মাণ-কীর্তির তুলনীয় আর কিছু যদি আমাদের খুঁজতে হয়, তবে বলতে হবে ৭ মার্চের ভাষণের কথা। যেমন ছিল মধ্যযুগের বাংলার রাজা ভীমের গড়া পাথরের মতো শক্ত মাটির দুর্গ, তেমনি রয়েছে বিশ শতকের বাংলার লোকনেতা মুজিবের ভাষণ, যেনবা মাটি দিয়ে গড়া, তবে পাথরের মতো শক্ত।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিল

আবুল আহসান চৌধুরী

বাঙালি জনজাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট প্রাচীন। এই স্বাধীনচেতা জাতি বহিরাগত শক্তি কিংবা কেন্দ্রিয় শাসকদের বশ্যতা স্বীকারে স্বভাবতই নারাজ ছিল। তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুক্তির উন্মাদনায় তারা বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—প্রবল প্রতাপশালী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। কখনো গড়ে তুলেছে ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। মূলত এই ধরনের প্রয়াস ছিল আঞ্চলিক পর্যায়েই সীমিত—তা কখনো গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কিংবা সমন্বিত স্বার্থে সংগ্রাম-লড়াই-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে নি। এর কারণ বাঙালির রাষ্ট্রীয় ঐক্য কিংবা জনগণের সংহতি অভিন্ন আদর্শ-চেতনায় কখনো গড়ে ওঠে নি যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে।

তাই বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে নি। বহু যুগ পরে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, নির্ভীকতা, অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা, জাতির প্রাণস্পন্দনকে অনুভব করার শক্তি, অনন্য দেশপ্রেম—এসব কিছুই তাঁকে বাঙালির জাতীয় জীবনে মহানায়কে পরিণত করেছে। কোনো জাতি যেমন তিল তিল করে গড়ে তোলে তাঁর জাতীয় মহাকাব্য, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমনই একজন রাজনীতির মহাকবি যিনি তাঁর মেধা-শ্রম-প্রজ্ঞা-সাহস দিয়ে বহু মনীষীর—বহু মানুষের বহুকালের আকাঙ্ক্ষার রূপ দিয়েছেন—বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে।

বাঙালির ইতিহাসের আধুনিক পর্বে তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ও প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্রিটিশের ভেদনীতি এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈর-মনোভাব বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে সবসময় বিভেদ-অনৈক্য-বিরোধে জর্জরিত করে রেখেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের অহিফেন ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ বাঙালির ঐক্যের পথে বড়ো ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই চেতনা নিয়েই সাতচল্লিশের দেশভাগ আর 'পাকিস্তান' নামক এক অবাস্তব রাষ্ট্রের জন্ম। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর মোহভঙ্গ হতে বিলম্ব হয় নি। এই রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ববঙ্গের বাঙালি জনগোষ্ঠী যে বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তাতে তথাকথিত স্বাধীনতার স্বাদ হয়ে ওঠে তিক্ত। জাতিগত নিপীড়ন, রাজনৈতিক বঞ্চনা, আর্থনীতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক দলন—নতুন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালিকে করে তোলে হতাশ, ক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী ও দ্রোহী। তার প্রকাশ ঘটে আটচল্লিশ ও বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনে, চুয়ান্নোর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, বাষট্টির শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলনে, তেষট্টি-চৌষট্টি থেকে স্বৈর-সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ছেষট্টির বাঙালির মুক্তিসনদ ছয় দফা দাবি পেশে, আটষট্টির কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে, সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একাত্তরে বাঙালির সার্বিক মুক্তির লড়াই-এ। এই যে বাঙালির জাগরণ—জাতিসত্তার উদ্বোধন—ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম—মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপদানের প্রক্রিয়া—পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে—এই ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২

উনিশশো একাত্তর—বাঙালির ইতিহাসে এই সালটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরেও পাক সামরিক-জান্তার নেপথ্য চক্রান্ত ও ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের কারণে আওয়ামী লীগকে শাসনক্ষমতায় যেতে দেওয়া হয় নি। এর বিরুদ্ধে বাংলার আপামর মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে যায় চূড়ান্ত পরিণতির দিকে—এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবির লক্ষ্যে। শুধু অপেক্ষায় থাকতে হয় একটি কণ্ঠস্বরের উচ্চারণ ও নির্দেশনার। ৭ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনের সেই বহু প্রতীক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার সম্মুখে পেশ করলেন তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ—বঙ্গবন্ধুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ—এবং বিশ্বের শোষিত মুক্তিকামী মানুষের জন্যে প্রেরণাদীপ্ত এক ধ্রুপদী ভাষণ।

বাঙালির ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে—এক ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দান করেছিলেন। সমগ্র জাতি সেদিন উৎকণ্ঠা ও প্রত্যাশা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়েছিল। এক নতুন দিশালাভের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল। বাংলা আর বাঙালির ভাগ্য যেন নির্ভর করছিল একজন মানুষের বক্তব্যের উপরে। কখনো কখনো কোনো বাক্য হয়ে ওঠে বাণী—কোনো মন্তব্য পায় প্রবচন বা সুভাষণের মর্যাদা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ করলে আমরা সেইরকম এক অসামান্য অমৃত বাক্য-বাণীর সন্ধান পেয়ে যাই।

৩

'রাজনীতির কবি'র ৭ মার্চের ভাষণকে একালের এক কবি, নির্মলেন্দু গুণ, ভাষণ বা বক্তৃতা না বলে বলেছেন 'কবিতা'। কবির স্মৃতি-বর্ণনার সেই পঙ্‌ক্তিমালায় ধরা পড়ে দীর্ঘ-প্রহর অপেক্ষমাণ 'বিদ্রোহী শ্রোতা'র আগ্রহ-উদ্বেগ-অনুরাগের কথা :

> একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
> লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
> ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে—
> 'কখন আসবে কবি?'

তারপর একসময় লক্ষ মানুষের 'ব্যাকুল প্রতীক্ষা'র অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কবি এলেন :

> শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
> অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
> তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল, হৃদয়ে লাগিল দোলা
> জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা—
> কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
> গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি :
> 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
> এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
>
> সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

বঙ্গবন্ধুর মাত্র ১৯ মিনিটের এই ভাষণ যেনো ছোটোগল্পের সংজ্ঞার মতো—'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা'। ভাষণটি পর্বে পর্বে বিশ্লেষণ-বিন্যাস করলে পাওয়া যায় : শোক-বেদনা, আশা ভঙ্গের ক্ষোভ-আক্ষেপ, বৈষম্য-বঞ্চনার খতিয়ান, সামরিক শাসনচক্রের কুটিল-কপটতা, সমদর্শীর মহানুভবতা, মানবিক-অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি, প্রশাসনিক নির্দেশনা, প্রতিরোধের আহ্বান, মুক্তির স্বপ্ন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। বঙ্গবন্ধুর দিক্-নির্দেশী ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিস্তরঙ্গ

জনসমুদ্র যেনো মুহূর্তে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে উত্তাল-মুখরিত হয়ে উঠলো। পরাধীনতার শেকল-ছেঁড়ার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো জনগণ—সেই মুহূর্ত থেকেই যথার্থ অর্থেই 'স্বাধীনতা' শব্দটির অধিকার অর্জন করলো বাঙালি। তাই বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণই এক-অর্থে স্বাধীনতার ঘোষণা—এরপর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

৪

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে সারা দেশের মানুষ অভিভূত-উদ্বেলিত-উজ্জীবিত-সম্মোহিত হয়েছিল। এ-এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা—এ-এক ঘোর-লাগা বিস্ময়ের অপরাহ্ন। কলকাতায় নির্বাসিত অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের দু-পঙ্‌ক্তির একটি শের-শায়েরি দিয়ে জনমানসের উপলব্ধি-অভিব্যক্তি অনেকখানি প্রকাশ করা যায় : 'খোআব থা জো কুছভি দেখা, জো সুনা আফসানা থা'—অর্থাৎ, 'যা কিছু দেখেছি, সবই স্বপ্ন—যা কিছু শুনেছি, সবই কাহিনি'। বঙ্গবন্ধুর নাটকীয় বিন্যাসে রচিত ভাষণ—বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান—উপস্থিত জনতাকে এতোটাই অভিভূত-সম্মোহিত করেছিল তাদের উপলব্ধিতে বাস্তবও যেনো স্বপ্ন আর কাহিনির রূপ নিয়ে উপস্থিত। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু জনগণকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—সে স্বপ্ন স্বাধীনতার, আখ্যান শুনিয়েছিলেন—সে কাহিনি বঞ্চিতের—শোষিতের। ৭ মার্চের ভাষণ তাই হয়ে উঠেছিল স্বপ্ন থেকে জাগরণের—কাহিনি থেকে বাস্তবে অবতরণের মন্ত্র।

এক হাজার একশো ৭টি শব্দে গাঁথা ১৯ মিনিটের এই অলিখিত ভাষণে একটি শোষিত জনজাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন-শতদল ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলেছে। কেন মুক্তি কাম্য বাঙালি জাতির, তার পূর্ব-প্রেক্ষাপট ও কার্য-কারণ ইতিহাসের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আবেগ ও যুক্তি হাত-ধরাধরি করে এখানে পথ চলেছে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে',—তাই ইতিহাসের মহানায়ক 'দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে' মুক্তিপাগল জনতার মুখোমুখি হন। তারপর তিনি সেই অমোঘ সত্যের ঝরনার মুখ দেন খুলে—মুজিবকণ্ঠ লক্ষ কণ্ঠের স্বর নিয়ে জেগে ওঠে : 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'। এই আকাঙ্ক্ষার কথা—এই অসন্তোষের কথা—এই দাবির কথা উঠে আসে বঞ্চনা-অবহেলা-নিগ্রহ-শোষণ-অত্যাচারের অভিজ্ঞতার আলোকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে জয়লাভ করেও শাসন ক্ষমতায় আসতে না-দেওয়ার পাকিস্তানি ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বর্তমান ঘটনাবলির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সেই একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

৫

বাঙালির মুক্তি-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পর্যায়ক্রমে দুটি রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করেছিলেন : প্রথমে অহিংস-অসহযোগ পন্থা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র লড়াই। তিনি সবসময়ই শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা-হস্তান্তরের পক্ষে ছিলেন। গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে শ্রদ্ধা করতেন বলেই তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশে বলেছিলেন : 'আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।' ইয়াহিয়ার পক্ষপাতিত্ব ও ভুট্টোর চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সততা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় মেলে এই কথায় : 'এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি হয় সে তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ রাজনৈতিক উদারতা দেখিয়ে অন্য দলগুলোকে বলেছিলেন : 'আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।' কিন্তু পাকিস্তানি রাজনীতির গোপন চক্রান্তে অ্যাসেমবিস্নর আহুত অধিবেশন স্থগিত ঘোষিত হয়। বঙ্গবন্ধুর কাছে ধীরে ধীরে এদের শঠতা ও ক্রূরতার মুখোশ ও স্বরূপ উন্মোচিত হতে লাগলো। ফলে 'এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল'। বঙ্গবন্ধু হরতাল-অসহযোগসহ 'শান্তি পূর্ণ সংগ্রাম' পরিচালনার আহ্বান জানালেন জনগণের কাছে।

দেশের পরিস্থিতি দ্রুত পালটে যেতে শুরু করলো। বাস্তবতা বঙ্গবন্ধুকে ক্রমশ কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলো। ১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠকের দিন ধার্য করে পাক-সামরিক সরকার। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে স্পষ্ট উচ্চারণ করেন : 'রক্তের দাগ শুকায় নাই।... ঐ শহীদদের রক্তের উপর দিয়ে... আর.টি.সি.তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।' পঁচিশে মার্চ এসেম্বলির বৈঠক ডাকা হয়। বঙ্গবন্ধু দেয়ালের লিখন পড়তে জানতেন—জনগণের নাড়ির খবর রাখতেন। তাই তিনি কঠিন শর্ত জুড়ে দিলেন অধিবেশনে যোগদানের জন্যে : 'সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।' জনগণই ছিল বঙ্গবন্ধুর আরাধ্য—তাঁর শক্তির উৎস—তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাই ক্ষমতার সিঁড়িতে পা দিয়েও তুচ্ছ-অগ্রাহ্য করতে পারেন ক্ষমতাকে—নির্লোভ জননায়কের মতো বলতে পারেন : 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।'

যতো দিন এগুচ্ছিল, বঙ্গবন্ধু ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছিলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিয়ে রাখলেন : 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তাঁর নিজের জীবন যে-কোনো মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারে, এমন আশঙ্কায় তিনি—'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি'—এই কথা বলে জনগণের কাছে তাঁর নির্দেশ জারি করেছিলেন। শত্রুপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন : 'আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।' যে-জাতি রক্ত দিতে জানে, সে-জাতির উত্থান কেউ কখনো রোধ করতে পারে না—এ-সত্য বঙ্গবন্ধু জেনেছিলেন ইতিহাসের আলোকে—নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাই প্রত্যয়ের অহংকারে বলতে পেরেছিলেন : '৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না।' যতো সমাপ্তির দিকে তাঁর বক্তব্য ধাবিত হয়েছে—ততোই তার অর্থ-ব্যঞ্জনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে, যেমন : 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শাআল্লাহ।' ভাষণ সমাপ্ত করলেন মুক্তির মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

৬

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ মাত্রা-আয়তন-বৈশিষ্ট্যে মানবিকীবিদ্যার অনেক শাখাকে স্পর্শ করেছে। এই ভাষণের রাজনীতি-সমাজ-ইতিহাস-দর্শন-মনস্তত্ত্ব-লোকতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-যোগাযোগবিজ্ঞান-শিল্পতত্ত্ব—নানা আঙ্গিকে বিশ্লেষণ সম্ভব। লোকবিজ্ঞানী শামসুজ্জামান খান বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে 'লৌকিক ভাষাভঙ্গি ও বাকপ্রতিমা'র আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই ভাষণে 'যোগাযোগবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ' সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অধ্যাপক খোন্দকার আশরাফ হোসেন বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের সঙ্গে ইতিহাস ও শৈল্পিক-সংশ্লেষের আভাস দিয়েছেন। আরো নানা কৌণিকে এর বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন হতে পারে—হওয়া উচিত।

৭ মার্চের এই ভাষণে যে প্রবচনতুল্য পঙ্‌ক্তি বক্তব্যকে সংহত ও শাণিত ও শিল্পিত করে তুলেছে তার কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা চলে। যেমন—'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়', কিংবা—'মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস', আবার—'আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব'। শব্দের ব্যঞ্জনা বক্তব্যকে গভীরতা দান করেছে, এমন উদাহরণ : ক. 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'. খ. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে', গ. 'রক্তের দাগ শুকায় নাই'। আবার 'দাবায়ে', 'দাবাতে', 'পারবা', 'রাখবা', 'দেবার'—এইসব আঞ্চলিক বুলি চমৎকার মানিয়ে গেছে তার বক্তব্যের সঙ্গে। সম্বোধনে মানুষকে কাছে

টানা—আপন করে নেওয়া—এ-ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। আনুষ্ঠানিক বক্তৃতাতেও তার ব্যত্যয় হয় নি। ৭ মার্চের ভাষণ শুরু করেছিলেন 'আপনাদের', 'আপনারা'—বলে, ভাষণের নির্দেশনা-পর্যায়ে সেই সম্বোধন পরিবর্তিত হয়ে গেলো 'তোমাদের', 'তোমরা'-তে। অবশ্য শ্রেণিবিশেষে পূর্বের সম্বোধন অপরিবর্তিত থেকেছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশাল হৃদয়ের মানুষ—সমদর্শী, অসাম্প্রদায়িক। ধর্ম বা ভাষার ভিন্নতাকে তিনি কখনোই মিলন বা ঐক্যের অন্তরায় ভাবেন নি। মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাই তাঁর ভাষণে বলেছেন : 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।' উদার মানবিক চেতনা মানুষ ও রাজনীতিক মুজিবের মধ্যে কী পরিমাণে ছিল, সেই দৃষ্টান্তও মেলে এই উক্তি থেকে।

৭

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলার মানুষের মনে যে কী বিপুল সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা জুগিয়েছিল সে-কথা আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। এই ভাষণের প্রেরণায় বাঙালির যে অটুট ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তা তুলনাহীন—আগে-পরে আর কখনো হয়নি। মানুষের মনে যে গভীর দাগ কেটেছিল তা মানুষকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুক্তির চেতনায় কতো কবিতা-গল্প লেখা হলো—বাঁধা হলো গান—ঘুচে গেলো শহর আর গ্রামের ব্যবধান—উচ্চ আর নিম্নবর্গের ফারাক। শহুরে কবির মতো গ্রামের কবিও—নিরক্ষর, কবিতার প্রসাধন-প্রয়োগে নিরুপায় কবিও—গান বাঁধলেন, কবিতা লিখলেন। এমন একজন লোককবির সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁর নাম রওশন আলি, সাকিন পুরাতন কুষ্টিয়া, পোস্ট হাটশ হরিপুর, জেলা কুষ্টিয়া। তিনি লিখতেন হেটো কবিতা—পথুয়া কবিতা। আট পাতার ছাপা কবিতা হাটে-বাজারে-গঞ্জে-মেলায় সুর করে গেয়ে শোনাতেন। তিনি লিখেছিলেন—'নব যুগ—নব লীলা বাঙলাদেশের ইতিহাস' নামে হেটো কবিতা। আট পাতায় বাংলাদেশের জন্মের কাহিনি। আমরা সেই নিরক্ষর গ্রাম্যকবির ভাব-ভাষা-ছন্দলালিত্যহীন কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে ধরি, যার মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণের কথা আছে—আছে ইয়াহিয়ার শঠতা আর পাকবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনি :

১৯৭১ সাল ৩রা মার্চ বুধবার দিনে
ঢাকার হলে মিটিং কল করলেন রাজ আইনে
ভুট্ট বলেন কুমন্ত্রনে মিটিং এবার বন্ধ থাক
কাল সাপেতে বাজায় কাশি ভালুক বাজায় ঢাক।
৮ই মার্চ সোমবার বেলা ৮টার সময়
সেখ মজিবর ভাষন দিয়া জানাই রেডিয়ায়।

খাজনা ট্যাক্স বন্ধ কর দিবেন না কেহ কাহাক।
কাল সাপেতে বাজায় কাশি ভালুক বাজায় ঢাক।
স্কুলকলেজ কোর্টকাচারী বন্ধ সব রবে
যত দিন আমার পুনঃআদেশ নাহি পাবে
শুনে খুসি হয় সবে চৈত্রিক মাসে বিভ্রাট যাক
কাল সাপেতে বাজায় কাশি ভালুক বাজায় ঢাক।
২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট করিয়া চাতুরি
গভির নিশিযোগে মজিবরে বন্দি করি
উড়োজাহাজে উড়ান ছাড়ি রাওয়ালপিন্ডি লয়ে যায় তাহাক
কাল সাপেতে বাজায় কাশি ভালুক বাজায় ঢাক।
সামরিক শাসনে কড়া আদেশ করলেন জারি
পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান কর কর না আর দেরী
আওয়ামি লীগে[র] নেতা ধরি খুলে দেও তার আঁখ
কাল সাপেতে বাজায় কাশি ভালুক বাজায় ঢাক।
লুটতারাজ ঘর জ্বালান নারী নির্যাতন।
ম্যাসিন গান জুড়ে মারে ছাত্রছাত্রীগণ...

বঙ্গবন্ধু ছিলেন গ্রামীণ বাংলার মানুষ—তাই তাঁর সংগ্রামের কথা যখন সেই মাটির মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়, তখন তা ভিন্ন ব্যঞ্জনা—ভিন্ন তাৎপর্য লাভ করে। এখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের আগে-পরের ঘটনা একজন গ্রাম্যকবির রচনায় যে আন্তরিক আবেগে ফুটে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা যেনো—'অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস'।

৮

আমার সংস্কৃতি—আমার ঐতিহ্য—আমার ভাষা—আমার সাহিত্য—যখন অন্তরে প্রবেশ ক'রে গভীর আবেগ ও গৌরব সৃষ্টি করে, তখনি জাতিসত্তার উদ্বোধন হয়—জাতীয়তাবোধ জন্ম নেয়—জাতীয়তার অসংলগ্ন চেতনা জমাট বাঁধে। সেই আবেগ ও গৌরব আমরা পেয়েছি মুজিবের কাছ থেকে—বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে—জাতির পিতার কাছ থেকে। তাঁরই নেতৃত্বে—তাঁরই নামের মহিমায় আমরা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আর সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা—প্রেরণা নিহিত ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে। এই ভাষণ তাই নিছক কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি নয়—এ হলো বাঙালি জাতির এক অবিনশ্বর—অবিস্মরণীয় দিক্‌দর্শনের রূপরেখা—রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের শাশ্বত দলিল—যার মধ্য দিয়ে প্রজন্ম-পরম্পরা বাঙালি শক্তি ও প্রেরণা পাবে—সংকটে-সংশয়ে পাবে ধ্রুবতারকার দিশা—অনুভব করবে প্রাণ-নাড়ির স্পন্দন।

জয় বাংলা—জয় বঙ্গবন্ধু।

যে ভাষণে বাংলাদেশ

গাজী আজিজুর রহমান

সব দিন নয়, কালপৃষ্ঠে কোনো কোনো দিন বরমাল্য পরে অমরতা লভে ইতিহাসে-পুরাণে। তাকে বলি শুভ দিন, স্মৃতি উজ্জ্বল দিন-'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' বিরল ভবনে। সেই বিরল রাগিণীর দিন, বসন্তের দিন, নক্ষত্রখচিত দিনে বাঙালির সব পথ এসে মিশে ছিল রেসকোর্স ময়দানে। সেদিন সব কোকিল এসে জড়ো হয়েছিল ময়দানের আকাশে, আকাশও নেমে এসেছিল সন্নিকটে, সমস্ত গোলাপ-চামেলী-বেলি তাকিয়ে ছিল মঞ্চের দিকে, প্রান্তরের সমস্ত ঘাস বাহু মেলে অস্থির ছিল সম্ভাষণে, বাতাসের আঁচল বরণের ভঙ্গিতে ছিল প্রস্তুত। সব কিছু অনুকূলে ছিল—মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশও। এমন দীপ্ত কল্লোলিত অদ্ভুত অপরাহ্ণ কেউ দেখেনি কোনো দিন। বিটোফেনের চন্দ্রলোকিত গীতির মূর্ছনার মতো সেই ক্ষণকে টাইটানিক উল্লাসে ভাসিয়ে দিয়ে শেখ মুজিব এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের মাঝখানে। বেজে উঠল খোল-করতাল-দামামা বজ্রনির্ঘোষে। যেন কলম্বাসের জাহাজ এসে ভিড়েছে আমেরিকার উপকূলে। একটি শব্দের জন্য অধীর প্রতীক্ষা—সেই "কথাটির দ্বিধাথরথর চূড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী/একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে/থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।" সেই ক্ষণকে কোটি মন্বন্তরেও ভুলবে না বাঙালি কোনোদিন।

সেদিনের ১৯ মিনিটের বিকেলটা ছিল শুধু তাঁর। সেদিন আর কোনো দৃশ্য ছিল না তাঁর দৃশ্য ছাড়া। সেদিন আর কারো কণ্ঠস্বর ছিল না তাঁর কণ্ঠস্বর ছাড়া। সেদিন একটি মাত্র নদী কলস্বরিত ছিল বাঙলায়। সেদিন তিনিই ছিলেন বাঙলার দিনমণি-অংশুমালী। সেদিন সবাই দেখলো এক অ্যালবাট্রস পাখিকে, এক প্রমিথুয়ুসকে, এক হারকিউলিসকে—দেখল স্পার্টাকাসরূপী এক অবিসংবাদিত

ত্রাতাকে। তিনি আর কেউ নন টুঙ্গিপাড়ার রাখাল ছেলে শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির বিস্ময়। তিনি অব্যয়, তিনি অক্ষয়।

১৯৭১-এর ৭ মার্চ বাঙালির ইতিহাসে এক হিরন্ময় দিন। এই দিনই জন্ম হবে মুক্ত পাখির মতো চার অক্ষরের একটি অবিনাশী শব্দ 'স্বাধীনতা'র। আর সেই বোমারু শব্দটি ছড়িয়ে পড়বে দেশ থেকে দেশান্তরে, মেঘে মেঘে, পর্বতে পর্বতে, নদী থেকে সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে। 'Hit, Hit and Hit' মাত্র তিন সেকেন্ডে হিটলারের ঘোষণায় শুরু হয় দ্বিতীয় মহাসমর। আর বঙ্গবন্ধুর মাত্র আট সেকেন্ডের ঘোষণায় শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম—"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এই মহাকাব্যটি ঘোষণার জন্য বাঙালিকে শত দুঃখ, দারিদ্র্য, পীড়ন, জেল-জুলুম, অত্যাচার, রক্তপাতের উপলখণ্ড আকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে হাজার বছর। এতকাল আমাদের তীর ছিল, তরী ছিল, দাঁড়ি ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো কোনো বলিষ্ঠ হালী ছিল না বলে আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে পারিনি।

যে ব্রাহ্মমুহূর্ত বা মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য পাড়ি দিয়ে হয় সপ্তসিন্ধু নদী, তিল তিল করে নির্মাণ করতে হয় ব্রাহ্ম লগ্ন—সেই শুভ লগ্নটির স্রষ্টা ছিলেন Poet of Politics ev Profet of Politics খ্যাত বিশ্ববন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি তাঁকে পেয়েছিল ওডিসিরূপে, টেলেমেকাসরূপে, আত্তিলারূপে।

দুই

৭ মার্চের অলিখিত কণ্ঠকুণ্ডয়ন ঘোষণাকে আমরা কেউ বলছি ভাষণ, কেউবা বলছি বক্তৃতা। আভিধানিক অর্থে ভাষণ হচ্ছে উক্তি, বচন, বিবৃতি বা বক্তৃতাও। আর বক্তৃতা হচ্ছে বাক্‌পটুতা, বাগ্‌বিন্যাস, বাগ্মিতা, বাক্যবিশারদ বা ভাষিকও। ইংরেজিতে বক্তৃতাকে বলা হচ্ছে lecture ev speech. আর ভাষণকে বলা হচ্ছে delever a lecture ev speech. মূলত দুটোই প্রায় সমার্থক শব্দ। মহানবির (সা.) বিদায় হজ্জের বাণীসমূহকে বলা হচ্ছে ভাষণ, আর আব্রাহাম লিংকনের 'গ্যাটিসবার্গ এড্রেস'কে বলা হচ্ছে বক্তৃতা। ১৯৪০ সালে চার্চিলের দেওয়া speech 'We shall fight' কেও বলা হয় বক্তৃতা। ২৮ আগস্ট ১৯৬৩ তে মার্টিন লুথার কিং-এর speech 'I have a dream' ও বক্তৃতা নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে 'Historical 7th March Address' (সচিত্র বাংলাদেশ, মার্চ ২০১১)। ভাষণ ও বক্তৃতা বিতর্কে না যেয়ে দেখা যাক 'World Book Encyclopedia' speech সম্পর্কে কী বলছে : "Speech has Several definations. It may mean the act of speaking the result of speaking or what is spoken, the language of a nation of group of nations, or the

dialect puculiar to a region or locatiy." ('S', Vol-18) Avi Freedom of speech সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "It is the right of people to say what they belive. Political liberty depends on this right, people need to hold free discussion and to exchange ideas so they can make an informed discussion on political issues. Free speech also contributies to political freedom by making government officials aware of public openion." (F, Vol. 7)

দেখা যাচ্ছে, যে ভাষণে জনগণের বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত, রাজনৈতিক অধিকার সার্বভৌম এবং যে ভাষণে একটি জাতির ভাষা, উপভাষা ব্যবহৃত হয় তাকেই speech বা বক্তৃতা বলে। লিংকন ও বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা এ জন্যেই বিখ্যাত ও যথাযথ।

শেখ মুজিবের বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে এর নানা মাত্রিক বৈভব। বক্তৃতাটি অতি বাস্তব, ইতিহাসনিষ্ঠ, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, বলিষ্ঠ, কবিত্বময়, নাটকীয় এবং একটি নিষ্পেষিত জাতির মুক্তির দলিল। শুনতে শুনতে মনে হয় শেক্সপীয়র, ডি. এল. রায় বা শচীন সেনগুপ্তের নাটকের কোনো দীর্ঘ সংলাপের ক্লাইমেক্স অংশ শুনছি। কথোপকথনের ভঙ্গিতে সাবলীল ভাষায় বর্ণিত এর আবেগ, সজীবতা, নাটকীয়তা, দিক নির্দেশনা, প্রমিত আঞ্চলিক ও বিদেশি ভাষার মিথষ্ক্রিয়া, আপনি-তুমি সর্বনামের সম্ভ্রমমূলক ব্যবহার, বজ্রকণ্ঠের বাগবৈদগ্ধ, সম্মোহিত করার যাদুকরি আকর্ষণ, মন্ত্রমুগ্ধতা, যুদ্ধ ঘোষণা করেও যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়ার কৌশল-সব মিলে একই অঙ্গে এত রূপের প্রাচুর্যের কারণেই এই ভাষণের শ্রেষ্ঠত্ব।

৭ মার্চের ভাষণের ক্যারিসম্যাটিক বিভার কারণে যৌক্তিকভাবেই বিদগ্ধ ব্যাখ্যাকারিরা লিংকন, লেনিন, চার্চিল, মাও সে তুং, হো চিমিন, গান্ধী, জিন্না নাসের, কিং ক্যাস্ট্রোর বক্তৃতার চেয়ে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতাকে সব সময় এক ধাপ উপরে রেখে করেছেন শংসিত। ভাষণটি মনে হয়েছে অগ্নিগিরি নিঃসৃত উত্তপ্ত লাভার মতো ভয়ংকর সুন্দর। যেন ডায়োলেন্সের ভায়োলিন। অথচ তিনি লেনিন, মাও, হো, চে, ক্যাস্ট্রোর মতো কোনো বিপ্লবী ছিলেন না। কিন্তু বিপ্লবের স্পন্দন ছিল বুকে। ছিলেন লুথার কিং, নেলসন মেন্ডেলার মতো আজম সংগ্রামী। ছিলেন লোকায়ত, লোকনায়ক, লোককবি। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বিরোধী এই শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিশ শতকের এক বিস্ময়কর জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর সমগ্র বক্তৃতায় তাই উপ্ত দেশ, দেশের ঠিকানা, বাঙালির ঠিকানা, বাঙালির আশা-আকঙ্ক্ষার ঠিকানা উদ্ভাসিত। এক কথায় তিনি ছিলেন বাঙালি জাতি-রাষ্ট্রের যথার্থ represntative ev spokesmen.

তিন

আলোকিত মানুষেরাই উন্মোচিত করতে পারেন অন্ধকারের পর্দা। আলো মানে আশা, আলো মানে মুক্তি, আলো মানে আমি আছি। পৃথিবীর বরণীয় মনীষীরা ছিলেন সেই আলোর পাখি। তারাই পৃথিবীতে এনেছেন বসন্ত; এসেছেন বালার্ক। এজন্য তাদের ভোগ করতে হয়েছে সিসিফাস যন্ত্রণা। তবু শত সংকটে, পীড়নে তারা থেকেছেন অনমিত, অনবতুল। এরাই লক্ষ কোটি মানুষের আশা ও দিশা, এরাই হয়েছেন গণদেবতা, গণনায়ক।

এই সব বরেণ্য মানুষের রেখে যাওয়া জীবন কাহিনী, বাণী, ভাষণ বা বক্তৃতা কালকে অতিক্রম করে শান্তি-সাম্য-মৈত্রী-মুক্তি-সংগ্রাম, ন্যায় ও সত্যের সংবীক্ষণ হয়ে হয়েছে কালজয়ী। এরাই হয়ে ওঠেন মানুষের দেশ, মানুষের দিশা, মানুষের আশা ও স্বপ্নের সপ্তর্ষিমণ্ডল। এরা হন সমাজ মানুষের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। পৃথিবীর যত পরিবর্তন, নতুনত্ব, অভিনবত্ব, বিপ্লব সব কিছুর মূল উৎস এইসব মানুষেরা। আর এসব সংঘটিত হয় তাদের কথায় অথবা লেখায়। অবশ্য আমাদের আলোচ্য যারা কথামালার কারিগর, যারা কথক-কবি।

মানুষের কথা কি শুধু শব্দ ও ধ্বনির সমষ্টি আর কিছু নয়? না আরো অনেক কিছু। শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই সৃষ্টি। শব্দই সৃষ্টির প্রথম ভাষণ। শব্দ সাজিয়েই গড়ে উঠেছে সভ্যতা। মানব সভ্যতা মূলত শব্দের খেলায় তৈরি। শব্দই বহন করে পৃথিবীর সত্য ও সুন্দরের শিল্প। শব্দ দিয়েই তৈরি হয় বাণী, ভাষণ, বক্তৃতা বা বিবৃতি। শব্দ রাজ্যেই মানুষের অধিবাস। একজন শব্দশিল্পী শব্দ নক্ষত্রের মালা গেঁথে প্রকাশ করেন তার প্রেম, ভালোবাসা, পূজা, দুঃখ, শোক যেমন—তেমনি সে শব্দের শিখা দিয়ে প্রকাশ করে সত্য, ন্যায়, অধিকার, স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তির ইশতেহার। সেই রকম এক ইশতেহারের স্রষ্টা ছিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলো শুধু আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ আদর্শ প্রচার আর জ্ঞান প্রচারের সমষ্টি নয়। ভাষণের যে কত রং-রূপ আছে, চিত্র আছে, কাব্যিকতা আছে—আছে উদ্যোগ, উৎসাহ, সাহিত্য-দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য হৃদয়স্থ অভিযান সে গ্যাটিসবার্গ ইড্রেস, নেভার সো মেনি, আই হ্যাভ এ ড্রিম বা এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তেমন উজ্জ্বলতর নিদর্শনের ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সেই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় এর ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী ও গতিশীল, বাক্যে আছে কাব্যিকতা ও সরলতা, প্রতিটি প্যারায় আছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, চে গুয়েভারার মতো ডাক দিয়ে যাই-এর আহ্বান, আছে জনসম্পৃক্ততা, অটল বিশ্বাস, লোকদর্শন, স্বদেশ প্রেম, নিঃস্বার্থতা, নাটকীয়তা এবং আবেগকম্পিত বজ্রকণ্ঠের নিনাদনা। ভাষণের প্রতিটি স্তরে আছে আশা আর উত্তেজনা, স্বপ্ন আর সম্ভাবনা, আর্তনাদ আর আত্মত্যাগের মহিমা, গণসংগ্রামের

দ্যোতনা এবং মুক্তির গান—এ দিক দিয়ে মান বিচারে ভাষণটি মার্টিন লুথার কিং-এর 'I have a dream' -এর সাথেই কিছুটা তুলনীয়। ভাষণে অনেকগুলো সুরের সম্মিলন আছে—হুমকির সুর, আদেশের সুর, সমঝোতার সুর, বেদনার সুর, আকাঙ্ক্ষার সুর, প্রত্যাখ্যানের সুর, প্রতিশোধের সুর, আত্মত্যাগের সুর, সবশেষে মুক্তির সুরে উজালা "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

একহাজার বিরাশিটি অশ্বক্ষুর ধ্বনি শব্দের ঝংকারে ভাষণটি পূর্ণ। যুক্তবর্ণসহ বর্ণ আছে তিন হাজার তিরানব্বইটি। ভাষণে মোট বাক্য আছে নব্বইটি, প্যারা আছে তেরটি, দাড়ি ছিয়াশিটি, কমা ঊননব্বইটি, প্রশ্নবোধক চিহ্ন চারটি। এতে ইংরেজি শব্দ আছে চারটি, আরবি শব্দ তিনটি, আঞ্চলিক শব্দ আছে বারোটি। এভাবে ইংরেজি, আরবি-ফার্সি, দেশজ শব্দ ও প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে ভাষণটিতে এনেছেন বৈচিত্র্য ও জনগ্রাহ্যতা। এই ভাষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে প্রচুর সর্বনামের ব্যবহার। যেমন : 'আমার' আছে ১৯ বার, 'আমরা' ১৯ বার, 'আমি' ১৭ বার, 'তিনি' ৮ বার, 'আমাদের' ৮ বার, 'আপনারা' ৪ বার, 'যারা' ৩ বার, 'তোমাদের' ২ বার, 'আপনি' ২ বার, 'ঢাকে' ২ বার, 'তার' ২ বার, 'তারা' ২ বার, 'তাদের' ২ বার, 'আমাকে' ১ বার, 'আপনাদের' ১ বার, মোট ৯২ বার তিনি ব্যবহার করেছেন আত্মবাচক, ব্যক্তিবাচক, নিত্য সম্বন্ধবাচক সর্বনাম—সম্ভ্রমার্থক ও নিকট সম্বন্ধার্থক সর্বনাম ব্যবহার করে তিনি ভাষণে তৈরি করেছিলেন জননৈকট্য, শ্রদ্ধা ও আত্মজনের সম্পর্ক। বিদায় হজ্জের ভাষণে আমরা এমনটা দেখি।

বঙ্গবন্ধু যে শিকড়ের মানুষ ছিলেন, কাদা-মাটি থেকে উঠে আসা মানুষ ছিলেন, জাতীয় ও তৃণমূলের নেতা ছিলেন ভাষণে বার বার dialect বা উপভাষা ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন তিনি ঢাকার শুধু নন টুঙ্গিপাড়ার ছেলেও। যেমন : ভায়েরা, দেবার চাই, জীবনের তরে, দিবার নাও পারি, দাবায়ে রাখতে পারবা না কিম্বা তোলো, থাকো, মনে রাখবা ইত্যাদি আহ্বান, দাবি ও হুকুমের মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর অন্তর নিংড়ানো আঞ্চলিকতার টান—যা তাকে দান করেছে লোক নায়কের অভিধা।

ভাষণটির শুরু ইতিহাস চেতনার দীপ্তিতে। সুদূর অতীত নয়, নিকট অতীত ও সমকালের ঘটনাকে হাতিয়ার করে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন বাঙালির আত্মত্যাগ, সংগ্রাম, রক্তপাত আর পাকিস্তানিদের অত্যাচারের ইতিহাস। স্মরণ করান দাসত্ব আর পরাধীনতার গ্লানির কথা, সব রকম অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা এবং তাদের সন্তানদের আত্মহুতির কথা। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে (১৯ মিনিট) তিনি তুলে ধরেন '২৩ বছরের করুণ ইতিহাস' অত্যাচারের ইতিহাস, রক্তের ইতিহাস, নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস'। যে ইতিহাস উপস্থিত সকলের জানা, কারো দেখা, কেউবা সরাসরি শিকার—সেই জীবন্ত সত্যকে উসকে দিয়ে

তিনি ভাষণের সূচনাতেই একসূত্রে গেঁথে ফেলেন সমগ্র দেশবাসীকে। তখন লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তাঁর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন। তখনই তিনি অতীত থেকে ফিরে আসেন বর্তমানে। বললেন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনে জয় লাভ করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে নারাজ। উল্টে দোষ চাপানো হচ্ছে বাংলার মানুষ ও তাঁর উপর। বোঝাতে চাইলেন পাক-শাসকেরা অত্যাচারী, অগণতান্ত্রিক, ক্ষমতালিপ্সু ও বাঙালি বিদ্বেষী। এর প্রতিবাদেই তিনি শান্তিপূর্ণ হরতাল ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও তারা স্তব্ধ করে দিতে চাইলো গুলি করে। তাদের পয়সায় কেনা এই গুলি ব্যবহার করার কথা বর্হিশত্রুর বিরুদ্ধে অথচ তা ব্যবহৃত হচ্ছে তার জনগণের উপর। এরপর কিসের আলাপ আলোচনা, কিসের রাউনটেলির কনফারেন্স? "যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সাথে...?"

এরপরও ২৫ তারিখ অ্যাসেম্বলি কল করা হয়েছে, কিন্তু তিনি 'শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে' তাতে যোগ দিতে পারেন না। শর্ত দিলেন ১. মার্শাল ল' withdraw করতে হবে, ২. সমস্ত সামরিকবাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে, ৩. যেভাবে হত্য করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, ৪. জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে—'তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।" তিনি জানতেন এতো ছাড় নয় বেঁধে ফেলা, এ শর্ত তারা মানতে পারে না, জনতারও একই মত। এই সুযোগে তিনি আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমার দেশের মানুষের অধিকার চাই"। এতো জনগণেরই চাওয়া। বুঝতে পেরে জনগণের স্বপক্ষে যেয়ে বলেন আজ থেকে রিকসা, ট্রেন, গরুর গাড়ি ছাড়া সব কিছু বন্ধ থাকবে, শুধু ২৮ তারিখে অফিসে যেয়ে বেতন আনবেন। যদি না দেয়, যদি আর গুলি চলে, হত্যা করা হয় তাহলে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। শত্রুকে ভাত-পানিতে মারতে হবে। বলেন আর গুলি চালাতে চেষ্টা করো না, "৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।" আরো বলেন "যখন মরতে শিখেছি এখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।" এটাই ছিল ভাষণের ক্লাইমেক্স অংশ।

জনতার পালস্ স্বপক্ষে বুঝতে পেরে অনুরোধের সুরে দায়িত্ব চাপালেন জনতা ও দলের কাঁধে। তাঁর স্বর নিচু, কোমল, বিনত। আবেদন করছেন আওয়ামী লীগারদের কাছে শহীদ ও আঘাতপ্রাপ্ত পরিবারদের সাহায্যের জন্য। শিল্প মালিকদের কাছে আবেদন হরতালের দিনগুলোতে শ্রমিকদের বেতন দিতে। দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। শত্রুবাহিনী ঢুকে যাতে আত্মকলহ সৃষ্টি করতে না পারে, বাঙালি অ-বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে দায়িত্বও নিতে হবে দলীয় কর্মীদের। এই অংশটি নাটকের dramatic relief এর মতো ভাষণে সংযুক্ত।

এর পর পরই কণ্ঠ আরোহে উঠিয়ে রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীদের হুকুমের সুরে বললেন যদি আমাদের কথা প্রচার মাধ্যমে প্রচার না করে, কেউ কাজে যাবে না। পূর্ববাংলা থেকে এক পয়সাও পাকিস্তানে চালান হবে না। টেলিফোন-টেলিগ্রাম এই বাংলায় চলবে, 'বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না'। একটা না-সুর ধ্বনিত হয় এই অংশে। এভাবে প্রতিটি শ্রেণি পেশার মানুষকে তিনি তাঁর ভাষণে সংযুক্ত করে, তাদের প্রতিবাদী করে তোলার পর পরই তিনি নিক্ষেপ করেন তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র বা একাঘ্নী বাণ।

জনচরিত্রের শিক্ষক বুঝলেন এখন যা তিনি জনগণ করতে বলবেন জনগণ ঠিক তাই-তাই করবে নির্দ্বিধায়। তখনই গ্রামে, মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে বললেন। যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতেও বললেন। রক্ত যখন দিতে হয়েছে রক্ত আরো দিতে হবে। বিনিময়ে "এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।" লিংকন ও লুথার কিং-এর বক্তৃতায় ছিল যেদিন স্বাধীনতা পাবো বা স্বাধীনতা আমাদের হবে—এই আশায় আন্দোলিত সেখানে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার বীরত্ব প্রকাশ করলেন ভাষণে। এখানেই ভাষণের অনন্যতা, অবিস্মরণীয়তা।

চার

জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বা 'দ্য লাস্ট দে অব পম্পেই'-তে যে আলোড়ন সৃষ্টির ইতিহাস ও কাহিনি আছে, শেখ মুজিবের মাত্র ১৯ মিনিটের ভাষণে তার চাইতে উথাল-পাথাল ঝড় উঠেছিল পূর্ব বাংলায়। যেন ১৯ মিনিটের ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে গেল পাকিস্তান সাম্রাজ্যের। এই ঝড়ো ও সংক্ষিপ্ত ভাষণের কোথাও জড়তা নেই, পুনরুক্তি নেই, অতি কথন নেই—ঠিক যতটুকু দরকার, যতদূর যাওয়া উচিত ঠিক ততদূরই গেলেন শব্দ গুণে গুণে, চরণ গুণে গুণে। যেমন যায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতা' যেমন যায় 'বিদ্রোহী' কবিতা তেমনি করেই এই ভাষণের বিস্তার, চড়াই-উৎরাই, গতিবেগ। মেঘনাদ বধ কাব্যের মতো এর নাটকীয়তা অতুলনীয়। সংলাপের পর সংলাপে আছে দুঃখ, ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা, শান্তি ও শৌর্যের বার্তা। আছে ৭ কোটি বাঙালির সব দায়-দায়িত্ব সিন্দাবাদের কাঁধে তুলে নেওয়ার শক্তি সাহস ও বীরত্ব। ভাষণে কোনো ছলনা, ছল-চাতুরী ছিল না। মানুষের মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা সবার উপর সত্য-এই বিশ্বাসের বলিষ্ঠ বাণীকার ছিলেন তিনি। তাই এই ভাষণটি যে কোনো পরাধীন দেশের জন্য একটা ম্যাগনাকার্টা।

> 'মাত্র ১৯ মিনিটের একটা ভাষণে ৭ কোটি বাঙালির মনের মণিকোঠায় ছবি হয়ে গেলেন শেখ মুজিব। গড়ে উঠলো দুর্বার ঐক্য, গড়ে উঠলো সংগ্রামী চেতনা, তৈরি হলো জীবন উৎসর্গের প্রেরণা। যেন সেই থেকেই সাত কোটি বাঙালি মানে শেখ মুজিব, ৭ কোটি বাঙালি মানে দেশ প্রেমের আদর্শ সৈনিক। সেই থেকে বাঙালির সব পথ স্বাধীনতার দিকে প্রবাহিত। সেই থেকে বাঙালির সত্যিকার ইতিহাসের জন্ম। ৭ মার্চ তাই বাঙালির স্বাধীনতার জন্মদিন।'

সেই জন্মের ডাক দিয়েছিলেন হ্যামিলনের এক বাঁশিওয়ালা। চে'র আহবান, মাও সে তুং-এর আহ্বান, লুথার কিং এর আহবানে যেমন সাড়া জেগেছিল সেদেশে তেমনি শেখ মুজিবের মার্চের ভাষণে জেগে উঠেছিল, গর্জে উঠেছিল সারা দেশ, তাদের রুখতে পারলো না পাহাড়-নদী বন, বৃষ্টি, অন্ধকার, শ্বাপদ-শত্রু। বাঙালি ফুঁসে উঠলো 'আমরা চলি সমুখ পানে/ কে আমাদের বাঁধবে—অতএব চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালি পাড়ি জমালো স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে। এখানেই ভাষণের সার্থকতা, সাত্ত্বিকতা।

পাঁচ

ক্রম সাযুজ্য রেখে তেরটি ধাপে রচিত এই কালজয়ী ভাষণটিকে একটা রেখাচিত্র অঙ্কন করলে এরকম দাঁড়ায় :

৩. আরোহ ও ক্লাইমেক্স অংশ		৫. আরোহ ও সমাপ্তি
১. আরোহ অংশ	চিত্র	৪. এ্যান্টি ক্লাইমেক্স অংশ
২. অবরোহ অংশ		
০	ভূমি	

ভাষণে যেন মহাকালের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত। যেন লঙ্ঘিতে হবে সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে। যে তরণীর কাণ্ডারি শেখ মুজিব নামে অসম সাহসী এক পাঞ্জেরীর। যিনি ভুগছিলেন একটি নব জন্মের প্রসব দেবনায়। সেই বেদনার স্বরলিপি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। শেষে অন্নদাশংকর রায়ের দু'টি লাইন একটু পরিবর্তন করে উদ্ধৃত করছি :

> যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
> তত দিন রবে ভাষণ তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলার লোকদর্শন
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের লোকউপাদান

আবদুল ওয়াহাব

সূচনা

সাধারণত দেখা অর্থে দৃশ্-ধাতু থেকে দর্শন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু দর্শন মানে দেখা হলেও যে কোনো দেখা দর্শন নয়; আসল কথা সত্যকে দেখা এবং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা। অর্থাৎ দৃশ্-ধাতুর একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করলেই কেবল দর্শন শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য পাওয়া সম্ভব।[১] কোনো একটি সামগ্রিক জীবন পদ্ধতির মধ্যে যে চিন্তা প্রতিফলিত থাকে তাকে ঐ জীবনধর্মীয় দর্শন বা চিন্তা হিসেবে অভিহিত করা যায়। সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, 'চিন্তার স্পষ্টীকরণ হচ্ছে দর্শনের কাজ'।[২] দর্শনের সঙ্গে জীবনের রয়েছে নিগূঢ় সম্পর্ক। সমাজ-সংসারের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বা জীবনসংগ্রামের বাস্তবতার উপলব্ধি থেকে দর্শনের বিকাশ ঘটে। তবে একথা বলতেই হয় দর্শন শব্দটি ইংরেজি 'ফিলসফি' শব্দের প্রতিরূপ।[৩] আমরা বলতে পারি দর্শন শব্দটি ইংরেজি ফিলসফি থেকেও অনেকগুণ বেশি ভারবহনকারী এবং শব্দটি ব্যাপকভাবে জীবনোপলব্ধিজাত। আন্তরসত্তার উপলব্ধির প্রতি অধিক গুরুত্ব থাকায় 'আত্মাকে জানো' প্রায় সব দর্শনের মূল কথা হলেও বাংলার লোকদর্শন সবসময় ব্যবহারিক উপলব্ধির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কাজেই বাঙালির জীবনে যে চিন্তা ছিল বা আছে তা স্পষ্টভাবে বয়ান করতে পারলে আমরা হয়ত বাঙালির জীবন ও দর্শনের সাধারণ পটভূমির সন্ধান পেতে পারি। তাই বাঙালির লোকদর্শনের সন্ধানে তার কাজের তহবিল নাড়াচড়া করা ছাড়া উপায় নেই। সে ক্ষেত্রে একটি জাতি হিসেবে বাঙালির জন্ম ও বিকাশের সূত্ররাশি, তার সীমা ও সীমানার

কথকতা, তার সম্ভাবনা ও লঙ্ঘনের দিগ্বিদিক, তার কথা ও কল্পনার কলতান, তার বোধ ও বোধের পরিসর, তার মাটি-রক্ত-ভূগোল ইত্যাকার সব কিছুই প্রাসঙ্গিক।[৪] বর্তমান নিবন্ধে বাংলার লোকদর্শনের সেই ব্যবহারিক উপলব্ধি এবং জীবনমুখী চিন্তা-চর্চার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে এবং একই সাথে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের লোকউপাদান অনুসন্ধান করা হবে। তার আগে 'লোক' ও 'বাংলার লোকদর্শন' প্রপঞ্চ দু'টির উপর কিঞ্চিৎ গুরুত্ব দিতে চাই।

লোক

'লোক' ইংরেজি Folk-এর প্রতিশব্দ। লোক একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ মনুষ্য, জন বা ব্যক্তি। বিস্তৃত অর্থে দেশের সাধারণ মানুষ বা লোকসকল। যেমন আমরা বলি লোকসমাজ, লোকসাধারণ ইত্যাদি। যেমন লৌকিকের বিপরীতার্থ অলৌকিক, তেমনি জাগতিক ও পারলৌকিক। লোক শব্দের অপর একটি অর্থ ইহজগৎ। ভারতের দর্শন গোত্রের একটির নাম চার্বাক দর্শন বা লোকায়ত দর্শন। চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত দর্শন বললে বুঝতে হবে এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত দর্শন[৫] যা একান্তভাবে জীবনমুখী দর্শন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মানসজাত, উপলব্ধিজাত, অভিজ্ঞতাজাত দর্শন। সাধারণ মানুষের চিন্তা বা মানসাকাঙ্ক্ষা সবসময় সর্বমাঙ্গালিক, এ জন্যই এটা সম্পূর্ণত হিংসা-দ্বেষ মুক্ত, আবার সম্পূর্ণত ইহজাগতিক বটে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লোকায়ত দর্শন বলতে সাধারণ মানুষের ইহজগতভিত্তিক দর্শনকে বুঝান। সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে লোকায়ত মতবাদ ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এ অর্থে এ দর্শন বস্তুবাদী বা জড়বাদী। অর্থাৎ লোক শব্দে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়জগৎ বোঝায়। আর লোকায়ত কথাটি অবশ্যই ইহলোকভিত্তিক।

দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লোকায়ত দর্শন বলতে ঋজু এবং মুক্তচিন্তার অধিকারী একটি সুসংগত বাস্তববাদী দর্শন বা বস্তু দর্শনকে বুঝেন। মার্কসবাদী দর্শনচিন্তার আলোকে তিনি লোকায়ত দর্শনের মূল্যায়ন করেন। তিনি এই দর্শনকে দেহতত্ত্ববাদী তন্ত্রদর্শন এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের দর্শন ও চিন্তা-প্রবণতার সাথে যুক্ত করেন। এই দর্শনের একটি জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও একটি দেহতত্ত্ববাদী সাধন পদ্ধতি আছে। আউল, বাউল, সহজিয়া, কাপালিক ও তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিতে তার সাক্ষ্য দেখা যায়।

লোকায়ত দর্শন বলতে যাঁরা ইহজাগতিক দর্শনকে বুঝেন তাঁদের কথা বলে পঞ্চানন তর্করত্ন বলেন, এই দর্শন স্থূল বস্তু জগতের বাইরে কোনো তত্ত্বকে স্বীকার করে না। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'লোক' অর্থে ইহলোক বুঝায়। বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ 'লোকায়ত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আয়ত বা আয়তন অর্থ ভিত্তি, 'লোক' অর্থ ইহলোক। জৈন দার্শনিক হরিভদ্রের মতে, 'লোক'

শব্দে ইন্দ্রিয় জগৎ বুঝায়। এই দর্শনকে মনিভদ্র পদার্থ সার্থ বা পদার্থসমূহের দর্শন বলেন। এইসব দার্শনিক ও ভাষ্যকারদের আলোকে এটা স্পষ্ট যে লোকায়ত দর্শন বলতে সাধারণ মানুষের ইহজাগতিক ভিত্তিক একটি দর্শনকে বুঝায়।[৬]

আহমদ শরীফ বলেন, 'লোক'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Folk বলেই মানি। 'লোক'-এর বাংলা অভিধা প্রাকৃতজন, অর্থাৎ যে-মানুষ কোনো কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি অর্জন করে নি—জন্মসূত্রে যে প্রকৃতি, ঘরোয়া পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিবেশ থেকে ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণ অনুকরণ করেছে সে-ই লোক।' লোকসংস্কৃতি শব্দটি থেকে বোঝা যায় এ সংস্কৃতি লোক সম্পর্কিত, অর্থাৎ মাটির মানুষজনের বা সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি। এর মর্মার্থে রয়েছে কোনো বিশেষ লোকগোষ্ঠীর বা লোকসমাজের সার্বজনীন আদর্শিক রূপ।[৭] Folk-এর প্রতিশব্দ 'লোক' বাংলা ভাষায় সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে একথা বলা যায়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে লোকদর্শন। তাহলে 'লোক' এর ইংরেজি ফোক এবং দর্শনের ইংরেজি ফিলসফি মিলে ফোক-ফিলসফি, অর্থাৎ ফোক-ফিলসফি-ই লোকদর্শন।

বাংলার লোকদর্শন : অমিত সম্ভাবনার স্মারক

বাংলার লোকসমাজের চিন্তাচেতনা ও বিবর্তনধারা জানার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনধারা আলোচনার দাবি রাখে। এক সময় যে বাংলার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষই ছিল বৌদ্ধ-এটা পণ্ডিতজনের স্বীকৃত। বাংলার আদি সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন-সঙ্গীত এ তথ্য দিয়েও বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সম্পর্ক প্রমাণিত। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু প্রাচীন মগধ রাজ্যভুক্ত যা বাংলার সীমান্ত সংলগ্ন। মগধ ছিল ৪০০ বছরের বৌদ্ধ-পাল রাজাদের আমলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু।[৮]

আদিম যাদু বিশ্বাস, সর্বপ্রাণবাদ, শ্রেণিসমাজের প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা, শ্রেণিবিভাজনের প্রতি তীব্র ঘৃণার পটভূমিতে বৌদ্ধদর্শন বাংলার লোকমানসে শিকড় বিস্তার করে। লৌকিক মতবাদ একদিকে যেমন মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি সাধন প্রণালির উদ্ভব ঘটে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মানুষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকেই উদ্ভূত হয় নাথপন্থা, অবধূত-মার্গ ও সহজিয়া ধর্ম। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে বাংলায় আগত সুফিবাদের উদারতার সংমিশ্রণে মধ্যযুগের প্রারম্ভেই বাংলার বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শন ও সাধন প্রণালির উদ্ভব ঘটে। বৌদ্ধদর্শনের মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়বোধ বাংলার লোকদর্শনকে মজবুত ভিত্তি দেয়। এ ধর্মের সামাজিক সাম্যনীতি প্রসঙ্গে রাহুল সাংকৃত্যায়ন আলোচনার সূচনা করে বলেন, 'বুদ্ধ পরিবর্তন চাইতেন উন্নততর জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য। এই ভবিষ্যৎ জগতের

প্রতীক হিসেবে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে সংগঠিত করেছিলেন, যেখানে জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ নেই, উঁচুনিচু ভেদ নেই, সেখানে সকলকেই সমান শ্রম দিতে হবে।'[৯]

বাঙালির লোকদর্শনের আকর রয়েছে প্রধানত বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের স্থানীয় ভবনা ও রূপে এবং শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, চৈতন্যদেব[১০], লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের জীবন ভাবনায়। একদিকে বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ, ওয়াহাবি-ফরায়েজি-ব্রাহ্ম-সুফি-বাউল মতবাদ, অন্যদিকে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জীমূতবাহন, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সত্যজিৎ, মানবেন্দ্র, ভাসানী, মুজিব, অমর্ত্য প্রমুখের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে বাঙালির লোকদর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বাঙালি মূলত দেহাত্মবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু বিদেশি ধর্ম-ভাবনা তার জীবন পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশ করার ফলে সে হয়েছে অদ্বৈতবাদী ও কায়াসাধক। বাঙালির আদি দর্শন সাংখ্য, বাঙালির চর্যা হলো যোগ-তন্ত্র, বলতে গেলে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সবার বেলাই একথা খাটে। বাঙালি পাপ-পূণ্যের চেয়ে জীবন রহস্য বুঝবার প্রতিই বেশি আগ্রহী। বাংলার অন্তত শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষ মারফতপন্থী, সেটা কখনো সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনভাবে, সে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে মানে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে; কিন্তু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে না, সে বেহেস্তে যাবে না দোজখে যাবে, স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে এই ভাবনা তার প্রকট নয়, কখনই নয়; এটা তার স্বভাব, সে কাজ করে, পরিশ্রম করে, মাছ-ভাত, শাক ভাত, ডাল ভাত খাবে, দুধ ভাত খাবার আশাও সে পোষণ করে। সে কষ্টও করবে; কিন্তু খুব একটা মসজিদ-মন্দিরে যাবে না বা স্রষ্টার আরাধনায় আত্মনিবেদন করবে না। বাঙালি জীবনবাদী, পারলৌকিক চিন্তার চেয়ে তার লৌকিক চিন্তাই প্রধান, জন্মান্তরে নয়, এ জীবনেই সে ভালো কিছু হবার, ভালো কিছু করার প্রয়াসী। বাঙালি দেহবাদী। আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণকার (১৭১২-১৭৬০) পাটনির মুখ দিয়ে বাঙালির লোকদর্শনের চিরকালিক বাণী উচ্চারণ করান, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। ইহলৌকিক বা জীবনমুখী দর্শনের নিদর্শন হিসেবে বাংলা সাহিত্যের এটি শ্রেষ্ঠ বাণী। বাঙালি কামাতুর নয়, লোভী নয়, সে স্বর্গ-বেহেস্তের জন্য লালায়িত নয়—'সে জীবনবাদী অর্থাৎ ইহজীবনবাদী—সে দুধে-ভাতে অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে, নির্ঝঞ্ঝাটভাবে বেঁচে থাকতে আগ্রহী। ভারতবর্ষের একটি অন্যতম দর্শন হচ্ছে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলে চার্বাকরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। চার্বাক দার্শনিকরা দেহাতিরিক্ত কোনো স্থায়ী আত্মাও স্বীকার করে না। তাঁদের কাছে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ-ই আত্মা, প্রত্যক্ষণই তার একমাত্র প্রমাণ। বাংলার লোকদর্শনের ইঙ্গিতও প্রত্যক্ষণবাদী। 'যা নেই দেহ ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে'

বাংলার দেহতাত্ত্বিক সাধন ভজনের এটা মূল কথা। দেহ ভিন্ন আত্মা নেই, চৈতন্য-স্মৃতি-বোধ-বুদ্ধি কিছুই নেই।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বাংলার জীবনমুখী দর্শনের বা লোকদর্শনের মৌল লক্ষণ ইহলৌকিকতাবাদী যা ধর্মনিরপেক্ষতার নামান্তর। ধর্মনিরপেক্ষতার এক অর্থ ইহলৌকিক। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অন্য অর্থ ইহলৌকিকতা'। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা যদি কোনো রাষ্ট্রের মূলনীতি হয় সে ক্ষেত্রে কেবল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারবে না এটাই নয়; বরং এর মৌলিক অর্থ প্রজাসাধারণ বা নাগরিকদের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।[১১] বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রসঙ্গে মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন, 'জাতীয় সংহতি-চেতনা ও ঐক্যবোধ যে এদেশের জীবনে নিকট অতীতে নিরেট স্লোগানের বিষয়ই ছিল না, তার প্রমাণ আমাদের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্ট। দেশের একটি বিশাল লোকগোষ্ঠীর মধ্যে যদি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার অভাব থাকত, তবে তিন দশকের ভাষাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি-বিপ্লব, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি আদর্শবাদের শক্তিশালী স্তম্ভ মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের আশ্চর্য রকম সাফল্য অর্জন, ১৯৬৮-৬৯-এর গণবিক্ষোভের প্রবণতা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক এলাকার উপরই একটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব কখনও সম্ভব হত না।'[১২]

বাংলার সমাজ-সংহতি-সমৃদ্ধির ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। আর কৃষিভিত্তির মূলে রয়েছে এ অঞ্চলের নদীগুলির জল-প্রবাহের মাধ্যমে স্মরণাতীত কাল থেকে বেয়ে-আসা প্রচুর পলিমাটি দ্বারা গঠিত ভূখণ্ডের উর্বরতা। এই উর্বর বঙ্গ ব-দ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দা হচ্ছে অনার্য লোকগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন জাতির ও শ্রেণির লোকজন। বাউল-জারি-সারি, মুর্শিদা, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকগীতির মার্মিক নিসর্গ প্রীতি ও আবেগ বিহ্বলতা, মঙ্গলকাব্যের আবহ, বাউল সহজিয়া সম্প্রদায়ের মরমি ধ্যানধারণা, সুফিদের সহজপ্রেম, হিন্দু-মুসলমানদের যাদু-টোনা-টোটেম প্রীতি, তাদের উৎসব-পার্বণের বহু উপকরণ—এক কথায় তাদের সংস্কৃতির ভাব ও রূপ বাংলার নদীমাতৃকতা ও কৃষিজ গ্রামীণতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তবে একথা বলতেই হয় যে সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে এই গ্রামীণ সংস্কৃতির গণ্ডির মধ্যে ধর্মের ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার ভেদ ঢুকে গেছে, ঘুচে গেছে শহুরে ও গ্রামীণ মানসিকতার ভেদ। এটাই বাঙালি সংস্কৃতি শক্তির দিক। সুতরাং এ সংস্কৃতির সম্ভবনা দিগন্ত প্রসারী।[১৩]

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো বাংলার মাটিতে অহিংসা ও ধর্মনিরপেক্ষতার বীজটা পোতা হয়েছে কবে বা কখন? না কোনো দিনক্ষণ দিয়ে এর হিসেব কষা

যাবে না বা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বকে দিয়েও নয়। প্রধানত নানা জাতের মানুষ, নানান মত ও পথ নিয়ে কালে কালে এখানে আগমন করেছে এবং বাংলার জলবায়ুগত কারণে সেগুলো মিলেমিশে দ্রবীভূত হয়ে, তারই মিথস্ক্রিয়ায় এই অনন্য লোকদর্শনের জন্ম দিয়েছে।

'সবার উপরে মানুষ সত্য' মানবতাবাদী এই অনন্য কাব্যবাণী বিশ্বে বাংলা ভাষায় প্রথম উচ্চারিত হয়। অহিংসা এবং পরমতসহিষ্ণুতা থেকে উৎসারিত এই কাব্যবাণী। এই অহিংসার বীজটি বাংলার মাটিতে পোতেন জৈন ধর্ম প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ শতকের দিকে। মহাবীর তার অহিংসার ধর্ম প্রচারার্থে দলবলসহ বছরাধিক কাল বাংলায় রাঢ় অঞ্চলে অবস্থান করেন। একথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, মহাবীর এই বঙ্গ ব-দ্বীপকেই তার অহিংসার বাণী প্রচারের বিশ্বস্ত ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন 'অহিংসা পরমধর্ম'। তাঁর জন্মস্থান উত্তর ভারতের গুজরাট অঞ্চলে। আর তারই সমকালীন গৌতমবুদ্ধ বলা চলে বাংলারই সন্তান হিমালয়ের পাদদেশের কপিলাবস্তুবাসী মানবতাবাদের, অহিংসার অনন্য বাণী 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' আমাদের কর্ণ কুহরে সুধার বাণীর মত শুনিয়েছিলেন। যে বাণী ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আজকের বিশ্বেও মহানবাণী হিসেবে মানবতাবাদীদের কাছে ও পরিবেশবাদীদের কাছে অনুপ্রেরণার আকর বাণী হিসেবে প্রভাব রাখছে। পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য মানুষের পাশাপাশি জীবসকলের—উদ্ভিদ সকলেরও বেঁচে থাকার, সুখী হবার অধিকার রয়েছে।

বাংলার অজ্ঞাত লোককবি পৃথিবীর নানান রং-এর গাভীর প্রশ্ন তুলে দুধের এক রঙ-এর উপমা টেনে পৃথিবীর সব মানুষ যে এক জাতি এই ধ্রুব সত্যকে তুলে ধরেছেন। বাংলার লোকদর্শনের মহানায়ক মহাত্মা লালন জাত হাতে পেলে আগুন দিয়ে পোড়ানোর সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছিলেন। লালন বলেছেন, 'যেথা যাই মানুষ দেখি, মানুষ দেখে জুড়াই আঁখি।' তাঁর কাছে মানুষ মাত্রেই মহান। উপনিষদে বলা হয়েছে 'মানুষ অমৃতের সন্তান'। মহাভারতে আছে মানুষই শ্রেষ্ঠ, সে যেমনই হোক। অর্থাৎ পাপিষ্ঠ মানুষও। আমাদের নজরুল তো বলেছেনই পাপিকে নয় তোমরা ঘৃণা করো পাপকে। একজন শিশুতো নিস্পাপ—নিষ্কলুষ, পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে পাপিতে পরিণত করে।

জৈন-বৌদ্ধ উর্বর বাংলার সমাজমন। এই উর্বর ভূমিতে তের শতকে অনুপ্রবেশ করে ইসলামের মানবতাবাদী জীবনদর্শন বিশেষ করে ইসলামের সাথে আরোধিক উদার জীবনদর্শন সুফিবাদ। সুফিবাদ বাংলার উদার আবহে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। তার কারণ বাংলার লোকদর্শন এমনিতে জীবনমুখী ও বস্তুতান্ত্রিক। সুফিরা ধনি-গরিব এক কাতারে দাঁড় করায়, জঙ্গল পরিষ্কার করে হাল-চাষ করে, নাচ-গানের আসর বসায়, জিকিরের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে নিমগ্ন হয় সকলে একত্রে সব কিছু মিলে এক উদার আবহ সৃষ্টি হয়। পাল

আমলেও জাতি গঠনের এমন একটা পরিবেশ আমাদের সংস্কৃতিতে ঘটেছিল যা একটি উদারনৈতিক জাতি গঠনে নানান উপাদানের যোগান দিয়েছিল।

৬ষ্ঠ-৫ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রচিত রামায়ণ মহাভারতে সু-কুয়ের দ্বন্দ্ব, পিতৃভক্তি, সততা ও নিষ্ঠার সর্বভারতীয় অনেক নজির বাংলার লোকদর্শনজাত। বৈদিক সভ্যতায় এক সময় অসংযত, উত্তেজনাপ্রবণ, সংশয়বাদী, স্থূল চিন্তা ও ইন্দ্রিয় সুখবাদী চিন্তা প্রশ্রয় পায়। এর ফলে সমাজে বিভিন্ন প্রকার সংকট, অস্থিতিশীলতা ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। বৌদ্ধ ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শনের প্রভাবে বৈদিক ধ্যান ধারণার ঐতিহ্যে আঘাত এবং মননশীলতার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়। ভারতবর্ষের মানুষ এ সময় তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে মুক্তির সন্ধান করে। রাধাকৃষ্ণণের মতে গাঙ্গেয় ভূ-ভাগের পশ্চিমাংশে (অর্থাৎ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের) লাভ করা উপনিষদীয় চিন্তাধারা বিতর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া পূর্বাংশে স্বীকৃতি পায় না। এ যুগে চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধদের আন্দোলনের ফলে উপনিষদীয় তত্ত্ববিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ষড়দর্শনের (সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত) ধ্বণাত্মক ধারাসমূহ ভাববাদ বর্জন করে লৌকিকতার দিকে, অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিকতার ও মানবকল্যাণের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করে। অমূর্ত ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্তা হ্রাস পায় এবং ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরের কল্পনা নানাভাবে প্রশ্রয় পায়। গীতায় বিষ্ণুকে কৃষ্ণের অবতার, পরবর্তীকালে উপনিষদের শৈববাদ, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবতারবাদ প্রশ্রয় পায়।[১৪] বাংলার হাজার বছর লালিত সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি ধর্মীয় উগ্রবাদের ও স্বার্থান্বেষী মহলের দূরভিসন্ধিকে রুখে দেয় এবং এই সংস্কৃতি অহিংসার দিকে, মানবকল্যাণের দিকে চলার পথে উৎস যোগায়। এই সাংস্কৃতিক বলয়ে জন্ম নেয় চৈতন্য দেব (১৪৮৪—১৫৩৩), লালন (১৭৭৪—১৮৯০), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১), নজরুল (১৮৯৯—১৯৭৬) এবং উদার মানবতাবাদী রাজনৈতিক রূপকার বাংলার অহিংসার স্মারক অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০—১৯৭৫)।

'এই বাংলার হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই।' 'ভাই' শব্দটি বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় একটি শব্দ। আমরা অনেক সময় শব্দটিকে কিঞ্চিৎ স্থূল অর্থে ব্যবহার করি—ভাই, তবে মায়ের পেটের ভাই কিনা; কিন্তু মুজিবের কাছে কেবল বাঙালি মাত্রেই ভাই নয়—বাংলায় বসবাসকারী সকলেই তাঁর ভাই। এই বোধ তাঁর মজ্জায়-শিরায় শিরায় প্রবাহিত যে মানুষ মাত্রেই ভাই। বাংলার লোককবিকুল থেকে, বাংলার লোকধর্ম থেকে, জৈনবৌদ্ধের অহিংসাজাত উর্বর সমাজমন থেকে, বাংলার বৈষ্ণববাদ থেকে, বাংলার নাথাবাদ-যোগবাদ থেকে, মহাত্মা লালন থেকে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে উপাদান নিয়ে মুজিব উজ্জীবিত হয়েছিলেন। সত্য ও নিষ্ঠার মিথস্ক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর মানসভুবনে যে মনুষ্যত্বের—দেশপ্রেমের—মানবপ্রেমের জন্ম হয়েছিল তার নজির বর্তমান বিশ্বে

বিরল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখার দৃঢ় সংকল্প তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, তেমনিভাবে বাঙালির প্রতি মুজিবের প্রত্যয়টি ছিল আরোধিক দৃঢ়। দেশপ্রেম ও বাঙালির প্রতি ভালোবাসার অমর স্বাক্ষর তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রেখে গেছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা মেকিয়াভেলির রাজনৈতিক দর্শনের চির পরিচিত বিষয়ের কথা স্মরণে আনতে পারি যে, 'নেতাকে হতে হবে সিংহের মত বলবান ও শৃগালের মত ধূর্ত'। মুজিব সিংহের মতো বলবান ঠিকই ছিলেন, কিন্তু কোনো প্রকার ধূর্ততার-শঠতার আশ্রয় তিনি নেন নি। বাঙালির প্রতি প্রবল আত্মবিশ্বাসই তাঁকে সে পথে নিতে পারে নি। তিনি যে লোকনায়ক! প্রকৃত লোকনায়ক তার লোকের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন কি করে?

আধুনিক মানবতাবাদের উপাদানের আকর বাংলার অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোকধর্মগুলো, যেমন কর্তাভজা, সাহেবধনি, খুশি বিশ্বাসী, ময়মনসিংহের পালপন্থী, মতুয়া সম্প্রদায়, বাউল প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিকাশমূলের প্রণোদনাকারী বাংলার লোকদর্শন। তিতুমীরের বিদ্রোহ, দুদুমিয়ার ফরায়েজি আন্দোলন, সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, বাংলার বড় বড় কৃষক বিদ্রোহ এমনকি আমাদের আলোচ্য ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার জন্য সমবেত উৎসুক জনতার অন্তর্প্রেরণাও লোকদর্শনজাত। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমাদের কবিকুল যেমন লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং রাজনৈতিক রূপকার বঙ্গবন্ধু প্রমুখের অনুপ্রেরণার উৎসমূলে রয়েছে বাংলার লোকদর্শন।

উত্তর ভারতের বাসিন্দা সন্ত কবীর (বারানসি, মৃত্যু : ১৫১৮) ছিলেন হিন্দু মুসলিম মিলনাকাঙ্ক্ষী সমন্বয়বাদী মনীষী। তিনি ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা রামানন্দের শিষ্য। দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণকারী রামানন্দ হিন্দু সমাজে বিদ্যমান ধর্মান্ধতা ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতায় ক্ষুব্ধ হন এবং উত্তর ভারতের এলাহাবাদ (বারানসিতে) এসে ভক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। কবীর ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের সমন্বয় করে এক নতুন মতবাদ সৃষ্টির প্রয়াস পান। সুফি এবং ভক্তিবাদী আন্দোলনের অনুসারী ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবর (১৯৫৬-১৬০৫)। তিনি বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মমত 'দিন-ই-ইলাহি' প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রপৌত্র দারাশিকোহ্ (মৃত্যু ১৬৫৯) ছিলেন সুফিমতবাদী এবং সমন্বয়বাদী। কবীর, আকবর ও দারাশিকোহের চিন্তার প্রণোদনাকারী ছিল ভারতের হাজার বছর লালিত লোকধর্মজাত লোকদর্শন।

লোকদর্শন সবসময় সর্বকালেই শান্তিপ্রিয় সহঅবস্থানের পক্ষপাতি। সুফি-দরবেশ-সাধকরা যে এ উপমহাদেশে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে ইসলাম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর একটি অন্যতম কারণ এই সমন্বয়বাদী সমাজচিন্তার আবহ ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় আরো বেশি পরিমাণ বিদ্যমান ছিল। অপর একটি কারণের উল্লেখ করা হয়তো যায়, এই সাধকরা ছিলেন নিষ্কলঙ্ক ও মধুর

চরিত্রের অধিকারী, তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছিলেন, এমনকি ইসলাম ধর্মকে সহজে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য অনেক সময় তাঁরা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানও গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। একেশ্বরবাদ ও সমান অধিকার ইসলামের এই বাণী জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করেছিল।[১৫]

ইতালির দান্তে বিশেষ করে পেত্রার্ক তাঁদের কাব্যভাষায় মানুষের স্বাধীনতা, মুক্তি ও মানবতার কথা বলেন। সেটি আধুনিক মানবতাবাদের একেবারে সূচনাকাল। বাংলার চণ্ডীদাস বাংলা ভাষায় এবং বিদ্যাপতি বাংলাঘেঁসা মৈথিলী ভাষায় মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে বাঙলায় দান্তে-পেত্রার্কের ভূমিকা পালন করেন।[১৬] চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রতিষ্ঠিত বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম মানবতাবাদের জয়গান ঘোষণা করে। চৈতন্যের বড় বিপ্লব হচ্ছে জাতিভেদপ্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা। বৌদ্ধ ধর্মের নানার শাখার উদ্ভব যদিও বাংলার সামাজিক ক্রান্তিকালে ঘটেছিল যেমন মহাযান আরো পরে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান তবু এর মধ্যেও বাংলার লোকদর্শনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে সারা বাংলায় সহজযানের প্রাধান্য। সিদ্ধ বা সিদ্ধাচাররা ছিলেন এর প্রধান ভূমিকায়। চর্যাপদে তাদের উপলব্ধি বিধৃত হয়ে আছে। সেখানে বৈদিকধর্ম উপহসিত।[১৭] বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পুরোহিততন্ত্র চার্বাকদের অবজ্ঞার স্বীকার হয়। এটাও বাংলার লোকদর্শনের একরূপ। কেননা বাংলার লোকদর্শন সবসময় উদারতন্ত্রী, কোনো মতাদর্শেরই কড়াকড়ি-বাড়াবাড়ি তার পছন্দ নয়।

বাঙালির ইতিহাস প্রায় তিন থেকে পাঁচ হাজার বছর পুরানো। এর মধ্যে অস্ট্রিক-ভোটচীনা, মঙ্গোল-নর্ডিক-শক-হূন-আরব-পাঠান-পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-ফরাসি-ইংরেজ জাতি এসেছে, এসেছে বহুমত, বহুপথ, শিল্পী-কারিগর-ইসলাম-জৈন-বৌদ্ধ-বেদ-উপনিষদ-বাইবেল-কোরআন; বাঙালি এসব কিছুকে তুল্যমূল্যে বিচার করে গ্রহণ করেছে, গ্রাস করেছে, বর্জন করেছে, আত্মস্ত করে স্বীয় জারক রসে জারিত করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্মকে মন্ত্রযান-কালচক্রযান-বজ্রযান-সহজযানে বিবর্তিত করে নিজের মতো করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম ধর্মকেও স্থানীয় ধর্মে রূপান্তর করেছে। দেবাদিদেব মহাদেব শিবকে করেছে যন্ত্রণাদগ্ধ হতদরিদ্র চাষা। হাজার বছর ধরে এখানে মানুষের জীবন অদৃশ্য প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব মুখর। জন্ম-মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বানভাসি-মহামারী ও দারিদ্র্যজর্জর জীবন অদৃশ্য সত্তার দিকে মুখ তুলে চায়, আশ্রয় চায়, মুক্তি চায়। একই সাথে বস্তুগত সমাজসত্তার বিকাশে তৎপর উদায়াস্ত শ্রমে অভ্যস্ত মানুষের জীবন বোধের সঙ্গী যেমন হয়েছে শিবের গান কিম্বা খনার বচন। তদুপরি রাজার শাসনবিরোধী কিম্বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পুতুল জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে ভূমি মানুষের দ্রোহের আগুনে উত্তপ্ত হয়েছে লোকবোধ। বিদ্রোহের ভাব ও ভাষায় নির্মিত হয়েছে এদেশের সর্বগণমানবিক লোকদর্শন।

মানুষ দার্শনিক জীব বটে। জনে-জনে যে জনবোধ তা একই সূতোয় গাঁথা এবং তা-ই দর্শন উৎসভূমি বাঙালির যা কিছু সম্পদ, বস্তুগত সম্পদের চেয়ে, বিশ্ব সভায় যা বাঙালিকে শীর্ষস্থান দিতে পারে তা বাঙালির লোকদর্শন। সে জন্ম দিয়েছে, চৈতন্যদেব, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত উদারপন্থী ধর্ম সাধকের। সে লালনের মত বিশ্ব লোকনায়কের জন্ম দিয়েছে। সে জন্ম দিয়েছে সর্বমানববাদী কবি, মানবপ্রেমী কবি রবীন্দ্রনাথকে, নজরুলকে, পাগলা কানাই, হাসন রাজাকে, শাহ আবদুল করিমকে। তার আগে শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্করকে। ক্ষুদিরাম-সূর্যসেন-প্রীতিলতা, চিত্তরঞ্জন-সুভাষ-মুজিব-অমর্ত্যকে।

বাংলাদেশের লোকদর্শনের ইতিহাসের মধ্যে আছে প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ দর্শন, এই দর্শন ধারার আছে বহুধারূপ যেমন বৌদ্ধ সহজিয়া, মহাযানী বৌদ্ধ দর্শন, হীনযানী বৌদ্ধ দর্শন, উল্লেখ্য এই সব বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও তার সঙ্গে বাংলার চিরায়ত যোগতান্ত্রিক-তান্ত্রিক চর্চা ও দেহ তত্ত্ববাদি দর্শনের যোগ রয়েছে।[১৮] প্রাচীন বাংলার দর্শনের মধ্যে রয়েছে নাথযোগীদের দর্শন, এই দর্শনও দেহাত্ববাদি, এরপর বাংলার লোকায়ত দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসলামি সুফি দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন ও সহজিয়া দর্শন। শেষোক্ত দর্শনের স্রোতধারা বাংলার ঐতিহ্য দর্শনের স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবতাবাদী উদারনৈতিক জীবন, মানুষ ও সমাজ দর্শন। পরবর্তীকালের বাংলার লোকায়ত দর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমন্বয়বাদী দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ফকির-সাধুদের দর্শন, যাকে বাউল দর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই দর্শনকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন কুষ্টিয়ার লালন। তিনি বাংলার সকল ধর্মমত, জাত-পাত ও দর্শনকে অস্বীকার করে নয়, বরং বাংলার চিরায়ত সকল ধরনের ধর্মমত-দর্শন, লোকচারের সঙ্গে সমন্বয়-সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত ইসলাম, বৌদ্ধ, সনাতন ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলো সুগ্রথিত করেছেন, যে কারণে লালনের দর্শন তার স্বকাল পেরিয়ে একালের মানুষের কাছেও নিরন্তর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে চলেছে।[১৯]

বিবিধ কর্ম ও কীর্তির মধ্যেই বাঙালির লোকদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলার লোকদর্শন বাঙালির কর্ম-কীর্তিতেই লভ্য। তার আগে আবারো বলি বাঙালি আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ। বেহেস্ত যাওয়া বা স্বর্গে যাবার লোভ তার একেবারেই নগণ্য। পুরোহিত-মোল্লারা কালে কালে প্ররোচনা-প্রণোদনা দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি থেকে সরে আসার জন্যই, কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি কখনো। আমরা বলতে চাই বাঙালি ধর্মবোধে শ্রদ্ধাশীল ঠিকই; কিন্তু সে ধর্মভীরু নয়।

বাংলার লোকদর্শনের সব থেকে উজ্জ্বল প্রমাণ বাউল মত। বাউল ধর্ম বাংলার খাস ধর্ম।[২০] বাংলার হাজার বছরের সমাজ সমীক্ষা, সমন্বিত চিন্তাদর্শের লোকায়ত দর্শন, এ দর্শন লোকজীবন থেকে উৎসারিত। বাউলরা মনে করে

দেহের গঠন ও তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কর্মযজ্ঞ সংগঠিত হয়। বাউলের দেহতাত্ত্বিক সাধনার মধ্যে মিথুনক্রিয়া ও যোগ সাধনার প্রভাব আছে। এ মতের প্রধান কথা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তিকে জাগ্রত করা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা আগেই বলেছি বাউল দর্শন একান্ত বাঙালির নিজস্ব দর্শন, লোকজীবন থেকে উৎসারিত বলে এ দর্শন সমন্বয়বাদী ও গভীরভাবে মানবতাবাদী। বাঙলার লোকগীতির অন্যতম ধারা বাউল গান। লালনের অন্যতম শিষ্য দুদ্দু শাহ তার এক গানে বাউল হবার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন—

তাইত বাউল হইনু ভাই
এখন বেদের ভেদবিভেদের
আর তো দাবিদাওয়া নাই।

অর্থাৎ বেদের যে মানুষে মানুষে বিভেদের নীতি বাউল তা অস্বীকার করে। বাউল জাতিভেদ বিরোধী এবং অখণ্ড মানবতাবাদে বিশ্বাসী। আর বাংলার এই বাউল মতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ লালন। বাউল গান লোকায়ত বাংলার অনন্য দলিল, এ গান বাংলার লোকসমাজের মানস-আকাঙ্ক্ষার ফসল। সহজ-আনন্দ লাভের মধ্যেই বাউলরা তাদের জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। গভীরভাবে সামাজিক আন্দোলনে নিজেদের জড়িত করেছে। তারা একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার চিন্তাও করেছে। এই কারণে লালনের জীবন দর্শন অনুসরণ করে তার চিন্তাগুলিকে কেতামাফিক দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করে নিতে পারলে বাউল দর্শনের আরো ব্যাপকতা, গভীরতা ও সামাজিক মাত্রা পাওয়া যেতে পারে।

দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী তিন দেবীর কর্মকাণ্ড, চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য-বাংলার লোকদর্শনের এক উজ্জ্বল দিক। তিন দেবীই সর্বমঙ্গলকামী। দেবী দুর্গার মধ্যে কল্পনা করা হয়েছে এমন এক শক্তি যার কাজ অন্যায়কে রুখে দেয়া। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই তার আবির্ভাবের মূলকথা। ত্রিলোকসন্ত্রাসী মহিষাসুর দুর্গার ত্রিশুলের আঘাতে অক্কা পেল। এ যেন দুনিয়া থেকে সমস্ত অশুভ শক্তির পতন হলো। এছাড়া লক্ষ্মী দেবী, সরস্বতী দেবী যথাক্রমে ধনের ও জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী হচ্ছে দুর্গার জ্ঞানশক্তি, বাগদেবী, হাতে পুস্তক ও বীণা, বাহন শ্বেতহংস, স্থিতি জলপদ্মে, শুভ্রবাসনা। হংসারূঢ়া কারণ হংস জল মেশানো দুধ থেকে শুধু দুধটুকু গ্রহণ করে জল ত্যাগ করতে পারে ঐ দেবী। এ হল হংসতত্ত্ব। লক্ষ হল পরমহংস হওয়া, দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস।[২১]

এই তিন দেবির কর্মজজ্ঞ ও চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য কল্পনার মধ্য দিয়ে বাঙালি অন্যায়-অবিচার-সন্ত্রাস থেকে মুক্তির যেমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে তেমনি লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা দিয়ে ধনের-মানের বাসনা এবং সরস্বতীর মধ্য দিয়ে বিদ্যা ও অহিংসার কামনা-বাসনা ব্যক্ত করেছে। দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজার সার্বজনীন উৎসব-মহাউৎসব পালনের মধ্য দিয়ে বাঙালির লোকদর্শন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দুষ্টের, অন্যায়কারীর, হিংসুকের ধ্বংস ও সত্যের উত্থান লোকদর্শনের মূল কথা। মহাভারতের দুর্যধনাদি অন্যায়কারী তাই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে দুর্যধনের পরাজয়ের এই চিত্র আমরা দেখতে পাই। বাঙালির কাছে কৃষ্ণতত্ত্ব সার্বজনীন উপলব্ধিতে আভিব্যক্ত হতে দেখি, কৃষ্ণ অর্জনকে যুদ্ধের জন্য প্রণোদনা-প্ররোচনা দিয়েছে সে জন্য কৃষ্ণের প্রতি কোনো প্রকার বিরাগবোধ নেই। বাঙালি অন্যায় নীতিবর্জিতদের ধ্বংসই দেখতে চায়। তাই কৃষ্ণ পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, ধর্মাত্মা, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল এক অনির্বচনীয় শক্তির পরিচায়ক। রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব অর্থাৎ রাধা সকল জীবের আধার এবং কৃষ্ণ হচ্ছে পরম, জীবাত্মা-পরামাত্মা এই দ্বৈতবাদ বাঙালি পরম আদরে গ্রহণ করে। চৈতন্যদেব কায়মনে রাধা হবার এবং কৃষ্ণের সান্নিধ্য পাবার সাধনা করেছেন। এখানেও বাঙালির লোকদর্শনে অহিংসার চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাঙালি বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে তার মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে। রক্তের বিনিময়ে সে প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী। এ উপলক্ষে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির একমাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করে—বইপ্রেমী বাঙালির কাছে এ মেলা বাঙালির জাতীয় উৎসবের মেলায় পরিণত হয়েছে। বাঙালি সাধারণভাবেই অসাম্প্রদায়িক। বাঙালি জাতিসত্তাকে সে সত্যিকারেই ভালোবাসে, তাই সে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল, ছিনিয়ে এনেছিল তার প্রাণের স্বাধীনতাকে যা সে হাজার বছর ধরে পোষণ করতো। সে ১লা বৈশাখ পালন করে বেশ ধুমধামের সাথে। সব বাঙালিই এবং বাংলায় বসবাসরত অন্যান্যরাও এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরি বাঙালির এক অনন্য সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। সে ঐতিহ্যবাদী, তার বহু ঐতিহ্যকে সে আজ নতুন করে শনাক্ত করছে। বাঙালি মুসলমান এক সৌভ্রাতৃত্ব পরিবেশে রোজার ঈদ ও কোরবানির ঈদ পালন করে। সে দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজাও অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে পালন করে।

বাংলা ভাষাকে সে প্রাণের মতো ভালোবাসে। আবার বিদেশে যাওয়া, বিদেশের জ্ঞান আহরণ করা, বিদেশে বাণিজ্য করা, চাকরি করার জন্য সে ইংরেজি ভাষা শিখতেও আগ্রহী। বাঙালি আজ রীতিমত আধুনিক, বিজ্ঞানপন্থি, কুসংস্কারমুক্ত মন্ত্র-তন্ত্র, ভোজবাজি, জাদু-টোনা এসব কিছুকে সে বিজ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়াসি। আধুনিক যুগ কম্পিউটারের যুগ। এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সে চলতে শুরু করেছে। বাঙালি প্রকৌশলী ১০৪ তলা দালানের নক্শা প্রণেতা। বাঙালি ক্ষুদ্র ঋণের মডেল প্রণেতা, বিদেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য এবং আমাদের সেনা সদস্যরা অত্যন্ত সুনামের সাথে সেটা পালন করছে। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির পরও বাঙালি এগিয়ে চলছে সামনের কাতারের দিকে।

আমরা বাংলার লোকদর্শন প্রপঞ্চটিকে বুঝাবার এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের লোকউপাদান খোঁজার জন্য প্রধানত দু'টি পরিচ্ছেদে

বাঙালির কর্ম-কীর্তি-অর্জনকে বিভাজন করে মূল আলোচনার সূচনা করতে চাই। পরিচ্ছেদ দু'টি হচ্ছে; ১. ভাষিক ও ২. রাজনৈতিক-সামাজিক।

১. ভাষিক

ভাষা কোনো জনগোষ্ঠীর বা জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের ও আত্মবিকাশের অন্যতম হাতিয়ার। যদিও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বা আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সমস্ত জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা এক নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোরও পৃথক পৃথক ভাষা রয়েছে, তথাপি লোকদর্শনের চর্চা-বিকাশ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই ঘটেছে। সুতরাং বাংলা ভাষার মধ্যেই আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। বস্তুত বিগত হাজার তিনেক বছর ধরে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষ তার জীবনধারাকে ইতিহাসের পাতায় স্বখ্যাত বৈশিষ্ট্যে দীপ্য করে অগ্রসর হয়েছে—ভাষা হচ্ছে তার প্রধান বাহন।

বাংলা ভাষা তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে এক অনন্য ইতিহাসের স্রষ্টা। মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য বাঙালিকে রক্ত দিতে হয়েছে যার নজির ইতিহাসে বিরল। প্রায় দুই হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাসে উনিশ শ' বায়ান্ন খ্রিষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে স্বার্থান্বেষীদের দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলার মানুষের প্রতি সামন্তবাদী ও উপনিবেশবাদী শাসন-শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন যেমন চলেছে, তেমনি চলেছে তার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিও। তবুও আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে সে এগিয়ে চলেছে আজন্মকাল। কখনো কখনো বাঙালির দরিদ্রতা ও পরাধীনতার সুযোগে সামন্ত শাসক, উপনিবেশবাদী তার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর চরম আঘাত হেনেছে—সব কালেই দেখা গেছে বাঙালি ধৈর্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করেছে। ভাষা সংগ্রামের লড়াইয়ে সফলতার মধ্য দিয়েই বাঙালির দেশপ্রেম, মাতৃভক্তি ও স্বকীয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বলতে গেলে সংকট মুহূর্তে ভাষাই বাঙালির প্রেরণাধাত্রী।

বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগের প্রারম্ভকাল থেকেই বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ইসলামের পিরবাদের উত্থান ঘটে এবং আর্থসামাজিক নানা কারণে তা ব্যাপকভাবে সমাজের আনুকূল্য লাভ করে। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা চলে ভারতবর্ষে বিকাশমান চতুর্বর্ণ প্রথার প্রভাবে মানুষের প্রতি মানুষের অমর্যাদা-অসম্মান, বাংলার ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতা, বৌদ্ধ উর্বর সমাজমন, নাথধর্মের প্রভাব, ইসলামের মরমি চেতনায় গর্ভজাত উদারনৈতিক মানবতাবাদী

সুফি দর্শনের সংযোগ সাধন ও বাঙালি সংস্কৃতি হাজার বছরের লালিত সমন্বয়বাদী জীবনদর্শন।

বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফিবাদের মরমি ভাবধারায় তাড়িত হয়ে কতিপয় মুসলিম কবি সমন্বিত সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে সাহিত্য সৃষ্টির অনন্য ধারার সূচনা করেন। চৌদ্দ শতকের শুরু থেকে আঠারো শতকের শেষ অবধি এ সাহিত্য ধারার সময়কাল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বেশ ক'জন মুসলিম কবি বাংলা ভাষায় সুফিবাদ ও যোগতন্ত্রের সমন্বিত রূপে ধর্মীয় ও উপাখ্যানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। প্রভাবশালী কবি শাহ মুহম্মদ সগীর এ ভাবধারারই রূপ দান করেন। তিনি তার ইউসুফ জুলেখা (১৩৮৯-১৪০৯) নামক গ্রন্থে বলেন যে, ধর্মীয় বিষয় বাংলায় লিখলে অপরাধ হয় এরকম চিন্তা করার কোনো ভিত্তি নেই। তিনি বরং বাংলায় ধর্মীয় বিষয়ে লেখা পুণ্যের কাজ বলে দাবি করেন।

নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণকারী কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি। স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি কবির প্রেম ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। সে যুগে মাতৃভাষার প্রতি এমন গভীর ভালোবাসার নিদর্শন ইতিহাসের এক বিরল দৃষ্টান্ত এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্বাজাত্যবোধের কালজয়ী ঐতিহ্যিক আদর্শ। তাঁর *নূরনামা* কাব্যের কয়েকটি পংক্তিতে বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর প্রেম, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রতিফলন ঘটেছে;

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ দেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

বাংলা ভাষাকে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ভাষাপ্রেমিকরা যে সক্রিয় ছিল, কবির এ বক্তব্য তারই প্রমাণ। কবি তার এ কাব্যবাণীতে তাঁর গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন।

আমরা বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক নিধু বাবুর রচিত এবং পরিবেশিত দু'টি পংক্তি পাঠেও উদীপ্ত হই। 'নানান দেশের নানান ভাষা। বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' দেশাত্মবোধক এ গানটি তাঁকে অমর করে রেখেছে। নিধু বাবুর এ কাব্যবাণী বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক উক্তি রূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। তেমনি লোককবি লালন শাহ লেখেন : 'শিখবি যদি আরবি বুলি, বাংলা খান নেওগা পাস করি'। তিনি মাতৃভাষাকে আগে শেখার এবং জানবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর এই সরলিকৃত ও ওজস্বীপূর্ণ কাব্যবাণী বাংলা ভাষার সপক্ষে অবিস্মরণীয়। বাউল আলেপ মাতৃভাষা অবহেলা করে যারা আরবি ভাষা শিখেছে তাদের বলেছেন 'দিনকানা'।

এসব কথায় স্পষ্টতই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে একটি বিরুদ্ধবাদী মনোভাব, একটি অবজ্ঞার সুর এবং মাতৃভাষা প্রেমিকের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সর্বদাই ক্রিয়াশীল তা বোঝা যায়। বিশ্ব দরবারে আজ বাংলা ভাষা প্রমাণ করেছে যে এই দ্বান্দ্বিকতায় মাটি ও মানুষের ভাষা, আমজনতার ভাষা, লোকসমাজের ভাষা বাংলা ভাষা সকল বিরুদ্ধবাদীকে পেছনে ফেলে তার বিজয় ঘোষণা করেছে। এই প্রতিবাদ প্রতিরোধেরই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটি দিন উনিশ 'শ বাহান্ন খ্রিষ্টাব্দের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। কি ঘটেছিল এই দিনে?

দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমের কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ নিয়ে ১৯৪৭-এর আগস্টে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পূর্ব বাংলা থেকে আমাদের প্রিয় সন্তান ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন (১১ শ্রাবণ ১৩৫৪)।

এভাবে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দু ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই যুগপৎ চলতে থাকে। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় এসে ২১ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এক সভায় ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু (Urdu only, and Urdu shall be the state Language of Pakistan)। শাসকগোষ্ঠীর এই দূরভিসন্ধির কথা বিদ্যুৎগতিতে পৌঁছে যায় বাংলার গ্রাম-গঞ্জ-মাঠ-ঘাট-বাজার, শহর-বন্দর, স্কুল-কলেজে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে প্রতিঘাতের প্রস্তুতি। বাংলাকে রাষ্টভাষার মর্যাদাদানে দৃঢ়-প্রত্যয়ী ছাত্রসমাজ কর্তৃক ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের আমতলা চত্বর থেকে প্রতি দলে দশজন করে রাস্তায় নেমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্রসমাজের এই সিদ্ধান্ত ছিল মাতৃভাষা রক্ষার ইতিহসে এক সাহসী পদক্ষেপ। ছাত্র-জনতার এ যৌথ মিছিলে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর রাইফেল গর্জে উঠে—এতে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বারসহ অনেকে নিহত হন। এ হত্যাযজ্ঞ ও দমননীতির ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যা। ফলে গড়ে উঠে দুর্বার গণ-আন্দোলন।

এই ভাষা আন্দোলন দেশের কবিসমাজকে করেছে প্রাণিত—আলোড়িত। কবিরা অসংখ্য কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনকে করেছেন বেগবান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-তেই আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচনা করেন 'আমার

ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফ্রেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি। আবেগ মথিত এ গানটি পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রাণস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের প্রভাবসিক্ত কবি শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' নামক বিখ্যাত কবিতা :

'তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে কী থাকে আমার?
উনিশ শো বাহান্নোর রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।'

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন ভাষাপ্রেমিক বাঙালির ভাবাবেগ তাড়িত কবিতা :

'মাগো ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে শুনতে দেবে না।
বলো মা তাই কি হয়?'

বাঙালির অধিকার আদায়ে প্রথম সফল সংগ্রাম হিসেবে স্বাধিকারসহ পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই একুশের চেতনা, ভাষার জন্য রক্তদান, বাঙালি জনমনে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। একুশের রক্তদানে-সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রণোদনাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়; এ চেতনারই পরিপূরক ফসল ১৯৬৬ সালের ছয়-দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে জয়লাভ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি কোন দিন, ক্ষণ বা তিথি নয়। একটি জাতির জীবন্ত ইতিহাস, এ ইতিহাস অগ্নিগর্ভ। যেন সজীব লাভা স্রাবক আগ্নেয়গিরি, কখনও অন্ত র্দাহে গর্জন করছে, আর কখনও চারিদিকে অগ্নি ছড়াচ্ছে। সত্যি এ ইতিহাস মৃত নয়, একেবারে জীবন্ত। বাঙালির জাতীয় চেতনার ইতিহাস এখানে এসে গাঢ়তর রূপ নেয়। জাতি ভাবতে শেখে তার জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রীয় সত্তার কথা।' এই একুশে ফ্রেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হওয়ায় বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি পেয়েছে বিশ্বজনীন মর্যাদা।

আমরা আগেই বলেছি একটি জাতির স্বাজাত্যবোধ এবং স্বকীয়তার প্রথম এবং প্রধানতম সত্তা ভাষা। আর ভাষা হচ্ছে বহতা নদীর মতো—নদী যেমন দুই পারের মাঠ উর্বর করে, পলি দিয়ে—ভাষাও তেমনি চারিদিক থেকে শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করে তার সমৃদ্ধির জন্য—তার পরিপুষ্টির জন্য। প্রাগ-ইতিহাসকাল থেকে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী এলাকা। এই কারণে নানান জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাগ্যান্বেষণে এসেছে সেই প্রাগ-ইতিহাসকাল থেকেই। এসেছে শক, হূন, আরব-তুর্কি, এসেছে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ—ফরাসি, এসেছে ইংরেজ। সবার কাছ থেকে গ্রহণ-বর্জন করে বাংলা ভাষা আজ সমৃদ্ধির শিখরে। বাংলা ভাষার লিখন

রূপ *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব সাহিত্য, কবি আবদুল হাকিম, সৈয়দ সুলতান, আলাওল প্রমুখের রচনাবলি এবং মধ্যযুগের বিপুল-বিশাল পুথি সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা, বাউল সাহিত্য, কৃতিবাসী *রামায়ণ*, কবীন্দ্র ও কাশিরামের *মহাভারত* ইত্যাদি বাংলা ভাষার গতিময়তার অনন্য স্বাক্ষর। এছাড়া আমাদের রয়েছে লোকনাট্য ও লোকগীতির বিপুল ভাণ্ডার। আধুনিককালে বিদ্যাসাগর-মধুসূদন, বঙ্কিম-মশাররফ-শরৎ, রবীন্দ্রনাথ-প্রথম চৌধুরী-নজরুল বাংলা ভাষাকে দিয়েছে অনন্ত সমৃদ্ধি এবং খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার দ্বার। বাংলার লোকদর্শনই তার মাতৃভাষা রক্ষা ও স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেয়ার প্রণোদনা দিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে।

২. রাজনৈতিক-সামাজিক

রাজনৈতিক প্রত্যয়টি আধুনিক কালের। আর এই রাজনৈতিক প্রপঞ্চের সঙ্গে কূটনৈতিক অভিধাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু বাঙালির লোকদর্শনে কূটনৈতিক অভিধাটি কম গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির লোকদর্শনের উজ্জ্বল দিকগুলোর প্রস্ফুটন ঘটেছে কতকগুলো সামাজিক আন্দোলন-বিদ্রোহ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা কতিপয় আন্দোলন-বিদ্রোহ ও উনিশ'শ একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিও আলোচনায় নিতে চাই।

বাঙালি তার আত্মরক্ষা, মুক্তি, স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশে দৃঢ়তার সঙ্গে কতকগুলো আন্দোলন-বিদ্রোহ সংঘটিত করেছে এবং উনিশ'শ একাত্তর সালে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত করেছে। এসব আন্দোলন-বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছে তার লোকদর্শন, তার লোকধর্ম, তার লোকসমাজ, তার লোকচরিত্রসিক্ত দৃঢ়তা, সংবেদনশীলতা, জনমানস-গণমানসাকাঙ্ক্ষা। এসব আন্দোলন-বিদ্রোহ-মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রমাণ করে যে বাঙালি বাঁচতে চায়, সুন্দরভাবেই বাঁচতে চায় এবং সে একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে সে বীরের জাতি বটে। সে অস্ট্রিক-ভেডডিড-মঙ্গোল-শক-হূন-মুঘল-পাঠান রক্ত বাহিত, সে কেবল সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রের সাধকই নয়; সে বীরেরও সাধক, তার লোকনায়ক কেবলই লোকনায়ক নয় রাষ্ট্রনায়কও বটে। তার সাধককুলের হাজার বছরের সাধনা ফলপ্রসূ হয় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় উন্মুক্ত ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এই আহবানের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত কারিশমা গুণে একই সঙ্গে হন লোকনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন লোকধর্মসিক্ত, অনন্য নেতা। বাংলার লোকদর্শন তাঁকে দিয়েছে প্রণোদনা। ম্যাক্সিম গোর্কি ১৯৩৫ সালে এক সাহিত্য সম্মেলনে লোকনায়ক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পৃথিবীর খ্যাতিমান সব কবি-সাহিত্যিক রাষ্ট্রনায়করাই ছিলেন লোকচরিত্রসিক্ত। লোকচরিত্র অভিধাটি লোকদর্শনজাত, লোকধর্মজাত। লোকধর্মে

থাকে স্বচ্ছ মানবতাবোধ। মানুষের প্রতি প্রেম-মৈত্রী-ভালোবাসা লোকধর্মের মর্মগুণ। লোকধর্মে স্বার্থপরতা বা হিংসা-দ্বেষের কোনো স্থান নেই। তিনি আরো বলেন; লোকসাহিত্যে হারকিউলিস, প্রমিথিউসের মতো লোকনায়ক কেন আগের মতো সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কিঞ্চিৎ দ্বিমত পোষণ করে বলি, সৃষ্টি হয় এবং হয়েছে। আজ থেকে পাঁচশ বছর হাজার বছর বা তারো পরে লেনিন, মাওসেতুং, মুজিব এঁরাই জনগণের কাছে প্রতিভাত হবেন হারকিউলিস, প্রমিথিউসের মতো লোকনায়কে। হারকিউলিস, প্রমিথিউস যেমন অত্যাচারিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত অসহায় মানুষের পাশে স্ব-উদ্যোগে জীবনকে বাজি রেখে এসে দাঁড়াতো তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে, লেনিন-মাও-মুজিবও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পাশে জীবনকে বাজি রেখে মুক্তির ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমরা বাংলার প্রধান কতিপয় আন্দোলন-বিদ্রোহের শিরোনাম এখানে উল্লেখ করছি এবং তার দু'চারটি বিশ্লেষণ করছি। ১৭৬৩ সালে সন্ন্যাসী বেশে ইংরেজদের ঢাকার কুঠি আক্রমণ, ১৯৬৭-৮৩ মেদেনীপুরের খড়ুই-খয়রা-চোঁয়াড় বিদ্রোহ, ১৯৬৭-৬৮ ত্রিপুরায় শমসের গাজির বিদ্রোহ, ১৭৬৯-১৮৭০ অন্তত চারবার সন্দ্বীপ বিদ্রোহ, ১৭৭৬-৮৬ পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ, ১৭৭৮-১৮৬১ নীলবিদ্রোহ, ১৭৭০-১৮০৪ রেশম চাষীদের বিদ্রোহ, ১৭৮০-৯৩ আফিম চাষীদের আন্দোলন, ১৭৮৩ রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬০) এর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন, পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ১৭৯২-৯৩ বাখরগঞ্জে সুবান্দিয়া বিদ্রোহ, ১৭৯৮-৯৯ দ্বিতীয়বার চোঁয়াড় বিদ্রোহ, ১৮০২-১৮৩৩ ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-শেরপুরের পাগলপন্থী ও সশস্ত্র গারো বিদ্রোহ, ১৮০৬-১৬ মেদেনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ, ১৮১২ ময়মনসিংহে কৃষক বিদ্রোহ ও হাতিখেদা বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৬১ সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৩ সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৯০ হাজং বিদ্রোহ, ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।

চরিত্রগত দিক থেকে এসব বিদ্রোহ ছিল গণবিদ্রোহ পর্যায়ের। অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে গণমানুষের মানসাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এসব বিদ্রোহ। এভাবে বাঙালির লোকদর্শনজাত প্রতিরোধ-প্রতিবাদ বারবার রুখে দিয়েছে স্বার্থান্বেষীদের সকল ষড়যন্ত্র। আজও তার রেশ রয়েছে। বলেছি যে সে বীর বটে। এই বীরত্ব রয়েছে তার রক্তে-মাংসে-মজ্জায়-শিরায় শিরায়। তাই তাকে অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে পার পেয়ে যাবে তা সম্ভব নয়।

ময়মনসিংহের গারো পাহাড় অঞ্চলে করম শাহ ফকির (মৃত্যু : ১৮১৩ খ্রি.) যে আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন তার মর্মমূলে ছিল শোষণ-বঞ্চনা ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির আন্দোলন। করম শাহ ও তাঁর শিষ্য টিপু পাগলার প্রবর্তিত ধর্মমতে

বলা হয়, 'সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি, কেহ কাহারো অধীন নহে, সুতরাং কেউ উচ্চ, কেউ নীচু এরূপ ভেদ করা সঙ্গত নহে।' ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও জমিদার গোষ্ঠীর অসহনীয় শোষণ-নিপীড়নের ফলেই গারোগণ স্বধর্ম ত্যাগ করে 'সকল মানুষ সমান' এই মানবধর্ম গ্রহণ করে।[২২] সেই চৌদ্দ শতকে বাংলার কবি চণ্ডীদাস গেয়েছিলেন, 'শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' অজ্ঞাত লোককবি গেয়েছেন, 'নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

১৭৬৩ সালের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৮৫৫-৫৭ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৭৭৮-১৮৬১ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালে জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে সমন্বিত জাতীয় চেতনায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়ে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ শাসনের পতন হোক এই ছিল জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা। আমরা অনেক লোকগীতিতে দেখি বিদ্রোহী নেতাদের প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত সচেতন উচ্চারণ :

১. হিন্দুর অখাদ্য খাদ্য গোমাংস মুসলমানের হারাম শুকুরের মাংস,
দুয়ে মিলে টোটা বানায় সাদা চামড়ায় গুলি চালায়
২. ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈ, তুঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে,
বীরদর্পে অস্ত্র চালায় ইংরেজ মাঝারে।
৩. গাছগুলো কেটে ফেল ঝাঁসীর রাণী আদেশ দিলেন।
যাতে ফিরিঙ্গীরা আমাদের সৈন্যদের ফাঁসি দিতে না পারে।[২৩]

বাংলার নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয় দীর্ঘকালব্যাপী। নীলকরদের জুলুমের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে দরিদ্র চাষীদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ১৮৫৮ সালের দিকে নীলচাষীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত অত্যাচার সত্ত্বেও আর কখনো নীল চাষ না করার মরণপণ আন্দোলন শুরু করে। এ অত্যাচারের সকরুণ কাহিনী অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ সালে নীলদর্পণ নাটক রচনা করেন। কৃষকের এই করুণ দুর্দশা নিয়ে লেখা হয় লোকগীতি, ছড়া, প্রবাদ। ঈশ্বরগুপ্ত লেখেন :

না বুনিলে নীল, মেরে কিল/'কিল' করে নীল করে
দেশের ছোটকর্ত্তা দিলেন তাদের/হর্ত্তাকর্ত্তা করে।...

বাঙালি বুদ্ধিজীবী হরিশচন্দ্র মুখার্জি এবং পাদরি লং মানবতাবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে নীল চাষীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে গ্রামীণ কবিয়ালের কণ্ঠে ভেসে উঠে :

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা/করল এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মলো/লং এর হল কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার।[২৪]

ইংরেজ কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার যে জনগোষ্ঠী এক আপোসহীন সংগ্রামের নজির স্থাপন করেছিল তাঁরা হলো সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। এঁরা যেভাবে

সংগঠিত ও একত্রিত হয়েছিল তার পেছনে কারণ ছিল তাঁরা এক বিশুদ্ধ নৃগোষ্ঠীর মানুষ। তাঁদের কাছে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে গোষ্ঠী স্বার্থই ছিল বড় কথা। ট্রাইবাল সমাজমনস্কতা বা সাম্যবাদের চেতনা তাঁদের মধ্যে ছিল সুপ্ত। তাই তাদের পক্ষে আমরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা যুদ্ধ করেছিল কামান-বন্দুকের গোলার বিরুদ্ধে হাতে তৈরি তীর ধনুক নিয়ে। এ ঐতিহাসিক বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চার ভাই সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সিধু ও কানু। তাঁরা আমাদের ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল নায়ক। আমাদের লোকগীতিতে তাঁরা অমর হয়ে আছেন। যেমন :

ও সিধো সিধো ভাই তোর কিসের রক্ত ঝরে
কি কথা রইল গাঁথা ও কানহু তোর ছল ছল স্বরে
দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রক্তে রাঙা বেশ
জান না কি দস্যু বণিক লুঠলো সোনার দেশ।
(ভাষান্তর : রামশংকর)।[২৫]

এরকম অসংখ্য আন্দোলন-বিদ্রোহ-সংগ্রাম সংঘটিত করে বাংলার গ্রামীণ খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশাজীবী দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ। দেশপ্রেম তাদের প্রেরণা। এই প্রেরণা-প্রণোদনা তাদের দিয়েছে লোকমানস থেকে উত্থিত লোকদর্শন। আমরা এ অনুচ্ছেদের শেষ টানতে চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক কালজয়ী ভাষণে নিহিত লোকউপাদনের বিশ্লেষণ দিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : লোকউপাদান অনুসন্ধান

৭ মার্চ ১৯৭১ সাল। তিন থেকে পাঁচ হাজার বছরে গড়ে ওঠা একটি জাতি, যার রয়েছে সুসংগঠিত ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভূগোল। ঢাকার খোলা একটি মাঠ, যে মাঠ তখন পরিণত হয়েছে বিশাল জনসমুদ্রে। নেতা আসবেন। নেতা লোকনায়ক—লোকধর্মসিক্ত—লোকদর্শনসিক্ত যাঁর মানস, ভয়—ভীতিহীন যাঁর হৃদয়—এই বাংলার সবাই তার কাছে আপন, তিনি আসবেন এবং তাদের প্রাণের কথা, মনের কথা, বাঁচার কথা, মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা, পতাকার কথা, বলবেন। গভীর আগ্রহভরে সেই লোকসমুদ্র কলবল করছে, তাদের সবারই মনের দৃষ্টি সেই ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর বাড়িটির প্রতি।

কবি নির্মলেন্দু গুণের *স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো*, শীর্ষক কবিতার ক'টি পঙ্‌ক্তিতে এ অনুভূতি বিম্বিত হয়েছে :

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে কবি'।

নেতা আসবেন, নেতা স্বরচিত কবিতা পাঠ করবেন, তাই বলে সে কবিতা গীতিকবিতা হলে চলবে না, স্বরচিত কবিতা বটে, কিন্তু গীতিকবিতা নয়; গীতিকবিতা তো অনেক লেখা হয়েছে, গীতিকবিতা শোনার সময় এখন নয়। সেখানে সমবেত লোকসমুদ্রের মানসাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকা চাই; তাই সেটাকে হতে হবে লোকগীতি। লোকগীতির গুণ বা ধর্ম কী?

আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক ধ্বনি, স্বতঃস্ফূর্ততা, লৌকিক ধ্বনিগত রূপ, জীবনসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি, জীবনদর্শন; লোকগীতিতে থাকবে ঐ লোকসমাজের মানুষের দুঃখ-কষ্ট-ঘাম ও রক্ত ঝরার ইতিহাস, জীবনযন্ত্রণা ও জীবনবাদের প্রতিচ্ছবি। জীবন কেবল আহল্লাদিত নয়, নয় কোনো সোনার হরিণ, নয় রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যা, জীবন কেবল হাসি-তামাশা আর আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়, জীবনের প্রায়োগিকতা, না পাওয়ার আকুতি লোকগীতির মর্মকথা, লোকগীতির অন্তর্দর্শন।

লোকগীতি প্রণেতার নির্লিপ্ততা, নিস্পৃহতা ও নির্মোহতা লোকগীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থ-কাম-যশ প্রাপ্তি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। লোভী মানুষের এ তিনটিই চাই। লোকগীতি প্রণেতা এর কোনোটিই চায় না—সে সংবেদনশীল, সে সমাজের প্রতি, সমাজের মননের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে জীবনসংগ্রামের চিত্র নির্মাণ করে। সে সমাজমনকে জানে এবং বোঝে, গভীর দরদ এবং কাব্যিকতা দিয়ে তা সে প্রকাশ করে। সে নির্মোহ-নির্বিবাদী, সে সমাজের কথা বলে, সে যূথবদ্ধ মানুষের কথা বলে। সে মানুষের জীবনযুদ্ধের কথা বলে। তবে সে কিছুই চায় না কেন?

চায় না তার কারণ সে নিজে স্বয়ং একজন ভুক্তভোগী, সে তাদেরই একজন। লোককবি নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না; এটাই তার নির্মোহতার কারণ। সমাজমানসে থাকে সমাজমনের ইতিবাচক দিক, থাকে মঙ্গলচিন্তা, মঙ্গলচিন্তা যা সবারই আকাঙ্ক্ষা, সবারই বাসনা, যা সবাই মনে মনে পোষণ করছে—উদ্‌গা একজন, সে ব্যক্ত করবে, গ্রহণ করবে সবাই, কেননা এ বক্তব্য তো তাদের হৃদস্পন্দনে প্রবাহিত। কেবল বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কে আবার, নেতা !

সেই নেতা আসবেন, স্বরচিত লোকগীতি পাঠ করবেন—প্রতীক্ষারত লোকসমুদ্র। নেতা আসলেন, স্বরচিত লোকগীতি পাঠ করলেন :

১. আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাইনা। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
২. আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

৩. আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
৪. আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
৫. আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।
৬. ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না।
৭. এই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই।
৮. দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নে-পত্র নেবার পারে।
৯. তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব—এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
১০. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৬]

বাঙালি জাতির ত্রাতা হিসেবে, অবিসংবাদী জননেতা হিসেবে বিশ শতকে বাংলার ইতিহাসে এই ভাষণটি বিরল ঘটনায় পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধু জানতেন মাঠে সমবেত-উৎকণ্ঠিত জনতার মানসাকাঙ্ক্ষা।[২৭] লোক আর লোকনায়কের মানসিকতার সংশ্লেষের প্রতিফলন ৭ মার্চের ভাষণ। '৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্ব এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।'[২৮] বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবদুল খালেক লিখেছেন, '... দার্শনিক যাঁরা, তাঁরা এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে আবিষ্কার করেছেন এক জন প্রখ্যাত দার্শনিক হিসাবে, সমাজবিজ্ঞানী যাঁরা তাঁরা এই ভাষণে ব্যাখ্যা করে বলতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী। কবি সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।'[২৯]

এটা লোকগীতি বটে ! কেবল ৭ কোটি কিংবা পনেরো কোটি বাঙালির নয়—এ লোকগীতির ধারক-বাহক কেবল নির্যাতিত-নিপীড়িত সংগ্রামী বাঙালি নয়, এ লোকগীতি সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের, স্বাধীনতাকামী মানুষের। আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক সুর, আঞ্চলিক শব্দের ধ্বনিগত রূপ, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং উচ্চারণশৈলীর গুণে এ ভাষণ বাংলার লোকদর্শন—মুক্তিকামী সমগ্র বিশ্বের লোকদর্শন। এ প্রসঙ্গে জনৈক বিশ্লেষক লিখেছেন :

বাংলাদেশের মানুষের একটা স্বকীয় সত্তা ও নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। লৌকিক ভাষা-ভঙ্গি ও বাক্‌প্রতিমায় তাঁর চমৎকার ও লাগসই প্রকাশ ঘটে। এই বিশিষ্ট সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক দার্ঢ্য, বিদ্রোহের মানসিকতা এবং কোনো অবস্থাতেই মাথা নত না করা। বাংলার পৌরাণিক চরিত্র চাঁদ সওদাগর, সাহিত্যের চরিত্র হানিফ গাজী ও তোরাপ, কাব্যস্রষ্টা কবি নজরুল এবং মানবিক ও রাজনৈতিক চরিত্র শেখ মুজিবে আমরা এই বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় পাই। বাঙালি চরিত্রের এই বিশিষ্ট রূপের স্পর্শ পেয়ে ৭ মার্চের ভাষণে যুক্ত হয়েছে অনন্য বৈভব। বঙ্গবন্ধু তাঁর আপোসহীনতা ও চারিত্রিক দার্ঢ্যের পরিচয় মুদ্রিত করেছেন লৌকিক ভাবভঙ্গির বিশিষ্ট বুলির সংযোজন। প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত এইসব মণিমুক্তাসদৃশ কিছু শব্দ বাঙালির ব্যবহারিক জীবন থেকে নেয়া। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর শিকড়সম্পৃক্ত বুলিসমৃদ্ধ এরকম একটি লাইন হল : 'সাড়ে ৭কোটি মানুষেরে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।[৩০]

আমরা বলি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অবিনশ্বর এবং অবিস্মরণীয়। এ ভাষণ পূর্বাহ্নে লেখা নয় বা কারো লেখা সম্পাদনা করা নয়। তা স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি চেতনায় প্রস্ফুটিত হয়ে হৃদয় থেকে উৎসারিত। কিন্তু তা সুসম্বন্ধ, নিখুঁত ঠাস্‌বুননি।[৩১] প্রতিটি কথা স্পষ্ট ধ্বনিসুষমায় যেন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীগানের দ্রুতলয়ের মেজাজ, যেন এক কণ্ঠে শত লোকবাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, যেন অর্কেস্ট্রার বাদনধ্বনি, স্বাজাত্যবোধের, ইতিহাসের, স্বাধীনতার-মুক্তির, শোষণ-মুক্তির এক একটি বাণী শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণে সেদিন স্পন্দন তুলেছিল। এই ভাষণ ছিল বাঙালির হাজার বছর লালিত অন্তরের অন্তস্থলে লেখা মুক্তির দলিল। সে দলিল ধ্বনিত হলো ৭ মার্চ ১৯৭১-এ। শুরুটা এরকম :

ভাইয়েরা আমার। আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।...
কিছু পরে :
আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।...
আরো পরে :
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।...
নেতার এই নির্দেশ। পরক্ষণেই :
'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি'

হুকুম কিন্তু তিনি দিলেন—এই কৌশলী বাক্য প্রয়োগ তাঁকে ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা-রাজনীতি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত হয়নি, হয়েছে গণমানুষের জন্য। তার বড় প্রমাণ তাঁর সম্বোধন রীতি। ভাষণের শুরুতেই তিনি সম্বোধন করতেন—"ভায়েরা আমার" বলে। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় যেমন ভাষণ দিতেন তেমন আলাপচারিতা করতেন। তিনি

বাংলার মানুষকে অপরিমেয় ভালোবাসতেন। মানুষকে ভালোবাসাই হলো লোকদর্শনের অন্যতম ভিত্তি। সেজন্য যখন একজন সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনার দোষ কোথায়?" তখন বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার সবচেয়ে বড় ও একমাত্র দোষ হলো আমি আমার জনগণকে বেশি ভালোবাসি"। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জনগণের রায় শোনার জন্য প্রশ্ন করলেন—"আমার উপর বিশ্বাস আছে?" জনগণ তখন বাঁশের লাঠি সমেত হাত শূন্যে তুলে কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে ইতিবাচক সাড়া দেয়। জনগণের রায় পেয়ে নেতা সিদ্ধান্ত দিলেন—"রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে।" তাই দেখা যায়, জনতা আর জনগণের মানসিকতার মেলবন্ধনের এক অপূর্ব প্রতিফলিত উচ্চারণ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। এই ভাষণে বার্তা ছিল নির্যাতিত ও সংগ্রামী বাঙালির জন্য, বার্তা ছিল পাকিস্তানি কুচক্রী শাসকগোষ্ঠীর জন্য, বার্তা ছিল বিশ্ববাসীর জন্য। তাঁর ভাষণে ছিল অতীতের ঘটনায় চুলচেরা বিশ্লেষণ আর আগামীর ইঙ্গিত। বাঙালি জাতিকে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তায় সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁর লোকদর্শনজাত প্রজ্ঞা দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল প্রখর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভালোবাসার মানুষদের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের আশঙ্কার বিষয়টি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন নি। অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন :

'কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদান কালেও বঙ্গবন্ধু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির (Humanistic approach) যে কোনো তারতম্য ঘটত না—তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য : "আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, ফৌজদারি আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল, কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো-ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না।"[৩২]

বঙ্গবন্ধু ও বাংলার লোকদর্শন প্রপঞ্চদ্বয়ের একটি অপরটির পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাল্য-কৈশোরকালে বাংলার শতসমস্যাক্লিষ্ট কৃষক, খাজনাদায়গ্রস্ত কৃষক, দুঃখজর্জর আধপেটা শ্রমিক, একদিন-দু'দিন নাখেয়ে থাকা অনশনক্লিষ্ট-হতদরিদ্র মানুষদের তিনি দেখেছেন নিজ চোখে; এটা দেখে দেখে তাঁর অন্তরে গেঁথেছে তাদের মুক্তির প্রেরণা। ঐ বাল্য-কৈশরেই শুনেছেন, মানুষের প্রতি উদারতন্ত্রী বাউল-ভাটিয়ালি-জারি-সারি গানের মধুর সুর-বাণী—এটা তাঁর প্রাণ মনকে আবেগ-আপ্লুত করেছে। আর ছিল তাঁর উদারতান্ত্রিক পারিবারিক আবহ—এই আবহ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র মনের গহিনে বাসা তৈরি করতে তাঁকে প্রণোদনা দিয়েছে। তাই বাংলার কৃষক মানে তার ভাই, নিরন্ন-দুঃখক্লিষ্ট সব মানুষ তাঁর ভাই। সব মানুষকেই তিনি ভালোবাসতে শিখেছেন সেই বাল্য-কৈশোরেই। বঙ্গবন্ধুর প্রধান গুণ ছিল সাহস-সারল্যতা ও কোমলতা। বিশেষ করে

বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। আর এ কারণেই বাংলার মানুষের কাছে তিনি সর্বজনমান্য সর্বজনগণ্য-সর্বজনশ্রদ্ধেয়—ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার কাছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম, বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার অঙ্গিকার তাঁর মনের মধ্যে সর্বদাই গাঁথা ছিল। এসব ক্ষেত্রে নিজের জীবনের প্রতি মায়া ছিল তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। জীবনকে তিনি বাজি রেখে কর্তব্যকর্মে অগ্রসর হতে কোনো প্রকার দ্বিধা তিনি করতেন না। এ প্রসঙ্গে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সমাজবাদী-চিন্তক সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন :[৩৩]

> ফরিদপুরের কৃষকের সন্তান শেখ মুজিবের এই একটা গুণ ছিল যে, সে জানের পরোয়া করতো না। এই গুণটা আমাদের ক'জনার থাকে? মরতে হবে, তবু আমরা মৃত্যুর ভয় করি। কিন্তু শেখ মুজিব জন্মগতভাবেই বোধ হয় একটু এক রোখা ছিলেন, গোঁয়ার ছিলেন। কৃষকের সন্তানের সারল্য থেকে তিনি হয়ত এই বোধটি পেয়েছিলেন। মরছিতো আমরা হরহামেশায়, নিত্য মুহূর্তে। তবে আর মৃত্যুর ভয় কি? এমন বোধ থেকেই ৭ মার্চে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ মানুষের জমায়েতে শেখ মুজিব বলেছিলেন : 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্'।

আমরা আগেই বলেছি বাংলায় তথা এই বঙ্গ ব-দ্বীপে বহুপ্রকার নৃ-গোষ্ঠী ও নানান মত-পথের মানুষের আগমনে এবং এখানকার ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত কারণে বাংলার লোকধর্ম হয় অনন্য বৈশিষ্ট্যরঞ্জিত। লোকধর্মের এই উদার আবহ থেকে বঙ্গবন্ধু দু'হাত ভরে আবাল্য লোকসংস্কৃতিজাত উদারতাকে আত্মস্থ করেন এবং তিনি নিজেকে পরিণত করেন অহিংসা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র-সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীনকারী, মানবতার ঝাণ্ডাধারী। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা অসাম্প্রদায়িক মানবতার কথা আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়। সম্প্রতি ড. আবুল আহসান চৌধুরী কর্তৃক লালন বিষয়ে নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ফাদার রিগান বলেন, 'লালন যদি বলেন 'জাতি নাই' বুঝিয়ে বলতে হবে তিনি কি চান। তুমি মুসলমান-মুসলমান হতে চাও, তার আগে তুমি মানুষ হও।... আজকে আমাদের এরকম সমাজ গড়ে তুলতে হবে—যেখানে হিন্দু-খ্রিষ্টান-মুসলমান একসঙ্গে যেন ওরা বাস করতে পারে। মুজিব ঠিক কথা বলেছেন, 'আমার ধর্ম আমার কাছে, তোমার ধর্ম তোমার কাছে—তার বাইরে সবাই ভাই ভাই।' ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। তুমি রবিবারে গির্জায় যাও, তুমি শুক্রবারে নামাজ পড়তে মসজিদে যাও, তোমার উপাসনার জন্য তুমি যাও মন্দিরে, কিন্তু বাইরে সবাই ভাই ভাই"।[৩৪]

বঙ্গবন্ধু ছিলেন লোকসংস্কৃতিজাত উদার মানবতাবাদে উজ্জীবিত এবং মহত প্রাণের অধিকারী। ঐকান্তিক ত্যাগ ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বের তৃণমূল মানুষের অবিসংবাদী নেতায়। সুফিয়া কামাল এক নিবন্ধে বলেন :

> 'মুজিবের ত্যাগের কোনও সীমা নেই। তার নিষ্ঠার কোনও পরিসীমা নেই। দেশকে যে সে কতখানি ভালোবাসতো তার পরিমাপ কোথাও নেই। মানুষের জন্য মমত্ববোধ, আত্মার একটা টান ছিল। আজকের দিনে তার মতো একটি মানুষ সারা বিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। পলায়নি মনোবৃত্তি ছিল না মুজিবের। যেখানে সংকট, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘাত দেখেছে সে এসে আগে দাঁড়িয়েছে। মরণকে ভয় করে নি। তার পেছনে লক্ষ জনতা মুজিব ভাই বলে লাফিয়ে পড়েই না এই দেশকে স্বাধীন করেছে। বাঙালি আমাকে মারবে না। এই প্রবল বিশ্বাস ছিল বাঙালির ওপর। সেই বাঙালির হাতে মুজিব হত্যা হয়েছে। সেই বাঙালি জাতির সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে আমি জানি না। মুজিবকে আমি অন্তর দিয়ে এখনও উপলব্ধি করি।'[৩৫]

বঙ্গবন্ধু ছিলেন লোকধর্মসিক্ত লোকদর্শনের জীবনমুখী চিন্তা-আদর্শের প্রতীক। তিনি কিংবদন্তির লোকনায়ক। অত্যাচারিত-নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির ত্রাতা। বাংলার হারকিউলিস-প্রমিথিউস।[৩৬] বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সান্নিধ্য পেয়েছিলেন উদার গণতন্ত্রবাদী ও মানবতাবাদী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, মওলানা ভাসানী ও তাজউদ্দীন আহমদের মতো সমাজবাদী একনিষ্ঠ রাজনৈতিক রূপকারের। সর্বতোভাবে বলা যায়, তিনি আজ বিশ্বের অবহেলিত-উৎপীড়ত লোকসমাজের মুক্তিকামীর প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

কালকেতু উপাখ্যানের ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখজর্জর জীবনের চিত্র আর বাল্য-কৈশোরে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ করা গ্রামবাংলার নিরন্ন মানুষের চিত্র আমরা মনে করি একই রকম ভীতিকর ও চিন্তা উদ্রেককারী। জীবন উপলব্ধি থেকেই নজরুল বলেছিলেন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান'। বাল্য-কৈশোরের দুঃখ ছিল নজরুলের জীবন সাথী; তাই তার ঐ মহান উপলব্ধি। আবারো বলি গ্রামবাংলার নিরন্ন কৃষক-শ্রমিকের হাড়জর্জর কঙ্কাল-সার দেহ যা ছিল দৃশ্যমান—বঙ্গবন্ধু প্রায়শই এ চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। সুকান্তের 'রানার' ও 'হে মহাজীবন' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা পাঠে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে নিরন্ন কৃষক-শ্রমিকের জীবনসংগ্রামের সাথে তাঁর কতটা আত্মিকতা ঘটেছিল। ক্ষুধার্থের বেদনা কত গভীর হলে তার কাছে 'পূর্ণিমার চাঁদ'ও ঝলসানো রুটি বলে অনুমিত হয়।

সমাজকাঠামো ভাঙ্গার অঙ্গীকারের কথা বিবেচনায় নিলে গান্ধী, সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ রাজনৈতিক রূপকারের চেয়েও বঙ্গবন্ধুকে গণচেতনার নেতা হিসেবে প্রথম সারিতে স্থান দিতে হয়। কিঞ্চিৎ জওহরলাল নেহেরুর সাথে তাঁর তুলনা চলে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা আরো বেশি বস্তুতান্ত্রিক। বঙ্গবন্ধু ছিলেন আরো বেশি প্রত্যক্ষবাদী ও লক্ষ্যাভিসারী। তাই তিনি কেবল বাংলার নয়, বিশ্বের দরিদ্র মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়েছিলেন।

বাঙালি বড় বড় কৃষক বিদ্রোহের নায়ক, নীল বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ প্রভৃতিতে অনেক সময়ই সে নায়কের ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়েছিল। সিধু-কানু ভ্রাতৃদ্বয়, ক্ষুদিরাম, যতীন দাস, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, তিতুমীর, দুদু মিয়া তার নায়ক, আসাদ, ড. জোহা, বরকত, সালাম, জব্বার প্রমুখ ভাষাসৈনিক, ৭জন বীর শ্রেষ্ঠসহ তাজাপ্রাণ উৎসর্গকারী হাজার মুক্তিযোদ্ধা, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, আজকের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রমুখ মহিয়সী নারী যে জাতির অগ্রপথিক সে জাতি তো এগিয়ে যাবেই। যার রয়েছে চিত্তরঞ্জন-সুভাষ বসু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন আহমদের মত রাজনৈতিক রূপকার, এসব মহান রাজনৈতিক রূপকারের অনুসারী হয়ে বাঙালি একদিন সামনের কাতারে পা রাখবেই-রাখবে।

তথ্যনির্দেশ

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৪।
আমাদের দেশে ঠিক কতদিন আগে 'দর্শন" শব্দের প্রচলন হয়েছে সে-বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতৈক্য নেই। এবং ঠিক কী অর্থে এই শব্দটি প্রচলিত হয়েছিল—সে-বিষয়েও সুদীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। সাধারণত 'দেখা' অর্থে 'দৃশ্'-ধাতু থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করা হয়; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার দেখাচ্ছেন, এ-ভাবে 'দর্শনে'র প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করবার চেষ্টা বিফল। এবং তাঁর মতে এই 'দৃশ্'-ধাতুর একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করলে পরই 'দর্শন' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য পাওয়া সম্ভব : 'চাক্ষুষজ্ঞান দৃশ্ ধাতুর মুখ্য অর্থ হইলেও জ্ঞানও উহার অপর অর্থ, ইহা পূর্বাচার্যগণ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে দৃশ্-ধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন, তাহাই শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থরূপে প্রতীয়মান হয়। অন্তঃকরণাদি জ্ঞানের সাধন হইলেও তাহা শাস্ত্র নহে।' প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
২. আফজালুল বাসার, 'বাঙালির জীবন, দর্শন ও অক্ষর', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫০ বর্ষ : ৩-৪ সংখ্যা, ফ্রেব্রুয়ারি ২৩০৭, পৃ. ১১৩।
৩. সোলায়মান আলী সরকার, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ১৭।
৪. আফজালুল বাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ. ৫।
বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ. ৮৭-৯৬।
৬. সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।
৭. আহমদ শরীফ, *বাঙলা ও বাঙালী*, (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০১৭।
৮. আবদুল ওয়াহাব, *ফোকলোর ও মানবতাবাদ*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫০ বর্ষ : ৩-৪ ৪র্থ সংখ্যা, ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১২৪।
৯. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *ভোলগা থেকে গঙ্গা*, পৃ. ৯৯।

১০. আবদুল ওয়াহাব, *লোকগীতির সমাজতত্ত্ব : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, (২য়-৩য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ৭৯-৮০।
১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন (তারিখ : ১৭ আগস্ট ২০০৯) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। আলোচক ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার এবং বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর নানামুখী গুণাবলির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু একদিকে সাহস ও অন্যদিকে কোমলতা দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন। আর বাংলা ভাষার উপর বঙ্গবন্ধুর ছিল অবাধ দখল। আজ তাই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতর একটি ভাষণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
১২. মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২-১৩
১৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
১৪. সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
১৫. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২ পৃ. ২১।
১৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীর রেনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি*, আনন্দ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ৪৩
১৭. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
বাংলার লোকসমাজের মুখপাত্ররা নবম-দশম শতকে সেকালের কর্তৃত্বশীল ব্রাহ্মন্য ধর্মের তীব্র সমালোচনা করে অনেক কঠিন বাক্য-বাণ ছুঁড়েছিলেন চর্যাগীতিতে কিংবা সরহপাদের দোহাকোষে তার অনেক নজির পাওয়া যায়। বেদের দাবি ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মুখ থেকে, তাই জন্মসূত্রেই ব্রাহ্মণরা অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তারা বেদ পাঠের অধিকারী, তারা মানুষের মুক্তি লাভের জন্য যজ্ঞ ও হোম করে, অগ্নিতে ঘৃতাহতি দেয়, তারা ব্রহ্মজ্ঞানী। কাজেই তাদের আদেশ-নির্দেশ সবাইকে মেনে চলতে হবে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের এ দাবি সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে সরহপাদ বলেন : 'ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল' যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন অন্যেও যে রূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেই রূপেই হয়; চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তাহাও পড়ুক, আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে বেদের শব্দ আছে। আর আগুণে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয, তাহা হইলে অন্য লোক দিক না। হোম করিলে যত মুক্তি হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ববেদের সত্তাই নাই, আর অন্য বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ ত আর মরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।' (সরহের এই উক্তিটির আধুনিক বাংলা সাধুগদ্যে রূপান্তর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধগান ও দোহা' থেকে গৃহীত)।

১৮. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য* প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৩।
১৯. আফজালুল বাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
২০. আবদুল ওয়াহাব, 'বাউল মত ও বাউল গান', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪৯ বর্ষ : ১ম ২য় সংখ্যা, আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৬০।
২১. আফজালুল বাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
২২. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতে কৃষি বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. ১৯২-৯৩।
২৩. সুকান্ত পাল, *প্রসঙ্গ : লোকসঙ্গীত*, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮।
২৪. আবদুল ওয়াহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
২৫. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ৩১০-৩১১।
২৬. মোনায়েম সরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, : *জীবন ও রাজনীতি*, (১ম খণ্ড), সম্পাদক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১ম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ৪২০-৪২২।
২৭. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফ্রেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ. ২৪-২৭।
২৮. এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২৯।
২৯. প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, *বঙ্গবন্ধুর উদারতা এবং উত্তরাধিকার*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৪৬।
৩০. শামসুজ্জামান খান, *বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও বর্তমান বাংলাদেশ*, বিজয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩০।
৩১. সনৎকুমার সাহা, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ও আজকের বাংলাদেশ, *মহাকালের মহামানব : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, মিজান পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৬৮৯।
৩২. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, *'সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ'*, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৫ আগস্ট, ২০০৯।
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ছাত্র, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপর্যুক্ত নাতিদীর্ঘ নিবন্ধটি রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, প্রতিমিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচারতত্ত্বে প্রতিমিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। একহাজার একশত ৭টি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই—আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।'
৩৩. সরদার ফজলুল করিম, *মহাত্মা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দ্রিরা গান্ধী*, 'বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী' তোফায়েল আহমেদ, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ২৬১।
৩৪. কালি ও কলম, ৩য় বর্ষ; ১২ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪৮-৫৫। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল ওয়াহাব, 'ফোকলোর ও মানবতাবাদ' বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫০ বর্ষ: ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ ১২৩-১৪৬।

৩৫. সুফিয়া কামাল, 'আমার দেখা মুজিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।
৩৬. গ্রিক পুরাণের বিখ্যাত টাইটান প্রমিথিউস। তিনি কাদা থেকে পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেন বলে গ্রিক পুরাণে উল্লেখ আছে। প্রমিথিউসের বড় বৈশিষ্ট্য, তিনি ছিলেন অসাধারণ মানবপ্রেমিক। তিনি দেবতা জিউসের বিরোধিতা সত্ত্বেও মানব জাতিকে সাবলম্বী করার জন্য অ্যাপোলোর অগ্নিরথ থেকে আগুন নিয়ে মানুষকে আগুনের ব্যবহার শিখিয়েছেন। এ জন্য দেবতা জিউস ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর উপর কঠিন শাস্তি আরোপ করেন।
গ্রিক পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হারকিউলিস ছিলেন আর এক মানবপ্রেমিক। তাঁর মাতা ছিলেন মানুষ। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হারকিউলিস আর্ত ও উৎপীড়িতের আহ্বানে সাড়া দিতে ছিলেন সর্বদা প্রস্তুত। তিনি জীবনকে বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন অন্যায়কারী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। এই হারকিউলিস্ই শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের জকৃত ভক্ষক জিউসের ঈগলকে বধ করে হেফেস্টাসের বজ্র শৃঙ্খল ভেঙ্গে প্রমিথিউসকে মুক্ত করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ফরহাদ খান, প্রতীচ্য পুরাণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৫০-১৫২ এবং ২১২-২১৮।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে লোকজ বৈশিষ্ট্য

ড. আবুল হাসান চৌধুরী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক আর স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালির অনেকেই আবেগে অভিভূত হয়ে আরো যেসব বিশেষণ ও অভিধায় তাঁকে ভূষিত করেন সেসবের অন্যতম প্রধান একটি হলো 'কিংবদন্তীর মহানায়ক'। আবেগ-উচ্ছ্বাসের অতিরেক এবং স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলতেই হবে, বঙ্গবন্ধু একাধারে যেমন একটি জাতির হয়ে-ওঠা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার নির্মাতা তেমনি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এবং জীবনাবশানেও স্বয়ং একটি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। এ কিংবদন্তীর স্রষ্টা মুক্তিসংগ্রামে এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়ী অগণিত সাধারণ মানুষ এবং সে কিংবদন্তীকথা বাঙালির মুখে মুখে ফিরবে আরো অনেক অনাগত কালব্যাপী।বাঙালির শোষণমুক্তির সংগ্রামে একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী (Living Legend)| বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের কাছে তিনি এখনো জীবন্ত এক কিংবদন্তীই এবং তা এ অর্থে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের মনের মণিকোঠায় তিনি এখনো শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় সিক্ত এক মহানপুরুষ। বাংলাদেশের খ্যাত-অখ্যাত লেখক, কবি-সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তাঁকে নিয়ে কত যে গান, কবিতা আর গল্পকথা তৈরি করেছেন তা হিসেব করে বলা কঠিন। এর বড় কারণ হলো, সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন। তিনিও বুঝতেন এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকমানসকে। আর তাঁর মধ্যেও ছিলো বাংলার উদার, মহান মানবীয় প্রেমবোধে উজ্জীবিত লোকায়ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষের বংশগতির ধারা। বঙ্গবন্ধুর চরিতাদর্শ কোনো ভূঁইফোঁড় সত্তা নয়—তা ইহ ও মানবতাবাদী সংগ্রামী বাঙালির পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য পরম্পরায় অর্জিত। সে কারণে গণমানুষের নেতা

হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ড, চলন-বলন কিংবা দেশের অগণিত খেটে-খাওয়া দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার ভাব-ভঙ্গিমার মধ্যেও ফুটে উঠেছে লোকজ বৈশিষ্ট্য। বাঙালির লোকায়ত জীবনদর্শনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের মৌল প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের সাজুয্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণেও লক্ষ্য করা যাবে।

এক বিশাল জনগোষ্ঠীর হৃদয়স্পর্শী ৭ মার্চের ভাষণটি ১৯৭১ সালের মুক্তিকামী বাঙালির আবেগ, উদ্দীপনা ও সংগ্রামী চেতনার দ্যোতনায় অসাধারণ কবিত্বময়—এর ভাব, ভাষা, উপমা ও উচ্চারণ গণমানুষের উন্মুখ অন্তরকে স্পর্শ করতে সক্ষম। লোকসাহিত্যের প্রকাশে যে অকপট সারল্য ও সৌন্দর্য থাকে, থাকে সমবেত শ্রোতাসাধারণের মন জয় করবার কিংবা তাদেরকে সম্মোহিত করবার যাদুকরী ক্ষমতা, বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটিরও সেই সরল সৌন্দর্য ও যাদুকরী ক্ষমতা ছিলো এবং এখনো আছে। ভাষণটি তিনি নিজে আগে থেকে লিখে নিয়েছিলেন কিংবা কেউ লিখে দিয়েছিলো এমন তথ্য নেই বরং এ সম্পর্কে লোকশ্রুতি হলো, সেকালের রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রতুল্য জনসভায় যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু নাকি তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ওরফে রেণুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর মুখচেয়ে-থাকা উৎকণ্ঠিত অগণিত মানুষকে তিনি কী বলবেন? আজীবন প্রেরণাদায়িনী রেণু সোজাসাপটা জবাবে বলেছিলেন, 'তোমার যা মনে আসে তুমি তা-ই বলবে।'

৭ মার্চের ভাষণটি বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন কোনোরকম ভূমিকা কিংবা ভণিতা ছাড়াই—'দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে'; সে সময়ে স্বাধিকার আন্দোলনরত বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নৃশংস নির্যাতনের কথা দিয়ে। এবং এর পরপরই তিনি পাকিস্তানি শাসনের তেইশ বছরের নির্মম ইতিহাস তুলে ধরে বলেন,"কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।" এরপর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে ঊনসত্তরের অসহযোগ ও গণ আন্দোলনে বাঙালির রক্তদানের ইতিহাস তুলে ধরেন তিনি। একজন কুশলী গল্পকথকের মতোই তিনি খানিকটা বিরতি নিয়ে, উৎকর্ণ শ্রোতার উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখেই আবার বলেন, 'তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো।' অতঃপর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও ক্ষমতা হস্তান্তরে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের তালবাহানা ও পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের কথা বিবৃত করেন। এখানে বঙ্গবন্ধুকে আমরা দেখছি তাঁর দেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের করুণ ইতিহাসের এক নিপুণ কথাকার হিসেবে। আবার একইসঙ্গে বাঙালির স্বাধিকার

আন্দোলন আর স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস সে ইতিহাস কথার তিনিই মহানায়ক। ৭ মার্চের ভাষণেও আমরা তাঁর নায়কোচিত গুণাবলীর পরিচয় পাই। নায়ক তিনিই হতে পারেন যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশের নির্যাতিত মানুষের জন্যে কাজ করবেন, ব্যক্তিগত লোভ-লাভের মোহে যিনি আর্তমানবতার সেবার কথা ভুলে যাবেন না; সংগ্রামী মানুষের নায্য দাবি আদায়ে আপোসহীন অনড় নেতৃত্ব দেবেন এবং প্রয়োজনে চরম আত্মত্যাগেও পিছপা হবেন না। বঙ্গবন্ধুর এসব গুণাবলী ছিলো বলেই তিনি নির্দ্বিধায় বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলতে পারেন,'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' হরতাল আহ্বান করে কোর্ট-কাচারি, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অচল করার নির্দেশ দিয়ে ফের এটাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'গরীবের যাতে কষ্ট না হয়,যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না।' ভাষণের একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি একইসঙ্গে তাঁর লোকেদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার নির্দেশ দেন এবং নিজের চরম আত্মত্যাগের কথা ব্যক্ত করে বলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশল্লাহ্।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণটি দেন সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়। গুরুগম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষা এর নয় তবে সুশ্রাব্য এবং এক লহমায় জনচিত্তে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে দিতে সক্ষম। খুব ভেবে চিন্তে তাঁকে শব্দচয়ন করতে হয় নি। সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তিনি তাঁদের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। যেমন,পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,'এহিয়া খান'—যেভাবে বাংলার সাধারণ মানুষেরা উচ্চারণ করে থাকে। বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের উপর পাকসেনাদের গুলী চালানোর কথা তিনি বিবৃত করেন এভাবে:'জনাব এহিয়া খান, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলী করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে।' এখানে 'বুকের উপরে গুলী করা' এবং 'মায়ের কোল খালি করা' বাক্যাংশদ্বয় একেবারেই সাধারণ মানুষের মুখের কথা কিংবা বাগবিধি—যা সহজ-সরল এবং স্বতোৎসারিত। ওই একইরকম বাগবিধি প্রয়োগ করে তিনি শত্রুর প্রতি হুমকি এবং হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন : 'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।' অন্যদিকে দেশের মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা কতটা অকৃত্রিম ও আন্তরিক তা অনুধাবন করা যায় 'আমার গরীবের উপর' কিংবা 'আমার মায়ের কোল ' কথাগুলোর উচ্চারণে। তাঁর এ ঐতিহাসিক ভাষণটিতে আঞ্চলিক কিংবা

লোকভাষার প্রয়োগও লক্ষ্য করার মতো। যেমন : 'ঐ রক্তের উপর পাড়া দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।' অথবা, '৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় সমন্বয়বাদী মানুষ। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁকে কখনো আক্রান্ত করে নি। লোকায়ত বাঙালির দর্শনও সমন্বয়বাদী এবং মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, সহৃদয় সহমর্মিতা প্রকাশের দর্শন। লোকায়ত এ দার্শনিক চেতনা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণেও ফুটে উঠেছে। জাতীয় জীবনে নেমে-আসা আপদকালীন সময়ে একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে তিনি যথার্থই বলেছিলেন,'মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমার ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।'

পরিশেষে বলতে হয়, যেকোনো ভাষণ একইসঙ্গে শ্রব্য ও দৃশ্য মাধ্যমে যখন শ্রোতা-দর্শকের কাছে পৌঁছায় তখন বক্তার সমগ্র পারফরমেন্স উপভোগ করা সম্ভব হয়। বঙ্গবন্ধুর জলদগম্ভীর কণ্ঠে এবং উত্তোলিত তরবারিসদৃশ তর্জনীর তালে তালে এবং তাঁর বীরোচিত, উন্নতশিরোশ্চালনে ৭ মার্চের ভাষণটি আমরা যখন শুনি এবং দেখি তখন তার (ভাষণটির) যে প্রদর্শনকলা তাতে মোহিত এবং মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। মোটকথা, সেদিন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে এবং তাঁর সাহসী, বীরোচিত ভঙ্গিমায় একইসঙ্গে আপ্লুত ও উজ্জীবিত হয়েছিলো। একজন কথাকার যেমন গল্প বলার ভঙ্গিতে আর পরিবেশনকৌশলে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে রাখেন বঙ্গবন্ধুও তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে সেটি করতে পেরেছিলেন তাঁর বজ্রকণ্ঠবাণী আর অনুকরণীয় বাকভঙ্গিমায়,কথার ভাব ও বক্তব্যের ধার অনুযায়ী অঙ্গুলি হেলন আর শিরোশ্চালনে। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এমন লোকপ্রিয় ভাষণ গোটা পৃথিবীতে অনন্য, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

৭ মার্চের ভাষণে লোকউপাদান : অন্বিষ্ট সেমিনারের অভিজ্ঞতা

জাহারাবী রিপন

সাহিত্য সংশিষ্ট গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে কদাচ এতদসংক্রান্ত কোনো কোনো সেমিনারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু তা অবশ্যই কোনো প্রধান আলোচক কিংবা বক্তা হিসেবে নয়। আমন্ত্রণ একজন নীরব শ্রোতার এবং সে মর্মেই যোগ দিই সেমিনারে। বলতে দ্বিধা নেই, বক্তার বাগবৈদগ্ধ্য কিংবা বিষয় পাণ্ডিত্যে আমার অবস্থান অতিশয় দীন বলেই হয়তো আমি শ্রোতা মাত্র, না বলার দলে। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে বিজয়ের মাসে এমন একটি সেমিনারে যোগদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় *উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে* যাই। তবে তা আয়োজক পক্ষ নয়, সেমিনারের মূল প্রবন্ধকার ড. আবদুল ওয়াহাবের আমন্ত্রণে। ৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত সেমিনারে তিনি *বাংলার লোকদর্শন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের লোকউপাদান অনুসন্ধান* শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন এই সংবাদ আমার মনে প্রবল উৎসুক্যের উদ্রেক করে। কারণ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের এতকাল হলো কখনও তো শুনি নাই ঐতিহাসিক সে সংগ্রামী ভাষণের এমনতরো ব্যাখ্যা অথবা অনুসন্ধান। অবশ্য এ ভাষণ নিয়ে অনেক লেখালেখি এমনকি কবিতা পর্যন্ত হয়েছে লেখা। পৃথিবীর সেরা ভাষণের তালিকায় শীর্ষ সারিতে এই ৭ মার্চের ভাষণ। তবে লোকগবেষণার ঘরে এর আরোহন এইতো প্রথম। একেবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা বলতে হবে।

একদিন অতিক্রান্ত দ্বিপ্রহরে শীতের কবোষ্ণ সৌরতাপ মাথায় নিয়ে মিরপুর থেকে গতিপথের বাঁক পেরিয়ে সোজা ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে এই প্রথম গমন করি প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে। প্রথম দেখায়

দৃশ্যমান সবকিছুতেই কৌতূহল জাগে। আগে দেখিনি বলেই হয়তো এমন ভাবনা আসে মনে। প্রথম দেখা মুহূর্তে অদেখা জগতের আলো অন্ধকার মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে নব নব আকার আকৃতির মূর্ত প্রতীক সৃজন করে। আগে যা দেখি নাই তাই দেখা হয়ে যায়। উচ্চতর মানবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে প্রবেশমাত্র দেখি পরিপূর্ণ এক আয়োজন। কক্ষে প্রবেশ পথের মুখে দরোজায় দাঁড়িয়ে উপরে তাকালে এ কেন্দ্রের সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দের ছবি ও নামের তালিকা দেখা যায়। এঁরা প্রথিতযশা, নাম বললেই চেনা যাবে নিশ্চয়। তবে এঁদের কেউ কেউ জীবিত, আবার কেউবা এখন দেহাতীত (অন্য ভুবনের অদৃশ্যলোকে। মানুষ নেই, ছবি আছে। ছবিতে তাকিয়ে আছে মানুষ)। আমরা জীবিত জনেরা দেখছি ওইসব মানুষের ছবি। মনে মনে ভাবি আমরাও তো ছবি হয়ে যাব একদিন ! হায় কী ভবিতব্য। কেন এলাম আবার কেনইবা চলে যাবো। মানুষ থাকবে না-থাকবে মানুষের ছবি। যাঁর ভাষণ নিয়ে সেমিনার তিনিও নেই। তিনি বিমুর্তে মূর্ত মানব কোটি মানুষের মনের ছবি—বঙ্গবন্ধু। তাঁর কর্ম ও কৃতির অন্বিষ্টে আলেখ্যাধৃত এই সেমিনার।

ডিসেম্বরের ৭ তারিখ, (সেমিনার মঞ্চের পশ্চাতে ব্যানারে দৃশ্যমান। ৭ কেন? ভাষণ দিবসের সঙ্গে সাতের মিল কি তবে কাকতালীয়? নাকি কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত অথবা ইচ্ছাপ্রসূত? যদি কাকতালীয় বলি তবে বলতে হবে—কাক হঠাৎ তালের উপর এসে বসতেই তাল বৃন্ত থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। আর যদি বলি ইচ্ছাপ্রসূত তবে বলতে হবে তারিখের সংখ্যার মিলে কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ১৯৭১-এর ৭ আর অদ্যকার ৭ তো এক নয়। সেদিনকার ৭, রমনার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ মানুষের গমাগমে আগুন তীব্র ক্ষোভ আর বঞ্চনার অগ্নিতে উত্তাল জনসমুদ্র। কিন্তু অদ্যকার ৭ একেবারে আলাদা। শৃঙ্খলাবৃত্তের সেমিনার কক্ষে আমন্ত্রিক জনেরা মাত্র উপস্থিত। আয়োজক আর আমন্ত্রিত সংখ্যায় পূর্ণ এক কক্ষ মানুষের সমাগমে সমুদ্রের কল্পনা তো অবান্তর। তবুও মনে মনে ভাবি এ সমাগমেও মুক্তিযোদ্ধা আছেন। হয়তো এঁদের অনেকেই সেদিনের সে জনসমুদ্রে জয়বাংলা ধ্বনির শঙ্খনিনাদিত উচ্চারণে ফেটে পড়েছিলেন। তাঁরা হয়তো আজ এই সেমিনারে এসে স্মৃতি-বিস্মৃত দিনের অভিজ্ঞতার ধ্বনি শ্রবণে তুলছেন, হয়তো মনে মনে সৃজন করছেন সে উত্তাল দিনের ছবি। সেই ৭ মার্চ, সেই রেসকোর্স ময়দান, সেই জনসমুদ্র। মুহূর্তে অদৃশ্য ছবি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

সেমিনার কক্ষের দেয়ালে শোভিত ছবির একজন ড. খোন্দকার আশরাফ হোসেন যিনি উচ্চতর মানবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক। তিনি সেমিনার শুরু করতে সঞ্চালকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। দিবস ত্রয়ী প্রহরের পথে। এমন সময় একজন ভদ্রলোক ছড়ি হাতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি প্রতিবন্ধী। চোখ আছে, আলো নেই। দৃষ্টি নেই বলে দৃশ্যহীনতার দায় তাকে

বহন করতে হয়। আয়োজকদের একজন তার হাত ধরে আমার পাশে এন বসিয়ে দিলেন। তিনি মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন খান, যিনি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জন করে পিএইচ. ডি. গবেষণার কাজ করছেন। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের মধ্যে তিনিই প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে এতটা উদ্যমী পুরুষ বলতে হবে। জানার জন্য তাঁর অপার আগ্রহ প্রত্যক্ষ করি। পাশে বসেই সেমিনার প্রবন্ধ পাবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ করে দেই। কিন্তু তিনি তো এ প্রবন্ধ পড়তে পারবেন না। তবে কি অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনবেন? তাই তো হবার কথা। অবশ্য সেমিনারে বসে প্রবন্ধকারের উপস্থপনা থেকেও শুনবেন তাতে যা লেখা আছে। কী আশ্চর্য তিনি দেখবেন না, শুধুই শুনবেন। এও তবে শোনা এবং দেখা তো নিশ্চয়। কানে শুনে অন্তরে দেখা। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কথা মনে পড়ছে—'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে/ অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে'। অদৃশ্যের আঁধারে পড়ে যেন সকল দৃশ্যলোকের ছায়া।

সঞ্চালক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করলেন সেমিনার। প্রবন্ধকার ড. আবদুল ওয়াহাব পাঠ করে আমন্ত্রিক শ্রোতাদের মূল প্রবন্ধ শোনালেন। অতঃপর মূল প্রবন্ধের উপরে আলোচনা-পর্ব। প্রথমে আলোচনা করলেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। সন্দেহ নেই, তিনি একজন প্রমিত বক্তা ও গবেষক। অধ্যাপক ঘোষ লোকগীতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মার্চের ভাষণের তুলনামূলক আলোচনাকে একটা আবিষ্কার হিসেবে উলেখ করেন। তিনি বলেন, লোকগীতির চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রবন্ধকার এ ভাষণের মিল খুঁজে পেয়েছেন, এ চিন্তাটি আমি বল অভিনব। আমি বলব আবদুল ওয়াহাব এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদগাতা। আমি প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানাই এই বিজয়ের মাসে বঙ্গবন্ধুর মার্চের ভাষণের উপর এ ধরনের গবেষণামূলক লেখা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য। অতঃপর আলোচনা করতে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম। তিনি বলেন—বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি গবেষণা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে অভিনব বিধায় নতুন অনেক বিষয়ে চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়। এজন্য প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ। নির্ধারিত দুই বক্তার আলোচনান্তে সেমিনারে উপস্থিত আরো কেউ কেউ আলোচনায় অংশ নেন। তাঁরাও প্রবন্ধকারকে এই অভিনব প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সকলের আলোচনাতেই বাঙালির ঐতিহ্য-চেতনা ও বঙ্গবন্ধু অস্তিত্বের অনুভব আবারও অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেদিন আমার তো তাই মনে হয়েছে।

অভ্যাগত অতিথি ও আলোচকবৃন্দের মানসিক অনুভূতি দৃশ্যমান এরকম বলে মনে হলো। বিশেষ করে, আলোচক অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় নিজ জীবনাভিজ্ঞতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা আবেগে-অহংকারে স্মরণ

করলেন সেদিন। সরবে নীরবে সবাকার মধ্যে তখন জন্ম নিয়েছে ৭ মার্চের অনিবার্য আহবান ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। সেমিনার কক্ষে সন্ধ্যার আঁধার ঘনায়ে স্মৃতি বিস্মৃতি লাখো মানুষের আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রমহানির বেদনা বহে আনে।

আলোচনার আধারে আরো অনেক কথা পূর্ণ হতে পূর্ণতর হতে থাকে। এ ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ এড্রেস-এর সঙ্গে তুরল্যমূল্যে বিবেচ্য বলা হয়। ১৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের এ ভাষণের চারিত্র্য লক্ষণ দেখে অন্নদাশংকর রায় বঙ্গবন্ধুকে Poet of Politics হিসেবে আখ্যায়িত করার কথাও আলোচনায় আসে। বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের লোক। তাঁর ভাষণে এতদঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ দাবায়ে, ভায়েরা, পৌঁছেয়ে দেবেন, দেবার প্রভৃতি লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধু প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসেও অঞ্চল বা প্রান্তকে ভুলে যাননি। আর এই-ই হলো লোকউপাদান। প্রবন্ধকার ৭ মার্চের ভাষণকে লোকগীতি হিসেবে অভিহিত করেন, যা প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলতে হবে। কারণ এ ভাষণের উচ্চারণে কোনো কোনো স্থানে আঞ্চলিক গীতিসুরের ধ্বনি কানে বাজে। গীতি কবিতার সুর-লয়ের অনুভব যেন অভিনব কাব্য শৃঙ্খলায় বাধা পড়ে গেছে। আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার তাকে আরো প্রাণময়, মৃত্তিকাগন্ধী ও প্রাকৃত করে তুলেছে। তবে এ ভাষণে লোকউপাদানের অন্বেষণকে অব্যর্থ বলতে হবে। ড. আবদুল ওয়াহাব তবে লোকগীতির একজন ধন্য গবেষক এ সত্য মানতেই হবে।

তবে উলিখিত প্রবন্ধে খানিক দুর্বলতাও পরিলক্ষিত হয়েছে। বক্তাদের আলোচনাতেও তা লক্ষণীয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে এ ধরনের গবেষণা অথবা অনুসন্ধানকে অসম মানসিক সাহসের সীমায় বিবেচনা করতে হবে। এবং তাতেই নব আবিষ্কারের কল্যাণ নিহিত আছে, অন্যত্র বিরুদ্ধ কোনো সমালোচনা কিংবা আলোচনায় নহে।

বক্ষ্যমাণ সেমিনারে গিয়ে ৭ মার্চ ভাষণ নিয়ে অনুসন্ধিৎসু মনে আরো নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। মনে পড়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক জর্জ ওয়াশিংটনের কর্ম ও কৃতির কথা। যিনি আমেরিকার বিপ্লবে মুক্তিকামী মার্কিন উপনিবেশনিবহের প্রধান সেনাপতি তিনি একদা রাজনৈতিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফেডারেলিস্ট ওয়াশিংটন তৃতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ না করে জেফারসনপন্থিদের উদ্দেশ্যে বিদায় ভাষণে (Farewell Address) বিদেশি শক্তিবর্গের সঙ্গে জটিলভাবে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। এরকম ৭ মার্চের ভাষণেও আছে; মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এ তো বিরল প্রত্যভিজ্ঞা। পৃথিবীর খুব কম রাজনীতিকের চরিত্রে তা লভ্য।

সেদিন সেমিনারের উপান্তে সভাপতির ভাষণে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতির অধ্যাপক নূরুর রহমান খান।

উলেখ্য, সকল সভায় সভাপতির বক্তৃতা সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, এ নিয়মই সচল। কিন্তু এ বক্তৃতা ব্যতিক্রম। খানিক দীর্ঘতর। হয়তো এজন্য যে, সেমিনারের শেষ বক্তার মনেও ৭ মার্চ ভাষণের বিশেষণ নয়তো এর জাগতিক মূল্য এক অভূতপূর্ব সন্ধ্যার আভায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সূর্য ডুবে গেলে আকাশে চাঁদের উদয়। সময় তখন অন্ধকার স্নিগ্ধ আলোকের দ্যুতিতে অভিরাম রাত্রির সৃজন করে। উল্লিখিত সেমিনারের স্বর্ণাভ কথামালা তো কখনই ভুলবার নয়। আমার মধ্য বয়সী যাত্রিক জীবন পথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে এই সেমিনারের স্মৃতি এখনও অমলিন ও অভিনব অভিজ্ঞতা। বাঙালির অস্তিত্বের অহংকারে জয়তু হে ৭ মার্চ। জয়তু বঙ্গবন্ধু।

ভাষাবিজ্ঞান

ভাষার জাদু : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিবেচনার ভূমিকা

ভাষার জাদু : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

এক বিদেশি সাংবাদিক ১৯৭১ এর ৭ মার্চ সকাল থেকেই একজন দোভাষী খুঁজছিলেন, সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিবেন, তা তাৎক্ষণিক ইংরেজি করে তাকে শোনাবে, সেজন্য। দুপুরের আগে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়, বললাম ভাষণ শুরুর আগে টিএসসিতে এসে তার সঙ্গে রেসকোর্স মাঠে যাব।

মাঠে সেদিন কত মানুষ ছিল, কেউ বলতে পারবে না। হয়তো দশ লাখ। হয়তো আট। কিন্তু মনে আছে ভাষণ শুরুর আধাঘণ্টা আগে যখন বিদেশি সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে বেরোই, মনে হল সারা বাংলাদেশ ভেঙ্গে পড়েছে রেসকোর্স মাঠে। সাংবাদিকদের জন্য মঞ্চের সামনে জায়গা ছিল। সাংবাদিক হাত ধরে আমাকে টেনে সেখানে নিয়ে গেলেন। আমি আমার কপালকে ধন্যবাদ দিলাম। এত সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পাব, ভাবতেও পারিনি। বঙ্গবন্ধুকে বেশ চিন্তিত মনে হয়েছিল। বক্তৃতা শুরুর আগে দু'একবার হাত দিয়ে মাথার চুল সমান করলেন; আকাশে একটা হেলিকাপ্টার উড়ছিল। সেদিকে একবার তাকালেন। তারপর সামনে মানুষের দিকে গভীর দৃষ্টি ফেললেন। মনে হল তাঁর চিন্তা সরে গিয়ে মুখে একটা প্রসন্ন ভাব যেন এল। তিনি লেকটার্নের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন।

পুরো বক্তৃতাই এখন ডিভিডিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যা পাওয়া যায় না তা হচ্ছে ওই আঠারো উনিশ মিনিটের জাদু। জাদুর অনুভব করছিল তারাই যারা সেদিন কোর্সে ছিল।

বঙ্গবন্ধু কথা বলছিলেন না, তিনি যেন বাঙালি জাতির সংগ্রামী ইতিহাসের একটা মুখবন্ধ লিখছিলেন, যাতে প্রতিফলিত হচ্ছিল বাঙালি চরিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রকাশগুলি—তাঁর সাহস আর সংকল্প তাঁর আত্মদৃপ্ত এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয়, তাঁর সততা আর সৌজন্য, তার ভেতরের আগুন এবং বারুদ। সারা মাঠের মানুষ নিঃশব্দে শুনছিল সেই জাদুময় ভাষণ যা তাদের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তাদেরকে এক একজন যোদ্ধায় পরিণত করছিল। এরকম গভীর আর দরাজ কণ্ঠের ভাষণ বঙ্গবন্ধুও হয়তো আর দেননি। এবং বক্তৃতাটি শেষ হলে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না তিনি কী চাইছেন : তিনি যা চাইছিলেন, আমরাও তা চাইছিলাম—বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এবং তাঁর ভাষণে তিনি মানুষকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন।

তাঁর ভাষণটি পাকিস্তানিরাও সঠিক পড়তে পেরেছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা কাপুরুষ ছিল এবং কাপুরুষেরা যা করে তারাও তা করেছিল—ঘুমন্ত মানুষ, নারী ও পুরুষের ওপর তারা রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল একটি সাহসী জাতির প্রত্যয়ী কিছু উচ্চারণ। বঙ্গবন্ধু নিজেও হয়তো পাকিস্তানিদের কাপুরুষতার ব্যাপকতাটা বুঝতে পারেন নি, যদিও তাদের কপটতা ও মিথ্যাবাদিতার বিষয়টি তিনি তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন।

২

একটা দুঃখবোধ থেকে ভাষণটা তিনি শুরু করেছিলেন। 'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'—এভাবেই তার ভাষণ শুরু। 'দুঃখ', 'দুঃখের বিষয়,' 'দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়' এবং 'করুণ ইতিহাস'—শুরুর কয়েক মিনিটেই এরকম বর্ণনা তিনি কয়েকবার দিলেন। আমি প্রথম তিন-চার লাইন দ্রুত অনুবাদ করলাম, কিন্তু সাংবাদিক আমাকে থামিয়ে দিলেন। 'আমি বরং ভাষণটা শুনি, তুমি যদি পারো, মনে রাখার চেষ্টা কর, পরে আমাকে অনুবাদে শুনিও,' সাংবাদিক বললেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পুরোটা সময় সেই সাংবাদিক একাগ্রতা নিয়ে বসেছিলেন—তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি প্রতিটি বাক্য বুঝছেন, যেন বঙ্গবন্ধু বাংলাতে নয়, ইংরেজিতে ভাষণটা দিচ্ছেন।

এবং আশ্চর্য, শুনতে শুনতে ভাষণটা আমার মাথায় একটা জায়গা করে নিল। বিকেলে চারুকলায় সাংবাদিককে যখন মূল বিষয়গুলি অনুবাদ করে দিচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম, আমার গলাতেও যেন আলাদা একটা জোর এসেছে, যেন ভাষণটা আমাকে আলাদা শক্তি জোগাচ্ছে। সাংবাদিক বললেন, কী ছিল শেখ সাহেবের ভাষণে?

আমি কিছু বলার আগে তিনি নিজেই বললেন, 'নিশ্চয় জাদু। ইট ওয়াজ সিম্পলি ম্যাজিকাল,' তিনি বললেন।

৩

জাদু তো বটেই। ইতিহাসের কিছু কিছু সময় থাকে, যখন জাদুর প্রয়োজন হয়; যখন বাস্তব এমন কঠিন হয়ে পড়ে, পরিস্থিতি এমন প্রতিকূলে চলে যায় মানুষের যে একটা জাদুর ঘটনা না ঘটলে কিছুতেই মানুষগুলো পথ খুঁজে পায় না, পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শিরদাঁড়াটা তাদের প্রয়োজনীয় দার্ঢ্য পায় না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল সেই জাদুর ঘটনা। একাত্তরের মার্চের দিকে তাকান। ৭ মার্চের আগের ও পরের দিনগুলির কথা ভাবুন। ৭ মার্চের পর বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে গেল আমরা বুঝে নিলাম, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের উদ্ভট গৃহস্থালির দিন শেষ।

কী ছিল সেই ভাষণে?

আজকালকার রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা শুনলে দুঃখ হয়, খুব কমই কাউকে তার মনের ভাষা খুব পরিস্কারভাবে বলতে শুনি। বেশির ভাগ রাজনীতিক বাক্য সমাপ্ত করেন না, অশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করেন। বঙ্গবন্ধুর অনেক গুণগ্রাহী এবং অনুসারীকেও দেখি, তাঁর মতো গুছিয়ে বলতে একেবারেই অপারগ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলোতে তিনি প্রতিটি বাক্য শেষ করতেন, একটি বাক্য থেকে অন্য বাক্যে তাঁর যাত্রা হত অবধারিত এবং যৌক্তিক। তিনি বুঝতেন কখন, কোথায় কতটা আবেগ মাখাতে হবে কথায়; কোথায় দিতে হবে প্রেরণার বাণী, অথবা কাজের উপদেশ।

সাত মার্চের ভাষণে তিনি আঞ্চলিক অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন 'শাসনতন্ত্র তৈয়ার' করা, 'বলে দেবার চাই যে,' 'হুকুম দেবার না পারি', 'মায়না-পত্র নেবার পারে' এরকম বলেছেন। একসময় যখন তিনি বললেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না'—মনে হল, এখানে 'দাবিয়ে রাখতে পারবে না' বললে যেন তাঁর গলার আগুনটা ঠিকমত উত্তাপ ছড়াতে পারত না। যে মুহূর্তে কথাগুলো তিনি বলছিলেন, সেটি একটি আরোহনের মুহূর্ত—যুক্তি দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে তিনি যুক্তির অংশটি প্রতিষ্ঠা করে 'দাবায়া রাখার' মুহূর্তে উঠে গেলনা আবেগ? প্রত্যয়ের একটি চূড়ায়। ঠিক ওই সময়ে তার আঞ্চলিক ভাষা থেকে কয়েকটি শব্দ ধার নেয়াটা যেন বাংলাদেশের প্রাণের উচ্চারণটি তীব্র স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রকাশ করার জন্য জরুরি হয়ে পড়ল।

অথচ তাঁর ভাষণের অনেক জায়গায় বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে খুব সাজিয়ে ব্যবহার করেছেন—'২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস', অথবা 'বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস,' অথবা 'তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণটির মুদ্রিত রূপটি আমাদের এরকম একটা ভাবনার কাছে নিয়ে যায়—তিনি কি আগে লিখেছিলেন ভাষণটির একটি খসড়া?

তা না হলে এত সুন্দর কী করে হয় তাঁর বাংলা? এত সুঠাম বাক্যে কীভাবে তিনি সাজান তাঁর কথাগুলি?

বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি ভাষণ শুনেছি বলে আমি বলতে পারি, ওই দিন ধানমণ্ডি বত্রিশ নাম্বার থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত যাত্রায় ভাষণটি তিনি তাঁর মাথায় লিখে নিয়েছিলেন। মাত্র কুড়ি বাইশ মিনিটের ভাষণ, কিন্তু কী বাঙ্ময়, বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস থেকে নিয়ে সংগ্রামের রূপরেখা, মানুষের করণীয় এবং স্বাধীনতার একটা ঘোষণা—সবই তিনি ওই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলে দিলেন। বঙ্গবন্ধু ইংরেজি ভালই জানতেন—স্বাধীনতার পর ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি শুনলে বোঝা যাবে, ইংরেজিতে তাঁর দখল মন্দ ছিল না। কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণে তিনি অকারণ কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন নি। 'প্রেসিডেন্ট,' 'ন্যাশনাল এসেম্বলি' অথবা 'সেক্রেটারিয়েট', 'সুপ্রিম কোর্ট' এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এগুলোতো ভাষার প্রতিদিনের ব্যবহারেই আমরা বলি। কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক-কে ইকোনোমিক বলেন নি, সাংস্কৃতিক-কে কালচারাল বলেন নি, মুক্তি কে ইন্ডিপেন্ডেন্স বলেন নি, নেতৃবৃন্দ না বলে লিডার্স বলেন নি।' পুরো ভাষণটা বাংলার প্রাণবন্ত ব্যবহারের একটি দলিল, যা একই সঙ্গে শিক্ষাহীন গ্রামের মানুষ এবং শিক্ষিত শহুরে মানুষ বুঝতে পারবে। একাত্তরের ৭ মার্চ যারা রেসকোর্সে এসেছিল, তারা সবাই বুঝেছে, পরের দিন যখন রেডিওতে সেটি প্রচারিত হয়, সবাই বুঝেছে। আজও যখন ভাষণটি কেউ শোনেন—সমাজ বা বিত্তের যে প্রান্তেই তার অবস্থান, তিনি সেটি বোঝেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে কেউ কেউ একটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাই বটে। কবিরা যদি যথাস্থানে তথাশব্দ ব্যবহারে পারদর্শী হন, তাহলে বঙ্গবন্ধুও তো কবি। এই ভাষণটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই নির্বিকল্প, প্রতিটি শব্দই তাৎপর্যমণ্ডিত। বক্তৃতার শেষে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধনিতার সংগ্রাম' একটি দু'পঙ্‌ক্তির কবিতাই বটে। এখানে মুক্তি ও স্বাধনিতার দুটি ব্যাখ্যা দেয়া আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যতটা রাজনেতিক-ভৌগলিক, মুক্তি ততটাই অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। একটি জাতি স্বাধীন হলেই সে মুক্ত হয় না। একটি দেশ অন্য কোনো দেশের আদর্শ ধারণ করে তার মুক্তিকে বিলিয়ে দিতে পারে। বঙ্গবন্ধু মুক্তির তাৎপর্য কী, তা জানতেন—তার কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। স্বাধনিতার বিষয়টি নিয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল না। স্পষ্ট কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। সেদিন তাঁর শ্রোতারা দুটিই চেয়েছিল। কিন্তু মাত্র সাড়ে চার বছর পর তাঁর যে ঘাতকেরা পাকিস্তানি কাপুরুষতার পুনরাবৃত্তি ঘটালো, তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও মুক্তি পায়নি। তারা পাকিস্তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিল। যুদ্ধাপরাধীরা, উগ্রবাদীরাও মুক্ত নয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে পাকিস্তানি

ভাবাদর্শ। এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থ। বঙ্গবন্ধু সেই মুক্তি চেয়েছিলেন যা স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, তিনি শুধু প্রত্যয়ে নয়, সৌজন্যে ও সততায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি 'এহিয়া সাহেব', 'ভুট্টো সাহেব' বলেছেন একাধিকবার। তাঁর কণ্ঠে হয়তো কিছুটা শ্লেষ ছিল, কিন্তু সৌজন্যও ছিল। একবার বলেছেন, 'আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব,' কিন্তু ঠিক তারপর বলেছেন, 'তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।' এই সৌজন্য পাকিস্তানি কোনো নেতা কোনোদিন দেখাতে পারেননি। এজন্যই কি না, ভুট্টো এত বিরাট জমিদার আর প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিবিদ হয়েও বঙ্গবন্ধুর সামনে এলে বাহাদুরিটা মূলতবি রাখতেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি তুললে ভুট্টো হৈ চৈ শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তর্কে নামতে ভুট্টো সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি। অথচ জাতিসংঘে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের পক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বক্তৃতা দিতেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিল যুক্তি এবং সততা, ভুট্টোর ছিল কপটতা আর অযুক্তি। বঙ্গবন্ধুর সামনে তার নিজেকে অরক্ষিত মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে মানুষকে একটা সংকল্পের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। শুরুতে সেই দুঃখবোধ, তারপর পাকিস্তানিদের শঠতার ইতিহাস। শুরুতে মানুষের বোধের কাছে তার প্রশ্ন 'কী অন্যায় করেছিলাম?' এবং একটু পরেই, ঠিক যখন মানুষ পাকিস্তানিদের শঠতার বিষয়টিকে ঘৃণা জানাতে শুরু করেছে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন 'কী পেলাম আমরা?' এই প্রশ্নে যখন মানুষ একটা হিসাবের দিকে তাকাতে শুরু করেছে নিজেদের মতো করে, বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দিলেন, 'আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরীব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে।' কি সুন্দর, ঝরঝরে তাঁর বাংলা। অথচ এই মুহূর্তটি মানুষের ঘৃণার একটা চরম বহিঃপ্রকাশের সময়ও। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বাঙালির গুলি খাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে আবার চলে গেলেন এহিয়া খানের প্রসঙ্গে। এবং এ প্রসঙ্গের এক পর্যায়ে যখন বললেন, পাঁচ ঘণ্টা গোপন বৈঠক করে ইয়াহিয়া খান বক্তৃতা দিলেন আর সব দোষ দিলেন বঙ্গবন্ধু ও বাংলার মানুষকে, রেসকোর্সের জনতার কাছে পক্ষ-প্রতিপক্ষের বিষয়টি স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল। তারপরই দ্বিতীয়বারের মতো 'ভাইয়েরা আমার' বলে জানিয়ে দিলেন, 'ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে' তিনি এসেম্বলিতে যোগ দিতে পারবেন না। তার পরই শুরু হল তাঁর ভাষণের সবচেয়ে কেজো অংশটা যেখানে তিনি হরতালের ঘোষণা দিয়েছেন, হরতালে গরীব মানুষদের যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' বলে তিনি যখন

আহ্বান জানালেন, এবং 'যা কিছু আছে' তা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোল, তখন মানুষের সামনে একটা পথ খুলে গেল। সেই পথটি আমাদের নিয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধে।

৪

একজন মানুষ এত সহজ ভাষায় মানুষের মনের ভেতরে, মাথার ভেতরে, রক্তের ভেতরে কীভাবে ঢুকে যেতে পারেন, তার প্রমাণ একাত্তরের ৭ মার্চ আমি পেয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কথা দূরবিস্তারি অনুরণন তুলেছিল রেসকোর্সের মাঠে। মানুষ আন্দোলিত হচ্ছিল, উদ্বেলিত হচ্ছিল ভাষণটির প্রতিটি বাক্য শুনে। আঞ্চলিক শব্দ মিশিয়ে যে বাংলা তিনি সেদিন ব্যবহার করেছিলেন, তাতে ইতিহাসের, লোকসংস্কৃতি আর জনজীবনের গভীরের দোলা অনুভব করা যাচ্ছিল। আজও যখন ভাষণটি শুনি, চোখ বন্ধ করলে বঙ্গবন্ধুর তেজদীপ্ত চেহারাটা মনে ভেসে আসে। তাঁর কথাগুলি পরিষ্কার শুনতে চাই, আর অনেক দিন আগের সেই অপরাহ্নে ফিরে যাই।

বিদেশি সাংবাদিক তার হোটেলে ফিরে যাবার আগে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ভাষণের পর কী হতে পারে। তিনি এক মুহূর্ত ভেবে বলেছিলেন, 'গেট রেডি'।

কী জন্য প্রস্তুত হতে হবে, সকল বাঙালিই তা জানত।

৭ মার্চের ভাষণ : ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিবেচনার ভূমিকা

সেলু বাসিত

আমাদের সমাজ বিন্যাসে কার্যকারণ যোজিত ঘটনা পরম্পরাঘাতে লোকায়তে অভিজাতে ঘটেছে সংঘাত। গণঅভ্যুদয় আমাদের চৈতন্যলোকে আত্মগত উপলব্ধিবোধের জন্ম দিয়েছে—জন্ম দিয়েছে আত্ম-সচেতনতা বোধের। সামগ্রিকভাবে সমাজ বিবর্তনের ধারায় মূল্যবোধের সঞ্চয়ণকে সত্তাগত উপলব্ধির সাথে অন্বয় সৃষ্টি করেছে মানসস্তরের। ব্রিটিশ ভারত বিভক্তি জনিত কারণে পূর্ববাংলা পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইতিহাস এদেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামোকে প্রভাবিত করলেও নানা ঘাত প্রতিঘাতে সত্তাগত চেতনার-উন্মেষ জন্ম দিয়েছে এক স্বাতন্ত্র্যময় অস্তিত্বের। ব্রিটিশ বণিক শিল্প পুঁজির সৃষ্ট এতদ্দেশীয় অভিজাত উচ্চবিত্ত, ইংরেজ আশ্রিত নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান আর হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির বিংশ শতকীয় বিকাশের সাথে বিকশিত ঢাকা ভিত্তিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণির বাংলার রাজনীতির সাথে রয়েছে এক ক্ষীণকায় পটভূমি। এ পটভূমির সাথে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে যুগান্তকারী রুশ বিপ্লব-কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সামাজিক বিকাশ যুক্ত হলো। মধ্যবিত্ত মুসলিম, সামন্ত দৈন্য বুর্জোয়া চেতনায় মুক্তবুদ্ধির প্রবাহ সৃষ্টি হল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) এবং তাদের মুখপত্র শিখা'র (১৯২৬) মাধ্যমে। কামরুদ্দীন আহমেদ এর ভাষায় এই সময়কালে 'ঢাকায় মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে তখনো রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেনি। যদিও কিছু কিছু মুসলমান ছেলে সন্ত্রাসবাদী দলে অথবা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। বাকি রাজনীতি আহসান মঞ্জিলের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল'।

ভাষা আন্দোলনের ফলে মনন শৈলীগত সৃজনশীলতার উৎসে যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের সামরিক শাসন তাকে স্তব্ধ করেছিল। আয়ুবি

শাসনামলের সূত্রপাতে এবং পরবর্তী দশকে অধিকাংশ মানবতাবাদী ও বামপন্থি বুদ্ধিজীবীরাও 'বিকার' ও 'নির্বিকারে' বিচিত্র লোভের শিকারে বর্ণান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়েছেন, কারো কারো 'অশক্ত বুর্জোয়া মানবতাবাদের নিরাপদ আশ্রয়ে ঘটেছে নৈতিক বিচ্যুতি।' এই ঘূর্নিপাকে রাজনীতি আবর্তিত হলেও ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, রবীন্দ্র জন্ম উৎসব, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ, ছয় দফা আন্দোলন, দেশ-কৃষ্টি আন্দোলন, ১১-দফা আন্দোলন, ঊন-সত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং এই সময়কালে আন্তর্জাতিক বামপন্থি আন্দোলনের মতাদর্শগত ও আন্তঃবিরোধ এদেশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তত্ত্ব গবেষণা ও দলীয় আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকলেও মেরুকরণ প্রক্রিয়া-সত্তরের নির্বাচন, সর্বোপরি প্রত্যক্ষ মুক্তিসংগ্রাম এক ইতিবাচক অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধির মননশীল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক গণবৈপ্লবিক এক রাষ্ট্রচেতনার সামাজিক আবহ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশ। সৈয়দ আকরম হোসেন এর এ-কথা যথার্থ যে 'বাংলাদেশের স্বপ্ন বাঙালি পুঁজিপতিদের কাছে আবশ্যক ছিল আত্মপ্রসাদের ক্ষেত্র হিসেবে। বাঙালি জনগণের কাছে ছিল সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসেবে, দুই প্রয়োজনের অনিবার্য প্রয়োজনে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছিনিয়ে আনল স্বাধীন রাষ্ট্রসীমা, রাষ্ট্রযন্ত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত। দুই বিরুদ্ধ প্রান্তকে যিনি ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিয়েছেন—তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক'। এই ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রদানকারী একাত্তরের একচ্ছত্র বাঙালি নেতৃত্বের অধিপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক বিকাশের ধারায় পূর্ব পুরুষদের মৌলিক মানবিক দিকসমূহ চিহ্নিত করেই বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর করেছেন আমাদের। আমরা বিকশিত জাতি চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছি আজকের স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্যের সূচনা একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে সূচিত হলো।

দুই

বঙ্গবন্ধুর 'আত্মজীবনী' যদি আমরা আত্মস্থ করি তাহলে দেখা যায় শৈশব এবং কৈশোরের চুম্বকবৎ অনুভবে সঞ্চারিত হয়েছে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক ব্যাপ্ত দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, মন্বন্তর, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষার যূথবদ্ধ, সুপারস্ট্রাকচারেল সমাজ এবং চিন্তন প্রক্রিয়া। ক্ষত-বিক্ষত এ-সমাজ বাস্তবতার অভিজ্ঞতা আর বলদীপ্ত তারুণ্যের প্রতিবাদ-উজ্জীবিত সময়কালের পটভূমিতে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিশ্রুদ্ধি ঘটেছে সূর্যসম্মত এক জীবন অন্বেষার দিকে। এ জীবন ভাবনায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বস্তুলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিমন্ডল হল তাঁর জীবন, জীবনায়তনের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠে উপলব্ধি করা যায় কাল সচেতন, ঐতিহাসিক বোধ আর পারিপার্শ্বিক চাঞ্চল্যে (ঊহারৎড়হসবহঃধষ ংবয়ঁবহপব) প্রবল অস্তিত্ব ও সত্তা সচেতন ভাবনায় তাঁর জীবন সংগ্রামকে অনুরনিত করেছেন।

তাঁর বিপন্ন মনুষ্যত্বের সামনে সংবেদন লাভ করা যায়, পূর্ণাঙ্গ মানবিক এবং সেমেটিক সচেতন জীবন-উপলব্ধির বাঙালির আত্মপর—আছে বিপর্যস্ত মানবাত্মার স্বীকরণকৃত উদ্বেলতা। উদ্বেলতায় বেগবান তটিনীর সমুদ্র সঙ্গমের মত লক্ষ্যাভিসারী মাটির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের জীবন মন্থনের উত্তাপ, অখন্ড বিশ্বলোকের মানবিক মোহনায় মিলনের উদ্বেলতা।

ভূম্যাধিকারী বংশগত ঐতিহ্যের মধ্য-শ্রেণি বৈশিষ্ট্যে সামন্তবাদী প্রতিবেশে সমাজ-সংকটের অবয়ব, শোষণ আর শ্রম আত্মসাৎ-এর বিরুদ্ধে, জনগণের একাংশে চিন্তার স্বেচ্ছাচারিতা এ সকলই তাঁকে বিচলিত করে। কখনোবা মধ্যবিত্ত সূলভ সংবেদে তিনি উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। তবে, আর্থ-সমাজ-রাজনীতির বিকাশের আহৃত সচেতনতার উপলব্ধি নিয়ে—বহুধা বিভক্ত আমাদের শ্রেণি পারম্পর্যকে আত্মস্থসহকারে স্বাধীনতামুখীন সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে তিনি ছিলেন প্রত্যাশী।

তিন

পঞ্চাশের বিবদমান সমাজ চৈতন্য আর বাঙালি জীবনায়তনে প্রবল প্রতাপ জীবনাগ্রহ, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের গণ-বৈপ্লবিক চেতনার প্রেক্ষাপটে ৬ দফা আন্দোলনের সূচনা আর ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সত্তরের বিজয়ের উন্মেষ ঘটেছে। মৃত্তিকায় মানুষের প্রাণের স্পন্দনে, যেখানে সৃষ্টি হবে নতুন স্বদেশ, নতুন দিনের আলোর প্রভাতে তাই প্লাবন জাগে নিঃস্ব প্রাণে—'এবার এলো শক্তিহীনের শক্তি লাভের দিন, নবীন ভুবন সৃষ্টি হবে, ঐক্যে অমলিন'॥ এই প্রত্যাশারই প্রতিফলন ৭ মার্চের ভাষণের বিবরণে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি দিলওয়ার তাই বলেন :

তোমার ৭ মার্চের ভাষণ—
আমাকে নিয়ে যায় খ্রীস্ট পূর্ব ৩৮৩ অব্দে
ঐ অব্দ বাগ্মীতার-র ইতিবৃত্তে চির অম্লান,
ঐ অব্দে যে-শিশু জন্ম নেয়
নাম তার ডেমস্থিনিস
৬১ বছরের আয়ু নিয়ে আসা এই পুরুষ
বাল্যকালে শব্দ উচ্চারণে ছিলেন
ঘোর প্রতিবন্ধী, ত্রাস জাগানো ছিল
মুখের বিকৃতি; কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি
রসনায় জট পাকানো এই বালক একদিন
অনলবর্ষী বক্তৃতা-ভাষণ-এ
কাঁপিয়ে তুলবে মেসিডোনিয়া-র ভিৎ
(The classical tradition of public
Speaking which governs
The oratory of today as much as
It did that of boygone ages

Springs from the works of the
Greats and the noblest of
Ancient Greeks Demosthenes
His own life – work was a
Fight of the freedom and independence
Of Athens and Greek against the
Invasion of philip of Macedon and
His son Alexander.)

বাংলার ডেমস্থিনিস্/৭ মার্চের তোমার ভাষণ/ক্রমশ গর্জনশীল হয়ে উঠছে।

চার

১৯৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ তাই লোক-ঐতিহ্যে স্বী-করণের সম্প্রসারনশীল সংস্কৃতি বাংলা ভাষার গ্রহণ শক্তিকে যেভাবে 'বাক্ সম্প্রদায়ের সদস্যদের মনঃসম্ভূত প্রতীক-অন্তর্লেখ্যের একটি সংশ্রয়' রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই বাক-সম্প্রদায় গণচৈতন্য, জন-সম্মিলন হলো সমগ্র বাঙালিসহ বাংলাদেশের ভূ-অভ্যন্তরস্ত জাতি-সম্প্রদায়। যারা ৭ মার্চের শ্রৌত-একক অবিছিন্ন বচনক্রম (Connected discourse) দ্বারা উদ্দীপিত, উজ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে যার যার অবস্থান থেকে সমর্পিত হতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নেতৃত্ব হচ্ছে is the process through which one member of a group (Its leader) influences other group member toward the attainment of specific group goals, G yukl-এর এ-কথাটি যে কোন জাতি-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ-ক্ষেত্রে Leadership motivation, personalized power motivation Ges socialized power motivation বঙ্গবন্ধুর স্বভাবজ, যা আচরণ বিদ্যার ভাষায় তাঁকে Transformational Leader-এ উন্নীত করেছে। Howell and frost-এর ভাষায় বলা যায়, 'Transformational leaders propose a vision, they describe, usually in vivid, emotion- provoking term, an image of what their nation could and should-become'. এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সামাজিক মনোবিদ্যাগত ও যোগাযোগ তত্ত্বের আলোকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় পৃথিবীর বিখ্যাত জন-ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনায়কদের নানা দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ। যেমন :

গ্রীসের ডেমস্থিনিসস্থেনেস (৩৮৪-৩২২) ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তা। স্বদেশের মুক্তির জন্য তাঁর ৩টি ভাষণ আজও পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এন্ডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) ভারতের গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ উত্থাপন করে মানুষের দৃষ্টি খুলে দেন। তাঁর দীর্ঘ ভাষণ বিশ্ব-রাজনীতির সাহিত্যে অতুলনীয় সম্পদ।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ষোলোতম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-১৮৬৫) গেটিসবার্গ যুদ্ধে শহীদদের সমাধিক্ষেত্র উদ্বোধনকালে মাত্র তিন মিনিটের যে ভাষণ দেন 'গেটিসবার্গ এ্যাড্রেস' নামে বিশ্বের রাজনৈতিক বক্তৃতার অবিস্মরণীয় বিবরণ তা। অনুরূপভাবে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' শীর্ষক ঐতিহাসিক ভাষণের সাথে অনেকে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনা করে থাকেন। মার্টিন লুথার কিং-ভাষণের কণ্ঠের সাথে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠের মিল খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়, এছাড়া ম্যালকম এক্স, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, ফিদেল কাস্ত্রো, চেগুয়েভারা-এসব জাতীয়তাবাদী নেতার বিভিন্ন পর্যায়ের ভাষিক চিন্তার সামঞ্জস্যও বিদ্যমান রয়েছে, যা বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ও চেতনার অংশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষিক যোগ্যতাবোধকতা সংহত এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ছিল রাষ্ট্রচালক রূপে, House, spangeter and woyeke-এর ভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র নেতৃত্বে বিশ্লোষিত মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধারণা নিয়ে ব্যক্ত করা যায় যে, high levels of self confidence and confidence in their followers, a high degree of concern for their followers, needs; excellent communication skills, such as the ability to 'read' others reactions quickly and accurately; and a stirring personal style. যা যৌক্তিক এ-শৈলীতে বৌদ্ধিক বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায় : 'impression management' তাঁর করায়ত্ব ছিল।

এ ভাষণে বিবৃত হয়েছে বাঙালির জীবন সংগ্রামের পটভূমি এবং লক্ষ্য। প্রজ্ঞাময় সম্মোহিত এ ভাষণ সম্পর্কে ৫ এপ্রিল'৭১ নিউজ উইক বলে : Mujib can attract a crowd of million people to his rallies and hold then spell-bound with great rolling waves of emotional rhetoric.

আহমদ ছফা বঙ্গবন্ধুকে মধ্যযুগের বাংলার রাজাভীমের মতো অভেদ্য মৃত্তিকা-দূর্গের নির্মাণ-কীর্তির লোক-কর্তারূপে চিহ্নিত করে বলেন : বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান এ-দুটো যমজ শব্দ একটি আরেকটার পরিপূরক এবং দুটো মিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল এক অচিন্তিত পূর্ব কালান্তরের সূচনা করেছে।

পাঁচ

ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায় সংখ্যাতাত্ত্বিক গুরুত্ব যেমন ভাষা সংগঠনকে চিহ্নিত করে ব্যক্তিত্বের কলা-বৈশিষ্ট্য তেমনি সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনায় সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের দ্বি-বিধ প্রকরণ বৈশিষ্ট্য এ-ক্ষেত্রে বিবেচ্য। প্রথমত ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য ব্যাষ্টিক ভাষা-রূপ এবং সংগঠন দ্বিতীয়তঃ সামষ্টিক ভাষা সংগঠন এবং রূপ বৈশিষ্ট্য। আফ্রো

এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকায় নিগৃহীত নিষ্পেশিত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তির এক সংগ্রামী অনুপ্রেরণা ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষ্য-মালা। একজন মানুষকে বিভিন্ন মুখী ভাষা ধর্মাচরন, সামাজিক বিন্যাস ইত্যাদি সযত্নে দূরপাল্লায় রেখে প্রেমাঙ্কুর জীবনকে ৭ সমুদ্রের বিশালতায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, This the motto of nature unifined philosophy of life and death. বঙ্গবন্ধু সে-প্রত্যয়ে জীবনে ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে এ দর্শনকে সন্দর্শন করেছেন আত্ম-সন্ধিৎসার আরাধনায়।

মুনীর চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়: "ভাষা মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপনের প্রধানতম সেতু, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম নির্বাহের অপরিহার্য মাধ্যম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই মানব-সমাজের মর্ম উদ্ধারে তৎপর সমাজতত্ত্ববিদ স্বাভাবিক কারণেই মানুষের ভাষার নানাবিধ পরিচয় গ্রহণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। ভাষার পরিসংখ্যানমূলক বিচারের উপকরণমূল্যের, ভাষার হ্রস্বদীর্ঘ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গণনার দ্বারা সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষার লেখ্য রূপের একাধিক বিস্তৃতি খণ্ড পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সে ভাষার সকল হরফ সমসংখ্যক বার ব্যবহৃত হয় না। কিছু হরফ আছে যা একই শব্দে বা দু-এক শব্দ পর পরই বার বার উদিত হয়। কিছু হরফ অত ঘন ঘন নয়। আবার দু-চারটে হরফ এমনও রয়েছে যার দর্শন মেলা ভার।" এতে বাক জনগোষ্ঠীর এবং ব্যক্তিক ধ্বনি প্রকৃতির প্রকাশ পায়, যেমন শতকরা হিসাবে ইংরেজী মূলধ্বনির ব্যবহার সংখ্যার ক্রমিক হার নিম্নরূপ :

ও	৮.৫৩%	ধও	১.৫৯%		হ	৭.২৪ %	ঢ়	২.০৪ %
∂	৪.৬৩	ড়ঁ	১.৩০		ঃ	৭.১৩	ভ	১.৮৪
ধব	৩.৯৫	∂	১.২৬		ৎ	৬.৮৮	য	১.৮১
ɛ	৩.৪৪	ঁ	০.৬৯		ং	৪.৫৫	ন	১.৮১
ধ	২.৮১	ধঁ	০.৫৯		ফ	৪.৩১	হ	০.৯৬
∧	২.৩৩	ধ	০.৪৯		ও	৩.৭৪	ঝ	০.৮২
র	২.১২	ড়	০.৩৩		℘	৩.৪৩	ম	০.৭৪
ব, বও	১.৮৪	লঁ	০.৩১		ু	২.৯৭	ল	০.৬০
ঁ	১.৬০	∂ও	০.০৯		স	২.৭৮	ঃং	০.৫২
					শ	২.৭১	ফ৩	০.৪৪
					া	২.২৮	θ	০.৩৭
					ি	২.০৮	৯	০.০৫
	———				———			
Total — 38%					Total — 62%			

অনুরূপ ভাবে বাংলা ধ্বনি পুনঃসংগঠন শব্দের পৌনঃপুনিকতার বিবরণ শ্রেণিভেদ অনুযায়ী নিম্নরূপ হতে পারে যা এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় :

এ পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাগত স্টাইলের স্বরূপ নিরূপণে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহারের পরিমাণগত আপেক্ষিক বিপুলতার কথা, ভিন্নার্থক স্বতন্ত্র শব্দের ব্যবহার যাঁর রচনায় যত বেশী সংখ্যক হবে তত তার শব্দ সম্পদের ঐশ্বর্য বেশী প্রশংসনীয় বলা যায়।

মনীর চৌধুরীর কথায় আরও বলা যায় : 'সংখ্যাতত্ত্ববিদ সাহিত্যের প্রকৃত সমঝদার না হতে পারেন; কিন্তু তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেন ভাষায় পৌনঃপুনিক ভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণির শব্দসমষ্টি পরস্পরের সঙ্গে কি কি আঙ্কিক সূত্রে গ্রথিত থাকে তার মর্মোদ্ধার করতে। তিনি আবিষ্কার করতে চান এর মধ্যে কোন্ সম্পর্কটা রচনা বিশেষের স্থায়ী গুণবাচক, বিষয়বৈষম্য বা আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি যাকে বিকৃত করে না। তিনি শব্দসমূহের অসমসংখ্যক বার ব্যবহারের সমাকৃত গড়ে বা ওয়েটেড মীন হিসাব করেন গী, তার অসম বিচ্যুতির সাধারণ মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিয়েশন পরিমাপ করেন θী; উভয়ের আনুপাতিক বিচ্যুতির গুণক বা কোফেশিয়েন্ট অব ভ্যারিয়েশন ঠী নিরূপণ করেন। আমাদের মত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ভাষাসাহিত্যের ছাত্রের জন্য দূরূহ সমীকরণ উপস্থিত করে বলেন যে ঠী/√/ঘ বা V^2x/N বা $\frac{\theta x/\sqrt{N}}{Mx}$ বা নিতান্ত সংক্ষেপে ঠস সাহিত্যরীতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক একটি উৎকৃষ্ট সূত্র রূপে গৃহীত হতে পারে। কারণ হিসাবে বলা হয় সব রচনার আন্তরস শব্দ বিন্যাসের অন্যান্য আনুপাতিক সম্পর্ক সামান্য কারণে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ঠস-এর অঙ্কফল স্থায়ী, কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক। এই অঙ্কের নির্দেশ গৃহীত হোক বা না হোক, সংখ্যাতত্ত্ববিদের পরীক্ষালব্ধ সুত্র অনুসরণ করে শব্দসুমারীর কাজে অগ্রসর হলে ভাষাতত্ত্ববিদ ভাষা সম্পর্কে এবং সাহিত্যিক ভাষারীতি বা স্টাইল সম্পর্কে যে নতুন দৃষ্টি লাভ করতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।' এ ভিত্তিতে ৭ মার্চের ভাষণকে আমরা বিবেচনা করতে পারি, তাতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের এক বিশেষ দিক উন্মোচিত হবে, যাতে আমাদের ভাষা গুণেরও নতুন মাত্রা নির্দিষ্ট হতে পারে।

ছয়

ডেমস্থিনিসের বক্তৃতায় স্বতন্ত্র শব্দ আছে ৪৯৭২, আব্রাহাম লিঙ্কন, উচ্চ স্বরগ্রামে উপভাষিক ক্যাল্টিক উচ্চারণে গেটিসবার্গ ভাষণ দেন দু'শ বাহাত্তর শব্দে এবং দশ বাক্যে। অবশ্য অনুষ্ঠানের মূল নান্দিপাঠে এডয়ার্ড এভারেটর ১৩, ৬০৭ শব্দে দু ঘণ্টা ব্রুপধী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একক বক্তা ও নির্দেশক। গণযোগাযোগ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের এ-কথা যথার্থ যে : 'প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ

করেছিলেন। সম্প্রচারতত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ আদর্শ হিসাব। এক হাজার একশত ৭টি শব্দের এ-ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই—আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম'।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উচ্চরিত বর্ণ সংখ্যা মূলধ্বনি ও অতিরিক্ত ধ্বনি মূলীয় বৈশিষ্ট্য নিদর্শন করতে প্রয়োজনীয় ভাষণের অক্ষর (syllabic) বিন্যাস এবং পৌনঃপুনিকতা নিম্নরূপ :

স্বরবর্ণ

অ — ৯
আ — ১১৪ + া ৪৯২ = ৬০৬
ই — ৩৫ + ি ২৪৫ = ২৮০
ঈ — ০ + ী ২৯ = ২৯
উ — ৩ + ু ৭৩ + ৭৬
ঊ — ০ + ূ ৬ = ৬
ঋ — ০
এ — ৩৯ + ে ৫০৭ = ৫৩৮
ঐ — ০ + ৈ ৫ = ৫
ও — ২২ + ো ৫৪ = ৭৬
ঔ — ০ + ৌ ১ = ১
অং — ০
অঃ — ০

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	—	১২১	ঞ	— ৪ + ঁ ৪ = ৮
খ	—	৩৪ + ক্ষ = ৩৭	ট	— ৩৪
গ	—	৩০	ঠ	— ৫
ঘ	—	২	ড	— ৬
ঙ	—	৭ + ং ১৩ + ২০	ঢ	— ১
চ	—	৩৪	ণ	— ৭ + ন ২০৭ = ২১৪
ছ	—	৩৫	ত	— ১২২ + ৎ ৩ = ১২৫
জ	—	৩৭	থ	— ৬
ঝ	—	২	দ	— ১২২
ধ	—	১৫		
ন	—	২০৭		
প	—	৬৫		

ফ	—	৬		
ব	—	১৫৮		
ভ	—	১৩		
ম	—	১৭০		
য	—	২৮		
র	—	৩৫২ + ্র ২৬ + ্য ২৪ = ৪০৫		
ল	—	১২৬		
শ	—	৩৮		
ষ	—	২৮		
স	—	৮২		
হ	—	৪৮ + ঃ ৬ = ৫৪		
ক্ষ	—	৩		
ড়	—	৫		
ঢ়	—	০		
য়	—	২৯ + ্য ৩২ = ৫১		
ৎ	—	৩		
ং	—	১৩		
ঃ	—	৬		
ঁ	—	৪		

স্বতন্ত্রভাবে কার ও ফলার বিবরণ নিম্নরূপ :

কার ফলা

া	—	৪৯২	্য	—	৩২	
ি	—	২৪৫	্র (রেফ)	—	২৬	
ী	—	২৯	্ব	—	২৪	
ু	—	৭৩				
ূ	—	৬				
ৃ	—	৩				
ে	—	৫০৭				
ৈ	—	৫				
ো	—	৫৪				
ৌ	—	১				

বঙ্গবন্ধুর শব্দার্থিক বৈশিষ্ট্য ডাইগ্লোসিয় চরিত্রকে যেমন ধরে রেখেছে তেমনি উপ-ভাষিক ধ্বনি-মাত্রাকে বিম্বিত করে স্বতন্ত্র শব্দ সমষ্টি বৈচিত্র্য-রূপ-সংগঠনে ভাষা সাংগঠনিক অতিরিক্ত ধ্বনি-রূপগত সম্প্রসারণশীলতাকে চিহ্নিত করে।

এ প্রেক্ষিতে ভাষণের স্বতন্ত্র শব্দ-গুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

ভায়েরা	গোলাম	তাদের	অস্ত্র
আমার	করে	সঙ্গে	কিনেছি
আজ	রেখেছে	আলাপ	বহিঃ শত্রুর
দুঃখ	উনিশ'শ	করলাম	আক্রমণ
ভারাক্রান্ত	সষট্টি	আপনারা	থেকে
মন	সালে	আসুন	দেশকে
নিয়ে	ছয়	বসুন	রক্ষা
আপনাদের	দফার	আমরা	করার
সামনে	আন্দোলনে	আলাপ	জন্য
হাজির	৭অই	করে	আজ
হয়েছি	জুনে	শাসনতন্ত্র	সেই
আপনারা	আমার	তৈয়ার	অস্ত্র
সবই	ছেলেদের	করি	ব্যবহার
জানেন	গুলি	তিনি	হচ্ছে
এবং	করে	বললেন	আমার
বোঝেন	হত্যা	পশ্চিম	দেশের
আমরা	করা	পাকিস্তানের	গরীব
আমাদের	হয়েছে	মেম্বাররা	দুঃখী
জীবন	উনিশ'শ	যদি	নিরস্ত্র
দিয়ে	ঊনসত্তরের	এখানে	মানুষের
চেষ্টা	আন্দোলনে	আসে	বিরুদ্ধে
করেছি	আয়ুব	তাহলে	তার
কিন্তু	খাঁনের	কসাইখানা	বুকের
দুঃখের	পতন	হবে	উপর
বিষয়	হওয়ার	এসেমব্লি	হচ্ছে
আজ	পরে	তিনি	গুলি
ঢাকা	যখন	বললেন	আমরা
চট্টগ্রাম	এহিয়া	যে	পাকিস্তানের
খুলনা	খান	যাকে	সংখ্যাগুরু
রাজশাহী	সাহেব	তাকে	আমরা
রংপুরে	সরকার	মেরে	বাঙালিরা
আমার	নিলেন	ফেলে	যখনই
ভাইয়ের	তিনি	দেওয়া	ক্ষমতায়
রক্তে	বললেন	হবে	যাওয়ার
রাজপথ	দেশের	যদি	চেষ্টা
রঞ্জিত	শাসনতন্ত্র	কেউ	করেছি

হয়েছে	দেবেন	এসেমব্লিতে	তখনই
আজ	গণতন্ত্র	আসে	তারা
বাংলার	দেবেন	তাহলে	আমাদের
মানুষ	আমরা	পেশোয়ার	উপরে
মুক্তি	মেনে	থেকে	ঝাঁপিয়ে
চায়॥	নিলাম	করাচি	পড়েছেন
বাংলার	তারপরে	পর্যন্ত	টেলিফোনে
মানুষ	অনেক	দোকান	আমার
বাঁচতে	ইতিহাস হয়ে	জোর	সঙ্গে
চায়	গেল	করে	তাঁর
বাংলার	নির্বাচন	বোন্ধ	কথা
মানুষ	হলো	করা	হয়
তার	আমি	হবে	তাঁকে
অধিকার	প্রেসিডেন্ট	আমি	আমি
চায়	এহিয়া	বললাম	বলেছিলাম
কি	খান	এসেমব্লি	জেনারেল
অন্যায়	সাবের	চলবে	এহিয়া
করেছিলাম	সাথে	তারপরে	খাঁন
নির্বাচনের	দেখা	হঠাৎ	সাহেব
পরে	করেছি	এক	আপনি
বাংলাদেশের	আমি	আইনে	পাকিস্তানের
মানুষ	শুধু	এসেমব্লি	প্রেসিডেন্ট
সম্পূর্ণভাবে	বাংলার	বোন্ধ	দেখে
আমাকে	নয়	করে	যান
আওয়ামী	পাকিস্তানের	দেওয়া	কীভাবে
লীগ কে	মেজরিটি	হলো	আমার
ভোট	পার্টির	এহিয়া	গরীবের
দেন	নেতা	খান	উপরে
আমাদের	হিসাবে	সাহেব	আমার
ন্যাশনাল	তাঁকে	প্রেসিডেন্ট	বাংলার
এসেমব্লি	অনুরোধ	হিসাবে	মানুষের
বসবে	করলাম	এসেমব্লি	বুকের
আমরা	পোনারই	ডেকেছিলেন	উপরে
সেখানে	ফেব্রুয়ারি	আমি	গুলি
শাসনতন্ত্র	তারিখে	বললাম	করা
তৈয়ার	আপনি	যে	হয়েছে
করবো	জাতীয়	আমি	কি

এবং	পরিষদের	যাবো	করে
এ দেশকে	অধিবেশন	ভুট্টো	আমার
আমরা	দেন	সাহেব	মায়ের
গড়ে	তিনি	বললেন	বুক
তুলবো	আমার	তিনি	খালি
এদেশের	কথা	যাবেন	করা
মানুষ	রাখলেন	না	হয়েছে
অর্থনৈতিক	না	পয়ত্রিশ	কি
রাজনৈতিক	তিনি	জন	করে
সাংস্কৃতিক	রাখলেন	সদস্য	মানুষকে
মুক্তি	ভুট্টো	পশ্চিম পাকিস্ত	হত্যা
পাবে	সাহেবের	ানের	করা
কিন্তু	কথা	থেকে	হয়েছে
দুঃখের	তিনি	এখানে	আপনি
বিষয়	বললেন	আসলেন	আসুন
আজ	প্রথম	তারপর	দেখুন
দুঃখের	সপ্তাহে	হঠাৎ	বিচার
সঙ্গে	মার্চ	বোন্ধ	করুন
বলতে	মাসে	করে	উনি
হয়	হবে	দেওয়া	বললেন
তেইশ	আমরা	হলো	আমি
বচ্ছরের	বললাম	দোষ	নাকি
করুণ	ঠিক	দেওয়া	স্বীকার
ইতিহাস	আছে	হলো	করেছি
বাংলার	আমরা	বাংলার	যে
অত্যাচারের	এসেমব্লিতে	মানুষকে	দশ
বাংলায়	বসবো	দোষ	তারিখে
মানুষের	আমি	দেওয়া	রাউন্ড
রক্তের	বললাম	হলো	টেবিল
ইতিহাস	এসেমব্লির	আমাকে	কনফারেন্স
তেইশ	মধ্যে	বোন্ধ	হবে
বছরের	আলোচনা	করে	আমি তো
ইতিহাস	করবো	দেয়ার	অনেক
মুমূর্ষ	এমন কি	পরে	আগেই
নর	আমি	এ দেশের	বলে
নারীর	এ	মানুষ	দিয়েছি
আর্তনাদের	পর্যন্ত	প্রতিবাদ মুখর	কিসের

ইতিহাস	বললাম	হয়ে	রাউন্ড
বাংলার	যদি	উঠলো	টেবিল
ইতিহাস	কেউ	আমি	কার
এ দেশের	ন্যায্য	বললাম	সঙ্গে
মানুষের	কথা	শান্তিপূর্ণভাবে	বসবো
রক্ত	বলে	আপনারা	যারা
দিয়ে	আমরা	হরতাল	আমার
রাজপথ	সংখ্যায়	পালন	মানুষের
রঞ্জিত	বেশী	করেন	বুকের
করার	হলেও	আমি	রক্ত
ইতিহাস	একজন	বললাম	নিয়েছে
উনিশ'শ	যদিও	আপনারা	তাদের
বায়ান্ন	সে	কল	সঙ্গে
সালে	হয়	কারখান সব	বসবো
রক্ত	তার	বন্ধ	হঠাৎ
দিয়েছি	ন্যায্য	করে	আমার
উনিশ'শ	কথা	দেন	সঙ্গে
চুয়ান্ন	আমরা	জনগণ	পরামর্শ
সালে	মেনে	সাড়া	না
নির্বাচনে	নেবো	দিলো	করে
জয়লাভ	জনাব	আপন	৫ ঘণ্টা
করেও	ভুট্টো	ইচ্ছায়	গোপনে
আমরা	সাহেব	জনগণ	বৈঠক
গদিতে	এখানে	রাস্তায়	করে
বসতে	এসেছিলেন	বেরিয়ে	যে
পারি	আলোচনা	পড়লো	বক্তৃতা
নাই	করলেন	তারা	তিনি
উনিশ'শ	বলে	শান্তিপূর্ণভাবে	করেছেন
আটান্ন	গেলেন	সংগ্রাম	সমস্ত
সালে	যে	চালিয়ে	দোষ
আইয়ুব	আলোচনার	যাবার	তিনি
খাঁন	দরজা	জন্য	আমার
মার্শাল'ল	বোন্ধ	স্থির	উপরে
জারি	না	প্রতিজ্ঞাবদ্ধ	দিয়েছেন
করে	আরও	হলো	বাংলার
করি	আলোচনা	কি	মানুষের
দশ	হবে	পেলাম	উপরে

বচ্ছর	তারপর	আমরা?	দিয়েছেন
পর্যন্ত	অন্যান্য	আমরা	ভাইয়েরা
আমাদের	নেতৃবৃন্দ	পয়সা	আমার
পঁচিশ	অন্যান্য	দিয়ে	রেডিও
তারিখে	জিনিসগুলো	রাখতে	টেলিভিশনের
এসেমব্লি	আছে	পারবা	কর্মচারীরা
কল	সেগুলোর	না	যদি
করেছে	হরতাল	আমরা	রেডিওতে
রক্তের	কাল	যখন	আমাদের
দাগ	থেকে	মরতে	কথা
শুকায়	চলবে	শিখেছি	না
নাই	না	তখন	শোনে
আমি	রিক্সা	কেউ	তাহলে
দশ	ঘোড়ার	আমাদের	কোন
তারিখে	গাড়ি	দমাতে	বাঙালি
বলে	চলবে	পারবে	রেডিও
দিয়েছি	রেল	না	স্টেশনে
অই	চলবে	আর	যাবেন
শহীদের	লঞ্চ	যে	না
রক্তের	চলবে	সমস্ত	যদি
উপর	শুধু	লোক	টেলিভিশন
পাড়া	সেক্রেটারিয়েট	শহীদ	আমাদের
দিয়ে	সুপ্রীম কোর্ট	হয়েছে	নিউজ
আরটিসিতে	হাই কোর্ট	আঘাত	না
মুজিবুর	জজ কোর্ট	প্রাপ্ত	দেয়
রহমান	সেমি	হয়েছে	কোন
যোগদান	গভর্নমেন্ট	আমরা	বাঙালী
করতে	দফতর গুলো	আওয়ামী	টেলিভিশনে
পারে	ওয়াপদা	লীগের	যাবেন
না	কোনো	থেকে	না
এসেমব্লি	কিছু	যদ্দুর	দুই
কল	চলবে	পারি	ঘণ্টা
করেছেন	না	তাদের	ব্যাংক
আমার	আটাশ	সাহায্য	খোলা
দাবি	তারিখ	করতে	থাকবে
মানতে	কর্মচারীরা	চেষ্টা	যাতে
হবে	যায়ে	করবো	মানুষ

প্রথম	বেতন	যারা	তাদের
সামরিক	নিয়ে	পারেন	মায়না
আইন	আসবেন	আমার	পত্র
মার্শালল	এরপরে	রিলিফ	নেবার
উইদ্র	যদি	কমিটিতে	পারে
করতে	বেতন	সামান্য	কিন্তু
হবে	দেওয়া	টাকা	পূর্ব
সমস্ত	না	পয়সা	বাংলা
সামরিক	হয়	পৌঁছিয়ে	থেকে
বাহিনীর	আর	দেবেন	পশ্চিম
লোকদের	যদি	আর	পাকিস্তানে
ব্যারাকে	একটা	এই	এক
ফেরত	গুলি	৭	পয়সাও
নিতে	চলে	দিন	চালান
হবে	আর	হরতালে	হতে
যেভাবে	যদি	যে	পারবে
হত্যা	আমার	সমস্ত	না
করা	লোককে	শ্রমিক	টেলিফোন
হয়েছে	হত্যা	ভায়েরা	টেলিগ্রাম
তার	করা	যোগদান	আমাদের
তদন্ত	হয়	করেছেন	এই
করতে	তোমাদের	প্রত্যেকটা	পূর্ব
হবে	কাছে	শিল্পের	বাংলায়
আর	আমার	মালিক	চলবে
জনগণের	অনুরোধ	তাদের	এবং
প্রতিনিধির	রইলো	বেতন	বিদেশের
কাছে	প্রত্যেক	পৌঁছায়ে	সঙ্গে
ক্ষমতা	ঘরে	দেবেন	নিউজ
হস্তান্তর	ঘরে	সরকারী	পাঠাতে
করতে	দুর্গ	কর্মচারীদের	হলে
হবে	গড়ে	বলি	আপনারা
তারপর	তোল	আমি	চালাবেন
বিবেচনা	তোমাদের	যা	কিন্তু
করে	যা	বলি	যদি
দেখবো	কিছু	তা	এ দেশের
আমরা	আছে	মানতে	মানুষকে
এসেমব্লিতে	তাই	হবে	খতম

বসতে	নিয়ে	যে	করার
পারবো	শত্রুর	পর্যন্ত	চেষ্টা
কি	মোকাবেলা	আমার	করা
পারবো	করতে	এই	হয়
না	হবে	দেশের	বাঙালীরা
এর	এবং	মুক্তি	বুঝে
পূর্বে	জীবনের	না	শুনে
এসেমব্লিতে	তরে	হবে	কাজ
বসতে	রাস্তা	খাজনা	করবেন
আমরা	ঘাট	ট্যাক্সো	প্রত্যেক
পারি	যার	বোন্ধ	গ্রামে
না	যা	করে	প্রত্যেক
আমি	আছে	দেওয়া	মহল্লায়
আমি	সবকিছু	হলো	আওয়ামী
প্রধান মন্ত্রীত্ব	আমি	কেউ	লীগের
চাই	যদি	দেবে	নেতৃত্বে
না	হুকুম	না	সংগ্রাম
আমরা	দেবার	শোনেন	পরিষদ
এ-দেশের	নাও	মনে	গড়ে
মানুষের	পারি	রাখবেন	তোলো
অধিকার	তোমরা	শত্রু	এবং
চাই	বোন্ধ	বাহিনী	তোমাদের
আমি	করে	ঢুকেছে	যা
পরিস্কার	দেবে	নিজেদের	কিছু
অক্ষরে	আমরা	মধ্যে	আছে
বলে	ভাতে	আত্ম	তাই
দেবার	মারবো	কলহ	নিয়ে
চাই	আমরা	সৃষ্টি	প্রস্তুত
যে	পানিতে	করবে	থাকো
আজ	মারবো	লুট	মনে
থেকে	তোমরা	তরাজ	রাখবা
এই	আমার	করবে	রক্ত
বাংলাদেশে	ভাই	এই	যখন
কোর্ট-কাচারী	তোমরা	বাংলায়	দিয়েছি
আদালত	ব্যারাকে	হিন্দু	রক্ত
ফৌজদারী	থাকো	মুসলমান	আরও
শিক্ষা	কেউ	বাঙালি	দেবো

প্রতিষ্ঠান	তোমাদের	নন	এই
অনির্দিষ্টকালের	কিছু	বাঙালি	দেশের
জন্য	বলবে	যারা	মানুষকে
বোন্ধ	না	আছে	মুক্ত
থাকবে	কিন্তু	তারা	করে
গরীবের	আর	আমাদের	ছাড়বো
যাতে	আমার	ভাই	ইনশাআল্লাহ
কষ্ট	বুকের	তাদের	এবারের
না	উপর	রক্ষার	সংগ্রাম
হয়	গুলি	দায়িত্ব	আমাদের
যাতে	চালাবার	আপনাদের	মুক্তির
আমার	চেষ্টা	উপরে	সংগ্রাম
মানুষ	করো	আমাদের	এবারের
কষ্ট	না	যেন	সংগ্রাম
না	৭	বদনাম	স্বাধীনতার
করে	কোটি	না	সংগ্রাম
সেই	মানুষকে	হয়	জয়
জন্য	দাবায়ে	মনে	বাংলা
সমস্ত		রাখবেন	

বাংলা বাক্য বিন্যাসে দু'অক্ষর এর শব্দ (Disyllabic/Bisyllabic word) যেমন রয়েছে তেমনি তিন অক্ষর বিশিষ্ট (Tri-syllabic words) শব্দও রয়েছে। ধ্বনিমাত্রিক এ-বিশিষ্টতা শব্দে গঠন প্রক্রিয়ায় দ্বি-শব্দ, ত্রি-শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ ভাব ব্যঞ্জক বাক্য প্রণালী বিদ্যমান ভাষা প্রকাশে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাবপ্রকাশ বাক্য-বিন্যাসে এ-ভাষা সংগঠন প্রয়োগ করেছেন। যেমন :

টাকা-পয়সা, কোর্ট-কাচারী, কল-কারখানা, রাস্তা-ঘাট, মায়না-পত্র, হিন্দু-মুসলমান, সামরিক আইন-মার্শাল ল, রেডিও-টেলিভিশন, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ, খাজনা-ট্যাক্স, আদালত-ফৌজদারী, বাঙালি-নন বাঙালি, হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট ইত্যাদি। তারপর Spech idiom রূপে : দুঃখ-ভারাক্রান্ত-মন, রাউন্ড-টেবিল-কনফারেন্স, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক, আসন-দেখুন-বিচার করুন: এক ত্রি-শাব্দিক ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করে।

বাংলা আত্মীকরণজাত বিদেশি শব্দ, বাংলার চেয়েও লোকভাষা, প্রমিত ভাষার শব্দ যোগে তৎসম, তদ্ভব, দেশী-বিদেশি ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে অনন্যতা দিয়েছে। যেমন : আজ, যদি, গোলাম, হরতাল, গুলি, দরজা, কসাইখানা, খাজনা, কচারী, ফৌজদারী, লুটতরাজ, রিক্সা, হুকুম, খতম, দোকান, অক্ষর, পরিষ্কার, পয়সা, বৈঠক, অস্ত্র, বদনাম, মোকাবেলা, সংগ্রাম, দোষ, হাজির, দুর্গ, ব্যাংক, রেল, লঞ্চ, স্টেশন, রেডিও, টেলিভিশন,

সেক্রেটারিয়েট, কনফারেন্স, এসেম্বলি, মার্চ, ফেব্রুয়ারী, প্রেসিডেন্ট, উইথড্র, রাউন্ড টেবিল, ট্যাক্সো, ব্যারাক, মেজরিটি, ওয়াপদা, রিলিফ কমিটি, সেমি-গভর্নমেন্ট, কলকারখানা ইত্যাদি।

উপভাষিক দক্ষিণ বাংলার সমতট ভাটি জনপদের লোক-শব্দ স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভাষণে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : ভায়েরা, সবই, বচ্ছর, ৭অই, বোন্ধ, শুখায়, যদ্দুর, দমাতে, দাবায়, দেবার, মায়না-পত্র, পয়সা, পারবা, পাড়া, পৌঁছায়ে, রাখবা, যায়ে, পোনারো, কোল ইত্যাদি।

শব্দ শাসাঘাত এবং বাক্য শাসাঘাতে পদগুলো বিন্যস্ত বাক্যমণ্ডলী স্বাভাবিকতা বজায় রেখে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলা ভাষার Bengali accent is initial and a Bengali phrase, or breath- group or sense-group, has only one stress, an initial one বৈশিষ্ট্য বঙ্গবন্ধুর বাগ-বিবৃতি (Neutral or statement sentence) তে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ঠিক একইভাবে যুক্তিমূলক ও আবেগপ্রধান বাক্যতে (Logical and Emotional Senlence)-এ শ্বাসাঘাত স্থান পরিবর্তন করে অর্থ গত বোধগম্য উদাত্ত (Acute tone) এবং স্বরিত (Combined/circumflex tone) বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত, ভাতে মারবো পানিতে মারবো, কিংবা আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল।

বঙ্গবন্ধু তিনশতাধিক ক্রিয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন, বাক্-প্রতিক্রিয়ায় কর্তৃত্ব বাচক নির্দেশনা নির্দিষ্টকরণ পাওয়া যায়: আমি যা বলি তা মানতে হবে, তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো, সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। কিংবা যারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, যারা শহীদ হয়েছে তাদের সাহাযার্থ্যে রিলিফ কমিটি গঠন করা, খাজনা ট্যাক্সো না দেয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, সর্বোপরি মানুষের তথা কর্মকর্তা কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদান। শিল্পনৈপুন্যে বাচনিক বর্ণনায় গীতি-স্বাচ্ছন্দ্যে পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যয়ী অভিব্যক্তি।

বস্তুত প্রাথমিকভাবে বাংলা বাক্যের স্বর-তরঙ্গ সূত্রবদ্ধ করেছেন চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী। তাদের সূত্র অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর ভাষণে নিঃসংশয় পরিসমাপ্তি উর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী যেমন ছিল তেমনি Imperative sentence-এ স্বর-তরঙ্গের সমন্বয় (Combination) লক্ষ করা যায়। সে ক্ষেত্রে বাংলার ছন্দ্রাশ্রয়ী ধ্বনি—দৈর্ঘ্য (Sound Length) বঙ্গবন্ধু লোক-ঐতিহ্য বহমান সুরতরঙ্গ প্রবাহিত করেছেন। যেমন : জীবনের তরে, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, তেইশ বচ্ছরের ইতিহাস, মূমুর্ষ নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধুর তাঁর ভাষণে নিজের বিবেকের কাছে এবং জনতার উদ্দেশ্যে হৃদয় স্পর্শিত প্রশ্নাবলী উত্তলন করেন :

কি অন্যায় করেছিলাম?, কি পেলাম আমরা?, কিসের আর.টি.সি?, কার সঙ্গে বসবো?, যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?

সোস্যুরীয় ভাষা প্রতীকের পরবর্তী পরিভাষা অনুযায়ী শব্দার্থিক তল সঙ্কেতিত (Signifie) উচ্চারিত সঙ্কেতিক (Significant) থেকে উদ্ভাসিত। রূপ এবং অর্থ ব্যাপ্তিতে স্যাপির নির্ধারিত অভিব্যক্তি এবং আধেয় (Content) নির্ধারক বটে। তাতে মানস্-নৈকট্য সমধর্মী চৈতন্যে গ্রন্থি রচনা করে।

আলেখ্যাদর্শ প্রতীকের অভিপ্রায় বাক সম্বন্ধ (Syntage) নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

বাক সংঙ্কেত (Language-signe) রূপ তাঁর ভাষা প্রকাশ রূপ বাক ব্যঞ্জনা (Language-suggestion) গদ্যময়তা অতিক্রম করে ভাষিক-ভাবিক (Language-sentimental) ব্যঞ্জনা অর্জন করে। বস্তুত ধ্বনি দ্যোতক রূপান্তরিত হয়ে মানসিক স্তর বিন্যাসে যে চিন্তন সংগঠন চমস্কির অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি মানুষের মানসিক সংশ্রয় (Mental System) ভাষিক বৃত্তি (Language Faculty) Cognitivist view ভাষণ জ্ঞানের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠিত করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার পারস্পরিক ধ্বনি-বাক প্রবৃত্তি-তরঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া গাণিতিক নীতির সাহায্যে ক্রিয়াশীল এবং প্রতিক্রিয়া উদ্দীপক। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভাষার সাথে চিন্তন প্রক্রিয়ার সাযুজ্যে দ্ব্যর্থবোধক, সিদ্ধান্ত বোধক এবং গ্রহণশীল উজ্জীবক শুধু নয় প্রণোদনা দায়ক।

সাত

হৃদবৃত্তিক ভাষা-নির্মিতির আবেগিক আবাহন সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে লৌকিক এবং শিক্ষা জাগতিক ভাষার এক ভাষিক effects devocation dun milcu সৃষ্টি করেছেন। যা স্বভাবত অভিব্যক্তির বিষয়কেন্দ্রিক (subjective) দার্শনিক সিদ্ধতা লাভ করেছে—আবার বাংলাদেশের ভূমি বিন্যাস অনুযায়ী জাতীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুক্তি সংগ্রামের আর স্বাধীনতার দৃঢ় প্রকাশ, যা হল—আমাদের সংগ্রাম 'আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' আমাদের 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

তথ্যনির্দেশ

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র, ১৫ই আগস্ট।

আবদুল ওয়াহাব (২০১০) বাংলার লোকদর্শন : বঙ্গবন্ধর ৭ মার্চের ভাষণে লোকউপাদান অনুসন্ধান, ফোকলোর, মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ ১৭-৪৬

আহমদ ছফা (১৯৫৯) শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহমেদ (১৩৮?) বাংলা মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭৫-৭৬

মুনীর চৌধুরী (১৯৬৯) সাহিত্য, সংখ্যাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ পৃ. ৬৪-৭৬

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সন্তোষ গুপ্ত (১৯৯৯), ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং আমাদের উপলব্ধির তারতম্য, দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা, ৭.৬.১৯৯৯

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৭৪), বাংলাদেশ, মনসুর মুসা সম্পাদিত বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৩৮-৩৯

সাইফুল আলম চৌধুরী (১৯৯৯), স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিলের শব্দ ও ভাষাগত বিশিষ্টতা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭/৩/১৯৯৯

Charles A Ferguson and Musir Chowdhury (1960) : The Phonemes of Bengali in Language, Journal of the Linguistic Society of America, Vol 36 Jan — March, P-25.

Dilwar (2010)-Bangladesh, me not your professional ally (translated with allnexure and index by professor Md. Quresh Khan) Dhaka.

E. Sapir (1921) Language : An Introduction to the study of speech, London 1921.

F.DE. Saussure (1949) Course de linguistique general (eds.ch.Bally-A.Sechehaye; 4th ed. paris.

G. yukl (1989) Leadership in organization 2nd ed-1 Englewood cliffs. nj. Premtice-Hall.

J.M Howcell and P.j Frost (1989) A Laboratory Study of Charismatic Leadership. Organizational Behavior and Human Decision processes, P-43, 243-269

R.J. House-(1977) A Theory of charismatic leadership in J.G Hunt of L.L. Larson (Eds.), Leadership: The cutting edgc (pp 189-207) Carbondale, IL. Southern Illinois University preess.

R.J House, W.D. spangler, Jwoycke (1991) Personal and Charisuam in The US Presidency : A psychological Theory of leader effectiveness, Administrative Science Quarterly, 36, p-364-396.

Suniti Kumar Chatterji (1970) The origin and Development of the Bengali Language, London. P-279.

সামরিক

৭ মার্চের ভাষণের সামরিক তাৎপর্য

৭ মার্চের ভাষণের সামরিক তাৎপর্য

এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার

গতকাল ছিল ৭ মার্চ। বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম মাইলফলক তৈরি হয়েছিল। একাত্তরের ৭ মার্চে ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ওই দিন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান প্রায় ১০ লাখ জনতার উপস্থিতিতে মাত্র সাড়ে ১৮ মিনিটের একটি অলিখিত ভাষণে ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের সীমাহীন শোষণ ও নির্যাতনের একটি প্রখর চিত্র তুলে ধরে সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও সামরিক দর্শনের পরিপূর্ণ এক রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন। যাতে নেতার অনুপস্থিতিতে তার প্রদত্ত দর্শনই জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। ঠিক তা-ই ঘটেছিল। নেতার অনুপস্থিতে কাতারে কাতারে মানুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে মাত্র ৯ মাসের মাথায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলে। যার উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল। সে জন্যই ৭ মার্চের ভাষণটির গুরুত্ব সব ভৌগোলিক গণ্ডির সীমানা অতিক্রম করে এখন সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জন্য এক অনন্য দর্শনে পরিণত হয়েছে। ফলে এটি এখন চিরঞ্জীব ও চির ভাস্বর।

ইতিহাসে অনেক সফল রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাষ্ট্রনায়কের উদাহরণ রয়েছে। তবে একজন রাষ্ট্রনায়কের যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থাকে তার সব দিকের পরিস্ফুটন এবং বহিঃপ্রকাশ সাধারণত সবার ক্ষেত্রে দেখা যায় না এবং সে সুযোগ সবার জন্য আসেও না। বিশেষ করে সমর দর্শনের দিকটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থেকে যায় প্রায় সুপ্ত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আলেখ্য ছিল সাধারণের চেয়ে ভিন্ন। দীর্ঘ সংগ্রাম, তারপর সশস্ত্র যুদ্ধ এবং যুদ্ধের

ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশকে গড়ে তোলার সব দর্শন ও প্রজ্ঞার পরিস্ফুটনই ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর জীবনে। বাস্তবতা ও আধুনিক যুদ্ধের যে ইতিহাস তাতে দেখা যায়, একটি জাতির সমরদর্শন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতখানি সফল ও বিফল তা পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল সে দেশের রাষ্ট্রনায়কের দূরদৃষ্টির ওপর। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যুদ্ধ হচ্ছে, More of Art than profession। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেভিল চ্যাম্বারলিন। যুদ্ধের শুরু থেকেই জার্মানির নেতৃত্বে অক্ষশক্তির বিজয় ধারা অব্যাহত থাকে। অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে চ্যাম্বরলিন পদত্যাগ করেন এবং ১০ মে ১৯৪০ সালে প্রধানমন্ত্রী হন উইনস্টন চার্চিল। ওই বছরের শেষ দিকে 'ব্যাটল অব ব্রিটেন'-এ ব্রিটেনের জয়লাভেই হিটলারকে বাধ্য করে ব্রিটিনের মূল ভূখণ্ডের ওপর আক্রমণ পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় পুরো সময়জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রুজভেল্ট। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টি যুদ্ধে মিত্রশক্তির চূড়ান্ত বিজয়ের ক্ষেত্রে অভাবনীয় ভূমিকা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র প্রেসিডেন্ট, যিনি পরপর চারবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্টালিন, এই তিনজন রুদ্ধদ্বার বৈঠকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টার্নিং পয়েন্টখ্যাত ফ্রান্সের উপকূলে নরম্যান্ডি নামক স্থানে সামরিক ইতিহাসে উদাহরণ সৃষ্টিকারী 'নরম্যান্ডি ল্যান্ডিং' নামক অপারেশনটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে উভচর মিলিটারি অপারেশন ছিল নরম্যান্ডি ল্যান্ডিং। ১৯৪৪ সালের ৬ জুন নরম্যান্ডিতে মিত্রশক্তির আক্রমণ শুরু হয় এবং মাত্র এক বছরের কম সময়ের ভেতর ১৯৪৫ সালের ৭ মে হিটলারের আত্মহত্যা এবং জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। একটি দেশ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন 'গ্রান্ড ন্যাশনাল স্ট্যাটেজি' অনুসারে নিজস্ব অবস্থান থেকে রাষ্ট্রের সব অঙ্গ বা মেশিনারি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের ফল বহুলাংশে নির্ভর করে রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে সেই রাষ্ট্রের পূর্ব-প্রস্তুতি কতখানি প্রজ্ঞাজনিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল তার ওপর। একটি দেশের জন্য সমরদর্শনের চিন্তা ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণে আন্তর্জাতিক বলয়ে রাষ্ট্রের অবস্থান ও সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই রাষ্ট্রের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, তাঁর চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, দর্শন এবং দিকনির্দেশনা একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করেছে, যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এবং সেই যুদ্ধে অভাবনীয় বিজয় অর্জিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র কর্মজীবন ঘিরে আমরা যে

সমরদর্শন ও প্রতিরক্ষা চিন্তার পরিচয় পাই, তাকে প্রধানত তিনটি ধাপ বা স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথম ধাপটি একাত্তর-পূর্ব, বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ-উত্তর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা। দ্বিতীয়ত, ৯ মাসের স্বাধীনতাযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সমর কৌশল, যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ভেতর। আর তৃতীয়টি, স্বাধীনতা-উত্তর সদ্য স্বাধীন একটি দেশের ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বঙ্গবন্ধুর প্রতিরক্ষাবিষয়ক চিন্তা-চেতনা ও তার প্রতিফলন। প্রসঙ্গত কারণেই আজকের লেখাটির পরিধি সীমাবদ্ধ থাকবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর সামরিক দিক নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা। যার প্রতিফল প্রধানত আমরা খুঁজে পাই ৭ মার্চের ভাষণের ভেতরে। বঙ্গবন্ধু সামরিক চিন্তাভাবনার অন্য দুটি অধ্যায় নিয়ে অন্য কোনো সুযোগে লেখার ইচ্ছা আছে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও তার প্রস্তুতির জন্য বঙ্গবন্ধুর যে সামরিক দর্শন ছিল তা বিশ্লেষণ করতে হলে সেটি প্রধানত দুটি আঙ্গিকে করা প্রয়োজন। প্রথমটি হলো, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং সেই ভাষণের ভেতর নিহিত সমর কৌশলের দিক-নির্দেশনা। দ্বিতীয় দিকটি হলো, বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঙালিদের যে করতে হবে তাও তাঁর দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বহু আগে। তাই তো দেখা যায়, ছয় দফার ষষ্ঠ দফায় পূর্ব-পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের দাবির মাধ্যমে বাঙালি যুসমাজের একটা অংশকে পাকিস্তানের নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোকে অনুসরণ করেই সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। যাতে তারাই মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় হতে পারে বাংলাদেশ গণমুক্তি ফৌজের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থল। তাদের ঘিরেই যাতে সব বাঙালি সুসংগঠিত হয়ে যুদ্ধ চালাতে পারে। তারপর বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক বিশ্বস্ত ও নিবেদিত সহচর তাজউদ্দীন আহমেদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধকে যেভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন এবং দ্রুত জয়লাভের জন্য বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের যে সামরিক সহায়তা পেয়েছিলেন তাতে এটা স্পষ্ট হয়, এগুলো সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর আয়োজিত পূর্ব-প্রস্তুতির ফল। তবে সেই আয়োজন ও নির্দেশনাগুলো কি, কখন ও কীভাবে ছিল তা এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। তাই আমার বিশ্লেষণটি সীমাবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে।

৭ মার্চের ভাষণের প্রায় শেষাংশে তাৎপর্যপূর্ণ সামরিক নির্দেশনা ছিল। যেমন :

এক. 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'।

দুই. 'জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা-যা আছে সবকিছু তোমরা বন্ধ করে দিবে'।

তিন. 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব।

চার. 'শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে'।

পাঁচ. 'বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়'।

ছয়. 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক'।

বৃহৎ এবং দীর্ঘ মেয়াদি গেরিলাযুদ্ধের জন্য মাও সে তুং-এর খ্যাতনামা ম্যাক্সিম হলো, 'শত্রু যখন ক্লান্ত হয়ে পিছু হঠবে ও নিজেদের সঙ্কুচিত করবে তখন তাকে ধাওয়া কর এবং আঘাত কর। আর শত্রু যখন এগুবে তখন পথে অসংখ্য ছোট ছোট বাধা সৃষ্টি কর এবং নিজেরা চলে যাও নিরাপদ স্থানে'। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা ও যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ ছিল মাও সেতুংয়ের উপরোক্ত সফল গেরিলাযুদ্ধের কৌশলের প্রতিফলন। এ নির্দেশের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই বাঙালি জনগোষ্ঠীকে যুদ্ধে শামিল হতে বলেছিলেন। এই সূত্রের সফল প্রয়োগ যত বেশি হবে, ততই গেরিলাবাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি গুণিতক হারে বাড়তে থাকবে। ফলে আক্রমণকারী বা দখলদারদের ভেতরে ভীতির সঞ্চার হবে, তারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে ক্যাম্প ও বাংকারের মধ্যে। আর তখন শত্রুর পরাজয় হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী এবং সময়ের ব্যাপার মাত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা সর্বত্রই ক্যাম্প ও বাংকারভিত্তিক হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক কনভেনশনাল বা প্রচলিত এবং নন-কনভেনশনাল বা অপ্রচলিত, উভয় যুদ্ধেই Denial Plan কার্যকরী করা যুদ্ধের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পরিকল্পনার মূল কথা হলো—নিজেদের কোনো সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা শত্রু যেন ব্যবহার করতে না পারে। রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু বন্ধ করা এবং ভাতে মারব ও পানিতে মারব নির্দেশনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমর কৌশল Denial Plan বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। উল্লিখিত চতুর্থ নির্দেশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মূলত সমগ্র বাঙালি জাতি এবং বঙ্গবন্ধু অবর্তমানে যারা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবে তাদের সবার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন দেশের অভ্যন্তরে রাজাকার, আল-বদর এবং তাদের সহযোগী রাজনৈতিক দলের অনুসারী দ্বারা পঞ্চম বাহিনী (Fifth Columnist) সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের বাড়িঘর, ধনসম্পদ লুটতরাজে লিপ্ত হয়েছিল। প্রবাসী বাংলাদেশ

সরকারের ভেতরে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তাও এখন সবারই জানা। তা ছাড়া মোশতাক ও মাহবুবুল আলম চাষীদের মতো বিশ্বাসঘাতকরা সরকারের ভেতর থেকে মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিল তাও এখন সবার কাছে পরিষ্কার। বঙ্গবন্ধু তার দূর দৃষ্টি দিয়ে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করেছিলেন, যাতে তারা সবাই মিলে ওই সব ভেতর ও বাইরের বাধা অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধকে একটি সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। পঞ্চম নির্দেশনার তাৎপর্য ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে যখন সে যুদ্ধটি পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হয় তখন দখলদার বাহিনী হয়ে পড়ে শহর বা নগরমুখী। বৃহত্তর গ্রামাঞ্চল চলে যায় স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। জনতার জলস্রোতে মাছের মতো মিশে যায় গেরিলা যোদ্ধারা। ওই সময়ে দখলদার বাহিনীর আইন-কানুনের কোনো প্রয়োগও থাকে না, মূল্যও থাকে না। অন্যদিকে যুদ্ধ-যেহেতু চলমান, সেহেতু নতুন স্বাধীন সরকারের প্রচলিত বা কনভেনশাল আইনি বিধি-বিধান তৈরি ও তা প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ থাকে না। ওই পরিস্থিতিতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা মূলত নির্ভরশীল থাকে দেশব্যাপী ছোট-বড় গ্রুপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গেরিলাযোদ্ধাদের নৈতিক মনোবল। যে কারণে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তার ওপর প্রবল বিশ্বাস এবং শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নেতার হুকুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অবিচল রাখা।

যুদ্ধের পুরো ৯ মাস দেশের অভ্যন্তরে কোনো নিয়মতান্ত্রিক পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী না থাকলেও আইন-শৃঙ্খলার বড় ধরনের কোনো অবনতি ঘটেনি। এ এক অপূর্ব বিরল ঘটনা। নেতার প্রতি এমন বিরল আস্থার কারণেই দেশ মাত্র ৯ মাসের মাথায় স্বাধীন হয়েছিল। ষষ্ঠ নির্দেশনার তাৎপর্য ছিল প্রধানত দেশব্যাপী যাতে বাঙালিরা সঠিক নেতৃত্বের অধীনে সুসংগঠিত হয় এবং সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যুদ্ধোন্মুখ সাধারণ মানুষ এবং অস্ত্রধারী বাঙালি, সেনা, ইপিআর, পুলিশ ও অন্যদের শত্রু যেন অতর্কিত হামলা করে পর্যুদুস্ত করতে না পারে। এর প্রতিফলন মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আমরা দেখেছি। ২৬ মার্চের আগে কিছুসংখ্যক বাঙালি সেনা ইউনিট বিদ্রোহ করে পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করেছিল।

এসব সেনা ইউনিটসহ পুলিশ, ইপিআর এবং বিক্ষিপ্তভাবে সারা দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে একটা শক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র বাঙালি জাতিকে বিশেষত সেনাবাহিনী, পুলিশ, তৎকালীন ইপিআর এবং আনসার বাহিনীর সদস্যদের এমনভাবে উদ্বেলিত করেছিল, তারা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যার কাছে যে অস্ত্র ছিল তা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে

তুলেছিল। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের মিলন ও সমন্বয় ঘটতে তেমন সময় লাগেনি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকে অবলম্বন করে এবং বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ফ্রন্ট এবং সশস্ত্র ফ্রন্ট এভাবে একই মোহনায় মিলিত হয়ে অগ্রসর হয়েছিল। যুদ্ধের সময় পুরো ৯ মাস জুড়ে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মনে সব সময় প্রেরণা ও অদম্য সাহস জুগিয়েছে ৭ই মার্চের ভাষণের মর্মবাণী। ৯ মাসব্যাপী মুজিবের কণ্ঠস্বর ছিল সাড়ে ৭ কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ১৯৭১ সালের ২৬ মে থেকে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত একটা গান প্রতিদিন নিয়মিত প্রচার হতো। গানটির কয়েকটি লাইন ছিল এরূপ :

'শোনো একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

আবদুল ওয়াহাব

সূচনা

সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে মানবিকতাবাদি চিন্তার সূত্র ধরে। পরিবার প্রথা, বৈবাহিকতা, সমাজ বিকাশের নানা পর্যায়ে উদ্ভূত সংঘ, ধর্ম ও দর্শন চিন্তা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মীমাংসা সূত্রে সমাজবিজ্ঞান নতুন নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে অগ্রসর হয়। নানামুখি বিশ্লেষণের সূত্রে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে সমাজবিজ্ঞানের উদরেই জন্মগ্রহণ করে নৃবিজ্ঞান। উৎস সমাজবিজ্ঞান হলে কি হবে, অচিরকালেই নৃবিজ্ঞান তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এবং পরিপূর্ণ বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কাজে কাজেই আমাদের বক্ষমান আলোচনা কেবল সমাজবিজ্ঞানেই সীমিত থাকবে না মাঝে মধ্যে এর ব্যাখ্যা নৃবিজ্ঞানকে ছুঁয়ে যাবে। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক চেতনার ভিত্তিভূমি সূচিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চল এবং সমৃদ্ধ বাংলা ভাষাকেন্দ্রীক জাতীয়তা। এখানে আরো কথা এই যে, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের অন্যতম সহযোগী হচ্ছে জীববিজ্ঞান। কিঞ্চিৎ হলেও বিষয়বস্তু হিসেবে জীববিজ্ঞানও এই আলোচনায় স্থান পাবে। আমাদের এ আলোচনার মূল টেকস্ট বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চে দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ। দেখতে চেষ্টা করব কীভাবে ভাষণটির মূল বক্তব্য উপর্যুক্ত ত্রয়ী উপাদানে ভরপুর। কেননা ভাষণটিতে শোষণ-বঞ্চনার কথা উল্লেখের পাশাপাশি বারংবার প্রাধান্য পেয়েছে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি। যেমন : 'আজ, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' '২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।' 'বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।' 'দোষ দেয়া হল বাংলার মানুষকে', 'আমরা বাঙালিরা', 'আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলী করা

হয়েছে।' 'বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন', 'আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি', 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বেঙলি-নন বেঙলি' কোনো বাঙালি', 'পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে', 'পূর্ববাংলায় চলবে' 'বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবে।'

এভাবে বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ এই তিনটি প্রত্যয় আমরা একই সঙ্গে পেয়ে যাই। এসব বাক্যে দেশপ্রেমের পরিচয়ের পাশাপাশি খানিকটা স্বাজাত্য অহমিকার ইঙ্গিত আছে বৈকি! 'আমরা বাঙালিরা, 'আমার বাংলার মানুষের'—এ উচ্চারণ কেবল একজন স্বাজাত্যাভিমানীর পক্ষেই করা সম্ভব। বঙ্গবন্ধু আমার বাংলার, আমরা বাঙালিরা প্রভৃতি নৃতত্ত্ব ও জাতিতাত্ত্বিক পরিভাষা অন্তরনিঙরানো দরদ দিয়ে এই ১৯ মিনিটের ভাষণে ১৯ বার উচ্চারণ করেছেন। এতে তাঁর স্বাজাত্যবোধ ও অগাধ দেশপ্রেমের পরিচয় মেলে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এসব কিছুরই ব্যাখ্যা করব একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে।[১]

দুই

প্রত্নতত্ত্ব ও প্রত্ন-ভাষার সহযোগিতায় সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান মানুষের জন্ম, তার বড় হওয়া, তার কৌম-গোষ্ঠী জীবন, তার জাতিগত পরিচয়ের গ্রন্থী উন্মোচনে জন্ম থেকেই নিরন্তর তৎপর। প্রাগ্রসর গবেষক-প্রত্নতত্ত্ববিদরা ফসিল, হাড়, মানুষের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী মাটি খুঁড়ে বের করেছেন এবং তাতে দেখা গেছে বর্তমান মানুষ ও মানবসমাজ লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফল। জীববিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইনের (১৮০৯-১৮২১) জৈবিক বিবর্তনমূলক মতবাদ অতীন্দ্রিয় ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস বা মরমি ভাবধারার প্রতি গুরুতর আঘাত হানে। তাঁর মতবাদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, মানুষ কোনো সত্তার সৃষ্টি নয়, বরং পশু সাম্রাজ্যের উন্নততর সদস্য বনমানুষ বা ওরাংওটাঙ্গের নিকটতম জ্ঞাতি বা বংশধর থেকে মানুষ আজকের পর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা আর সে কথায় যাই না। সামাজিক মূল্যবোধ, মতাদর্শ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সমাজ পরিবর্তনেই আমাদের আলোচনা সীমিত থাক। সমাজবিজ্ঞান তার গবেষণায় উপসংহার টেনেছে এই বলে যে, আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার আগে একটা সম্পূর্ণ বিভিন্নতর ধরনের সমাজ ছিল; দীর্ঘকালব্যাপী সেই আদিম সমাজ সংগঠনে মৈত্রী, স্বাধীনতা-সাম্য, সত্যিকারের গণতন্ত্র-সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ বা সমঅধিকারমূলক সমাজ ছিল। এমন কি সেই সৌহার্দ্যমূলক সমাজে নারী-পুরুষ ভেদেও সম-অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাত্যয় ছিল না।[২] এ পর্যায়ে আমরা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশ সুবিস্তর জানার চেষ্টা করবো।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব সবচেয়ে পরে। ১৮৩৯ সালে এই বিজ্ঞানের নামকরণ করা হয়। সমাজতত্ত্ব তার নামটি পায় ফরাসি সমাজ তাত্ত্বিক অগাস্ট কোৎ-এর কাছ থেকে। অগাস্ট কোৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) তাঁর

পজিটিভ ফিলোসফি (৬ খণ্ড) পুস্তকে এই বিষয়টির পরিধি ও কার্যাবলির বিশদ বর্ণনা করেছেন। আর এটি করতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্বতন দার্শনিক সেইন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫) থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। কোৎ-এর দৃষ্টিতে সমাজতত্ত্ব আর ততটা তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত চিন্তা থাকছে না, বরং তা ফলিত দিক নিয়ে কাজে লাগছে—আর অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের চেয়ে এর প্রয়োজন কম হচ্ছে না—বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকায়। ফ্রান্সে অগাস্ট কোৎ-এর মতো আরো এক দিকপাল সমাজতাত্ত্বিককে আমরা পাই, তিনি হলেন এমিল দুর্খাইম (১৮৫৮-১৯১৭)। তাঁর হাতে সমাজতত্ত্ব চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে। এরপর যে পূর্বসূরির নাম করতে হয় তিনি হলেন ব্রিটিশ চিন্তাবিদ হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩)।

সমাজতত্ত্ব গড়ে ওঠার পেছনে যে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের কাছে সমাজতত্ত্ব বিশেষভাবে ঋণী তা হলো নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব। এক শতকের মধ্যে সমাজতত্ত্ব তার একটা বড় রকম জায়গা করে নেয় অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে। আর দেখার বিষয় হলো সর্বক্ষেত্রে এর বিচরণের দিকটি। পদ্ধতিগতভাবে সমাজতত্ত্ব ঐতিহাসিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিও গ্রহণ করেছে। ইদানিং এর ঝোঁক পরিমাণগত মাপের দিকে বেশি। অবশ্য ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদক্ষেপ নিতেও খুব একটা পিছপা হচ্ছে না।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজতত্ত্বের বেশ বড় রকম অগ্রগতি হয়। এর আগে সমাজতত্ত্ব নিয়ে খুব বেশি মাত্রায় তাত্ত্বিক আলোচনা হতো, আলোচনা হতো সমাজতত্ত্ব কী হওয়া উচিত তা নিয়ে। আজ অবশ্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো সমাজতত্ত্ব আসলে কী। সামাজিক ঘটনা যে সমাজতত্ত্বের আলোচনার মৌল দিক এটি আজ প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক ঘটনা বা ব্যাপার বলতে বোঝায় একাধিক মানুষের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। একই ইউনিট বা এককগুলো সমাজতত্ত্বের গবেষণার বিষয়। মানুষের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো অবশ্যই চর্মচক্ষে দেখা যায়। যেখানেই সম্পর্ক বা পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ওঠা-বসা আছে তাকে আমরা সামাজিক সম্পর্ক নামে অভিহিত করতে পারি। যেখানে এই সামাজিক সম্পর্ক দীর্ঘসূত্রিতা একটি সামাজিক গ্রুপ বা দল তৈরি করে আর এই দলের নানারকম ধরন থাকে। এই সামাজিক দলের থাকে একটি পদ্ধতি আর এই অংশের থাকে একটি নিজস্ব কাঠামো, যা পুরো সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েও তা নিজের চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য বিলোপ করে না।

সমাজতত্ত্ব পাঠের আর একটি মৌল ক্ষেত্র হলো সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ। সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে সহযোগিতা হলো সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি। এর বিপরীত প্রক্রিয়া হলো বিরোধিতা—তাও সমাজতত্ত্বের অন্যতম পাঠের ক্ষেত্র। আর এর মধ্যে পরিষ্কার দুটি অংশ আমরা লক্ষ করি, তা হলো প্রতিযোগিতা ও বিবাদ।

উনিশ শতকে বিশ্বখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এবং একই সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের যুগ্ম তারকা হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি মর্গান এবং ইংল্যান্ডের এডওয়ার্ড টাইলার। তাঁরা দুজনই বিবর্তনবাদী ছিলেন। মানবজাতি পশুর জগৎ থেকে সভ্যতায় উঠে আসার জন্য কতকগুলো প্রগতিশীল পর্যায় পার হয়েছে—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে তারা অগ্রসর হয়েছেন। তারা যথেষ্ট জড়বাদীও ছিলেন, অর্থাৎ তারা জীবনের প্রয়োজন ও উপযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য শ্রমের বিস্তারিত তৎপরতা দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং এ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই আদর্শ, মানুষের অধি-কাঠামোগত প্রতিষ্ঠান, রীতি, ধারণা ও বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিবর্তনবাদী জড়বাদী পদ্ধতির সবচেয়ে সফল ব্যাখ্যাদাতা হচ্ছেন লুই হেনরি মর্গান। মর্গান তার যুগান্তরকারী রচনা *অ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি* (আদিম সমাজ : ১৮৭৭) গ্রন্থে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানধর্মী গবেষণার অবতারণা করেন এবং সমাজের অগ্রগতির প্রধান তিনটি পর্যায়ের চিত্রানুগ বর্ণনা দেবার জন্য ব্যবহার করেন বন্য অবস্থা থেকে বর্বর অবস্থা পেরিয়ে সভ্যতায় পদার্পণ। আজ আমরা এই তিনটি পর্যায়ের সময়কাল পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারি। বন্য অবস্থা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘতম; বলা চলে পৃথিবীতে মানুষের জীবনের শতকরা ৯৯ ভাগ জুড়ে। বর্বর অবস্থা শুরু হয় এখন থেকে ৮০০০ বছর (৬০০০ খ্রি. পূর্বাব্দে) আগে কৃষি ও মজুদ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে এবং আজকের সভ্যতার সূত্রপাত হয় মাত্র চার/পাঁচ হাজার বছর পূর্বে; অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের মতো আগে।

জীবজগতের বিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম আবিষ্কারক চার্লস ডারউইন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Origin of the Species* : ১৮৬১-এ ঘোষণা করেন, আজকের যে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর যে রূপ বা আকৃতি আমরা দেখছি তা লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফল। তিনি বিশেষভাবে বলেন আজকের পৃথিবীতে যে মানুষ তা বানরসদৃশ বা বানর জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষচারী প্রাণী থেকে উদ্ভূত। তাঁর মতে পরিবেশের সাথে প্রাণীর বাঁচার তাগিদে খাপ খাইয়ে নেবার প্রক্রিয়া থেকেই বিবর্তনের উৎপত্তি। এ প্রক্রিয়ার নাম অভিযোজন। এ প্রক্রিয়া যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় তার নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন। তিনি বলেন বিশেষ নিম্নতর জীব থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আজকের দিনের মানুষ।[৩]

বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া গেলেও ঠিক কোন যুগে মানব-সম বা হোমিনিড (hominid) প্রাণী এবং বনমানুষ (apes, গরিলা, ওরাংউটাং, শিম্পাঞ্জি ও গিবন) পৃথক হয়ে নিজ নিজ ধারায় বিবর্তিত হয়েছে, সে সম্পর্কে এখনো কিছু মতানৈক্য আছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে সবাই একমত যে মানবজাতির বিবর্তন ধারায় সাধারণ বানরকুল বহু পূর্বেই (আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি বছর আগে) পৃথকীকৃত হয়েছে, এবং খুব সম্ভবত ১.৪ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির পূর্বপুরুষ এবং গরিলা ও শিম্পাঞ্জির পূর্বপুরুষের বিবর্তন একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। এ মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে

মানব-সম বা হোমিনিডের প্রথম প্রতিনিধি রামাপিথিকাস (Ramapithecus)। এই গোষ্ঠীর জীবাশ্মের অংশবিশেষ ভারত (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে) এবং কেনিয়াতে (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে) আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ঐ সকল জীবাশ্মের বয়স প্রায় এক কোটি চলিশ লক্ষ বছর। অনেকের মতে রামাপিথিকাস মানবজাতির সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ এবং আনুমানিক ১.৪ কোটি বছর পূর্বে রামাপিথিকাসের উৎপত্তির ফলে মানবজাতির পূর্বপুরুষ ঐ সময়কাল থেকে শিম্পাঞ্জি-গরিলার পূর্বপুরুষের ধারা থেকে বিভক্ত হয়ে স্বকীয় ধারায় অভিব্যক্ত হতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা দ্বয় মার্কস-এঙ্গেলস ডারউইন ও মর্গানের চিন্তা ও কর্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ডারউইন যে সমস্যাটি তুলেছিলেন; কিন্তু যার জবাব খুঁজে পান নি, পরে সেই মুখ্য প্রশ্নটি তুলে নেন এঙ্গেলস। সেটা হচ্ছে, ঠিক কীভাবে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা রূপান্তরিত হন? এঙ্গেলস তার The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man রচনায় ব্যাখ্যা করেন যে, পদ্ধতিগত কর্মতৎপরতার ফলেই গরিলাসদৃশ্য বনমানুষ, মানবসদৃশ্য আকারে পরিণত হয়েছিল। এঙ্গেলসই প্রথম রূপরেখার আকারে সেই বিষয়টি প্রকাশ করেন, যাকে সঠিকভাবে সামাজিক উদ্ভবের শ্রম-তত্ত্ব বলা যায়। একই সঙ্গে আমরা কর্মযোগী নারীর প্রশ্নটিরও সম্পৃক্ততা দেখতে পাই।[৪]

ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত যে পৃথিবীর প্রাচীন সমাজ গড়ে উঠেছিল ট্রাইবাল বা কৌম ভিত্তির উপর। সে যুগে এক একটি আদিম ক্ষুদ্রজাতির (বা ট্রাইবের) অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুল (ক্লান) উদ্ভূত হয়। অনেক সময় দেখা যায়—এরূপ এক একটি কুল কোনো জীবজন্তুকে কিংবা বৃক্ষাদিকে নিজেদের আদিপুরুষ বা আদিমাতা বলে জানে; কারণ হয়তো সেই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় খাদ্য বা সম্পদ হিসেবে প্রথমত ঐ প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী। কালের বিবর্তনে ঐ জন্তু বা গাছ হয়ে পড়ে ঐ গোত্রের টোটেম পিতা বা টোটেম মাতা। তার নামেই সে কুলের পরিচয় হয়; কুলস্থ সবাই তার সন্তান-সন্ততি বলে পরিচিত হয়। এই সমাজপদ্ধতিকেই বলে টোটেমিক সমাজ।[৫] সম-অধিকার ছিল এ সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুণগত বিচারে এ পর্বের উৎপাদিকা শক্তির প্রকৃতি ছিল খুব নীচু মানের। শিকার, মাছ ধরা, পশুপালন ও ফলমূল সংগ্রহ ছিল জীবিকার্জনের প্রধান পন্থা। কালক্রমে নতুন হাতিয়ার আবিষ্কার এবং নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন আনে। বাঁচার তাগিদে গোড়া থেকেই মানুষ যূথবদ্ধভাবে জীবিকার্জনে শামিল হতো। পশু শিকারের জন্য দলবদ্ধভাবে বিচরণ করা অপরিহার্য ছিল—দলবদ্ধ হবার আর-এক কারণ ছিল প্রকৃতি ও হিংস্র প্রাণীকুল থেকে আত্মরক্ষা। প্রথমত মানুষ যূথবদ্ধ হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে; কিন্তু ফাঁদ, বেষ্টনী, গর্ত ইত্যাদির মাধ্যমে বড় শিকার করায়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন হয় আরো বেশি জনশক্তির। ফলে প্রতিবেশী যূথগুলো

একত্রিত হয় এবং যৌথসমাজ বিকাশ লাভ করে। কোনো অঞ্চলে ফল, গাছ ও পশু যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া না গেলে জীবিকার সন্ধানে তাদের অন্যত্র চলে যেতে হয়। সেখানে নতুন করে বসবাসের আয়োজন করে। প্রাকৃতিক গুহা অপ্রতুল হলে তারা বাসস্থান নির্মাণের প্রচেষ্টা নেয়। এভাবেই মানুষ ধীরে ধীরে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তখন থেকে টোটেমিক-ট্রাইব-কৌম সমাজ সংগঠনের সূচনা ঘটে। এই কৌম সমাজেই সামাজিক সংহতির অনুষঙ্গে রক্তের সম্পর্ক দানা বাঁধতে থাকে, যার ফলে কালক্রমে সংগঠিত হয় পরিবার প্রথা।

পরিবার থেকে সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। পরিবারের মধ্যে সরল শ্রম বিভাজন ছিল—প্রত্যেকে সমবেতভাবে শ্রমে অংশগ্রহণ করে এবং শ্রমের ফল সমভাবে বণ্টিত হয়। শিকারি ও মৎস্যজীবীদের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা আদিম মানবসমাজের সামাজিক সম্পর্ককে পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন টোটেমিক (totemic)।[৬] এ সময়কার মানব সমাজ কয়েকটি (tribe) বা মূল দলে বিভক্ত থাকতো। ট্রাইবগুলো আবার ছিল একাধিক উপদল বা কৌমে (Clan) বিভক্ত। কোনো বিশেষ জন্তু বা পশু-পাখি কিংবা বৃক্ষাদির নামানুসারে কৌমগুলোর নামকরণ হতো। কৌমগুলো নিজেদেরকে ঐ প্রাণীটির বংশজাত বলে মনে করতো এবং ঐ প্রাণীটি ছিল তাদের কাছে বিশেষভাবে পূজ্য। এই পূজ্য জন্তুটি বা বৃক্ষটির নামই টোটেম। কোনো কৌম টোটেমের ক্ষতিসাধন করে না, কারণ তা পাপ বলে গণ্য। টোটেম বিষয়ে প্রচলিত বা আরোপিত বিধিবিধানগুলোকে বলা হয় ট্যাবু (Taboo)। টোটেম-জাত যৌথ বা যূথবদ্ধ সমাজগুলো ছিল জাত ভাই। ফলে কালক্রমে একই কৌমভুক্তদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এক একটি কৌম ছিল বৃহৎ পরিবার তুল্য। প্রত্যেক টোটেমেই ধীরে ধীরে বিবাহপ্রথা একটা নিয়মে পর্যবসিত হয়—অতীতে যৌনাচার ছিল অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। টোটেম সমাজে যৌনাচারের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান আরোপিত হয়; এমনকি একই কৌমের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। এ সমাজেই পরিবার প্রথা দৃঢ় ভিত্তি পায়।[৭]

টোটেমের গোত্র সম্বন্ধ মায়ের দিক হতে ঠিক হতো—এভাবে টোটেমে মাতৃকর্তৃত্ব স্থাপিত হয়—এজন্যই টোটেম সমাজকে 'মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ' বলা হয়। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মর্গান আমেরিকার ইরকয়দের মধ্যে এরকম মাতৃকর্তৃত্ব দেখেছেন উনিশ শতকের মধ্যভাগেও। মেয়েরা কৃষিকাজ করে, পুরুষরা শিকারে যায়। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে সবাই মিলে উৎপাদন করতো। পুরুষরা যেতো মাছ ধরতে ও শিকার করতে। মেয়েরা সবাই সমবেত শ্রমদ্বারা কৃষিকাজ করতো—পশু ও মৎস শিকার এবং কৃষিতে যা উৎপন্ন হতো সবাই মিলে ভোগ করতো। কৃষি উৎপাদনের হাতিয়ারাদির নতুন আবিষ্কার ও সংস্কার, গরু, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ দ্বারা লাঙ্গল টানার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হলে কৃষি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সবাই মিলে খাবার পরও ফসল উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষণ ও মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ট্রাইবাল সমাজের আদিমতায় ভাঙ্গনের সূত্রপাত ঘটে।

শ্রমবিভাগ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন প্রক্রিয়া জটিল হতে থাকে। লাঙ্গলের ব্যবহার ব্যাপক হারে শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে পুরুষের শ্রমের গুরুত্ব বাড়ে, মেয়েদের কর্তৃত্ব কমতে থাকে। জীবন্ত পশুকে ধরে আনা, জঙ্গল পরিস্কার করা, বড় বড় গাছ উপড়ানো ইত্যাদি কাজে পেশিশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে পুরুষ অগ্রগণ্য। ফলে মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারের দিকে ঝুঁকে পড়ে।[৮] কৃষিপণ্য উৎপাদনে উন্নততর উপকরণ আবিষ্কার, উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের মালিকানা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ছয় থেকে আট হাজার বছর আগে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে ভাঙ্গন শুরু হয় এবং পুরুষের পেশিশক্তির কারণে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিকতা ও শ্রেণি সমাজের উদ্ভব ঘটে।[৯]

অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাস থেকে ধর্মের উৎপত্তি। বস্তুত এ বিশ্বাস জন্মেছে সমাজ বিকাশের বিশেষ এক স্তরে, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে। নিয়ানডারথাল মানুষের হাতে হাতিয়ার ছিল অত্যন্ত দুর্বল; তারা এক দিকে ছিল হিংস্র জন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত অপরদিকে ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঝড়-ঝঞ্ঝা, মহামারি। তারা মানুষের ছায়া বা পশুর ছায়াকেও জীবন্ত মনে করতো; গাছপালা, নদী, হ্রদ, পাথর প্রকৃতির অন্যান্য সব বস্তুই সজীব এবং শিকার ধরা ও বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারে এগুলো সহায়ক হবে এ ছিল তাদের বিশ্বাস। শিকারিরা হাতিয়ারের গায়ে পশুর ছবি আঁকতো। গুহায় বসবাসের সময় গুহার পশুর ছবি আঁকলে পশু তাদের বশে আসবে। অনেক সময় পশুর হাড়, সিংহ, ভালুকের নখের মালা রক্ষা কবচ হিসেবে ব্যবহার করতো। ঝড়-বৃষ্টি এলে তারা চিৎকার করতো, শূন্যে পাথর ছুড়ে ঝড়ের দৈত্য-দানবকে ভয় দেখাতো। এসব ভয়-ভীতি থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিশ্বাস ও ভোজবিদ্যার উৎপত্তি ঘটে। এভাবে মানুষের নিজের ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের ভুল ধারণা ও অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস থেকে ধর্মের উৎপত্তি ঘটে।

প্রাচীন টোটেমিক সমাজ বা সমবণ্টনভিত্তিক সমাজের অবসানে শ্রেণি বিভাজিত সমাজের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে সমাজে নেমে আসে দুর্নিবার অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, উৎপীড়ন। বিশেষ করে এই অবস্থা প্রকটিত হয় প্রাচীন গ্রিস ও রোমে। সমাজে শ্রেণি বিভাজনের মধ্য দিয়েই শ্রেণিসংঘর্ষের সূচনা ঘটে। গ্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এথেন্সের শ্রেণিসংঘর্ষের ইতিহাসই ভালোরকম জানা যায়। এথেন্সই ছিল গ্রিসের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গ্রিস ও রোম দুটি সভ্যতাই বস্তুত দাসশ্রম, দাস-ব্যবসায় ও লুণ্ঠিত সম্পদের উপর গড়ে উঠেছিল। এরকম পরগাছা সামাজিক ব্যবস্থা গ্রিসের মনীষী দার্শনিকেরা সমর্থন করতেন। একজন বলেন, বিলাসিতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন স্বাধীন মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক; দাস এবং নিকৃষ্ট স্তরের লোকদেরই যে খাটতে হয় তা প্রকৃতিরই বিধান। তাদের প্রধান দেবতা জিউস (Zeus) স্বয়ং এরকম ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, দাসব্যবস্থা প্রকৃতিরই নিয়ম। তিনি দাসকে

উৎপাদনের যন্ত্র রূপে শনাক্ত করেছিলেন, জড়যন্ত্র হচ্ছে হাতুড়ি, কাস্তে আর সজীব যন্ত্র দাস। প্লেটো কর্মহীনতাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, যদি উচ্চচিন্তা করতে হয় তবে অবসর জীবন একান্ত আবশ্যক। গ্রিক নাগরিকদের কর্মকুণ্ঠতা দাস ব্যবস্থার বিষমফল এবং পরিণামে ধ্বংস।

একাত্তর খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অজস্র ক্রীতদাসের শ্রমে-ঘামে ও রক্তের উপর গড়ে ওঠা পরাক্রমশালী রোম সাম্রাজ্যে ব্যাপক দাস বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহ ছিল শত শত বছর ধরে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত-অবহেলিত-পদদলিত মানবেতর জীবন যাপনের বিরুদ্ধে দাস সমাজের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের নায়কের নাম *স্পার্টাকাস*।[১০]

খ্রিষ্টপূর্ব দেড়-দুই শত বছর আগে থেকেই রোমে দাস বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এর মধ্যে পূর্বোল্লিখিত খ্রিষ্টপূর্ব একাত্তর সনে কেপুয়ায় স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহ ইতিহাসে বিশেষভাবে খ্যাত। বন্দি স্পার্টাকাস তার সাথীদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, 'রোমানদের মনোরঞ্জনের জন্য পশুর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ না দিয়ে স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণ করা বরং শ্রেয়।' প্রায় সত্তর জন গ্লাডিয়েটর স্পার্টাকাসের সঙ্গে একত্র হয়ে পাহারারত রক্ষীদের অতর্কিত আক্রমণ করে বিসুভিয়েস পর্বতে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।[১১] স্পাটাকাস সত্তর হাজার দাসের এক বিরাট বাহিনী গঠন করেন এবং কেম্পগনিয়া ও এপুলিয়া দখল করেন। তিনি দক্ষিণ ইটালিতে একটি স্বাধীন রিপাবলিক স্থাপন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্পার্টাকাসকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

৬৬-৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জুডিয়ায় কৃষক ও দাসরা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দীর্ঘ চার বছরের যুদ্ধে রোমানরা জুডিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়।[১২] রোমের দাসমালিকরা গর্বের সঙ্গে বলতো রোমের ক্ষমতা চিরস্থায়ী। তাদের শক্তিমান রক্ষীবাহিনী ও বিশাল সেনাবাহিনী অপরাজেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দাস, সর্বহারা এবং প্রাচ্যের সর্বস্বান্ত প্রজাদের অসন্তোষ-এর সঙ্গে দ্বিতীয় শতক থেকে জার্মানদের উপর্যুপরি আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ছিল সময়ের প্রশ্ন মাত্র। চতুর্থ শতকে জার্মানদের সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধের ফলে রোমের সামরিক সংগঠন একেবারে ভেঙ্গে যায়। দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো রোমের অর্থনৈতিক কাঠামো ধসে পড়ে। দাসের স্থানে উদ্ভূত হয় সর্বস্বান্ত আধা-স্বাধীন মানুষের। পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নতুন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জন্ম হয়। খ্রিষ্টধর্মকে শ্রেণিসংঘর্ষ এড়ানোর একটা প্রধান উপায় ভেবে সম্রাট কনস্টেন্টাইন ৩১০ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম রূপে স্বীকৃতি দেয়।[১৩] কিন্তু এসব সত্ত্বেও চতুর্থ শতকের শেষের দিকে রোমানদের পক্ষে জার্মানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার আর উপায় থাকে না। অবশেষে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানরা সম্রাট অগাস্টুলাসকে সরিয়ে দিয়ে জার্মান নায়ক ওডোয়েকারকে (odoacer) রাজা ঘোষণা করে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা ঘটে। রোমান

সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেন, 'অবিরত দাস-বিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যকে দ্রুত অবনতির পথে নিয়ে যায়। দাস-বিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে এবং নতুন সমাজের পথ পরিষ্কার করে।'[১৪]

প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে রোমের দাসবিদ্রোহ সমাজচিন্তার ইতিহাসে এক বিরাট মাইলফলক এবং সমাজে এই দাসবিদ্রোহের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভূ-স্বামী আর রাজ-রাজড়ার বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক বিদ্রোহের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে নীল নদের তীরে পরাক্রমশালী ফারাও সাম্রাজ্যের শোষণ আর গণদারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কৃষক ও কারিগররা এক অভ্যুত্থান ঘটায়। ঋণদাসত্ব বাতিল, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জমির দাবিতে গ্রিসে বিদ্রোহ ঘটেছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে। চিনে ব্যাপক আকারের কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৩৫৮ সালে ফ্রান্সে কৃষক জনতা সামন্ত প্রভুদের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৩৮১ সালে কৃষক বিদ্রোহ সংঘঠিত হয় ইংল্যান্ডে। তের-চৌদ্দ শতক থেকে অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭) পর্যন্ত রাশিয়ায় অসংখ্য বিদ্রোহ ঘটে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও দক্ষিণী দাস মালিকদের পরাজয় ১৭৭৬ সালে। ফ্রান্সে ১৭৮৯ (১৪ জুলাই) সালে ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার দাবিতে কৃষক-জনতা শাসককূলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, শত শত বছরের অত্যাচারের পীঠস্থান 'বাস্তিল' ধ্বংস করে, হাজার বছরের সংস্কার ভেঙ্গে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়। এ বিপ্লব চলে ১৮৪৮ সাল অবধি, ইতিহাসের পাতায় যা 'ফরাসি বিপ্লব' নামে পরিচিত। ১৮৭২ সালে বাংলার কৃষকদের ব্যাপক অভ্যুত্থানে কৃষকদের সংগঠন 'রায়তসভা' জমিদারদের পাইকারিভাবে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সংঘটিত করে। এছাড়া বাংলায় সংঘটিত হয় ফকির বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৮)।

এসব বিদ্রোহ ও ক্ষয়ক্ষতি হাজার বছরের শোষণ, উৎপীড়ন, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘটলেও সর্বকালেই স্বার্থান্বেষী মহলের চাতুরি ও প্ররোচনায় 'রাজা যায় রাজা আসে'র মতো পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি সমাজেই শোষক আর শোষিত, সুবিধাভোগী আর বঞ্চিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রতিনিয়ত ঘটতেই থাকে। 'সমাজ সর্বদাই বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল', সমাজ দর্শনের এই পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে উদ্ভূত হয় সমাজবিজ্ঞান এবং অপেক্ষাকৃত পরে সমাজবিজ্ঞানের আর-এক শাখা 'নৃবিজ্ঞান'। অ্যারিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস, রুশো, ভলতেয়ার, মর্গান, কোঁৎ, দুর্খেইম, ওয়েবার, হেগেল, ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী সমাজকে নানা আঙ্গিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এবং এর নানামুখী সমাধানসূত্র নিয়ে এগিয়ে আসেন। আমরা এসব মনীষীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে সাহায্য

নিয়ে প্রাগ-ইতিহাসকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল সমাজের একটা ধারাবাহিক চিত্র নির্মাণ করতে পারি।

সামন্ততন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে মূল যোগানদার রাজতন্ত্র ও মর্গান কথিত বর্বর সমাজের নির্যাতন-নিষ্পেষণ, অত্যাচারে সৃষ্ট মানবেতর জীবন যাপনকারী সহায়সম্বলহীন দাস, ভূমিদাস এবং শ্রমিক শ্রেণি। দাসকে শোষণ করে দাস-মনিব, ভূমিদাসকে শোষণ করে সামন্তপ্রভু আর শ্রমিককে শোষণ করে কারখানা-মালিক। দাসকে মনে করা হতো দাস-মালিকের সম্পত্তি; মালিক তাকে বিক্রয় করতে পারে—আজকের দিনের গরু ছাগল বিক্রির মতো, মালিক তাকে শাস্তি দিতে পারে—এমন কি হত্যাও করতে পারে। দাসের নিজের কোনো সংসার নাই, সম্পত্তি নাই। ভূমিদাসের আবার অন্যরকম সমস্যা। ভূমিস্বামী তাকে জমি ঠিকই দেয়, তার হাল-গরুও কিছু হয়তো বা থাকে, তার নিজেরও থাকে পৃথক সংসার। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের যুগে কৃষককে বাধ্যতামূলকভাবে মনিবের জন্য খাটতে হতো, মনিবের জমিতে বেগার কাজ করে দিতে হতো এবং নিজের কথিত জমির ফসলের সিংহভাগ দিতে হতো মনিবকে—এছাড়া দিতে হতো রাজার খাজনাপাতি।[১৫] এসব বাদে তার অবশিষ্ট থাকতো খুব সামান্যই ফসল। ভারবাহী পশুকে যেভাবে দেখা হয়, মনিব কৃষককে সেভাবেই দেখত। কৃষকের আত্মরক্ষার কোনো উপায় বা অধিকার ছিল না।

শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন হলেও উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণ থেকে সে বঞ্চিত। নিজের বলতে তার আছে শুধু শ্রমশক্তি। শ্রম বিক্রিই তার বাঁচার একমাত্র পথ। অনেক সময় কাজ যোগাড় করতে না পারলে তাকে বেকারের জীবনযাপন করতে হয়, এতে তার পরিবার পরিজনসহ না খেয়ে মরার উপক্রম হয়।

ভূস্বামীরা ছিল স্ব স্ব এলাকার সার্বভৌম অধিপতি। সম্পত্তির অনুপাতে তাদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য ছিল, যেমন সবার উপরে রাজা, তার নীচে ডিউক, কাউন্ট, ভাইকাউন্ট, ব্যারন, সবার তলায় নাইট। তারা সবাই পরস্পর নির্ভরশীল ছিল। রাজা অভিজাতদের ও সামরিক কর্মচারীদের জমি দিত এই শর্তে যে, তারা যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। এ ব্যবস্থাই সামন্ততন্ত্র বা ফিউডেলিজম বলে পরিচিত। সামন্ততন্ত্রে চার্চের খুবই প্রভাব ছিল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রেই চার্চের প্রাধান্য ছিল। চার্চই সবার সেরা ভূস্বামী। চার্চ সম্পত্তির অধিকারী হয় নানা উপায়ে—রাজা এবং সামন্তরা চার্চকে ভূমিদান করত। চতুর্থ শতক থেকে রোমের ধর্মযাজককে বলা হতে থাকে রোমের পোপ। পোপের অধীনে সমগ্র চার্চ সংগঠন কেন্দ্রীভূত হয়। নবম শতকের দিকে পোপের ক্ষমতা এতটা বৃদ্ধি পায় যে রাজাকেও পোপের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সমাজের চেতনা শক্তির ভাষা ধর্ম আফিমের মতো প্রয়োগ করে চার্চ। ক্যাথলিক চার্চ নিঃস্ব নিরন্ন জনসাধারণকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে সুখ ও শান্তির আশা করা যায় পরলোকের জন্য, আর পরলোকে সুখ শান্তি পেতে হলে এ

জীবনের দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করে যেতে হবে। ধর্মযাজকরা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে আর জনসাধারণকে শিক্ষা দেয় ধৈর্য, নম্রতা ও বাধ্যতা যাতে করে তারা শ্রেণিসংঘর্ষ থেকে দূরে থাকে।[১৬]

এগার শতকের শেষ দশকে (১০৯৫ খ্রি.) ইউরোপের খ্রিষ্টানরা বিধর্মী বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। এই ধর্মযুদ্ধকে বলা হয় 'ক্রুসেড'। প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ বাইরের একটা আবরণ। ইটালির বণিকরাই ক্রুসেডের যথার্থ সংগঠক। তথাকথিত ধর্মযুদ্ধের যথার্থ উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ও দেশ জয়। এ যুদ্ধের জন্য পোপ স্বয়ং সৈন্যদল সংগ্রহের জন্য অগ্রণী হন। এভাবে চার্চের ক্রস, সৈনিকের তলোয়ার ও বণিকের বাণিজ্য স্বার্থ একত্রে মিলে তথাকথিত ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হয়। ১০৯৫ সাল থেকে প্রায় দুই শত বছর এ যুদ্ধ চলে।

সমগ্র ইউরোপে রাজা, ভুস্বামী ও চার্চের ভোগলিপ্সা ও অত্যাচারে কৃষক, শ্রমিক-জনতা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। চৌদ্দ শতকে কৃষকের জীবনে চরম দুর্গতি দেখা দেয়। খোদ প্যারিস শহরের নিকটে ১৩৫৮ সনে কৃষকরা বিদ্রোহ করে। প্যারিসের নাগরিকরা এবং কারিগরেরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এরপর ইংল্যান্ডে ১৩৮১ সালে কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সর্বত্রই বিদ্রোহীদের সাময়িক জয় হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজাতরা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে।

সমাজের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে এমন একদল সংস্কৃতিবান মনীষীর আবির্ভাব ঘটে যারা মানবধর্মী। সব বিষয়ই তারা বিচার ও পর্যালোচনা করেন লৌকিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে। ইতিহাসে এঁরা 'হিউমেনিস্ট' হিসেবে পরিচিত। এঁরা নবযুগের বা রেনেসাঁর স্রষ্টা, নতুন ভাবধারার বাহক। এ সময় গ্রিস ও রোমের সংস্কৃতি চর্চার গভীর পর্যালোচনা শুরু হয়। শহরের বণিক শাসকদের মধ্যে শিল্পকলা, চিত্রকলা, সাহিত্য, সংগীতের সমাদর দেখা দেয়। বাণিজ্যের বিকাশ ও শিল্পের উন্নতিতে বিজ্ঞান, দর্শন ও কলাশাস্ত্রের ভিত্তি রচিত হয়।

স্বভাবতই চৌদ্দ শতকে এক শ্রেণির লেখকের মধ্যে তাদের রচনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। ফ্লোরেন্সের কবি পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) প্রাচীন গ্রন্থাদি ও পাণ্ডুলিপি ঘেটে মানবহিতৈষণার নবতর তথ্য প্রকাশ করেন। পেত্রার্ক তাঁর সনেট রচনার মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের পতাকা উড্ডীন করেন। বোক্কাচিও (১৩১৩-১৩৭৫) সামন্তপ্রভু ও ধর্মযাজকদের বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করেন। বোক্কাচিও নাগরিকদের অনুসন্ধিৎসু মন ও কর্মশক্তির প্রশস্তি রচনা করেন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিল্প সে সময়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। চার্চের প্রভাবে শিল্পীরা যথার্থভাবে জীবনকে, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি; কিন্তু বণিক প্রধান সমাজে শিল্পীদের প্রধান প্রচেষ্টাই থাকে যথার্থ জীবনকে ফুটানো।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস প্রথমে দেখা দেয় ইতালিতে, তারপর ফরাসি দেশে ও ইংল্যান্ডে, এরপর জার্মানিতে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে। রেনেসাঁসের প্রধান

লক্ষ্য হলো গ্রিক ও লাটিন জগতে নব আবিষ্কৃতি। চৌদ্দ-পনেরো শতকে গথ ভিসিপথ এই সব বর্বরদের উপর্যুপরি আক্রমণে রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংযজ্ঞের মধ্যে গ্রিক পণ্ডিতেরা পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়ে যায় কনসটানটিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুলে) এবং কনসটানটিনোপল হয়ে ওঠে হেলেনিক সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম আস্তানা।

আর গ্রিক লাটিন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার অভাবে সমগ্র ইউরোপে নেমে আসে ঘোরতর অন্ধকার। বার শতক অবধি ইউরোপ অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। ইতিহাসে এই সময়টুকুকে বলা হয় Dark Age বা অন্ধকার যুগ। ইউরোপে যখন ঘোরতর অন্ধকার বিরাজমান সে সময় পশ্চিম এশিয়াবাসী হেলেনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে লালন করে এবং সাত শতকে নবজাগ্রত ইসলাম গ্রিক পাণ্ডিত্য ও মনীষাকে সমাদৃতি জানায়।

ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় ইউরোপবাসী জেরুজালেম উদ্ধার করতে পশ্চিম এশিয়ায় আসে। ফলে গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে নতুন করে পরিচিত হয়, পুঁথিপত্র সাথে করে নিয়ে আসে। গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নতুন করে আবিষ্কার করার ফলে ইউরোপে চৌদ্দ শতকেই ঘটে রেনেসাঁস। আবার পনেরো শতকে তুর্কিরা ইস্তাম্বুল পুনর্দখল করার ফলে ১৪৫৩ সালে সব গ্রিক পণ্ডিত ইউরোপে বিশেষত ইতালিতে চলে আসে। ফলে ইতালিতে দেখা দেয় পরিপূর্ণ নবজাগৃতি। দীর্ঘকাল প্রায় হাজার বছর ধরে ইউরোপীবাসী ধর্মের মোহের মধ্যে ছিল তাই জীবনের চাইতে মৃত্যু, আধিভৌতিকের চাইতে আধ্যাত্মিকতা, দেহের চাইতে আত্মা, ইহকালের চাইতে পরকাল, মুক্তিলাভের চাইতে মোক্ষলাভ অনেক বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু রেনেসাঁসের ফলে মানুষ প্রাধান্য পেল। মানুষ পেল অপরিসীম মর্যাদা। গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাস বলেছেন 'Man is the measure of everything' অর্থাৎ মানুষ হলো সব কিছুর মাপকাঠি। ফলে শিক্ষা হলো জীবনমুখী—যে শিক্ষার পরিচয় মেলে গ্রিক-ল্যাটিনে। তাই সে সময় গ্রিক ল্যাটিন পুথি সংগ্রহ এবং ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার আলোড়ন পড়ে যায়।

রেনেসাঁসের মূল লক্ষণগুলো হলো : ক. জীবনমুখীনতা, খ. মানবপ্রীতি, গ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তিমানুষ জীবনের যে চর্চা ও সাধনা করবে এর আদর্শ হলো হেলেনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে সেই সংস্কৃতির সাথে ইউরোপবাসী পরিচিত হতে চাইল। এবং এই প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম দেখা দিল ইতালিতে। ইতালিতে রেনেসাঁসের হোতা হলেন পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪), বোক্কাচিও (১৩১৩-১৩৭৫), লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এবং অন্যরা। এরপর রেনেসাঁসের জোয়ার বয়ে চলে ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ষোল শতক অবধি প্রায় সমগ্র ইউরোপে রেনেসাঁসের পূর্ণ জোয়ার বইতে থাকে।

রেনেসাঁ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী দ্য ভিঞ্চি ছিলেন স্থপতি, কবি, চিত্রকর ও বিজ্ঞানী।[১৭] তিনি যাজকদের ধর্মের বুলি ও উপদেশ কপচাতে নিষেধ করেন; তিনি

প্রকৃতি থেকে পাঠ নেবার পরামর্শ দেন। ইটালিতে সে সময় যুগোপযোগী রাষ্ট্রতত্ত্বের জন্ম হয়। ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) পুরোপুরি সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ দাবি করেন। তিনি বলেন ধনবান নাগরিকরাই শাসন কার্য পরিচালনা করবেন; এরকম রাষ্ট্র গড়ার জন্য যে-কোনো কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। এভাবে সামন্ততন্ত্রের অস্তিমতার সূচনা হয় এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে স্বাগত জানানোর পথ প্রশস্ত হয়।

ইতিহাস প্রাচীনের মধ্যে সভ্যতার উপকরণ অন্বেষণ করে।[১৮] এ উপকরণের ভিত্তি হচ্ছে : ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত প্রত্ন-সামগ্রী, প্রাচীন স্থাপত্য, মানুষের নৈমিত্তিক ব্যবহারের দ্রব্য-সামগ্রী, সেই সঙ্গে প্রত্ন-ভাষা, নাচ-গান, চিত্রকলা, শিল্পকলা, লোকগীতি, লোকগাথা, লোককাহিনী, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন এবং লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদান—যেমন শিকারের জন্য নির্মিত হাতিয়ার, কৃষির জন্য নির্মিত লাঙ্গল, খুনতি, কোদাল, দা-ছুরি, মৃত্তিকা ও অন্যান্য উপাদানে নির্মিত হাড়ি-পাতিল—এসব সমাজ জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ এবং বিবর্তনের দিকচিহ্ন।[১৯]

আদিম সমাজ ছিল সমবণ্টন (equal distribution) ভিত্তিক, সকলে মিলে যা উপার্জন করতো, তা সবাই মিলে সমান অধিকার (equality) সূত্রে একত্রে ভোগ করতো; কালক্রমে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে গোষ্ঠী সচেতনতার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং গোষ্ঠীচেতনতার মানসিকতাই শ্রেণিচেতনতার (Class Consciousness) জন্ম দেয়। সামাজিক কাঠামো এমন এক স্তর বিন্যাসের সূচনা করে যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজ ও শ্রেণিনিরপেক্ষ হতে পারে না। আরো পরে শ্রেণি বিভাজিত সমাজের অন্তিমতার ইঙ্গিতও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এসেছে যে, শ্রেণিবিভাজিত সমাজের অনিবার্য পরিণতিতে জন্ম নেবে শ্রেণিহীন, সমবণ্টনভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র —যার রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন বিশেষত মার্কস ও এঙ্গেলস।

সমাজবিজ্ঞান ধারণাটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশেষভাবে দানা বাঁধে। সামাজিক কাঠামোর সার্বিক বিশেষণ ও মূল্যায়ন করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ। ১৮৩৯ সালে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোৎ সমাজবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন।[২০] এ শতক থেকেই সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজের বিকাশ, বিবর্তন ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে বিশ্লেষণের অন্যতম উপাদান ও উপকরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার বিকাশে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লব সমাজ-বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সংঘটিত শিল্পবিপ্লব ইউরোপীয় সমাজের পুরানো ভিতকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়। এ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের সূত্র ধরে। ইতোপূর্বেকার হাতে চালিত সমস্ত কলকারখানায় ইঞ্জিনের সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ বিপ্লবের মূলকথা ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বস্তরে যন্ত্রের প্রবর্তন। এর প্রভাব যে শ্রেণির উপর সর্বাধিক মাত্রায়

পরিলক্ষিত হয়েছিল সেটি হলো শ্রমিক শ্রেণি[২১]। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে একদিকে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশ ঘটতে থাকে অপরদিকে ন্যূনতম মজুরিতে শ্রমিকদের জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য, হতাশা ও বঞ্চনা। প্রযুক্তি ও ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা উনিশ শতকের চিন্তাবিদদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছিল। র‍্যাডিক্যালদের রচনায় শ্রমিকরা কেমন করে যন্ত্রের নাট বল্টুতে রূপান্তরিত হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ মেলে মার্কসের অন্বয়তত্ত্বের যান্ত্রিকীকরণের দার্শনিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে।

ফরাসি বিপ্লব ইউরোপের প্রথম সার্থক রাজনৈতিক বিপ্লব। এ বিপ্লবের ফলে বিশ্বসমাজে যে নতুন ধ্যানধারণা ও কর্মসূচির উন্মেষ হয় তা আজও অমলিন। এ বিপ্লবের কালপর্ব ১৭৮৯-১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে ফ্রান্সের সমাজ জীবনে যে ব্যাপক রদবদল ঘটে সেদিক দিয়ে বিচার করলে উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকে সমাজ ও সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে নতুন ভাবনা বিকাশে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল ফ্রান্স। সাঁ সিমো, কোঁৎ, তকভিল প্রমুখের মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার বিপবোত্তর ফরাসি সমাজের নতুন বিহঙ্গগুলি ধরা পড়ে। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পতন ঘটে—প্রবর্তিত হয় নতুন পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র।[২২] পরিবার, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সম্পত্তি-সম্পর্ক, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভৃত্য-মনিব সম্পর্ক, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সম্প্রদায়, মর্যাদা, কর্তৃত্ব, মতাদর্শ সর্বক্ষেত্রে দ্রুত রদবদল ঘটতে থাকে। যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে সমস্ত ঘটনা ও বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দেয়। যে চেতনা থেকে এই অুনধাবন প্রক্রিয়া শুরু করার প্রেরণা আসে সেই চেতনাকে পিটার বার্জার বলেছেন, 'সমাজতান্ত্রিক চেতনা'। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ইউরোপীয় সমাজচিন্তার প্রধান উপজীব্য ছিল ফরাসি বিপ্লব। কোৎ থেকে দুর্খেইম পর্যন্ত সব সমাজতাত্ত্বিকের রচনার প্রেক্ষাপটটি ছিল এ বিপ্লব। কারণ ফরাসি বিপ্লব যেমন সার্থক রাজনৈতিক বিপ্লব তেমনি এ বিপ্লব ছিল ইউরোপের প্রথম মতাদর্শগত বিপ্লব। এ বিপ্লব ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ ও নীতিবাদী মতাদর্শের সমাহারে গঠিত এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মানবাধিকারের ঘোষণা, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ সাবেকি সমাজের চিন্তাভাবনার জগতকে সম্পূর্ণ এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ব্যক্তির যে-কোনো বৃত্তি অর্জনের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সিদ্ধ করা হয়, অবৈধ সন্তানের পারিবারিক সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার স্বীকার করা হয়, পরিবারসহ সর্বক্ষেত্রেই সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি অনুসৃত হয়, শিক্ষা বিস্তারের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ শুরু হয়, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা হয়; চার্চের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়; রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও যুক্তির মেলবন্ধন ঘটে; যার ফলে সাংসদদের মধ্যে ক্ষমতাকে সাম্যের বাহন হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা দেখা দেয়।

ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপীয় সামন্তসমাজের যূথবদ্ধতা যেমন গিল্ড ব্যবস্থা, গ্রাম সম্প্রদায়, চার্চ, জাতি ও স্টেট প্রথা, পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে বিযুক্ত হয়ে ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে ধাবিত হয়। নবজাত সমাজের এ রূপটি ছিল সমাজতান্ত্রিক কল্পনার প্রধান উপজীব্য।[২৩] জন্মের উষালগ্নে সমাজতত্ত্ব যেসব সামাজিক সমস্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিল সেগুলো হলো সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম। সমাজতত্ত্বের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণিসহ সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণির স্তরগুলির সমস্যা। সর্বপ্রথম সিমোঁ ও আগাস্ট কোৎ-এর রচনায় শ্রমিক শ্রেণির সমস্যা সমাধান করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। দুর্খেইম শ্রমবিভাজনের অস্বাভাবিক (abnormal) ধরন নিয়ে আলোচনা করেন, কারণ-এর নেতিবাচক প্রক্রিয়া তার কাছে সমাজ সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক মনে হয়েছিল।

সমাজতত্ত্ব বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে মূলত দু'টি পৃথক ভাগে ভাগ করা যায়। এক. ধ্রুপদী সমাজতত্ত্ব যার অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি দৃষ্টবাদ (Positivism) এবং দুই. মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব যার ভিত্তিভূমি হলো দ্বন্দ্বতত্ত্ব।[২৪] 'দৃষ্টবাদ' (বা প্রত্যক্ষবাদ) হচ্ছে জল্পনাকল্পনার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়গম্য প্রপঞ্চ ও সন্দেহাতীত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদ। এ মতবাদের উদ্‌গতা ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোৎ (১৭৯৮-১৮৫৭)। প্রায় একই কালসীমার মধ্যে সফল দু'টি বিপ্লব সংঘটিত হলে হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় সমাজের চলতি মানচিত্রটি বদলে যায়। অগাস্ট কোৎ-এর রচনায় দৃষ্টবাদী পদ্ধতিতে সমাজবিক্ষণের যে প্রচেষ্টা শুরু হয় তা পরবর্তীকালে সমাজবীক্ষণের একটি বিশিষ্ট ধারায় রূপান্তরিত হয়। কোৎ তাঁর প্রগিত (Progress) ও শৃংখলার (order) ধারণায় যে কল্পনা করেছিলেন তা ছিল সমকালীন ফ্রান্সের সম্পত্তিবান মধ্য শ্রেণির ধারণা। দৃষ্টবাদের নিরপেক্ষতা আসলে ছিল বিপবদীর্ণ ফ্রান্সের বিশৃংখলার মুখোমুখি হবার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা। পরবর্তীকালে দৃষ্টবাদী ধারা কাঠামোবাদী তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। কাঠামোবাদ হলো অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বর্তমানের মধ্যে আবদ্ধ ইতিহাস-নিরপেক্ষ সমাজবীক্ষণ। দুর্খেইম থেকে পারসন পর্যন্ত এসব ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের শ্রেণিভিত্তিটি ছিল সম্পদশালী বুর্জোয়া শ্রেণি, তারা ছিলেন বর্তমান সমাবজব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে তার সংস্কার সাধন অর্থাৎ তারা নতুনভাবে সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধী।

এক্ষেত্রে আমরা প্রাচ্যের তথা এই বঙ্গ ব-দ্বীপের সমাজচিন্তক উপন্যাসখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আলোচনায় আনতে পারি। বঙ্কিমের সাম্য প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। পরে এটি ১৮৭৯ সালে অন্য কয়টি প্রবন্ধের সাথে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। একথা ঠিক যে সর্বজনীন মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা

থেকে বঙ্কিম 'সাম্য' রচনায় মনোনিবেশ করেন। সাম্য বিষয়ে আলোচনার সূচনাতেই বঙ্কিম সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি ভূমিকায় কৈফিয়তের সুরে বলে, 'সাম্যনীতি নতুন তত্ত্ব নহে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও স্বদেশীয় সাধারণ জনগণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান আমি দুঃখিত হইব না। শিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।

শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিকল্পনা করে অনেক সংগঠন ও মনীষীই মানুষের সামাজিক মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন, ইতিহাসে এমন এক দলের নাম ইউটোপিয়ান বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী। বইটি চিন্তার সবচেয়ে উলে-খযোগ্য ফসল হচ্ছে, টমাস মুর-এর ইউটেপিয়া: ১৫১৬। বইটি সমকালীন বিশ্বে সাম্যবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে সমাজচিন্তকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মুরের ইউটোপিয়া এক কাল্পনিক দ্বীপ বিশেষ যেখানকার মানুষগুলি সুখি ও শান্তিপ্রিয়। সাম্যসুখী সমাজ ও রাষ্ট্রের এক নিখুঁত চিত্র তিনি অঙ্কন করেন এ বইয়ে। এটা ষোল শতকের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। সামন্তবাদী সমাজকাঠামোর অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে সবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনা ঘটেছে। মুর ছিলেন মানবতাবাদী রেনেসাঁস যুগের বৈজ্ঞানিক ধারার সেরা প্রতিনিধিদের অন্যতম। তাঁর বিশ্ববীক্ষা গঠনে বড়ো একটা প্রভাবে পড়ে অক্সফোর্ডে পাঠরত অবস্থায়, যেখানে পনেরো শতকের শেষের দিকে মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজমকে কোণঠাসা করেছিলো মানবতাবাদের নতুন হাওয়া। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালে একদল মানবতাবাদী অধ্যাপকের তৎপরতায় বয়ে চলেছিলো মানতাবাদের সুবাতাস।[২৫] সমকালীন সমাজে উদ্ভূত সমস্যা ও দ্বন্দ্বের জবাব ইউটোপীয়। আমরা আগেই বলেছি ষোল শতক ছিল পুঁজিবাদ উদ্ভবের যুগ। পুঁজিবাদের সূচনাকালেই দেখা গেছে বহুসংখ্যক মজুর নির্মম শোষণের-পীড়নের শিকার হচ্ছে, তাই বলা চলে মুরের ইউটোপীয়া কেবল সামন্ততন্ত্র নয়, একই সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থারও স্থায়ীত্ব নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মুরের কাল্পনিক দ্বীপে ন্যায় ও সাম্য বিরাজমান। মুর মনে করেন, ব্যক্তিগত মালিকানাই সামাজিক অন্যায়ের/অনাচারের মূল কারণ। সেকারণেই ব্যক্তিগত মালিকানা দৃঢ়ভাবে নাকচ করতে হবে। তাঁর কল্পিত ইউটোপীয়া দ্বীপে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, মুদ্রা সঞ্চালন নেই, পরিপূর্ণ সমতা সেখানে বিরাজমান। সমাজের ভিত্তি হলো শ্রম। সেখানে শ্রম সবার পক্ষে বাধ্যতামূলক। তাই ইউটোপীয়া দ্বীপের কৃষিকাজে সমস্ত নাগরিক যোগ দেয় পালা করে। এজন্য শহর থেকে লোকে গ্রামে উঠে আসে দুই বছরের জন্য। প্রতিটি পরিবারের বাড়ি আছে শহরে। মালিকি মনোবৃত্তি যাতে না গজায়, তার জন্য

পরিবারগুলি নিয়মিত বাড়ি বদল করে। এমন কি সে দ্বীপে নাগরিকদের একত্রে ভোজনেও যৌথবাদ প্রণোদিত হয়। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতীতি হয় যে মুরের সমকালে (১৪৭৮-১৫৩৫) সমাজ হাজার বছর লালিত সামন্ততন্ত্রের কুফল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আকুপাকু করছিল; সেখান থেকে উত্তরণের তাগিদেই মুরের এই যুগান্তকারী সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আসে।

সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে প্রত্যয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছি, তার মধ্যে বহুকালব্যাপী লালিত মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনাকেও বিবেচনায় আনা সমীচীন বলে মনে করি। যেমন গৌতম বুদ্ধ, যিশু, মুহম্মদ প্রমুখ সমাজ সংস্কারক-ধর্মবেত্তা-ধর্মপ্রচারকগণ যে মূল্যবোধ উপহার দিয়েছেন তার অবদান সমাজ-সভ্যতায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। সেজন্য একজন ভিক্ষু, একজন খ্রিষ্টান, একজন মুসলমান এবং একজন কমিউনিস্টের জীবনদৃষ্টিতে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবনাচরণে মনুষ্যত্ব বিকাশকারী অভিন্ন আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ সমাজে ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলেছে। গৌতম বুদ্ধ, যিশু, মুহম্মদ, মাওসেতুং এঁরা সকলেই কমবেশি মানবতাবাদী এবং মানবকল্যাণে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। উলেখ্য, ভাববাদ, বস্তুবাদ বা অন্যান্য মতধারা ও জীবনাদর্শের ভিন্নতা-বিভিন্নতাকে বিন্দুমাত্র অস্বীকার না করেও জীবনধারার অনুকূল ঐ সব বিভিন্ন মূল্যবোধ বহুকালব্যাপী মানুষের অন্তর্গত এবং নিউরনবাহিত শোণিত ধারায় স্পষ্টভাবে-অস্পষ্টভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বর্তমান গবেষণায় গৌতম বুদ্ধ ও হযরত মুহম্মদের মানবতাবাদী চিন্তার মর্মকথাটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি।

হিমালয়ের পাদদেশে শাক্য নামে যে ক্ষুদ্র জাতি বা ট্রাইব ছিল; যার রাজধানী ছিল কপিলাবস্তু। এই কপিলাবস্তুর অনতিদূরে মাতুলালয়ে যাবার পথে লুম্বিনি নামের শালবনে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৬-এ গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতীয় চিন্তাধারায় মানবপ্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধের জীবন চিন্তায়। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় সত্তার উলেখ নেই। বৌদ্ধ দর্শনের মৌলবাণী হচ্ছে মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। এ দর্শনে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধ যে চারটি মহাসত্য ও পাঁচটি শ্রেয়োনীতির অবতারণা করেছেন তাতে তার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জয় ঘোষিত হয়েছে। তাঁর বিশ্বমানবচিন্তায় মানুষ মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই—সাদা-কালো, ধনি-গরিব, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে—এক সর্বজনীন মানবপ্রেমের অন্বিত রূপ তাঁর চিন্তায় বিকশিত হয়েছে। বৌদ্ধের উদারনৈতিক মানবপ্রেমের প্রভাব-প্রসার বিশ্বজনীন। ভারতবর্ষ ও বাঙলার চিন্তাশীল সকল মানুষ ও সম্প্রদায়ের উপর তার চিন্তাদর্শের প্রভাব আজও ক্রিয়াশীল। লালন, রবীন্দ্রনাথও এ প্রভাব-বলয়ের বাইরে নন। ভারত ও বাংলার দুই মহান রাজনৈতিক রূপকার মহাত্মা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তাদর্শেও বৌদ্ধের অহিংসবাদের প্রভাব লক্ষ্যযোগ্য। বুদ্ধের

প্রচারিত দর্শনে জাতি-বর্ণ, ধনি-গরিব নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা ও সর্বজনীন মঙ্গলচিন্তা তার প্রভাব এই অহিংসবাদী দুই নেতাকে মহামনীষীতে পরিণত করেছে।

আমরা যদি মুহম্মদের আহবান বিবেচনায় আনি তাহলে দেখবো তিনি জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বংশমর্যাদা শ্রেণিবৈষম্যসহ মানুষে মানুষে উঁচু-নীচু ভেদাভেদি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন আজ থেকে প্রায় পনেরোশত বছর আগে। তাঁর ভাষ্য আরব-অনারব, সাদা-কালো সবাই এক পিতা-মাতার সন্তান সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য হতে পারে না।

নারীকে যেখানে জীবন্ত কবর দেয়ার মতো বর্বর প্রথা ঐ কালের আরবে প্রচলন ছিল, সেখানে হযরত মুহম্মদ (স.) নারীকে অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করেন। আধুনিক কালে হযরত মুহম্মদই প্রথম নারীকে জীবনসংগ্রামের সহযোদ্ধা হিসেবে শনাক্ত করেন। মানবতাবাদের ক্ষেত্রে এ এক বৈপ্লবিক ঘটনা, যা ছিল আদিম সাম্য-সমাজের অনুকৃতি। আধুনিক বিশ্বে প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য সবখানে নারী-পুরুষের সমতার যে বিকাশধারা যেটি মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওসেতুং প্রমুখ সমাজচিন্তকের মধ্যে গ্রথিত দেখি, তার শিকড়টির রসসিঞ্চনের ধারাও হযরত মুহম্মদের চিন্তার মধ্যে নিহীত বলে মনে করা যায়। মানুষের মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমাদের যেমন অধিকার আছে তোমাদের স্ত্রীদের ওপর, তোমাদের স্ত্রীদেরও অধিকার আছে, কাজেই স্ত্রীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। আর তোমাদের ক্রীতদাস-দাসীদের যেন সেই খাদ্য দেয়া হয় যা তোমাদের জন্য প্রস্তুত হয় এবং তোমরা নিজেরা যে প্রকার বস্ত্র পরিধান কর সেই প্রকার বস্ত্র তাদেরও প্রদান করবে। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি অসহায়-দরিদ্র-বঞ্চিৎ মানুষের মুক্তির বার্তা শুনান এবং তাঁর এই ভাষণের ফলপ্রসু প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রণীত মদিনা সনদে ঘোষিত হয়েছে, মদিনায় বসবাসরত ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সবাই একদেশি এবং সবাই সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে; সব ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। সেদিন তিনি একজন দক্ষ সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকের ন্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মদিনা সনদ প্রদান করে মদিনায় বসবাসরত বহুমাত্রিক ধর্মাবলম্বীর সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই সঙ্গে বলা যায় তাঁর বিদায় হজের যুগান্তকারী ভাষণের কথা। এই অভিষণটি ছিল সর্বজনীন মানবাধিকারের এক ঐতিহাসিক ঘোষণা।

রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রে আমরা মেকিয়াভেলির কথা আলোচনায় আনতে পারি। মেকিয়াভেলির মূল রাজনৈতিক ভাবনা ছিলো একক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠন। রাষ্ট্রের নির্বাহীকে হতে হবে চূড়ান্ত ক্ষমতাধর, তাকে রাষ্ট্রের স্বার্থে হতে হবে

কঠোর, দৃঢ় ও নির্মম; অবশ্য সেই সঙ্গে অবশ্যই তাকে হতে হবে মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমিক। তাকে চূড়ান্তরূপে চূর্ণ করতে হবে সামন্তদের, তাদের সম্পত্তিগুলোকে সম্মিলিত করতে হবে একটি মাত্র বৃহৎ রাষ্ট্রে এবং তাতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নাগরিক সমতা, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার পক্ষে মানবিকতাবিরোধী ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া তিনি সম্ভব গণ্য করেছিলেন কেবল একটি চূড়ান্ত ক্ষেত্রে গোটা স্বদেশের ধ্বংসসূচক বিপদের মুখে। 'নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি স্বদেশকে' মৃত্যুর কিছুকাল আগে এক বন্ধুকে লেখা তাঁর পত্রের ভাষ্য এ। পশুর কাছ থেকে সার্বভৌমকে নিতে হবে সিংহ আর শেয়ালের গুণ, কেননা ফাঁদের কাছে সিংহ অসহায় আর শেয়াল অসহায় নেকড়ের কাছে। তাহলে চতুরতার সাথে ফাঁদি এবং ফাঁদের প্রতি সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে শাসককে। কেননা স্বার্থের হানি হলে স্বার্থান্বেষী নানান দিক থেকে ফাঁদ পাতবে; সুতরাং সদাজাগ্রত; ফাঁদে যেন পা না পড়ে। তাঁর রচনাবলী বিশেষণ করে আমরা তাঁকে দেখি প্রজাতন্ত্রী হিসেবে, বিশেষত এক দেশপ্রেমিক হিসেবেও।[২৬] সমকালীন ঘটনাবলীর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল মেকিয়াভেলির চিন্তাধারার উপর। তাঁর সময়ে প্রাচীন জগতের প্রতি আকর্ষণ ইউরোপে এক তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপবের সূচনা করেছিলো, ইতিহাসে যা রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলে প্রসিদ্ধ লাভ করে। রেনেসাঁসের প্রত্যক্ষ পরিণতি হলো মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের নাগপাশ হতে মানুষের চিন্তাধারাকে মুক্ত করা। সংক্ষেপে মানুষকে নতুন করে আবিষ্কারই ছিল নবজাগরণের সব থেকে বড় অবদান। তের শতকে জার্মান সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন, চৌদ্দ শতকে ফরাসি রাজতন্ত্রের কাছ পোপের অধীনতা সত্ত্বেও ইটালির নগররাষ্ট্রসমূহ স্বীয় মাহিমা ও আপন প্রত্যয় বজায় রাখতে পেরেছিল। আর ফ্লোরেন্স ছিল নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। ফ্লোরেন্সের লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শের মধ্যেও এর চরম প্রতিফলন ঘটে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মেকিয়াভেলির রচনাবলীর মধ্যে এই নতুন শিক্ষার প্রকাশ ঘটে।[২৭] মেকিয়াভেলি তাঁর *দ্য প্রিন্সে* শাসককে পরামর্শ দেন এই বলে :

> একজন শাসককে জানতে হবে কেমন করে পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়কেই ব্যবহার করতে হয়। পুরাকালের লেখকরা শাসকদের গুপ্তভাবে এই শিক্ষাটাই দিয়েছেন। শাসক শৃগাল ও সিংহকে অবশ্যই অনুসরণ করবেন, কেননা সিংহ ফাঁদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, আর শৃগাল পারে না নেকড়েদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। তাই একজনকে অবশ্যই শৃগাল হতে হবে ফাঁদগুলো চিনবার জন্য আর সিংহ হতে হবে নেকড়েদের সন্ত্রস্ত করবার জন্য। যারা শুধু মাত্র সিংহ হতে চায় তারা এটা বুঝবে না। তাই একজন বিচক্ষণ শাসকের আস্থা রাখা ঠিক হবে না যখন তার কোন কাজ তারই বিরুদ্ধে যাবে, আর যখন তার বাধ্যবাধকতার কারণগুলো থাকবে না। যদি সব মানুষই ভাল হত তবে এ পরামর্শটা কাজে লাগত না। কিন্তু যেহেতু তারা সবাই উত্তম নয় আর তোমার প্রতি তাঁরা বিশ্বাসভাজন হবে না তাই তোমারও এ ব্যাপারে কোন দায় থাকে না। আবার কখনও আইনসিদ্ধ

কারণগুলো শাসকের কাছে ব্যর্থ হয়নি যে শাসক নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে না পেরে বর্ণাঢ্য ছুতো দেখাতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে ও দেখানো যেতে পারে শাসকদের বিশ্বাসহীনতার দরুন কতবার শান্তি ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে ও প্রদত্ত বহু প্রতিশ্রুতি অর্থহীন হয়েছে; আর যারা শৃগালকে অনুসরণ করতে পেরেছেন, সবচেয়ে ভালভাবে তারাই সফল হয়েছেন।[২৮]

বঙ্কিম, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখ মনীষীদের কথা উলেখ করে আলোচনা করেন তাঁর *সাম্যে*। তিনি লেখেন, যিনি ন্যায় বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দাণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহার যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। তিনি জমিদারি শোষণের চিত্রও নিখুঁতভাবে অংকন করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বে তিনি জমিদারি প্রথা বিলোপ করার পক্ষপাতি ছিলেন না।[২৯] কাজেই তার সাম্যচিন্তা এক ধরনের কাল্পনিকতার জালে আবদ্ধ। আমরা বলতে পারি এক ধরনের উদার মানবিকতাবোধের তাড়নায় তিনি সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন; যে কারণে পরবর্তীকালে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করে এ পথ পরিত্যাগের ঘোষণা দেন।

তিন

সমাজ শৃঙ্খলা কেমনভাবে সম্ভব এ ছিল দৃষ্টবাদীদের সমাজ বীক্ষণের উদ্দেশ্য, আর সমাজ শৃঙ্খলার পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব[৩০] এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমুখ সমাজচিন্তক। মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ব সমাজবাস্তবতাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কল্পনা করে। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর যৌথ প্রণীত ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার-এর প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যই হলো—আজ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। মার্কস-এঙ্গেলস এর চোখে শ্রেণি হচ্ছে মৌলিক সামাজিক গোষ্ঠী বা বর্গ যার সংঘাতে সমাজের বিকাশ ঘটে।[৩১] শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তর সাধন ছিল মার্কসবাদের লক্ষ্য। মার্কসীয় সমাজবীক্ষা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমাজশৃঙ্খল রক্ষার কারণগুলি অনুধাবনের উপর যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনি গুরুত্ব প্রদান করে সম্পত্তি ও সহায়সম্বলহীন শ্রমিক শ্রেণির পক্ষাবলম্বন করে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শরিক হবার বিষয়টিকে। ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিকরা পরিগণিত হয়েছিলেন বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থক হিসেবে, আর মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অনুপুঙ্খ সমালোচনার মধ্য দিয়ে। মার্কস-এঙ্গেলস-এর তত্ত্বের বিশিষ্টতা এইখানে

যে তারা শ্রমিক শ্রেণির জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

শ্রেণিবিভাজিত সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর আগেও কতিপয় সমাজচিন্তক সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজের কিছু মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোকপাত করেন। ১৫১৬ সালে প্রকাশিত ইউটোপিয়া গ্রন্থে টমাস ম্যুর ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক অশান্তির মূল কারণ রূপে শনাক্ত করেন।[৩২] তিনি সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে যৌথ মালিকানার কথা বলেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে তিনি সাম্যবাদের কথা বলেন। এর একশত বছর পর অর্থাৎ সতের শতকে ইংল্যান্ডের লেভার ও ডিগারদের আন্দোলনে এ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। লেভাররা প্রচার করেন যে, সকল মানুষ সমান। ইংল্যান্ডের গরিব নিপীড়িত মানুষদের ঘোষণাপত্র নামে একটি ঘোষণাপত্র ডিগাররা প্রকাশ করেন। তাদের আদর্শগত বক্তব্য হলো পৃথিবী সবার সম্পত্তি। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থপরতার জন্যই পৃথিবীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়। শান্তির জন্যই পৃথিবীকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে। ডিগাররা মনে করতেন শ্রমই সমস্ত সম্পদের মূল।[৩৩]

ফরাসি বিপ্লবের প্রধান প্রেরণাদায়ী দার্শনিকদ্বয় হচ্ছেন ভলতেয়ার ও রুশো। রুশোর দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্যের বিধান। সাম্যের নিশ্চয়তার জন্য রুশো চেয়েছিলেন সম্পদের সুষম বণ্টন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হলে দেখতে হবে ধন-সম্পদ যেন ব্যক্তিবিশেষের হাতে এরূপভাবে কেন্দ্রীভূত না হয় যাতে কেউ অন্যকে ক্রয় করার মতো শক্তি অর্জন করে এবং অপরাপর ব্যক্তি দারিদ্র্যের কারণে একেবারে নিজেকে বিক্রয় করে দেয়। কেউ হবে ধনবান আর কেউ হবে ভিখারি—সমাজের এ চরম অবস্থা শোধরাতে হবে। এ অবস্থার ফলে সৃষ্টি হয় শোষক, অত্যাচারী ও উৎপীড়ক শ্রেণি। তাদের কাছে মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়—একে ক্রয় করে-অন্যে হয় বিক্রি। তিনি বলেন, প্রকৃতির বিধান কিন্তু একেবারে নিরপেক্ষ; প্রকৃতি কাউকে রাজা, ধনবান বা অভিজাত করে সৃষ্টি করে নি। তিনি বলেন, সব অবস্থায়ই মানুষ সমান।[৩৪] রুশো রাজনৈতিক দর্শনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেন তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে। এখানে তিনি আমজনতার রুটি-রুজির প্রশ্নকে বড় করে তোলেন; বিধাতার লিখন কপালের দোষ স্বার্থান্বেষীদের এ ধরনের প্রপাগাণ্ডা ও মিথ্যাচারকে অস্বীকার করে রুশো শোষিত-নির্যাতিত-বঞ্চিত জনতার অধিকারের প্রশ্নে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের দায়িত্ব মানুষের মৌলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নে তিনি বলেন, ধর্ম পালন একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেখানে রাষ্ট্রের ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই; কিন্তু কেউ যদি বলে খ্রিষ্টধর্মই প্রধান, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে রাষ্ট্রের সীমানা থেকে বের করে দিতে হবে।

দেখা যাচ্ছে সমকালে খ্রিষ্টধর্মের ধর্মীয় উন্মাদনার জের ধরেই রুশো জনগণের পক্ষ নিয়েছেন। মানুষের জন্মগত অধিকার, সার্বভৌম ক্ষমতা, সমষ্টিগত ইচ্ছা ও সাম্যের পক্ষে রুশো যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের মুক্তির দূত হিসেবে তা তাকে স্থায়ী আসন দান করে। সুতরাং রুশোকে সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পথিকৃৎ বলা চলে। সমকালে আরো দুজন মনীষী নির্যাতিত সাধারণ মানুষের দুর্দশার অবসানকল্পে সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। সাম্যবাদের প্রথম প্রবক্তা রূপে এ দুজন স্বীকৃতি পেয়েছেন। এঁরা হলেন জ্যাঁ মরেলি এবং আবে মাব্‌লি।[৩৫] মরেলির কাছে ধর্ম ও চার্চকে মনে হয়েছে মানুষকে বোকা ও অনুগত রাখার উপকরণ মাত্র। তিনি বলেন, অসমতা প্রকৃতির বিধানের পরিপন্থী। প্রকৃতি সবাইকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছে, সবার বাঁচার এবং চলার সমান অধিকার রয়েছে। বিশ্বের মঙ্গলকর সবকিছুর সমান অংশভাগী হবার অধিকারও রয়েছে সব মানুষের। সাম্যবাদী চিন্তাধারার ব্যাপকতর প্রভাব রাখেন মরেলি। তিনি ঘোষণা করেন, সম্পত্তির মালিকানা নির্মূল করতে হবে, সম্পত্তির মালিকানার সাথে যে অন্ধ ও হীনস্বার্থপরতা জড়িত তাও নির্মূল করতে হবে। যেসব কুসংস্কার ও ভুল ধারণার ভিত্তিতে এসব সংরক্ষিত হচ্ছে তারও উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। এঙ্গেলস তাঁর *ইউটোপীয়ান এন্ড সায়েন্টিফিক সোশালিজম* গ্রন্থে লিখেছেন, আঠারো শতকে সত্যিকার কমিউনিস্টসুলভ তত্ত্ব মরেলি ও মাব্‌লির সাম্যের দাবি আর শুধু রাজনৈতিক অধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না, তা প্রসারিত হয়ে গেল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও। শুধু শ্রেণিগত বিশেষাধিকার উচ্ছেদ নয়, শ্রেণিভেদেরই অবসান করতে হবে। জীবনের সবকিছুর উপভোগ বর্জন করে যোগীসুলভ এক ধরনের স্পার্টান কমিউনিজম হলো এই নতুন মতবাদের প্রথম রূপ।[৩৬] এসব আন্দোলনের ভাবাদর্শীয় অভিব্যক্তি মেলে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের তাত্ত্বিক বক্তব্যে। যেমন টমাস মুর (৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৭৮ থেকে ৬ জুলাই ১৫৩৫), টমাস কাম্পানেলা (১৬-১৭শতক) আর আঠারো শতকে মাব্‌লি ও মরেলির কমিউনিস্ট তত্ত্ব, যাতে তীব্র সমালোচনা করা হয় জারমান বুর্জোয়া ব্যবস্থার।

শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের আলোকে মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদী সমাজের সযত্নে রক্ষিত আচ্ছাদনটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশেষণ করেন এবং এর পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করেন। মার্ক্সীয় চিন্তার উপাদানগুলির সমন্বিত রূপ হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। আর মার্কসের সমাজতত্ত্বের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদের মূল কথা হলো, বস্তুজগতের অভ্যন্তরে নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বস্তুজগতের পরিবর্তন সাধিত হয়। দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেয় গতি; আর গতি সূচনা করে পরিবর্তনের।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উৎস নিহিত রয়েছে মর্গানের *অ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি* (আদিম সমাজ) নামক ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে। এর উপর ভিত্তি করে

এঙ্গেলস রচনা করেন অরজিন অব দ্যা ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট গ্রন্থ। এ বইয়ে তিনি সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর এসব বক্তব্যের ব্যাপক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তারই প্রণীত *ডায়ালেকটিক অব নেচার* গ্রন্থে।

মার্কস-এঙ্গেলস এর চিন্তাদর্শকে বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, মার্কসবাদী সমাজ নিরীক্ষার বিশ্ববীক্ষা হলো দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি হলো দ্বন্দ্বমূলক। এ পদ্ধতি অনুসারে বস্তুজগৎ এবং একই সঙ্গে সমাজজীবনও সর্বদা পরিবর্তনশীল ও গতিময়। বস্তুজগৎ ও সমাজ পরিবর্তন বিকাশ প্রক্রিয়ার মর্মমূল হলো প্রকৃতি ও সমাজ জীবনের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের পরিণতি; পরস্পর-বিরোধী প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফল। বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, সে সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের তত্ত্ব হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। আর সামাজিক জীবনধারা অর্থাৎ সমাজ ও সমাজ ইতিহাসের বিচারের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতি প্রয়োগ ও ব্যবহারকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এক্ষেত্রে সমাজ জীবনের পরিবর্তনকে বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিত হলো ঐতিহাসিক উপাদান। অর্থাৎ সমাজের বাস্তব জীবন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জকে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

ডায়ালেকটিক্স কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ ডায়ালিগো থেকে—এর অর্থ আলোচনা করা, তর্ক করা। প্রতিপক্ষের তর্কধারার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধগুলি প্রকাশ করে দিয়ে এবং সেগুলিকে অতিক্রম করে সত্যে পৌঁছানোর উপায়কে প্রাচীনকালে বলা হতো ডায়ালেকটিস (দ্বন্দ্বতত্ত্ব)। প্রাচীনকালে অনেক দার্শনিক ছিলেন যারা বিশ্বাস করতেন যে চিন্তাধারার ভিতরকার স্ববিরোধগুলি উদঘাটন করা এবং পরস্পরবিরোধী মতের সংঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যে পৌঁছানোই শ্রেষ্ঠ পথ; এই ডায়ালেকটিক (দ্বন্দ্বমূলক) যুক্তিবিচারের পদ্ধতিই পরে প্রাকৃত জগতের ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হবার ফলে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করার ডায়ালেকটিক (দ্বন্দ্বমূলক) পদ্ধতিই বিকশিত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে বস্তুজগত সর্বদা পরিবর্তনশীল ও গতিময়। বস্তুজগতের পরিবর্তন ও বিকাশ হলো প্রকৃতির অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের পরিণতি, পরস্পরবিরোধী প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফল।[৩৭]

মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রধান লক্ষণসমূহ হচ্ছে—বস্তুজগৎ অখণ্ড ও সমগ্রভাবে সুসংহত এবং তার প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জের পারস্পরিক প্রকৃতিগত সংযোগ সুসংহত আছে, তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্কস বলেন, প্রকৃতি জগতে যে-কোনো ব্যাপারের রহস্য আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে যদি তাকে আমরা তার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে বিচার না করি—যদি তাকে আমরা পরিবেশ থেকে পৃথক করে বিচার করি। বরঞ্চ অন্যদিকে যে-কোনো ব্যাপারকে বোঝা যাবে ও তার ব্যাখ্যাও

সহজ হবে যদি পারস্পরিক অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার অপরিহার্য সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তার বিচার করি, যদি লক্ষ্য করি যে বস্তুটি তার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর দ্বারাই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির বিচারে বিশ্বপ্রকৃতি স্থাণু ও অনড় নয়, অচঞ্চল ও সনাতন নয় এবং বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম পরিবর্তনশীল ও গতিশীল—সেখানে প্রতিনিয়তই আবর্তন ও বিবর্তনের ক্রিয়া চলছে। প্রতিক্ষণেই কোনো না কোনো, নতুন বস্তুর আবির্ভাব ও বিকাশ হচ্ছে। আবার কোনো না কোনো বস্তু বিনষ্ট ও তিরোহিত হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই নিহিত আছে স্ববিরোধ—কারণ প্রত্যেক বস্তুরই দু'টি রূপ আছে—একটি ধনাত্মক অপরটি ঋণাত্মক, একটি অতীত আর একটি তার ভাবি সম্ভাবনা—তার ক্ষয়ের দিক ও বিকাশের দিক। এই বিপরীত গুণের সংগ্রাম, পুরাতন আর নতুনের সংঘর্ষ, ক্ষয়িষ্ণুর সঙ্গে বিকাশোন্মুখের এ বিরোধই হলো ক্রমবিকাশের ধারার অন্তর্নিহিত সারকথা।

মার্কসীয় বস্তুবাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি ও তার নিয়মকানুন জানা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। অপরপক্ষে ভাববাদী দর্শন বিশ্বপ্রকৃতিকে বা তার নিয়মাবলীকে জানার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, তারা বলতে চায় যে বিশ্বপ্রকৃতি এমন কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ সত্তায় পূর্ণ যে বিজ্ঞানের কাছেও তার রহস্য চিরকাল অজ্ঞাত থাকবে। আর মার্কসীয় বস্তুবাদের মতে বিশ্ববিকৃতির কিছুই অজ্ঞেয় নয়—পৃথিবীতে এখনও আমাদের অজানা অনেক কিছু আছে যা ভবিষ্যতে আমরা বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদঘাটন ও আয়ত্ত করতে পারবো।

মার্কসীয় চিন্তায় সমাজ জীবনকে, সমাজের ইতিহাসকে আকস্মিক ঘটনার অর্থহীন সমষ্টি রূপে দেখা চলতে পারে না—সমাজ জীবনকে এখন দেখা যায় সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক ধারা হিসেবে, ফলে সমাজ ইতিহাসের অনুশীলন তাই বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে। কোনো সমাজের জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে ব্যবস্থা, তদনুসারেই সেই সমাজের চিন্তা, ভাবাদর্শ, রাজনৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মার্কস বলেন, মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী সমাজের বাস্তব জীবনব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? আর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের স্বকীয় বিশেষত্বগুলো কী কী?

সমাজের বাস্তব জীবনব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে প্রথমেই পড়ে সমাজের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি জগৎ এবং ভৌগোলিক পরিবেশ, যা সমাজের বাস্তব জীবনের পক্ষে একটি অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় শর্ত এবং যা অবশ্যই সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে। তবে ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব নিয়ন্তা প্রভাব নয়, কারণ সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের গতি এতই দ্রুত যে ভৌগোলিক

পরিবেশের পরিবর্তন ও বিকাশের গতির সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। তিন হাজার বছরের মধ্যে ইউরোপে পরপর তিন রকম সমাজব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেছে আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা, দাসপ্রথা এবং সামন্তব্যবস্থা। ইউরোপের পূর্বভাগে সোভিয়েত রাষ্ট্রে এমনকি চার রকমের সমাজব্যবস্থা উৎখাত হয়ে গেছে। তবু এই তিন হাজার বছরে ইউরোপের ভৌগোলিক অবস্থার কোনোই পরিবর্তন হয়নি, কিংবা এতই সামান্য পরিবর্তন হয়েছে যে, ভূগোল তাকে আমলেই আনে না। আর তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভৌগোলিক পরিবেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে, এদিকে কয়েক শ অথবা হাজার দুই বছরই মানুষের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন এমনকি গুরুতর পরিবর্তনের পক্ষেও যথেষ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজবিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ প্রধান বা নিয়ন্তা কারণ নয়, যে ভৌগোলিক পরিবেশ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে, তা যে সমাজব্যবস্থা কয়েকশ বছরের মধ্যেই আমূল পরিবর্তিত হয়, তার বিকাশের নিয়ন্তা-কারণ হতে পারে না। সমাজ বিকাশের প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব হলো সুদূরপ্রসারী। দ্বিতীয়ত হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন মাত্রায়[৩৮] জনবসতির ঘনত্ব। সমাজের বাস্তব জীবনব্যবস্থা কথাটির অন্তর্ভুক্ত। সমাজের পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধিও সমাজ গড়নের নিয়ন্তা শক্তি নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, জীবনযাত্রা-ব্যবস্থার জটিল ধারার মধ্যে কোন প্রধান শক্তি সমাজের গড়ন, সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি এবং এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থার সমাজ বিকাশের নিয়ন্তা হিসেবে কাজ করে? ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে যে, জীবনধারণের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করার যে উপায় তাই হলো এই শক্তি। সমাজের বাঁচার ও বিকাশের জন্য যা অবশ্য প্রয়োজন সেই খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, জ্বালানি উৎপাদনের উপকরণ প্রভৃতি বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন পদ্ধতি হলো এই শক্তি।

জীবনধারণের জন্য খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয়, জ্বালানি ইত্যাদি প্রয়োজন; এই বাস্তব প্রয়োজনগুলি মেটাতে হলে মানুষকে এগুলো উৎপাদন করতে হবে; তা করতে হলে খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয়, জ্বালানি ইত্যাদি উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণ করতে হয় এবং তার ব্যবহারও করতে হয়। উৎপাদনের যে উপরকণগুলির সাহায্যে বৈষয়িক দ্রব্য উৎপাদিত হয়, যে জনগণ উৎপাদন অভিজ্ঞতা এবং শ্রমকৌশলের বলে উৎপাদনের উপকরণগুলি technic of production ব্যবহার করে এবং বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, এসব কিছু নিয়ে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি গঠিত হয়।

কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি হলো উৎপাদনের ব্যবস্থা ও পদ্ধির মাত্র একটি দিক- যে প্রকৃতির শক্তি ও বস্তুসমূহকে ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করা হয় তাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির

আর এক দিক হলো উৎপাদনের কার্যক্রমের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং প্রকৃতির শক্তিকে বাস্তব প্রয়োজনে কাজে লাগায়, কিন্তু এই সংগ্রাম মানুষ একা একা করে না, ব্যক্তিগতভাবে করে না, করে একসঙ্গে, দলবদ্ধভাবে, সমাজবদ্ধভাবে, সুতরাং সর্বকালে সর্বঅবস্থায় উৎপাদন বলতে সামাজিক উৎপাদন বোঝায়। বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদনে মানুষকে পারস্পরিক কোনো না কোনো সম্পর্কের বন্ধনে, কোনো না কোনো উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয়—শোষণমুক্ত সমাজে জনগণের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতাও তার একটি রূপ হতে পারে, আবার প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কও এ বন্ধনের অন্যরূপ হতে পারে। আবার এ উৎপাদন সম্পর্ক এক স্তর হতে অন্য এক স্তরে রূপান্তরের অন্তবর্তীকালীনও হতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কের স্বরূপ যাই হোক না কেন, সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই উৎপাদিকা শক্তির মতোই তা উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান।

মার্কস বলেছেন, উৎপাদনের ব্যাপারে মানুষ শুধু প্রকৃতির উপরে ক্রিয়া করে না, পরস্পরের উপরেও ক্রিয়া করে। এক বিশেষ প্রকারের সহযোগিতা ও তাদের কর্মের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন করতে হলে মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে কয়েকটি বিশিষ্ট সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই প্রকৃতির/জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং উৎপাদন করা সম্ভব হয়। [কার্ল মার্কস, *সিলেকটেড ওয়ার্কস*, ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো ১৯৪৬, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১১]। সুতরাং উৎপাদন ও উৎপাদন পদ্ধতি বলতে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক দুই-ই বোঝায়; এই বৈষয়িক মূল্যাদি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তারা যে অবিচ্ছেদ্য তাই নির্দেশ করে।

উৎপাদনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তা কখনও বহুদিন এক জায়গায় আটক থাকে না। উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও উন্নত হয়—আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক ধারণা, রাজনৈতিক মতামত ও প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে—সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করারও দরকার হয়। উন্নতির বিভিন্ন স্তরে জনগণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করে কিংবা মোট কথায় বলতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা চালায়। আদিম যৌথ-সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের রীতি ছিল এক রকম, দাস ব্যবস্থায় ছিল আর-এক রকম, সামন্ত অবস্থায় ছিল এক রকম। আর এই রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে মানুষের সমাজ ব্যবস্থায়, আধ্যাত্মিক জীবনে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়।

সমাজের উৎপাদন রীতি যে ধরনের তাই প্রধানত সমাজ, সমাজের চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শ, সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক মনোভাব ও ব্যবস্থাকে নিরূপণ করে। অথবা আরও সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে, মানুষের জীবনযাপনের রীতি যেমন, তার চিন্তাধারাও তেমন। এর অর্থ এই যে, সমাজ বিকাশের ইতিহাস সর্বোপরি

উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস, শতকের পর শতক ধরে যে উৎপাদ পদ্ধতি একের পর আর-এক ধারা অনুষরণ করে চলছে তার ইতিহাস এবং জনগণের পারস্পরিক উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ইতিহাস। অতএব সমাজ বিকাশের ইতিহাস বলতে সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক মূল্যাদির উৎপাদকের ইতিহাস, শ্রমজীবী জনতার ইতিহাসকে বুঝায়; এই শ্রমজীবী জনতাই উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রধান শক্তি, তারাই সমাজের অস্তিত্বের জন্য যেসব বস্তুর প্রয়োজন তা উৎপন্ন করে।

ইতিহাসকে যদি যথার্থ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে হয়, তবে ইতিহাস এখন আর রাজা ও সেনাপতিদের বিজেতা ও দিগ্বিজয়ীদের কার্যকলাপ দিয়েই সমাজবিকাশের ধারাকে ব্যাখ্যা করবে না; ইতিহাসকে সর্বোপরি বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনকারী, শ্রমজীবী মানুষ, জনগণের ইতিহাসের অনুধানে আত্মনিয়োগ করতে হয়। কাজেই, সামাজিক ইতিহাসের নিয়মকে বুঝতে হলে মানুষের মন, তার চিন্তা ও সমাজ সম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যে তার রহস্য উদঘাটিত হবে না; তার সন্ধান মিলবে কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে। অতএব ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হলো উৎপাদনের নিয়ম, উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের নিয়ম, উৎপাদন সম্পর্ক এবং সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলির আলোচনা করা ও প্রকাশ করা।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির উন্নতির একটি মোটামুটি ছবি এখানে রাখা যাক। প্রথমে লোকে ব্যবহার করতো এবড়ো-থেবড়ো পাথরের অস্ত্রাদি, তারপর তীর ধনুকের প্রবর্তন হলো। সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাপনের রীতির পরিবর্তন হলো, ব্যাধের জীবন ছেড়ে মানুষ পশুপালনে ও আদিম পশুচারণে রত হলো। মানুষ যখন পাথর ছেড়ে ধাতুনির্মিত (লোহা, খড়্গ, লোহার ফলাযুক্ত কাঠের লাঙ্গল ইত্যাদি) অস্ত্রের ব্যবহার শিখল, তখন সে কৃষিজীবী হয়ে উঠলো। এবার এলো ধাতু নির্মিত অস্ত্রাদির উন্নতি, কামারের হাপর, কুমোরের কাজ, সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম হাতের কাজের প্রবর্তন হলো ও উন্নতি ঘটল; কৃষিকার্য থেকে এ সকল হাতের কাজকে আলাদা করা হলো, স্বতন্ত্র কারুশিল্পের বিকাশ ঘটল এবং ছোট কারখানার আবির্ভাব হলো। ক্রমে হাতের কাজের যুগ গত হলো এবং যন্ত্রযুগের প্রবর্তন হলো। কারুশিল্প ও ছোট কারখানা যন্ত্রশিল্প বিরাট কারখানায় রূপান্তরিত হলো, যন্ত্রব্যবস্থা ও আধুনিক বিপুল যন্ত্রশিল্প দেখা দিল। এ হলো মানবসমাজের ইতিহাসে উৎপাদিকা শক্তির ক্রমোন্নতির একটি সাধারণ এবং মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত্র। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যারা উৎপাদনের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিল তাদের সাহায্যেই এই উৎপাদনের যন্ত্রাদির পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে, মানুষকে বাদ দিয়ে এ উন্নতি হয়নি। সুতরাং উৎপাদন যন্ত্রাদির বিকাশ ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তন হয়েছে আর মানুষই উৎপাদন শক্তির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। যন্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে

সঙ্গে মানুষের উৎপাদনের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয়েছে, তার শ্রমকুশলতা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা বেড়েছে।

ইতিহাসে সমাজের উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের পাঁচটি প্রধান রূপ ইতিহাসে দেখা যায় : আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা, দাসপ্রথা, সামন্তপ্রথা, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।[৩৯]

উৎপাদন সম্পর্কের অপর নাম শ্রেণিসম্পর্ক। শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রাম মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রেণি সম্পর্ক মূলত শোষণমূলক। সমাজ পরিবর্তন হয় শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে, বৈপ্লবিক উপায়ে। প্রতিটি পর্বের অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্ব পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। মার্কসের মতে মানুষই প্রায়োগিক কর্মের (Praxis) মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। Praxis এর ধারণা মার্কসীয় তত্ত্বের অন্যতম ধারণা।[৪০] মার্কসের লক্ষ্য শ্রেণিহীন সাম্যবস্থা।

মার্কস-এঙ্গেলস-এর গবেষণার আগে ধারণা ছিল কেবল চেতনা দ্বারাই সমাজ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস দেখালেন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কই সমাজ পরিবর্তন বা বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে চেতনা সহায়ক মাত্র। সমাজ বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রাক-মার্কসীয় যুগে ইতিহাসের পর্যায়গুলোকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ এ ধরনের সরলীকরণকৃত বিভাজন নীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু এ ধরনের বিভাজনে, কোনো সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক কেমন ছিল তা নির্দিষ্ট করে বোঝার উপায় থাকে না। মার্কস-এর মতে সমাজ ঐতিহাসিক কাল পরিক্রমায় মানুষের জীবন ব্যবস্থায় বিকাশমান একটা প্রক্রিয়া। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজ একটি গতিশীল সত্তা এবং পৃথিবীর সব সমাজই এক ও অভিন্ন বিবর্তন ধারায় আবর্তিত হয়েছে। উক্ত বিবর্তন ধারার অন্তর্নিহিত শক্তি সত্তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সমাজ বিবর্তিত হয় মূলত উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তন, শ্রেণি সংগ্রাম ও আদর্শগত সংগ্রামের পরিণতিতে। প্রত্যেক সমাজেরই মূল ভিত্তি বা basic structure এবং অধিকাঠামো বা super structure. মূল কাঠামো হচ্ছে অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং অধিকাঠামো হচ্ছে ভাবাদর্শ বা চেতনা। উভয় প্রক্রিয়ায়ই সমাজ পরিবর্তিত হয়। সুতরাং আমরা মার্কসীয় চিন্তাদর্শে পাই সমাজ ও চিন্তা পরিবর্তিত হয় ও বিকশিত হয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সম্পর্কের পরিণতিতে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌলিক বিষয় হলো পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহের যুগপৎ ঐক্য এবং সংঘাতের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয় নতুনের আবির্ভাব। এ প্রত্যয় সবরকম সৃষ্টির এবং প্রকৃতির ও সমাজের সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ঐতিহাসিক বস্তুবদীদের মতে সমাজের পাঁচটি ধারাবাহিক গঠনরূপ রয়েছে। যেমন, ১. আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থা, ২. দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, ৩. সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা, ৪. পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এবং ৫. সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।[৪১] আদিম সাম্যবাদী সমাজ সর্বপ্রথম স্তর। এ স্তরে জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে। যেমন পশু শিকার, ফলমূল আহরণ ইত্যাদি। এ পর্যায়ে অর্জিত সবকিছু সমভাবে বণ্টিত হতো। এই শোষণহীন, পীড়নমুক্ত, ব্যক্তিস্বার্থহীন সমভাবাপন্ন সমাজকে বলা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজ। আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরিণত পর্যায়ে উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিকরা দুর্বল ও পরাজিতদের দাসে পরিণত করার মধ্য দিয়ে দাস সমাজের উদ্ভব ঘটে। এই সমাজেই সৃষ্টি হয় গোষ্ঠীপ্রধান, পুরোহিত ও দাস মালিকের। সমাজে দেখা দেয় শ্রেণি বিভক্তি। কালক্রমে দাস সমাজে স্থবিরতা দেখা দেয়—মানুষের মননশীল প্রয়াসের ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে—দাস মালিকরা সামাজিক প্রগতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিণতিতে দাস ও জনসাধারণের অভ্যুত্থানে দাস সমাজের পতন ঘঠে। দাস মালিকানাভিত্তিক সমাজের পতনের পর যে নতুন সমাজের পত্তন ঘটে তা হলো সামন্তবাদী সমাজ। কিন্তু এই প্রক্রিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা ও মতাদর্শগত চেতনার পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর সব ভৌগোলিক অঞ্চলে একই সঙ্গে বা একই সময়ে সংঘটিত হয় না।

সমান্তবাদী সমাজে সামন্ত প্রভুরা ছিল উৎপাদনের উপকরণের মালিক। এছাড়া দাসদের উপর তাদের আংশিক মালিকানা ছিল। সামন্ত সমাজে যে দুটো প্রধান শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল তা হলো সামন্ত প্রভু ও কৃষক সম্প্রদায়। এক পর্যায়ে সামন্ত প্রভুরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকেও তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। কালক্রমে ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে সামন্ত প্রভুদের বিরোধ দেখা দেয় এবং তারা ধর্মকেও প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে। শুরু হয় সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলন—পরিণতিতে পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটে। পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক পুঁজিপতি। পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি হলেও উৎপাদনের উপকরণসমূহ পুঁজিপতির অধিকারে থাকায় স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিরা বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করে এবং শ্রেণি সংঘাত একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যয় করতো তাদের নিজেদের ভোগ এবং নতুন নতুন কানখানা গড়ে তোলার কাজে। এক সময় তাদের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দেশীয় বাজারের তুলনায় উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা নতুন নতুন বাজারের সন্ধানে বের হয় দেশের বাইরে অনুন্নত দেশসমূহে। ছলে বলে কলাকৌশলে তারা দখল করতে থাকে বাজার। এর ফলে পুঁজিবাদ পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে। পুঁজিবাদী সমাজের উত্তরাধিকার হিসেবে সমাজাতান্ত্রিক সমাজ

অনিবার্য প্রক্রিয়া। এ সমাজে উৎপাদনের মূল উপকরণসমূহ থাকবে সামাজিক মালিকানায়। এ হলো মার্কস ও এঙ্গেলসের সমাজতত্ত্বের মার্মিক সূত্র।

মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি বিবেচনায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মাধ্যম হিসেবে এক-একটি উৎপাদন পদ্ধতি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পরিকাঠামো তৈরি করে দেয়।[৪২] যেমন শিকার সংগ্রহ, পশুপালন, পশুচারণা ও কৃষি প্রতিটি পদ্ধতির পারম্পরতা সত্ত্বেও ঐসব সামাজিক পর্যায়গুলোর সংস্কৃতির পরিকাঠামো ভিন্ন ভিন্ন। শিকারিজীবী মানুষের নাচ, গান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, পুরাণবৃত্ত, দেবতাকল্পনা, আচার, সংস্কার, বিশ্বাস, রাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গেই পশু এবং পশু শিকারের ব্যাপারটি জড়িয়ে থাকে। আমরা অজন্তা গুহা ও আলতামিরায় যে চিত্র-নৈপুণ্য দেখি তা শিকারজীবী আদিম মানুষের কথা বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিকারের উপর জীবন নির্ভর করে, শিকারের পশুর ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও মগ্ন। আর কি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ ও সত্যসন্ধ তাদের এই পশুজগৎ বিষয়ক দৃষ্টি।[৪৩] পশুপালনজীবী পর্যায়ে ঐগুলি বহুলাংশেই রূপান্তরিত হয়ে পশুপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাবনার অভিব্যক্তিতে পরিণতি পায়। কৃষি যখন জীবিকা হয়, তখন ভাবনার পরিকাঠামো গড়ে ওঠে কৃষিকে কেন্দ্র করেই।

এ সমস্ত পর্যায় বিবর্তনের সূত্রে একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে আর-একটি প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সময় পূর্বতন গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে পরবর্তী গোষ্ঠীর মানুষদের দ্বন্দ্ব ঘটে। কৃষির উদ্ভবের পর উদ্বৃত্ত ফসলের ভাগাভাগি ও মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারটি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; তখন থেকে শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের ব্যাপারটিও প্রতিফলিত হতে থাকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে।[৪৪] প্রকৃতি বনাম মানুষ, দেবতা বনাম মানুষ, শক্তিশালী পশু বনাম মানুষ, শক্তিশালী পশু বনাম দুর্বল পশু, সু এবং কু, ভাল এবং মন্দর দ্বন্দ্ব মনোজগতে বিম্বিত হয়, মানুষের কল্পলোকে এগুলো নানাভাবে পল্লবিত হতে থাকে, সৃষ্টি হয় লোককাহিনী, মিথ ও পুরাণ।

সমাজ বিবর্তনের প্রাকৃতিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বাহ্যিক ও অন্তর্গত শর্তাবলি থেকে আমরা দেখতে পাই মানুষের মন বা সমাজ শুধু বস্তুগত ভিত্তির উপরই নির্ভরশীল হয়ে বিবর্তিত হয় না—অনেক সময় মানুষের মন বা সমাজ থেকে উৎসারিত প্রচণ্ড অভিঘাতে পুরানো সমাজ ও মনের পুরানো অভ্যাস ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ মার্কসীয় বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় জীবনব্যবস্থা বা অর্থব্যবস্থাই ভিত্তি basic structure হলেও তা একমাত্র নির্ধারক উপাদান নয়। সমাজ পরিবর্তনের সময় মানসিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিতে পারে। অনেক বিপ্লবেই বা সমাজসংগ্রামেই আমরা তার প্রকাশ পাই। কাজেই যে অধিকাঠামো super structure সমাজের ভিত্তি যা আর্থিক কাঠামোর উপর রচিত হয় সে অধিকাঠামোও

তার ভিত্তিকে পরিবর্তন করতে নিয়ামক বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তাই আইন, শ্রেণি সম্পর্ক, ধর্ম, শিক্ষণ, দর্শন, ললিতকলা, সাহিত্য, পরিবার, রাজনীতি বা জাতীয় সকল অধিকাঠামোর উপাদানের ভিত্তিতে একটি নিবিড়, দ্বান্দ্বিক ও গতিশীল সম্পর্ক রয়েছে। যে-কোনো সংস্কৃতির বিচারেই তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

বলা যায় যে, মানবতাবাদী চেতনা মাথায় নিয়ে সমাজতত্ত্ব তার যাত্রার সূচনা করেছিল তা আজও ক্রিয়াশীল। মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমাজতত্ত্ব এগিয়ে চলেছে; তার বিকাশ এখনো পূর্ণতা পায়নি সত্য; কিন্তু ইতিমধ্যে সে অনেকখানি সফলও হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে হাজার রকমের মানবদরদি সংস্থা গড়ে উঠেছে। অনেক রাষ্ট্রও নীপিড়িত মানুষের, অন্নহীন-বস্ত্রহীন মানুষের সেবায় এগিয়ে এসেছে—হতদরিদ্রের খাওয়া-পরা, চিকিৎসা-স্বাস্থ্য সেবা এমন কি বাসস্থান ও শিক্ষার সুব্যবস্থার আয়োজন করছে। অনেক ব্যক্তি মানুষও এ বিষয়ে তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এতে করে আমরা নিঃসন্দেহে মনে করতে পারি অদূরভবিষ্যতে না হলেও দূরভবিষ্যতে মানবসমাজ পরিপূর্ণ সাম্যবস্থায় ফিরে যাবে সেই আগের মতোই। আমরা এই প্রত্যাশাই করি।

চার

আমরা এতক্ষণ সমাজতত্ত্বের উদ্ভব বিকাশ তার নানা ধারা-উপধারা, প্রায়োগিক দিক প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের কথামালায় বিধৃত সমাজতাত্ত্বিক উপাদান নিয়ে কথা বলতে চাই। সাধারণভাবে জানি সাহিত্য জীবন সংগ্রামের ছবি। অবশ্য এই মত নিয়ে কিঞ্চিত দ্বিধা আছে। একদল বলেছেন সাহিত্য কেবলই নান্দনিক অর্থাৎ বিনোদনই এর প্রধান এমনকি একমাত্র উপাদান। অপর দলের দুই ভাগ এক. সাহিত্য হচ্ছে সমাজ বাস্তবতা অর্থাৎ জীবন সংগ্রামের চিত্র, দুই. সাহিত্যে সমাজ জীবন তো থাকবেই, সেই সঙ্গে থাকবে কারুকার্য, এই দুই-এ মিলে হবে মহৎ সাহিত্য। একজন সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এই শেষোক্তটি বড় বেশি কাম্য।

সাহিত্যকে আমরা বিবেচনা করবো জীবনবাস্তবতার নিরিখে। যদিও প্রায়সই সাহিত্যকে চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে হিসেবে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা যদি বলি, সাহিত্য কেবল বিনোদন নয়, কেবল স্বাচ্ছন্দ্য বা অলস ভাবনার কথামালা নয়; সাহিত্য জীবনের ক্লেদ, দুঃখ-কষ্ট, জীবনের না পাওয়ার বেদনা, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সকলকে সহমর্মি-সমমর্মি হবার প্রেরণার কথামালা। সাহিত্য জীবনসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। এতে কেউ কেউ হতচকিত হতে পারেন; তবুও তা সত্য এবং নির্মম সত্য; আর নির্মম সত্য বলে চিরকালই শাসকগোষ্ঠী তা নিয়ন্ত্রণে তৎপর। তাই নজরুল যা লেখেন ব্রিটিশ শাসক তা অনুবাদ করে তাদের ভাষায় পাঠ করে দেখতে চায়, দেখেন এ তো জনগণের আকাঙ্ক্ষার কথা, জনগণের অধিকারের কথা, তাদের মনের কথা—তখন তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পেশিশক্তির

বলে। আমরা এমন কথাও বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের অনেক গভীর আবেগোচ্ছাসমূলক কবিতাবলিতেও দিনানুদৈনিক ও সমকালের ছাপ সুস্পষ্ট। পিকাসো যেমন বলতেন কোনো শিল্পই এ্যবস্ট্রাক্ট নয়; রবীন্দ্রনাথের ও লালনের রচনাবলি ব্যাখ্যা করলে তা প্রতীয়মান হবে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'সোনার তরী', 'বলাকা' এমন কি 'গীতাঞ্জলিতে'ও গভীরভাবে সমাজবাস্তবতার ছাপ বিদ্যমান।

আধুনিক কালে সাহিত্যিক সমাজের বক্তব্য যে, সত্যিকারের সাহিত্য সৃজন করতে হলে সমাজ সচেতনতা পূর্বশর্ত হিসেবে সাহিত্যিককে মানতেই হবে। তা হলে এই সমাজ সচেতনতা কি? এক কথায় বলা যায় 'সমাজ সচেতনতার অর্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি'। ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনায় সামাজিক বাস্তবতা এমনভাবে উঠে এসেছে যে, কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে সামাজিক ঘটনা চরিত্রাবলি চিত্রণের মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পেয়েছে, যেমন শ্রেণিসংগ্রাম, আত্মহত্যা, গ্রামীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমঝোতা, মহাজনি ব্যবসায় ইত্যাদি। সমাজের সমস্যা, সমাজের উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া বিশেষত জীবনবিজ্ঞাসা থেকে সাহিত্যিক লাভ করেন সমাজ সচেতনতা। এ. কে. নাজমুল করিম যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> 'আবার আজকাল সাহিত্যিক মহলে রেওয়াজ চলেছে, সত্যিকারের সাহিত্যিককে মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র না এঁকে নিম্নশ্রেণীর চিত্র আঁকতে হবে—তা'হলেই সাহিত্যিক সমাজ সচেতন হলেন। তা' মোটেই নয়। সমাজ সচেতনার অর্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে সাহিত্য মানুষকে, ঘটনাকে, জীবনজিজ্ঞাসাকে সমাজ বিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছে, তাই হলো প্রকৃত সাহিত্য। এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, সামাজিক ঘটনাবলি বা সমস্যাবলি সাহিত্যিকের মনে কেবল অনুপ্রেরণাই নিয়ে আসছে না বা তিনি তা' কেবল অনুভবই করছেন না এবং তাঁর লেখায় তা' প্রকাশ করছেন না—সমাজের যে সামগ্রিক উত্থান-পতন হচ্ছে এবং যে সব শক্তি ঐ উত্থান-পতনে সহায়তা করছে, তা' বুঝবার ক্ষমতা সে সাহিত্যিকের আছে। আমাদের পূর্ববর্তীরা সামাজিক উত্থান-পতনের সূত্রের সাথে পরিচিত ছিলেন না—বর্তমান যুগে আমরা তার সাথে অনেকটা পরিচিত। ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের পূর্ণতর গবেষণা হয়েছে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থার উত্থান-পতনের ততটুকু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হয়নি সত্য। কিন্তু আমরা মোটামুটি জানি যে, আমাদের দেশে ইউরোপীয় ফিউডাল তন্ত্র হতে আলাদা ধরনের সামন্ততন্ত্র চালু ছিল। সে সামন্ততন্ত্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে এবং তার স্থানে নতুন সমাজ গড়া আরম্ভ হয়েছে। আমাদের সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে এ হলো মূলসূত্র। সাহিত্যিককে কেবল এ মূলসূত্র জানলেই চলবে না—সমাজের প্রতিস্তরে কী করে এ সমাজ পরিবর্তন পরিব্যাপ্ত হয়ে কাজ করছে, তা বোঝা ও অনুভব করবার ক্ষমতা না থাকলে, তিনি এ যুগের সাহিত্যিক হতে অপারগ। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, কেবল সঠিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা কেবল রসসৃজনশীল প্রতিভাই

> এ ধরনের সাহিত্য সৃজন করবে না। প্রকৃত সাহিত্য সৃজনে এ-দু'এর সংমিশ্রণ চাই। এ সংমিশ্রণের অভাবের ফলেই বনেদী সাহিত্যিকদের সংজ্ঞায় রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলতে নারাজ।
>
> নতুন সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সাহিত্য রচনা তাই কত জটিল হয়ে পড়ছে। আমাদের বিচারে সার্থক রচনা আজকের দিনে কত মুষ্টিমেয়। আজকাল আমরা যখন বলি, 'অমুক সাহিত্যিক ভাল লেখেন না' তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর চরিত্র সৃজনের ক্ষমতা নাই বা তাঁর ভাষার উপর দখল নাই। এর মানে হলো এই যে, সমাজ বিবর্তনের যে সব শক্তি কাজ করছে সে সাহিত্যিক সে সব শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তার সাহিত্য তাই ভবিষ্যতের কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে না। মোট কথা, তার সাহিত্যে সামাজিক শক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা ফুটে উঠেছে।'[৪৫]

আদিম সমাজে যখন মানুষের জীবিকা ছিলো হিংস্র পশুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত, শিকার-সর্বস্ব জীবনে সমবেত শক্তির প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, তখন অপরিহার্য ছিল সমন্বিত উদ্যোগ ও আবেগের, যার ফলশ্রুতি ছিল সেই আদিম কাব্য বা সমবেত সংগীত। কডওয়েল তাকেই বলেছেন, 'Lightened form of ordinary speech'. গুহাবাসী মানুষের জীবন-যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সাহিত্যের উদ্ভব, তা ছিল জীবনের অঙ্গীভূত, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে তা ক্রমে স্বতন্ত্র সত্তা পেয়ে পরিণত হয়েছে 'superstructure'-এ; কিন্তু নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়নি। তাই সাহিত্যের সে বৈশিষ্ট্যের অপসৃয়মান প্রত্যক্ষ নিদর্শন বহন করে বেড়াচ্ছে আদিম উপজাতীয় মানবগোষ্ঠী ছাদপেটা বা নৌকা বাইচের গান তার আধুনিকতম পরিণতি। ইংরেজ সমালোচকের ভাষ্য তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : 'Primitive folk song was probably communal improvisation to the rythm of wok ... gradually it looses its communal authorship and the words are supplied by one moe skilled in versification.' নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যের এই বিস্তীর্ণ ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সাহিত্যে খুঁজে পাই শ্রমের সাযুজ্য : অন্য কথায়, সাহিত্যকে পাই জীবনযুদ্ধের অপরিহার্য অনুষঙ্গ রূপে। উৎস থেকে সাহিত্য সমাজের সঙ্গে যে মৌলিক সম্বন্ধের নিগড়ে বাঁধা, সমাজের বিবর্তনে তার ব্যবহারিক প্রক্রিয়া রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র; মৌল প্রেরণাটি রয়েছে অবিকৃত। কেবল অবকাশরঞ্জন বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত সাহিত্যের সৃষ্টি নয়, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ আরো গভীর এবং জটিল। অনুভূতিপ্রবণ সাহিত্যিক তাঁর চেতন সত্তাকে সাহিত্যে রূপ দেন শুধু তাঁর খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য নয়, সমাজের অনুপ্রেরণায় ভেতরে আবেগ এতই ঘণীভূত হয় যে, তিনি সৃষ্টি না করে পারেন না।[৪৬]

'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' বিকাশের ক্ষেত্রে মার্কসীয় চিন্তাপদ্ধতি সাহিত্য এবং সমাজবিজ্ঞান-নৃবিজ্ঞানের জগতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা দেখি মার্কসবাদে সবসময় একটা দ্বান্দ্বিক ধারণা ক্রিয়াশীল, যা সমাজে একটি

কাঠামোকে নির্দেশ করে। মার্কসবাদে রয়েছে মূলকাঠামো-অধিকাঠামো তত্ত্ব ; যা কোনো না কোনোভাবে বাস্তব জগতের বিভিন্ন অসাহিত্যিক বিষয় থেকে সাহিত্যকে যেমন পৃথক করে তেমনি সংযুক্তও করে।[৪৭] মার্কস জোর দিয়ে বলেন যে, কোনো সমাজ-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক (Socio-Economic) উপাদানই চূড়ান্ত নির্ধারক। 'আর্থসামাজিক' শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রণালী দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্কসমূহ। পুঁজিবাদী সমাজে এ সম্পর্কটি হচ্ছে পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়েতের। এ সম্পর্কটি অবশ্যই শোষণভিত্তিক, কাজেই তার প্রকৃতি দ্বান্দ্বিক। অর্থনৈতিক মূল কাঠামো অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। এসব প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে বা দ্বন্দ্বকে অবসিত করে এবং উৎপাদন অব্যাহত রাখে। পুঁজিবাদের স্বার্থে সৃষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা। আর্থসামাজিক মূল কাঠামোভিত্তিক এসব উপাদানকে মার্কস সমাজের অধিকাঠামো হিসেবে অবহিত করেছেন। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের একটি নির্দিষ্ট ও সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে, আর তা হচ্ছে সামাজিক বাস্তবতার (social reality) ব্যাপকতর কাঠামোর মধ্যেই সাহিত্যকে কেবল সঠিকভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

সাহিত্যের স্রষ্টা এবং সাহিত্যের ভোক্তা উভয়কেই সমাজতাত্ত্বিক হতে হবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'না'। একজন মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচক যখন সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হবেন তখন তার অবলম্বন হবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদসম্মত সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। একজন অমার্কসবাদী সমালোচককেও একই পথ বেছে নিতে হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বা সৃষ্টশিল্পে রয়েছে একটি সমাজ, সমাজ পরিবেশ। একটি সমাজ কাঠামোর বলয়ের আধার হিসেবেই তো কোনো শিল্পী তার শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। কেননা হাজার বছর আগের গুহামানবদের গহীন গুহার গায়ে অঙ্কিত গুহাচিত্রগুলো তো ঐ সমাজকাঠামো বলয়েরই নিদর্শন।

সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিটি যদি দ্বান্দ্বিক না হয়ে যান্ত্রিক হয় তা হলে সমালোচক দেখতে চাইবেন বাস্তবের হুবহু প্রতিফলন; অথচ উন্নত সাহিত্য বা উৎকৃষ্ট সাহিত্য কখনই বাস্তবের হুবহু প্রতিফলন নয়—তার মধ্যে থাকবে দ্বান্দ্বিকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা এবং এ দুইয়ের সংশ্লেষে প্রস্ফুটিত হবে নান্দনিক সৌকর্য। পাঠক ও সমালোচকের কাছে এটাই কাম্য।

মার্কসবাদ যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সবরকম সামাজিক প্রপঞ্চের বিশ্লেষণে জোর দিয়ে থাকে উৎপাদন শক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর। সমাজের শ্রেণী কাঠামোটি অঙ্কুরিত হয় উৎপাদন কৌশল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিভূমিকে আশ্রয় করে। এটা সমাজ বিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়া এবং অবশ্যই এটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়। মার্কসবাদের ভিত্তিমূলে এটাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

বিশ শতকের প্রথম ভাগে 'কলাকৈবল্যবাদ'-এর বিপরীতে সাহিত্যের বাস্তবতামুখী ও জীবনবাদী হবার পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক উঠেছিল। তর্ক চলেছিল আইডিয়ালিজম ও রিয়ালিস্টিক হবার পক্ষে। সাহিত্যে যদি জীবেনর চিত্রই বিম্বিত না হয় তবে সে সাহিত্যের মূল্যই বা কি, জীবনের তার স্থান-ই বা কোথায়। সাহিত্যের জন্য সাহিত্য বা শিল্পের জন্য শিল্প একথা অর্থহীন; কারণ শিল্পের উদ্দেশ্য হল জীবনবোধ বা জীবন প্রেরণা। সাহিত্য বা শিল্প গড়ে ওঠে মানুষের প্রেরণা—মানুষের সাধনা দিয়ে—মানুষের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে তার স্থিতি। কাজেই মানুষের জীবনই যদি সেখানে স্থান না পায় তবে সে সাহিত্যে মানুষের প্রয়োজন কি?'

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক, যে লেখনী আর্তের উপকারার্থে না লিখিল সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।' অর্থাৎ মানবতাবাদী চিন্তা সাহিত্য সৃষ্টির মৌল শর্ত।

সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব নামক শাখাটির উৎপত্তি ঘটেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বস্তুত মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বিভিন্ন লেখার সূত্র ধরে সাহিত্যসমালোচক, ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী-নৃবিজ্ঞানীরা সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়টির গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীকালে বহুসংখ্যক দার্শনিক, সাহিত্যসমালোচক, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ এবং যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে বিশ শতকে এসে সমাজবিজ্ঞানের এ শাখাটির বিচিত্র বিকাশ ঘটে।

অজন্তা-আলতামিরার গুহাচিত্র এক প্রকার সাহিত্য। সেখানে একই সঙ্গে জীবন সংগ্রামের, জীবন আকাঙ্ক্ষার বেঁচেবর্তে থাকার প্রচণ্ড তাড়না; তারই সঙ্গে আছে অঙ্কনকুশলতা। আমরা প্লেটোর রিপাবলিক, দ্যা লজ বা আইন প্রভৃতি গ্রন্থে কী পাই। রাজাকে কেন দার্শনিক হতে হবে, প্রজ্ঞাবান হতে হবে অথবা দার্শনিক কিংবা প্রজ্ঞাবানকেই কেন রাজা হতে হবে, যার মধ্যে থাকবে না ব্যক্তিগত লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষের চিহ্নমাত্র, রাষ্ট্র কেমন করে চলবে, তার বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, প্রশাসন কেমন হবে ইত্যাকার সমাজ ভাবনা থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে (খ্রি. পূ. ৪২৭-৩৪৭) নিবেদিত প্রাণ ভাবনা করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন। মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) *দ্যা প্রিন্স*ও লিখেছেন সমাজ ভাবনা থেকে। টমাস মুর তার ইউটোপিয়া রচনা করেছেন (১৫১৬ সালে প্রকাশিত) ভবিষ্যতের একটি সুন্দর, মৈত্রীমূলক, সাম্যমূলক সমাজ-আকাঙ্ক্ষা থেকে। ভলতেয়ার-রুশো অজস্র লিখেছেন সমাজকে ধর্মান্ধতা থেকে টেনে-হেঁচড়ে বের করার জন্য। জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যাজকতন্ত্রের কূপমন্ডূকতা থেকে মুক্ত হবার জন্য। একটি সুন্দর-সমতামূলক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁদের অন্তরে। মার্কস্ এঙ্গেল দুই কালজয়ী সুহৃদ অজস্র সাহিত্য রচনা করেছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রভাবনা তথা সমাজভাবনা থেকে; সেই সাহিত্য আজ কালজয়ী-কালোত্তীর্ণ। ১৮৪৮ সালে তারা যৌথভাবে প্রণয়ন করেন

কমিউনিস্ট ইস্তেহার। ছোট একখানি বই ডবল ডিমাই আকারের ৫০ পৃষ্ঠাও নয় তথাপি হাজার বছরের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, সমাজ বিবর্তন এবং ভবিষ্যতের সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে রয়েছে এ বইয়ে। তাঁরা সমাজকে অনুপুঙ্খ জেনে, গবেষণা করে এই অনন্য সাহিত্যটি রচনা করেছেন।

ফ্রান্সের বিখ্যাত দুজন দার্শনিক ভলতেয়ার ও রুশো। ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), রুশো (১৭১২-১৭৭৮) থেকে ১৮ বছরের জেষ্ঠ্য। কিন্তু তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন একই বছর। সেই সময়ে ফরাসি সমাজে নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে একটি উদারতন্ত্রী মনোভঙ্গি সমাজের গহীনে দানা বেঁধে উঠেছিল। বরেণ্য এই দুই ব্যক্তিত্ব তারই ফসল। ভলতেয়ার লিখেছেন প্রচুর; প্রায় শ'খানেক বই। তাঁর লেখা সংগ্রামী শক্তির দ্যোতক হয়ে ওঠে। সনাতন পদ্ধতি বর্জন এবং অভিজাত ও যাজকদের বিরুদ্ধে তার কলম সোচ্চার ছিল।

রুশো যাজকদেরকে মানবজাতির শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। সকল পুরোহিতকে তিনি মনে করতেন ভণ্ড-প্রতারক। অলৌকিক বলে দাবি করা সব বাণী ছিল তাঁর কাছে মিথ্যার বেসাতি মাত্র। তাঁর মতে, যাজক কথিত সব প্রত্যাদেশ মানুষের উদ্ভাবিত। তিনি কঠোর ভাষায় তাদের আক্রমণ করেন। তাঁর মহান লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ভণ্ডামী তথা যাজকীয় শক্তির বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

রুশো ছিলেন বিপ্লবী আদর্শের প্রতিভূ। যাঁর লেখায় সূচনা হয়েছিল এক নবযুগের। তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারায় প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব, যার মূলমন্ত্র ছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। আদিম সাম্য সমাজের প্রতি তাঁর ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম—প্রকৃতি থেকেই তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেন। মানুষ প্রকৃতির সন্তান এই বিশ্বাস ছিল তাঁর বদ্ধমূল। তাঁর মতে, আদিতে মানুষ এক প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করতো, সেটা যথার্থই ছিল স্বর্গস্বরূপ—সে ছিল এমন এক অবস্থা, তখন মানুষকে আপনার অধিকার সংরক্ষণে কোনো রকম বিপত্তির সম্মুখীন হতে হতো না। ধীরে ধীরে সমাজে নেমে আসে ব্যক্তি মালিকানার চেতনা, ব্যক্তিস্বার্থবোধ—ফলে সৃষ্টি হয় বৈষম্য, প্রতারণা-ফাঁকিবাজি, অতৃপ্তি-অশান্তি, সমাজে উৎপন্ন হয় অহঙ্কার, হিংসা-দ্বেষ। রুশোর বিখ্যাত বই *সমাজ সংস্থা* (১৭৬১)। *সমাজ সংস্থায়* লিখেছেন, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার; কিন্তু তবু সর্বত্রই মানুষ শৃংখলিত। মানুষ মাত্রেই অন্যের উপর দাবি করে বটে, কিন্তু সে ভুলে যায়, সেও অন্যের চাইতে কম পরাধীন নয়। তিনি ছিলেন যৌথ সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। সব অধিকার সমর্পণ করতে হবে লোকসমাজের কাছে। এটা করতে হবে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। রুশোর দর্শনের মূল লক্ষ্য মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখা। স্বাধীনতা প্রকৃতির অর্পিত মানুষের জন্মগত অধিকার। এ স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার অর্থ মানুষের মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেয়া, সমগ্র মানবতার অপমান

করা। তিনি স্বাধীনতার সাথে সাম্যের কথাও বলেছেন। তিনি বলেন, সাম্যের প্রয়োজন আছে; কেননা সাম্যের বিধান না হলে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা মেলে না। সাম্যের নিশ্চয়তার জন্য রুশো চেয়েছেন ধন-সম্পদের সুষম বণ্টন। তিনি বলেন, প্রকৃতির বিধান নিরপেক্ষ, প্রকৃতি কাউকে রাজা, ধনবান বা অভিজাত করে সৃষ্টি করে নি। তাঁর মতে, সব অবস্থায়ই মানুষ সমান। তিনি উপমা দিয়ে বলেন, গরিবের উদরের চাইতে ধনীর উদর তো আর বড় নয়, ভৃত্যের চাইতে প্রভুর বাহু দীর্ঘতর বা অধিকতর সবল নয়। সব মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমরূপ এবং এ প্রয়োজন মেটাবার উপকরণও সমভাবে সবার নাগালে থাকতে হবে।[৪৮] তিনি ছিলেন উদারনৈতিক মানবিক দর্শনের প্রবক্তা। তাঁর অন্তরাত্মা ছিল মানবিকতায় পূর্ণ। তাঁর ধর্ম ছিল মানব ধর্ম। ফ্রান্সের বিপ্লবী পরিষদ এবং সংবিধান সভায় মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে রুশোর যে মতবাদ ব্যক্ত হয় সেখানে বলা হয়েছে—মানুষ মাত্রেই সমান, সমষ্টিগত ইচ্ছাই হলো আইন এবং জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।[৪৯]

পাঁচ

আমরা লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিম, শরৎ সবার রচনায়ই সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ, দ্বন্দ্ব, হিংসা-দ্বেষের ছবি দেখতে পাই। সব কবি-সাহিত্যিক-সমাজচিন্তক সমাজকে সামনে রেখে জেনে-বুঝে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণেও গভীরভাবে সামাজিক চেতনার ভিত্তি প্রস্ফূটিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে একজন শক্তিমান সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র রূপায়িত হয়েছে। আমরা এখন লালন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক দিকটির প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি দিতে পারি।

লালনের চিন্তার মর্মমূল বস্তুবাদ। মানুষের সামাজিক মুক্তির কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। তাঁর গানের উপমাদি সবই বস্তুভিত্তিক এবং সমাজ অভিজ্ঞতাজাত। ট্রাইবাল বা কৌম সমাজের সাম্যচিন্তা এবং বৌদ্ধ প্রবর্তিত সাম্যচিন্তার সমন্বিত রূপেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে লালনের সমাজ-সাম্য চিন্তার মধ্যে। তিনি লাঞ্ছিত-নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত জনমানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন বস্তুবাদী জীবন দৃষ্টিতে। তাঁর সঙ্গে তুল্য-মূল্যে বিচার চলে এমন মানুষ বিরল। এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং রাজনৈতিক রূপকারদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা স্মরণ করতে পারি। বঙ্গবন্ধু ধর্মকে দেখেছিলেন একান্ত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় আকর্ষণ ছিল লোকধর্ম তথা মানবধর্মের প্রতি। পনের শতকে চণ্ডীদাস ঘোষণা করেন মানুষের জয়গান, সবার উপরে মানুষ সত্য, বিশ শতকে নজরুল এক ধাপ এগিয়ে সাম্যের গান গাইলেন। তিনি আরো স্পষ্ট করে বললেন, মানুষই গ্রন্থ এনেছে, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, নাস্তিকেরও তো বিধাতার বর পেতে কোনো অসুবিধা হয় না; বরং ভালো যে তার ধার্মিকতার আরম্বর নেই :

'নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর,
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো।'

৪২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিসের এথেন্সে জন্মগ্রহণকারী প্লেটোর ভাবনা, পাঁচশত খ্রিষ্টপূর্বে নেপালের কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণকারী গৌতমবুদ্ধ এবং আঠারো শতকে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবের উদ্‌গাতা ভলতেয়ার, রুশো ও বাংলার লালন-দুদ্দু-বঙ্কিমের সমাজ ভাবনা আমরা এক সারিতে দাঁড় করাতে পারি।

"কেহ নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে না; দ্বিতীয়ত, কাহারও এমন কোনো বাসগৃহ বা গোলাবাড়ি থাকিবে না যাহা অন্যদের জন্য অবারিত দ্বার নহে।"

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির ব্যাপারে এই কঠোর বক্তব্য রাখেন প্লেটো। আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণির জীবন যাপন পদ্ধতির বিষয়ে *রিপাবলিক*-এ তিনি এই নীতির কথা ঘোষণা করেন (Republic, Book III, 415)।[৫০]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কেন তিনি দার্শনিক রাজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে রাজা হবেন দার্শনিক কিংবা দার্শনিক হবে রাজা—যার থাকবে না সন্তান-সন্ততি, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা। এই দার্শনিক প্রায় আশি বছর বয়সে ৩৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রয়াত হন। এ গেল পশ্চিমি দুনিয়ার কথা। পূর্বপ্রান্তে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার হিমালয়ের পাদদেশে নেপালে, প্লেটোর প্রায় একশত বছর আগে ৫৫০ খ্রিষ্টাপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন গৌতমবুদ্ধ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিষয়ে তিনি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা বেধে দেন তার সৃষ্ট ভিক্ষু সংঘে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, উন্নততর জগত প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধ প্রতীক হিসেবে ভিক্ষু সংঘকে সংগঠিত করেন—সেখানে জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ উঁচু-নীচু ভেদ নেই। এখানে সবাই সমান, সবাইকে সমান শ্রম দিতে হবে। তিনি ভিক্ষুসংঘের সদস্যদের একটুকরো পরিধানের কাপড়, একটা থালা, একটা চিরনি প্রভৃতি মাত্র ৮টি জিনিস ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্লেটোর দার্শনিক রাজারই প্রতিধ্বনি পাই এই ভিক্ষু সংঘের নিয়ম-নীতির মধ্যে।

বাংলার সমাজচিন্তক বঙ্কিম জন্মগ্রহণ করেন এ কালে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলাদেশের কৃষক, সাম্য প্রভৃতি লেখায় বঙ্কিম শোষিতজনের পাশে দাঁড়ান। তিনি সাম্যে লেখেন :

'যিনি ন্যায় বিরুদ্ধে আইনের দোষে পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দন্ড প্রচণ্ড প্রতাবান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাহার যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাহার সমকক্ষ এবং তাহার ভ্রাতা। জন্ম দোষগুণের অধিন নহে, তাহার অন্য কোনো দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।'

এ বক্তব্য একই সঙ্গে প্লেটো ও রুশোর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। প্লেটো তৎকালের গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা এথেন্সের বিচারবিভাগের নীতি-নিয়োম মেনে নিতে পারেননি, বিশেষ করে গুরু সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর দার্শনিক চিন্তার ভিত নির্মাণ করেছিলেন সক্রেটিস। তাঁর কাছে সক্রেটিস ছিলেন ন্যায়নীতির এবং আদর্শ মানুষের স্মারক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এই আদর্শবান মানুষটিকে যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে তখন সেই গণতন্ত্রের প্রতি, সেই বিচার বিভাগের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি হন গণতন্ত্র বিরোধী। অর্থাৎ তাঁর এই প্রতীতি হয়েছে যে গণতন্ত্র সবসময় ন্যায়ধর্ম বা ন্যায়নীতি রক্ষা করতে পারে না। কাজে কাজেই দার্শনিক রাজার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন যা বাস্তবে কখনও সম্ভব নয়। আমরা তাঁর *রিপাবলিক*-এ বর্ণিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিষয়ে ফিরে আসি।

প্লেটোর ধারণা রাজা যদি দার্শনিক হয় অথবা দার্শনিক যদি রাজা হয় তাহলে সেই রাজার থাকবেনা কোনো লোভ-লালসা কিংবা হিংসা-দ্বেষ। সেই রাষ্ট্রে শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা হবে। সামষ্টিক চেতনা থাকবে ভরপুর এটা এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক চেতনাপ্রসূত। সাম্যতন্ত্রতো বটেই। এই চেতনার প্রত্ন-ভিত্তি হচ্ছে আদিম সাম্য সমাজ যার উৎপত্তি ট্রাইবাল বা কৌম সমাজ যেখানে যৌথচেতনাই সমাজ কাঠামোর ভিত্তি। গৌতমবুদ্ধের সমাজ ভাবনায়ও সাম্য সমাজের প্রত্ন-উপাদান ঐ কৌম সমাজ। এমনকি যে বেদ-বৈদিকতা এক সময় সমাজকে শ্রেণিবিভক্ত করেছিল বিপদজনক পর্যায়ে তারও গোড়ার দিকে সাম্যচেতনার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। পণ্ডিত-গবেষকরা এ কথা প্রমাণ করেছেন। বিশেষ করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তে 'ঋত' নামক একটি শব্দ আছে যার অর্থ ন্যায়নীতি, যার উৎস ট্রাইবাল সমাজের সামষ্টিক চেতনাজাত। এর ধারক এবং বাহক ন্যায়ের দেবতা বরুণ। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের দেবতা ইন্দ্র, ইন্দ্র সন্ত্রাসী-লুণ্ঠনকারী, শ্রেণিসমাজের প্রতিভূ, হিংসাপরায়ণ অপর পক্ষে বরুণ অহিংসার, ন্যায়ের, সাম্যের স্মারক। কাজেই বেদের অনেক কবিই সন্ত্রাসী, লুণ্ঠন প্রত্যাশী, হিংসাপরায়ণ দেবতা ইন্দ্রের কবল থেকে নিস্তার কামনা করে প্রাচীন ন্যায়নীতির দেবতা বরুণকে কামনা করেছেন। সেই সাম্যের সমাজ কামনা করেছেন যে সমাজে যৌথ চেতনা ছিল প্রধান। গৌতম বুদ্ধের ঐতিহ্য সেই সামষ্টিক সামাজিক চেতনার সমাজ।

ইউরোপের রেনেসাঁর জনক পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) তাঁর রচনায় আধুনিক প্রাগ্রসর জীবনচেতনার জয়গান শোনালেন; একই সঙ্গে দেশপ্রেম-মানবপ্রেম—স্বীকার করলেন এসব তিনি পেলেন প্রাচীন থেকে, পুরানো পাণ্ডুলিপি ঘেটে। বললেন ক্লাসিক সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কৃতি কোনো বিরোধ নেই। এখনকার ভুরিভুরি পণ্ডিত একথা মানেন না। দ্যা ভিঞ্চি থেকে পিকাসো কী বললেন তাঁদের চিত্রকর্মে। গুয়েরনিকায় দেখা যায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত এক সমাজের ছায়া। আমাদের এস এম সুলতান (১৯২৪-১৯৯৪) কর্মঠ—পেশিবহুল উর্বর কৃষকের ছবি এঁকে কি আমাদের কৃষিসমাজের সমৃদ্ধিকে তুলে ধরেন নি। জয়নুল (১৯১৪-১৯৭৬) তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের করুণ হৃদয়-ব্যথিত-দুর্বিসহ দৃশ্য তুলিতে এনে দুর্দিনের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। একই সঙ্গে তা শিল্প এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত-কারুকার্যময় আবার তা জীবন সংগ্রামের চিত্র। এসব একই সঙ্গে শিল্পের, সাহিত্যের এবং সমাজ ইতিহাসের পাতা।

আমরা সক্রেটিসের জবানবন্দি (খ্রি. পূ. ৪৫৬-৩৮৫) এ্যাপোলজি, নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৬) জবানবন্দি এবং বঙ্গবন্ধুর (১৯২০-১৯৭৫) ৭ মার্চের ভাষণে কী কী সাযুজ্য দেখি। বঙ্গবন্ধুর আঠারো/উনিশ মিনিটে বলা কথাগুলোও একটা জবানবন্দি। দশ লক্ষাধিক মানুষের সামনে, বাংলার এক ক্রান্তিকালে অলিখিত ঐতিহাসিক বক্তৃতা তিনি বিশ্বের দরবারে পেশ করেন। এসব সাহিত্যে সমাজ চিত্রিত কিনা? যদি বলি হ্যাঁ তাহলে সেই সাহিত্য সমাজতাত্ত্বিকের কাছে গবেষণার জন্য মূল্যবান।

উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি কী ধরনের এবং সেই পদ্ধতিটি কার নিয়ন্ত্রণে চলছে, এরই ভিত্তিতে সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে, আর উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনেই পরিবর্তনেই এটা বদলায়। একদল খেটে মরছে, মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে; আর একদল সেই খেটে খাওয়া মানুষদের শ্রমলব্ধ উপার্জনে বিলাসিতায় মত্ত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সমাজতাত্ত্বিক উপাদান আরো গভীরভাবে প্রতিয়মান এই কারণে যে তৎকালীন পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান বানিয়েছিল উপনিবেশ; সেখানে জন্মগত অধিকার মাতৃভাষায় কথা বলা সেটাও তাদের রোষাণলে পড়েছিল। যে-কোনো মানুষের জন্মগত অধিকার তার মাতৃভাষায় কথা বলা—সেখানে পাকিস্তানের জান্তা সরকার চরম বাধার প্রাচীর নির্মাণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। শোষণের চিত্রজাল বিস্তার করে বাংলায় উৎপাদিত সব রকমের সম্পদ কেন্দ্রে অর্থাৎ পাকিস্তানে পাচার করে সেখানে কৃষির আধুনিকায়ণ ও নানা প্রকার শিল্প-কারখানা গড়ে তুলছিল। সামরিক দিক থেকেও পশ্চিম পাকিস্তানের সুরক্ষা দৃঢ় করেছিল, সেদিক থেকে বাংলা ছিল শূন্যের ঘরে। সমাজ ছিল খানিকটা সামন্তবাদী, আবার পুঁজিবাদী, ধনবাদী-উপনিবেশবাদী লক্ষণও ছিল এর মর্মমূলে। সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজের কুফল সবটাই ছিল বাঙালির ঘারে।

বঙ্কিম তাঁর সাম্যে, বাংলাদেশের কৃষকে ও বিড়ালে প্রভৃতি লেখায় শোষণের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কি *মা* (প্রকাশকাল: ১৯০৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝি* শীর্ষক উপন্যাসে কিংবা সুকান্ত 'রানার' প্রভৃতি কবিতায় শ্রেণিশোষণের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করে কালজয়ী সাহিত্যের খ্যাতি পেয়েছে। আমরা তো জানি সাহিত্য সমাজের ছবি, জীবনের ছবি, জীবন বাস্তবতা, জীবনের নানামুখী সংকট তো সাহিত্যে স্থান পাবেই, এতো স্বতঃসিদ্ধ কথা। এক কথায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধু আরো প্রত্যক্ষভাবে, নিবিড়ভাবে, বাস্তবভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন, আর তাই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণে তার পরিচয় ফুটে উঠবে সে কথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব।

ছয়

৭ মার্চের ভাষণের প্রথম প্যারার একটি বাক্য এরকম : 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'। এই মুক্তি চাওয়া, বাঁচতে চাওয়া এবং অধিকার চাওয়ার প্রশ্নই সমাজতন্ত্রের মূলভিত্তি। সমাজতন্ত্রের কথা হচ্ছে সমাজ কীভাবে সমনীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে অগ্রসর হবে। বৈষম্যহীন ও হিংসা-দ্বেষমুক্ত জীবনজিজ্ঞাসার প্রশ্নে সমাজতত্ত্ব নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি'। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সঙ্গে সমঝোতার জন্য, বন্ধুত্বের জন্য, মৈত্রী রক্ষার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেও তিনি সফল হননি। তখন আমাদের আর কী করণীয়! এখানে উপনিবেশবাদী, শোষণমূলক সামন্ত সমাজের প্রতিভূ পাকিস্তানি শাসকচক্রের দূরভিসন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, বাঙালির বাঁচার অধিকার রক্ষায় আমরা ঐক্যবদ্ধ।

আমরা রেসকোর্স মাঠে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ১৯ মিনিটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেয়া ভাষণটিকে একটা উৎকৃষ্টমানের সাহিত্য হিসেবে অভিহিত করতে পারি। উৎকৃষ্ট সাহিত্য মানেই সেটা হবে সমাজতাত্ত্বিক উপাদানে ঠাসা। আমরা এই সাহিত্যের বিচার করব ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে তথা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের আলোকে। মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের মতে সাহিত্য যেখান থেকে উদ্ভূত হয় বা যার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে থাকে সেই সমাজ কোনো অস্পষ্ট বা অজানা পরিপ্রেক্ষিত নয়। অর্থাৎ সাহিত্য সমাজেরই আধার। শিল্প-সাহিত্যকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বের আলোকে বিচার করে সমাজজীবনে তার সক্রিয় প্রভাব অন্বেষণ করা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের মূল লক্ষ্য। মার্কস শিল্প-সাহিত্যকে সামাজিক চেতনার প্রতিরূপ মনে করেছেন। তাঁর ভাষায় : 'Art is form of social consciousness' অর্থাৎ শিল্প সাহিত্যকে সামগ্রীক বিশ্ববীক্ষার আলোকে বিবেচনা করতে হবে। মার্কস-এঙ্গেলস-মাও সেতুং প্রমুখ মনে করতেন উপদেশ-বিতরণ

শিল্পের কাজ নয়; বরং শিল্পে প্রতিফলিত হতে হবে বাস্তব জগত, সমাজে নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিখুঁত চিত্র।[৫১]

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে প্রথমেই বলেছেন, 'আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'। বাংলার মানুষ একটি সুচিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষ। তার রয়েছে সমৃদ্ধ ভাষা, আর রয়েছে পৃথিবীখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক ও রাজনৈতিক রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাদেরই জীবন-মরণ সমস্যা একদল লোক, একটি চক্রান্তকারী গোষ্ঠী—তারা হচ্ছে পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী সামরিক জান্তা। আবার এ চক্রের স্থানীয় মদদদাতারাও চিহ্নিত। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে, বেঁচে-বর্তে থাকার প্রশ্নে নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে বলছেন, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ নামের একটি রাজনৈতিক সংগঠনের একছত্র অধিকর্তা। ভালভাবে বেঁচে থাকার এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে বাংলার মানুষ ১৯৭০ সালের ৭ তারিখের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সামরিক জান্তা সেই অধিকার না দিয়ে বাঙালি জাতিকে ফেলেছে মহাসংকটে। আর এর ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধু এই সংকটের পটভূমি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তার এই মৌখিক রচনায় বর্ণনা করেছেন। ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস—মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। তিনি এদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত ঐতিহাসিক দিনগুলো স্মরণ করেছেন : ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের সামরিক জান্তা আয়ুবের পতনের জন্য সংগঠিত গণ-অভ্যুত্থান। ঐ দিনে তাঁর এই বর্ণনা অগণিত দর্শক-শ্রোতার কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তাদের ধমনীর স্পন্দন বেড়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি মেজরিটি পার্টির নেতা। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা মতে তাঁর কথাই প্রধান, তাঁর আদেশ-নির্দেশ সকলকে মেনে চলতে হবে। পাকিস্তান সামরিক জান্তা সরকারের তখন একমাত্র কর্তব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কল করা। অবশিষ্ট সবকিছু দেখভালের দায়িত্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর। কিন্তু না, এহিয়া খান তাঁর কোনো কথা শুনছেন না, নানাভাবে ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছেন, বাহানা করছেন। আর কাহাতক। রেসকোর্স মাঠের মঞ্চেতো বঙ্গবন্ধুকে এই কারণেই আসতে হয়েছে।

'আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন'। এরপর ইয়াহিয়া খান বললেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে দেয়া হবে। কিন্তু হঠাৎ

করে মার্চের ১ তারিখে তা বন্ধ করে দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু ও বাংলার মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি আমাদের ভবিষ্যৎ?

জার শাসকদের অত্যাচারে রাশিয়ার জনমানুষ অতিষ্ঠ। একই বংশের প্রায় ২০০ বছর শাসনের পর লেলিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে তার পতন ঘটে। পৃথিবী নামক গ্রহের পাঠশালার একজন খ্যাতিমান ছাত্র ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)। পাঠকবর্গের কাছে তিনি সর্বাধিক পরিচিত তার 'মা' (১৯০৫ সালে প্রথম প্রকাশিত) উপন্যাসের জন্য। ভ্লাদিমির এ্যালিচ লেনিন-এর নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাত্র ১২ বছর আগে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। তবে তাঁর আরো উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম রয়েছে। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। ১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার সামাজিক বাস্তবতার ক্যানভাসে রচিত হয় তার 'মা' উপন্যাস। শ্রেণিবিভাজিত পুঁজিবাদী সমাজে মালিক-শ্রমিকের মানস-সংঘাত এ উপন্যাসে রূপায়িত। শ্রমিক-জনতার বিপ্লব-পূর্ব প্রস্তুতি এ উপন্যাসের মর্মবাণী।

'মা' উপন্যাসে গোর্কি শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র মা সাধারণ এক কারখানা শ্রমিক। ছেলে পাভেল যখন কারখানা-বস্তির অভ্যস্ত জীবনধারা থেকে সরে বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, 'মা' তখন ছেলের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। জার শাসিত রাশিয়ার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষ উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। গোর্কি এই সমাজ বাস্তবতা বাণীবদ্ধ করেছেন 'মা' উপন্যাসে।

মার্কসবাদী চিন্তায় শিল্পের সমাজতত্ত্ব অর্থাৎ তার সামাজিক চরিত্র এবং শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সংগ্রামে শিল্পের ভূমিকা আলোচনায় প্রাধান্য পায়। শিল্প একান্তভাবে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, গোর্কি এ মতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি বলেন, মানবতাকে এ যাবৎ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। তাঁর মতে ইতিহাসে যা-কিছু মহান ও সুন্দর তার উৎস হল সমবেত শ্রম, সংগ্রাম এবং অভিজ্ঞতা। এ কথা এঙ্গেলসও জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন।[৫২]

বাংলার বস্তুবাদী জীবন দর্শনের স্মারক হিসেবে খ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২৯-১৮৮৬) তাঁর *'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'* নামক গ্রন্থে গতানুগতিক ধর্মীয় আচারের সমালোচনা করে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের সমর্থন করেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কাজ করাই ধর্ম, কাজ না করা অধর্ম। প্রার্থনা-আরাধনার গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে তার গাণিতিক সমীকরণটি নিম্নরূপ :

পরিশ্রম = শষ্য
প্রার্থনা + পরিশ্রম = শষ্য
অতএব প্রার্থনা = ০

বিশ শতকের গোড়ার দিকে এমিল ডুরখিমসহ কতিপয় ফরাসি সমাজচিন্তাবিদ যে সমাজতাত্ত্বিক মত প্রচার করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের উপর্যুক্ত মতের মধ্যে তার সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ডুরখিম ও তাঁর সমমনা অন্যান্য প্রকৃতিবাদীর মতে মানুষ যে-সব দেবতার উপাসনা করে তারা সমাজমানস কর্তৃক অবচেতনভাবে সৃষ্ট মানুষের কাল্পনিক সত্তা। ধর্মে যে অতিপ্রাকৃত সত্তার কথা বলা হয় এবং যে সত্তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উৎস ও নিয়ন্ত্রক বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সে রকম কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা নেই। অক্ষয়কুমার দত্ত উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও কদাচার দূর করা ছিলা তাঁর জীবনের ব্রত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এবং মানিক বন্দোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯০৫৬) সাহিত্যকর্মের উপর দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলো ফেলে আমরা দেখবো কি নিপুণভাবে তাঁরা সমাজ বাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন। তদরূপ আমরা শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) প্রমুখের সাহিত্যকর্মেও দেখবো বস্তুবাদী জীবনচিত্র বিম্বিত হয়েছে।

যে সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা প্রতিফলিত হবে এবং কেবল সেই সাহিত্যই সমাজতাত্ত্বিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের লেখা প্রতিনিধিত্বশীল সৃষ্টি 'পল্লী সমাজ' নামক উপন্যাসের কথা বলা যায়। এ উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ নিকষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কূপমণ্ডূকতায় ভরা। ধূর্ততার জ্বলন্ত উদাহরণ বেনী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস ও পরাণ হালদার। এর মধ্যে আলোর বর্তিকা হাতে রমেশ ও বিশ্বেশ্বরীর মতো জেঠাইমার অবস্থান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরের হৃদয়হীনতাকে শরৎ সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মহেশ নামের ছোটগল্পটির কথাও উল্লেখ করা যায়। গফুর বিদ্রোহী চরিত্র না হলেও তাঁর অনেক কথায় প্রচলিত শ্রেণিসমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা* প্রভৃতি বিখ্যাত রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করলেও সামাজিক সমস্যার আলোকে লেখেন, *বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল*। এছাড়া তিনি ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট মানের প্রবন্ধ লেখেন, যে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। দ্বিরুক্তি হলেও বলছি তিনি 'সাম্য' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন ১৮৭২ সালে; এটি প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। অন্য একটি প্রবন্ধসহ ১৮৭৯ সালে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। সর্বজননীন মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে বঙ্কিম সাম্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি সমাজে বিদ্যমান ধনবৈষম্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।[৫৩]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) শিক্ষানুরাগী, সমাজ সেবক ও সমাজচিন্তক। বিশেষ করে নারী শিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থান ও নারীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার ছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সমাজের কুসংস্কার, জড়তা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেন।[৫৪] পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪), বোক্কাচিও (১৩১৩-৭৫), লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) প্রমুখ সমাজ চিন্তকের লেখায় রেনেসাঁসের সুর ধ্বনিত হয়। পেত্রার্ক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেটে এবং সনেট রচনার মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের পতাকা উড্ডীন করেন। বোক্কাচিও নাগরিকদের অনুসন্ধিৎসু মন ও কর্মশক্তির প্রশান্তি রচনা করেন। দুহাত ভরে তিনি এই চেতনার উপাদান সংগ্রহ করেন লোকসংস্কৃতি থেকে। চার্চের প্রভাব মুক্ত হয়ে শিল্পকলা ও ভাস্কর্য শিল্প সে সময় অন্ধকার অতিক্রম করে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, 'Man is the measure of every thing' অর্থাৎ মানুষ হল সবকিছুর মাপকাঠি। রেনেসাঁসের মূল লক্ষ্য হলো জীবনমুখীনতা, মানবপ্রীতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ সমাজের নবজাগৃতি, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'চিৎপ্রকর্ষ'।

এই রেনেসাঁসের ছোঁয়া এসে লাগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখনীতে। বাংলার সমাজে এটা কেমন করে ঘটে? সমাজ-সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত উপাদান এই প্রেরণার/জাগরণের উৎস। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এই শক্তি আছে বলেই না লালন, রবীন্দ্রনাথ, রোকেয়া, নজরুল, বঙ্গবন্ধুর জন্ম এইখানে এই মাটিতে সম্ভব হয়েছে।

রোকেয়ার সব রচনাই সমাজ জীবনের আচরিত বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। তাঁর আধুনিক ও প্রাগ্রসর সমাজচেতনা বাংলার হাজার বছর লালিত লোকসংস্কৃতিজাত উদারনৈতিক মানবচেতনা থেকে গৃহীত। *মতিচুর* (দুইখণ্ড, ১৯০৪ ও ১৯২২), *অবরোধবাসিনী* (১৯৩১) তাঁর গদ্য গ্রন্থ, *পদ্মরাগ* (১৯২৪) তাঁর উপন্যাস। নারীর প্রতি পুরুষের আধিপত্য, নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননা এবং সমাজে আচরিত ধর্মান্ধতা রোকেয়ার মনে তীব্র বেদনাবোধের সঞ্চার করে এবং তিনি লেখনীর মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। এভাবে তিনি বাংলায় মানবতন্ত্রী তথা বস্তুতান্ত্রিক সমাজের ভিত রচনা করেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণের ধারা উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হয়েছে মানিক-সাহিত্যে। মার্কসবাদী চেতনাসিক্ত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *পদ্মনদীর মাঝি* (১৯৩৬)। মাঝিদের দরিদ্রতার করুণচিত্র এবং সমাজে নিয়ত শ্রেণিসংগ্রামের সুস্পষ্ট চিত্র এ উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে। মানিক ছিলেন বস্তুবাদি সমাজচিন্তক। তাঁর রচনার উপজীব্য মনুষ্যত্ব ও মানবতাবাদ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। এ উপন্যাসের নায়ক। চিরপঙ্গু স্ত্রী মালা। স্ত্রী মালার বোন কপিলা। কুবের সফল মাঝি, মাছ শিকারি; কিন্তু চার পাশের মহাজন-দালাল-ফরিয়ার

চক্রজাল সে ভেদ করতে পারে না, তাই দারিদ্র্য তার চিরসাথী। মানিক ছিলেন মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বের একনিষ্ঠ সমর্থক। ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা তাঁর রচনায় চিত্রিত হয়েছে।

শওকত ওসমানের *জননী* (১৯৫৮) উপন্যাসে গার্হস্থ্য পরিবারের হতদরিদ্র আমেনার জীবন সংগ্রামের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমাজে নিরন্তর শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্পষ্ট পরিচয় তার সাহিত্যে বিধৃত হয়েছে। তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, উদারনৈতিক, খানিকটা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাঁর *জননী, কৃতদাসের হাসি* (১৯৬২) প্রভৃতি উপন্যাসে জীবন বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) সমাজ সচেতন একজন শক্তিমান লেখক। সমাজে যারা বঞ্চনার স্বীকার, শোষণের স্বীকার তিনি তাদেরই জীবনালেখ্য নির্মাণের প্রয়াসী। অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য যাদের মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে সেই সব অবহেলিত মানুষদের জীবনাচরণ তার কথা সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত। তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *খোয়াবনামা, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন*, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর এবং ভারত বিভাগকালীন সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পটভূমিতে রচিত হলেও শ্রমজীবী মানুষের ছবিও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দরিদ্র-দুঃখি মানুষদের কাতারের মানুষ। তিনি কথায় কথায় বলতেন তাঁর দরিদ্র মানুষরা। বিশ্বে একটি নতুন রাষ্ট্রগঠিত হবে। সেটা হবে বিশ্বের অন্যতম জাতি-রাষ্ট্র। চলছে তার গভীর ক্রান্তিকাল। প্রসূতি এক সময় যখন সন্তান জন্মদানের চূড়ান্তক্ষণে পৌঁছে বাংলার ইতিহাসে ৭ মার্চ তেমনি এক অবস্থা। ২৩/২৪ বছর ধরে তিলতিল করে বঙ্গবন্ধু জাতিকে আজকের এই দিনক্ষণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কাজেই তাঁর এই ভাষণ হঠাৎ করে রচনা করেছেন তা নয়, মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে, মেধা দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে জাতিকে যেমন সংগঠিত করেছেন তেমনি নিজেও কল্পনার জাল বুনে বুনে এই সময়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। তাই বলা চলে যে কারো পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এ ভাষণ তৈরি করা পাঠ করা সম্ভবপর নয়। দিনের পর দিন ধরে ঐ কথাগুলো তাঁর মনের কোণে দানা বেধে উঠেছিল। হয়তোবা সমাজতত্ত্ব তিনি কোনোদিন পাঠ করেন নি; কিন্তু ভাষণের প্রতিটি বাক্য সমাজতাত্ত্বিক উপাদানে ঠাসা। তিনি বলেন :

> বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।

বাংলার ক্রান্তিকালের ইতিহাসের এক দুঃসময়ের কথা উপর্যুক্ত বক্তব্যে প্রস্ফূটিত হয়েছে। ছয় দফা দাবি উত্থাপন বাঙালি জাতির একটি মাইল স্টোন। বিগত ২৩/২৪ বছর ধরে আমাদের পাকিস্তানি শাসকচক্র শোষণ করছে, বঞ্চিত করছে। তারই এক যৌক্তিক এবং গঠনমূলক প্রতিবাদ এ ভাষণ। আয়ুব খান মার্শাল লজারি করে দশ বছর ধরে বাঙালিকে কৃতদাসের মতো ব্যবহার করছে, যেন বাংলা তাদের উপনিবেশ। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের দিন শেষ, তোমরা আর আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। বঙ্গবন্ধু প্রশ্ন রেখেছেন : 'কী পেলাম আমরা? 'আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরীব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি।'

প্রত্যেকটি মানুষের খাদ্য-বাসস্থান-শিক্ষার অধিকার রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র দিন দিনই তাদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে চলছে, অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে; বাংলার মানুষ উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড্ডিনকারী ফরাসি বিপ্লব(১৭৮৯) প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমাজকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রেরণা দিয়ে গেছে। এ বিপ্লব ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ, মানবতাবাদের ঘোষণা স্বরূপ। এ বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা হয়, ব্যক্তির যে-কোনো বৃত্তি অর্জনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, অবৈধভাবে অর্জিত চার্চের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীকালে সমাজের মঙ্গলার্থে কোঁৎ, দুর্খেইম প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকরা ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণাকে পুঁজি করে তাঁদের চিন্তাদর্শের প্রেক্ষাপট রচনা করেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালি জাতির এই অংশের অর্থাৎ লালন-রবীন্দ্র-নজরুল-বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের মানুষের জন্য গভীর সংকটকাল। গভীর মানবসৃষ্ট বিপদ—এই বিপদ থেকে উত্তরণ/পরিত্রাণের সমগ্র দায়ভার একজন ব্যক্তির ঘাড়ে বর্তেছে। সেই ব্যক্তিটি আর কেউ নন—যিনি আর কিছু দিনের মধ্যেই সর্বকালের. সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে অভিধা পাবেন, অভিসিক্ত হবেন। ইতিপূর্বে যিনি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে—তাঁর অবস্থা কুল রাখি না শ্যাম রাখির মত নয়। তাঁকে কুল ও শ্যাম অর্থাৎ দুকুলই রাখতে হবে। দেশব্যাপী-বিশ্বব্যাপী গুঞ্জন ঐদিন বঙ্গবন্ধু মঞ্চে কী বলবেন—তাঁর কী বলার আছে। তাঁর পক্ষে কী বলা সম্ভব। জল্পনা-কল্পনা অন্তহীন। আমেরিকা, ইউরোপ, এমনকি মাও সেতুং-এর দেশ চিন যে দেশ সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দেশ, যাদের নীতি হবার কথা ছিল শোষিতের পক্ষে তারা পর্যন্ত উপনিবেশবাদী চেতনার পক্ষে দাঁড়ানোর পায়তারা করছে। এসব ভয়ানক আশঙ্কা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু প্রতিনিয়ত পা রাখছেন সামনের কাতারে। জনগণের মধ্যে খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

চলছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে দুই টুকরো হবে। যাদের কাছে পাকিস্তান অর্থ পাক-পবিত্র স্থান। পাক যে পাঞ্জাবের পি (p), করাচির 'কে' (k) তা কয়জন জানে। আর 'স্তান' হচ্ছে তাদের কাছে স্থান, অর্থ জায়গা। তাদের কাছে পাকিস্তান অর্থ পাক-পবিত্র জায়গা, তাকে রক্ষা করতেই হবে।

পশ্চিমা দুনিয়া বঙ্গবন্ধুকে কোনোভাবেই বাগে আনতে পারেনি; তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদেরও না, তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলী দেশপ্রেমিকের এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। দেশের-জাতির স্বার্থের একচুল বাইরেও তারা যাবে না। তবে দলে আছে বর্ণচোরা, ভানকারী মোশতাক, তারও আবার সঙ্গী-সাথী আছে। ভয়ঙ্কর ট্যাটন, কূট ও আত্মগোপনকারী।

বঙ্গবন্ধু এগুচ্ছেন দৃঢ় পদক্ষেপে, কঠিন সাহসের সঙ্গে। কৃষকের পোলা—বাংলার যে কৃষক বহু মরণপণ বিদ্রোহের নায়ক, সাঁওতাল বিদ্রোহ, রংপুর-সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ, অত্যাচারী নীল চাষের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামকারী, শতবছর ধরে বাংলার বার ভূঁইয়াদের পক্ষে সংগ্রামকারী, তারা বাঁশের লাঠি দিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করে পরাজিত করে। সেই বাঙালির সাহস একটু বেশি হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই মুহূর্তে নেতার চাই যেমন সাহস, তেমনি আবশ্যক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা।

বিকেল তিনটা নাগাদ তিনি দশলক্ষাধিক সমবেত জনতার সামনে দাঁড়ালেন। কী বলবেন তিনি। অজন্তা আলতামিয়ার গুহাবাসীরা পাহাড়ের গায়ে কি এঁকেছিলেন, কোন্ শিল্পবোধ থেকে? না শিল্পবোধের কারণে নয়—জীবন সংগ্রামের নিখুঁত ছবি তারা আঁকলেন। পিকাসো কি এঁকেছেন গোয়েরনিকায়। এস. এম. সুলতান তাঁর প্রাচীন বাঙালির হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারার চিত্র অঙ্কন করে কী বোঝাতে চেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যে, তাৎক্ষণিক রচনায় আমরা কী পাব বলে প্রত্যাশা করছি। চারদিকে রাইফেল তাক করা, মাথার উপর জঙ্গি বিমানের চক্কর। মরণকে আলিঙ্গন করার ঝুকি নিয়ে মঞ্চে উঠবেন-উঠতে হবে। তাঁর কাছে এবং জাতির কাছে এর আর কোনো বিকল্প নেই।

উনিশ শতকের সমস্ত সমাজচিন্তাবিদদের কল্পনা জুড়ে ছিল ইউরোপে সংঘটিত শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসি বিপ্লবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্মিলনে গঠিত জায়মান বাস্তবতা। সনাতনি সমাজের পতন ও বুর্জুয়া সমাজের আগমনের সন্ধিক্ষণে নতুন এই সমাজ বাস্তবতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষার ও সমাজবিদ্যার। সূচনাকাল থেকেই সমাজতত্ত্ব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যেসব সামাজিক সমস্যার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল সেগুলো হল ধনবৈষম্যের কারণে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যা, বেকারত্ব ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড।

সমাজতত্ত্ব বিকাশের প্রক্রিয়াটি প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত—ক. ধ্রুপদি সমাজতত্ত্ব, যার ভিত্তি হল দৃষ্টিবাদ, খ. মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব যার ভিত্তিভূমি হল দ্বন্দ্বতত্ত্ব। অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টিবাদি পদ্ধতিতে সমাজবীক্ষণের প্রচেষ্টা করেন এবং পরবর্তীকালে তার এই পদ্ধতি সমাজবীক্ষণের একটি বিশিষ্ট ধারায় রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য প্লেটো থেকে শুরু করে সমস্ত সমাজচিন্তাবিদদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল সমাজ সংহতির প্রকৃতি ও উৎস নির্ধারণ।

মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব বিপ্লবী ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয়। প্রচলিত সমাজ কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে সমাজশৃঙ্খলা কেমন করে রক্ষা করা সম্ভব এই ছিল দৃষ্টিবাদী সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার উদ্দেশ্য। আর মার্কস-এঙ্গেল্‌সের সমাজ ভাবনার মূল কথা হচ্ছে সমাজশৃঙ্খলার পরিবর্তন কোন পথে তার অনুসন্ধান। সমাজ কাঠামো বা সামাজিক অবস্থা শতাব্দী পর শতাব্দী একই রকম থাকে না। তবে তার পরিবর্তন কেমন করে ঘটে তার বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণ দেন মার্কস। সমাজে প্রতিনিয়ত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটছে। আদিম সাম্য সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা কিরকম ছিল, যাযাবর সমাজে, শিকারি সমাজে এবং কৃষি সমাজে কেমন ছিল। উৎপাদন পদ্ধতি কেমন ছিল তার উপর স্থির হয় উৎপাদন সম্পর্ক। সামন্ত সমাজে সামন্ত রাজা এবং ধর্মবেত্তাগণ মিলে একসঙ্গে সাধারণের উপর শাসন ও শোষণ চালিয়েছে। আবার পুঁজিবাদী সমাজেও পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে জনগণকে তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা অঢেল সম্পদ কুক্ষিগত করেছে। এই প্রক্রিয়া চলেছে যুগপৎ। এইসব অসঙ্গতির কারণে যুগপৎ আচরিত সমাজ দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিণত হয়েছে। এই সমাজের পরিবর্তন ও গতিধারা সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেল্‌স প্রণীত এবং ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মার্কস-এঙ্গেল্‌সের সাহিত্য রচনার পরিপ্রেক্ষিত আমাদের জানা আবশ্যক। তার কারণ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিত ছিল বাংলার স্বাধীনতাকামীদের মানসাকাঙ্ক্ষা। বাংলার প্রতিটি মানুষ তখন পরিণত হয়েছে এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, প্রতিটি মানুষ এক-একটি বারুদ পিণ্ড; এই মানস-অবস্থারও প্রেরণা সঞ্চরি উপাদান যুগিয়েছেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। কাজে কাজেই যার মাথা তার ঘাড়ে। তিনি যা বলবেন যা বলতে পারেন সেটা তো সকলের অন্তরের কথাই হতে হবে।

মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের কথা হচ্ছে সাহিত্য হতে হবে সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন। সাহিত্য নিছক শিল্প নয়, জীবন বাস্তবতার ছবি। বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাঞ্চলের মানুষ যারা একমত হয়েছে যে স্বাধীনতা তাদের চাই-চাইই। এটা তাদের অধিকার। বঙ্গবন্ধু ১৮/১৯ মিনিট ধরে বিবৃত করলেন লোককবির মত, কবিগানের কবির মতো, তিনি প্রশ্ন করলেন প্রতিপক্ষের কাছে

আবার নিজেই তার সমাধান খোঁজেন। সভাশেষে জনতার হৃদয় কুহুরে বুকভরা প্রেরণা নিয়ে রওনা হন যে যার আবাসস্থলে। বঙ্গবন্ধু যখন বলেন, 'আমি প্রধান মন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই'। বোঝা যাচ্ছে এদশের মানুষের অধিকার খর্ব করছে অন্য কোনো দেশের একদল লোক। তা তারা করছে অন্যায়ভাবে, তবে তারা একটা শক্তি, তাদের মোকাবেলা করতে হবে! সুতরাং :

> 'তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।'

নেতা হুকুম দিলেন হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়ে জীবনমরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাঁর ঘোর সন্দেহ যে তিনি এর পর আর কিছু বলার সুযোগ পাবেন না, তাই মন উজাড় করে সব বলে দিলেন।

মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী। এই সমাজতত্ত্বের মতে শ্রেণিচেতনায় তাড়িত-সর্বহারাশ্রেণি একবার একত্রিত হবে—এটা সাধারণভাবে কোনো অঞ্চল বিশেষে নয়, বিশ্বব্যাপী; যেমন তাদের শ্লোগান, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। এই চেতনা যে অঞ্চল বিশেষে ঘটতে পারে তার বহু প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। এবং তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনারও সংমিশ্রণ/সংশ্লেষ ঘটেছে। কাজেই বাংলাভাষী এই অঞ্চলের মানুষও যে তার ব্যতিক্রম নয় তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া এখানকার মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন এবং ভাষার জন্য জীবন দান নজিরবিহীন ঘটনা। সেই জাতির অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের রেশ থাকবেই এবং থাকাটাই স্বাভাবিক।

মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের মৌলভিত্তি শ্রেণি-ধারণা। শোষিত শ্রেণি আর শোষক শ্রেণি। শ্রেণিচেতনা থেকে সংঘটিত হয় শ্রেণি সংগ্রাম। শ্রেণি এবং শ্রেণি-সংগ্রাম ধারণা মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের দুটি কেন্দ্রীয় ধারণা। ধারণা দুইটি যুগপৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকবর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুঁজিবাদী সমাজে সৃষ্ট মুক্তিকামী নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েত বা শোষিত শ্রেণির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মার্কস গবেষণা করেন। আর এটি অনুসন্ধানের সূত্রেই তিনি পুঁজিবাদী সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনায় ব্রতি হন। সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে সূচনাবিন্দুটি হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো এবং ঐ সমাজে আচরিত শ্রেণি সংগ্রামের প্রকৃতি নির্ণয়। আর এই গবেষণা হতে হবে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। উৎপাদনশীল জীব হিসেবে মানুষ অন্যদের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হয় ফলে উৎপাদন হয়ে উঠে সামাজিক উৎপাদন—উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সম্মিলনে সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে ওঠে, যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত উপরিসৌধ। এই ক্রিয়াকর্ম যুগপৎ চলতে থাকে। কালক্রমে উদ্বৃত্ত ফসলের মালিকানার প্রশ্নে কতিপয় ব্যক্তি

উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর ব্যক্তি মালিকানা স্থাপন করে। এখান থেকেই উৎপত্তি হয় দুটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যার একদল বিত্তবান অপরদল বিত্তহীন এবং অবশ্যই তারা পরস্পর স্বার্থ বিরোধী। একদল শোষক অপর দল শোষিত। প্রধানত শ্রমজীবীরাই শোষিত। এঙ্গেলস তাঁর *দ্য অরিজন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এ্যান্ড স্টেট* গ্রন্থে বলেন, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদনের মধ্যে সম্পত্তির এবং সম্পত্তির মালিকানাগত অসাম্যের মধ্যে শোষণের মূল চিত্র গ্রথিত। তিনি বলেন, পণ্য উৎপাদন মালিকানাগত অসাম্যের জন্মদাত্রী। সম্পত্তির মালিকানা বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয় প্রথার মাধ্যমে। তার আগে আদিম মানুষেরা সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সমাজের এই মনোভঙ্গিই কালক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দেয়। এরই ফলে বংশানুক্রমিক স্টেটের ও অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। শ্রেণিবিভাজনের মূলে প্রথিত রয়েছে শ্রমবিভাজন। প্রথমত যুদ্ধে পরাজিতদের অর্থাৎ দাসদের ব্যাপকভাবে শ্রমে নিয়োগ করা হয়; পরে অন্যরাও শ্রমে নিয়োগ পায়। সুতরাং শ্রেণি বিভাজনের মূল হল শ্রমবিভাজন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শোষণের উদ্ভবের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল শ্রমবিভাজন। এরই ফলে সমাজে দুটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। একটি শোষক এবং অপরটি শোষিত। বঙ্গবন্ধু অনেক বক্তৃতা বিবৃতিতেই বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষের দুটি জাতি আছে, একটি শোষক অপরটি শোষিত, আমি শোষিতের দলে। আর এ কারণেই আমাদের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি 'সমাজতন্ত্র'। একটি সাম্যের ও অহিংসার সমাজ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর আজন্ম। বিশ্ব রাজনীতির বিশেষ করে শোষকচক্রের বহু ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর নীতি থেকে তিনি একচুল বিচ্যুত হননি; নীতির প্রশ্নে কোনো আপোষ করেননি, আপোষ করলে তাঁকে পরিবারশুদ্ধ অঘোরে প্রাণবিসর্জন দিতে হতো না একথা হলফ করে বলা চলে। জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে, অত্যন্ত সাহসীকতার সঙ্গে ৭ মার্চে রেসকোর্স মাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বপ্নে লালিত কবিতাখানি রচনা করেন এবং পাঠ করেন। তিনি যখন বলেন :

> 'সরকারি কর্মচারীদের বলি—আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশ মুক্ত না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো। ...দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।'

এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা পাগল বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে আহ্বান জানালেন। সেই আহ্বান বুকে ধারণ করে দশ লক্ষাধিক মানুষ ছুটে চললো যে যার গন্তব্যে। সভায় উপস্থিত জনতার অধিকাংশই এসেছিল গ্রাম থেকে, তারা যে যার গ্রামে ফিরে গেল, পরদিন থেকে গ্রাম বাংলার মানুষের মনে গুঞ্জন উঠলো স্বাধীনতার, আর এই স্বাধীনতার জন্য চাই যুদ্ধ। পাড়ায় পাড়ায়,

স্কুল-কলেজে, মাঠে, ময়দানে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং, সাজসাজ রব, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে হবে—আর কোনো পথ খোলা নাই। সর্বস্তরের মানুষ মরণপণ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল।

সাত

বঙ্গবন্ধু ভাষণটি শুরু করেছিলেন 'বাংলার মানুষ মুক্তি চায়' বলে, আবার শেষও করলেন মুক্তির সংগ্রাম বলে :

> 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

মুক্তি কথাটির তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়' এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' দু'টি বাক্যই ছিল যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি তাৎপর্যময়। বাংলাদেশের আপামর মানুষের এবং বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য একটি মহৎ ইচ্ছা ও স্বপ্নের দ্যোতক হয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। স্বাধীনতা আমাদের চাই-চাই-ই; কিন্তু স্বাধীনতার চাইতেও ব্যাপক তাৎপর্যময় এবং অর্থবহ শব্দ মুক্তি, আমরা একই সঙ্গে সেই মুক্তিও চাই। স্বাধীনতার সীমা আছে—চৌহদ্দি আছে; কিন্তু মুক্তি সকল সীমা অতিক্রম করে যায়—শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-সংকীর্ণতা-কূপমণ্ডূকতা-দীনতা থেকে মুক্তি। মহান সব মনীষীদের ক্ষেত্রে এ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক এবং স্বতপ্রণোদিত। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে তাই এই স্বতঃপ্রণোদিত-স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু এবং শেষ আছে; কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের শেষ নেই। অনুমান করি সংগ্রামী মুজিব এই বৃহৎ তাৎপর্য থেকেই এই মহৎ উচ্চারণ করেছিলেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর বাক্য দু'টিকে বন্ধনীর মধ্যে নিয়ে উপসংহারে বলতে চাই বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের শোষিত দলের দলনেতা। তাই বাংলার মানুষের হাজার বছরের মানসাকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরদার ফজলুল করিমের বক্তব্য :

> শেখ মুজিব কতখানি ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, তা আমি জানিনে। কিন্তু সংগ্রামী মুজিব অচেতনভাবে হলেও অনুভব করেছিলেন, 'স্বাধীনতা'র চাইতে ব্যাপকতর তাৎপর্যের শব্দ 'মুক্তি'। স্বাধীনতার যদি ভৌগোলিক সীমা-চৌহদ্দি থাকে, মুক্তি অতিক্রম করে যায় সকল সীমাকে : মুক্তি বঞ্চনা থেকে, মুক্তি বৈষম্য থেকে, মুক্তি শোষণ থেকে, মুক্তি সংকীর্ণতা থেকে, কূপমণ্ডূকতা থেকে, মুক্তি সকল দীনতা থেকে। মানুষের জীবনে এর চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কি হতে পারে। সেই মহৎ স্বপ্নই উচ্চারিত হয়েছিল সেদিনকার সংগ্রামী মানুষের নিশানবরদার শেখ মুজিবের কণ্ঠে। স্বাধনিতার সংগ্রামের শুরু এবং শেষ আছে। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের শুরু অবশ্য আছে : বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষের ক্রমবর্ধমান চেতনার মধ্য দিয়ে তার শুরু। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের শেষ নেই। ক্রমমুক্তির মধ্য দিয়েই অধিকতর মুক্তিপানে মুক্তিসংগ্রামের অনিবার অগ্রগমন।

বস্তুত তাঁর এই মুক্তি চাওয়ার অর্থ কেবল বাংলার শোষিত মানুষের মুক্তি নয়, বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির প্রতিধ্বনি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। হ্যাঁ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়—আজও চায়—আর চায় বলেই সেই মুক্তিযুদ্ধ সে করেই চলেছে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম চলছে।

মানব ইতিহাসের সূচনাকালে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে, ফলত তখন থেকে শুরু হয় শ্রেণিসংগ্রাম এবং তা চলে যুগপৎ। এই শ্রেণিসংগ্রামের পথ ধরে ঐতিহাসিক কালের শুরু থেকে চলে মুক্তির সংগ্রাম। এই মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে মানব ইতিহাসে এ যাবৎকাল যত গান-কবিতা-নাটক-উপন্যাস-ভাষণ-অভিভাষণ-জবানবন্দি রচিত হয়েছে তাঁর মধ্যে এই ৭ মার্চের ভাষণই শ্রেষ্ঠ। কারণ অধিকাংশ সময়ই সেগুলো লেখা হয়েছে বা বলা হয়েছে সময় নিয়ে, কাগজ-কলম নিয়ে, কখনো বা আলাপচারিতার মাধ্যমে, কখনো কখনো অন্যান্যের সহযোগিতায়। বঙ্গবন্ধু এই মুক্তির কবিতাটি রচনা করেছেন এককভাবে এবং তাৎক্ষণিক। তবে তাঁর অতীত কর্মকাণ্ড এবং সাধন-ভজনের ইতিহাস নীরিক্ষা করলে বোঝা যায় তাঁর মানসভূবনে এ বক্তব্য বহুদিন ধরে রচিত, চর্চিত হচ্ছিল; ঐ দিন, ঐ মঞ্চে তার প্রকাশ ঘটেছে। ঐ দিন, ঐ মঞ্চ, ঐ জনরোশ ছাড়া এর প্রকাশ সম্ভব ছিল না। এ কবিতায় মুক্তির আহ্বান প্রত্যক্ষ, বস্তুগত; কোনো স্বাপ্নিক বা ভৌতিক নয়। শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের সংকল্প নিয়ে এ ভাষণই সৃষ্টি করেছে একটি দেশ স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাই সমগ্র বিশ্বের শোষিত মানুষের মুক্তির আহ্বানে এ ভাষণ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ। মানব সমাজ যতদিন আছে ততদিন পৃথিবীতে মুক্তির সংগ্রামে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়েই এ ভাষণ বেঁচে থাকবে এবং মুক্তির সংগ্রামে যোগাবে অনন্ত প্রেরণা। এ ভাষণ নিয়ে গবেষণাও চলবে নিরন্তর। একজন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার পথিক হিসেবে একথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

একদিন বাঙালি শোষনমুক্ত, কূপমণ্ডূকতামুক্ত, জাতিগত নিপীড়ন ও বঞ্চনাহীন অহিংসার সমাজ গড়বেই গড়বে; আর এ সমাজ সমগ্র বিশ্বসমাজে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রেরণা যোগাবে—এটাই ছিল নেতার আজন্ম আকাঙ্ক্ষা। আমাদের প্রত্যাশা তা একদিন সফল হবেই হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবদুল ওয়াহাব, ফোকলোর, মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৫১
বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ, পূর্ববাংলা প্রভৃতি শব্দ ১৯ বার উচ্চারিত হয়েছে।

২. আবদুল ওয়াহাব, ফোকলোর, মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৯৪

৩. *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫,পৃ.৯৬
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৮২, পৃ. ৪০-৪১)।

৪. প্রাগুক্ত, উর্মি রহমান, পৃ. ৮

৫. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ওরিয়েন্টাল বুক এন্ড কোম্পানী, কোলকাতা-১২, সপ্তম সংস্করণ ১৯৬৫, পৃ. ৪৯-৫০
৬. গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১
৭. শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও উৎপল ঘোষ, *মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব*, পশ্চিমবাঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কোলকাতা, ২০০০, পৃ.৮৪
৮. প্রাগুক্ত, রেবতী বর্মণ, পৃ. ১০
৯. ঐ, পৃ. ১৫
১০. রোমের অভিজাতরা দাসদের সিংহ বাঘ প্রভৃতি জন্তুর সঙ্গে খেলতে বাধ্য করতো। দাস ও পশুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে হয় পশু মরত না হয় দাস মরত। এরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো অভিজাত রোমান নাগরিকদের আমোদ-স্ফুর্তি তথা চিত্তবিনোদনের জন্য। এ দাসদের বলা হতো গাডিয়েটার। পশুর সঙ্গে লড়াইয়ের কৌশল শিক্ষার জন্য গাডিয়েটার স্কুল থাকতো। এরকম একটি স্কুল ছিল কেপুয়ায়। স্পার্টাকাস তার সতীর্থদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, রোমানদের মনোরঞ্জনের জন্য পশুরু সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ না দিয়ে স্বাধীনার জন্য মৃত্যুবরণ করা বরং শ্রেয়। স্পার্টাকাস প্রায় সত্তর জন গাডিয়েটার নিয়ে পাহারাত রক্ষীদের অতর্কিতে আক্রমণ করে তারা বিসুভিয়াস পর্বতে পালিয়ে যান। শীঘ্রই আরো অসংখ্য পলাতক দাস তার দলে যোগ দেয়। স্পাটাকস প্রায় সত্তর হাজার দাসের এক বিরাট বাহিনী গঠন করেন এবং দক্ষিণে তিনি একটি স্বাধীন রিপাবলিক স্থাপন করেন। কিন্তু রোমান সেনাবাহিনীর বারংবার আক্রমণের ফলে স্পার্টাকাস পরাজিত হন। *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, রেবতী বর্মণ, পৃ.১০২।
১১. রোমে প্রাচীণ রোমানদের নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্যের অবশেষ ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্য অন্যতম রোমান সম্রাটদের সুখ্যাত বা কুখ্যাত ক্রীড়াসৌধ কলোসিয়াম। কলোসিয়াম প্রাচীন পৃথিবীর এক অবাক করা স্থাপত্য কীর্তি। খ্রিষ্টীয় আশি অব্দে এই অট্টালিকার উদ্বোধন করেন টাইটাস। আকারে-প্রকারে এই ক্রীড়াঙ্গনের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। গ্যালারিতে ৪৫ হাজার দর্শকের বসিবার আসন ছিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যাবলি দেখিতে পারিতেন আরও ৫ হাজার। দর্শকদের সেখানে পৌছাইবার জন্য ছিল ৭৬টি তোরণ। তাছাড়া দুইটি সংরক্ষিত ছিল সম্রাট, রাজপরিবার, আমির ওমরাহ এবং বিদেশী অতিথিদের জন্য। তাহার পরও দুইটি তোরণ ছিল। তাহার মধ্য দিয়া রঙ্গ তথা রণভূমিতে প্রবেশ করিত ইতিহাসের সেই ভয়াবহ আত্মঘাতী যোদ্ধার দল যাহাদের বলা হয়—গ্ল্যাডিয়েটার। তাহারা প্রবেশ করিত ঘোড়ায় টানা রথে। রঙ্গভূমির ডাইনে-বায়ে গ্যালরির নিচে ছিল অস্ত্রশালা, বন্যপশু, রসদ এবং প্রয়োজনীয় নানা ঘর। এক সময়ে রোমের মানুষের মুখে একটি কথা ভাসিয়া বেড়াইত-যতদিন কলোসিয়াম মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, ততদিন রোমের পতন নাই। যেদিন কলোসিয়াম থাকিবে না, সেদিন রোমও ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেটুকু এখনও অবিশষ্ট আছে, তাহা দেখিয়াই দর্শকরা হতবাক। গত সপ্তাহে কলিকাতার খবরের কাগজে ছোট একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার মর্মঃ পর পর দুই রাত্রি উজ্জ্বল সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত ছিল রোমের কলোসিয়াম। কারণ, দুর প্রাচ্যে ফিলিপিনস দেশ হইতে মৃত্যুদন্ড উচ্ছেদ করিয়াছে। আধুনিক কালে কোনও দেশ মৃত্যুদণ্ড উচ্ছেদ করিলে প্রাচীণ বধ্যভূমি কলোসিয়াম নাকি সোনালি আলোয় অবগাহন করিয়া এভাবেই আনন্দ প্রকাশ করে।
(দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা বধ্যভূমিতে জীবনের উৎসব, ৮১ বর্ষ, ২১০ সংখ্যা, রবিবার, ২৮ অক্টোবর, ২০০২)।

১২. রেবতী বর্মণ, পৃ. ১০২
১৩. রেবতী বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
১৪. গোপাল হালদার প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫
১৫. রেবতী বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
১৬. গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬
১৭. রেবতী বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪
১৮. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিটার্স, কোলকাতা, ১৯৯৫, পৃ.৪০৮
১৯. ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮
২০. ঐ. পৃ. ৪০৮
২১. শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও উৎপল ঘোষ, *মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ ২০০, পৃ. ১
২২. প্রাগুক্ত, পৃ.৪
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
২৪. ঐ. পৃ. ১০
২৫. *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস* (আধুনিক কাল) প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৭.পৃ.৫৬-৬১
২৬. রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
ফ্লোরেন্স শাসককে মেকিয়াভেলি করেছেন প্রজাতন্তের ব্যাপারে বেশি প্রভাবপাত করার সুযোগ জনগণকে দিতে, আইন ও প্রতিষ্ঠানদিতে খুব বড়োরকমের পরিবর্তন সাধন থেকে বিরত থাকতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হাত না দিতে, জনগণকে অস্ত্র দানে ভয় না পেতে, ভাড়াটে সৈন্য অথবা মিত্রশক্তির কাছ থেকে পাওয়া বাহিনীর চেয়ে নাগরিক মিলিশিয়া ও জনবাহিনীকে শ্রেয় মনে করতে, বিবেচকের মতো নিজের মন্ত্রকদের বাছতে এবং রাষ্ট্রের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তাদের অবাধে বিচার বিচেনা ও নির্দেশাদি দানের সুযোগ দিতে। ষড়যন্ত্র ও বলাত্মক উপপব এড়াবার জন্য একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে যে দুই শ্রেণি নিয়ে সমাজ গঠিত তাদের একটির, অর্থাৎ হয় অভিজাত নয় সাধারণ লোকের উপর স্বাধীনতা রক্ষার ভারাপর্ণের সুপারিশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি উলেখ করেছেন যে কাজটা জনগণকে দিলে ঝুঁকি থাকবে কম, কেননা সাধারণত তাদের ইচ্ছেটা কেবল পরের অধীনস্থ না হওয়া; পক্ষান্তরে কর্তৃত্ব করতে অভিজাতরা পিছ-পা নয়; সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমতা দখলও আশা করা যেতে পারে। (প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮)।
২৭. *দ্য প্রিন্স*, অনুবাদ সুনীলবরণ বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮৬, পৃ. ভূমিকা-৭
২৮. দ্য প্রিন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪
২৯. অনীক মাহমুদ, *সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১ পৃ. ৩০
৩০. শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও উৎপল ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩
৩১. অরুণাভ ঘোষ, *শতবর্ষে কমিউনিস্ট ইশতেহার-এর প্রাসঙ্গিকতা*, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ৫৭
৩২. অরুণাভ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৩৩. অরুণাভ ঘোষ, প্রাগুক্ত, ৩১
৩৪. আবুল কালাম, *ফরাসি বিপবের পটভূমি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনমুর্দ্রণ, ১৯৯৮, পৃ. ৮৩

৩৫. আবুল কালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩৬. আবুল কালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৩৭. জে. ভি. স্তালিন, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮তম মুদ্রণ, কোলকাতা, ২০০২, পৃ. ৬
৩৮. জে. ভি, স্তালিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩৯. জে. জি, স্তালিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২, ২৩
৪০. শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও অরুণাভ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪১. শরীফ হারুন, *ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৮
৪২. প্রাগুক্ত, ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৩২৯
৪৩. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কোলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ৫১
৪৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
৪৫. মুহম্মদ আফসারউদ্দীন (সম্পাদনা), 'এ কে নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ' সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ২৬
৪৬. আবুল কাশেম চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা (১৮২০-১৮৪৮), বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৮
৪৭. আফজালুল বাসার (অনুবাদ), বিশশতকের সাহিত্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ২২০
৪৮. আবুল কালাম, ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৮৩
৪৯. আবুল কালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৫০. গোলাম ফারুক, প্লেটোর দর্শন ও রাষ্ট্র চিন্তা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১
৫১. আবদুল ওয়াহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৫২. সত্যনারায়ণ মজুমদার, মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩৫
৫৩. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, পৃ. ১৪৪
৫৪. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০১১, পৃ. ৩৩৫

অর্থনীতি

৭ মার্চের ভাষণ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য

৭ মার্চের ভাষণ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য

মুহম্মদ মাহবুব আলী

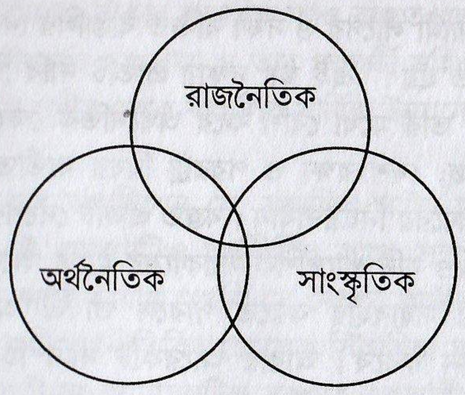
একটি স্বাধীন দেশের অভুদ্যয়ে ৭ মার্চ, ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪৭ সালের তথাকথিত দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম হয়। এই দুর্ভাগ্যজনক বিভক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানিদের। ফ্যাল্যান্ড এবং পার্কিসনের ভাষায় এই আপাতত দেশ বিভাগের সময়কালকে বর্ণনা করা হয়েছে, "দ্বিতীয় ঔপনেবেশিক শাসনকাল"। বস্তুত বাঙালিরা সবসময়েই স্বাধীন ভূখণ্ড চেয়ে এসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কূটকৌশলে তাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে একটি বিশাল ধাক্কা স্বরূপ ঘটনা ঘটলো। দুর্ভাগ্যজনক যে, পশ্চিমাদের হাতে পড়ে বারবার দেশের অর্থনীতি সমাজ-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। পর্যায়ক্রমিক ঘটনার বিবর্তনে শোষণ-বঞ্চনা এবং সংস্কৃতির উপর জগদ্দল পাথরের মত একের পর এক চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের লোভ-লালসায় যখন বাঙালি জাতি ক্ষত-বিক্ষত সে মুহূর্তে ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির জন্যে দিক নির্দেশনাস্বরূপ। যে নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা ২৩ বৎসর ধরে দিবানিশি কষ্ট সহ্য করছিল, বারবার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্ফূলিঙ্গ জ্বালিয়েছিল তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ও দিক নির্দেশনা বাঙালির প্রাজ্ঞ নেতা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণে উচ্চারণ করেছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণ যদিও রাজনৈতিক তবুও এটি একটি দেশের স্বাধীন অভুদ্যয়ের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা যেমন রেখেছিল, তেমনি দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করেছিল।

৭ মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণে যখন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন যে, আমার ভায়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে—তখন সেই বাক্য চয়নের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকে তাণ্ডবের লীলাচিত্র বাস্তবতার আলোক ধারায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শোষিত-বঞ্চিত মানুষ সব সময়ই অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের শিকার হয়। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা হিসাবে একদিকে যেমন জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সাথে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পরিপূর্ণ হওয়া নির্ভর করে থাকে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণে মানুষ পরনির্ভর, ক্ষুধার্ত এবং কুসংস্কারের চক্রে আবদ্ধ থাকে। আর তাই বাঙালিকে বারবার শোষণ বঞ্চিত করতে দেশের মানুষের রক্তে ইতিহাস রঞ্জিত করা হয়েছে—এরই ধারাবাহিকতায় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। আবার ১৯৬৬ সালে ছয় দফার পাশাপাশি ঊনসত্তরে ১১ দফা দাবি পেশ করা হয়। কিন্তু দেশের উন্নয়নে অগ্রগতি সাধন হবে ভেবে পাকিস্তানিরা এই সমস্ত দাবি গ্রাহ্য করেনি। দেশের সিংহভাগ মানুষ ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র থাকার ব্যবস্থা করেছে—পশ্চিমারা এদেশকে তাদের শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এতে বীর বাঙালি ভীত হয়নি। রাজপথে বার বার পাকিস্তানিদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদে সেদিন এদেশের মানুষ অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে—আর এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে বাঙালির জাতীয় জীবনে শোষণ-বঞ্চনা এবং অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের হাত থেকে পরিত্রাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সেদিন সে কথাটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন। বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর সকল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে শক্তিতে রূপান্তর করেছিল, দ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠেছিল; গর্জে উঠেছিল।

সত্তরের যে পরম আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন হয় তাতে শুধু পূর্ববঙ্গেই নয় বরং সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। দেশে সে সময়ে আওয়ামী লীগের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ ভয় করেছিল যে, সত্যের মুখোমুখি হতে হলে তাদের এদেশ থেকে অর্থ পাচারের উপায় বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাই জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক চক্রান্তের খেলায় মেতে উঠল। তারা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন নি। এ জন্যেই ৭ মার্চের ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচনের পরে এদেশের মানুষ আমাকে, আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণভাবে ভোট দেন। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা—এদেশের সম্পদ লুঠ করে পশ্চিম পাকিস্তান যেভাবে তাদের সম্পদ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে—এই ভয় পশ্চিমা শাসকচক্র এবং তাদের দোসরদের ভীতু করে তোলে। তারা ধর্মের দোহাই দেয়। অথচ অধার্মিকের মত এদেশ থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। পশ্চিম অঞ্চলের বিত্ত-বৈভব গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে,

নিপীড়ন করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ক্ষত-বিক্ষত করেছে। সাধারণ মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে সচেষ্ট থেকেছে।

বঙ্গবন্ধু সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, এদেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। তাঁর এই বাক্য চয়নের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে এদেশের মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার বাস্তবতার কথা। বাস্তবতা হলো বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার জন্যে একের পর এক চক্রান্ত করেছে। এই চক্রান্ত তাদেরকে প্রতিহত করতে হয়েছে। সাধারণ মানুষ শোষিত বঞ্চিত হতে হতে দারিদ্র্যের করালগ্রাসে নিপতিত হয়েছিল। নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে বাঙালি কালাতিপাত করছিল। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর আশা ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন করা। রাজনৈতিকভাবে পরাধীনতার যে শৃংখলা দীর্ঘকাল ধরে বাঙালিদের জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল তা থেকে মুক্তির দিক নির্দেশনা সেদিনের ভাষণে ছিল। আর সাংস্কৃতিক অঙ্গণেও বারবার আঘাত হেনেছে পাকিস্তানিরা। বারবার চেষ্টা করে ভাষার ক্ষেত্রে সফল না হতে পারলেও কখনো চেষ্টা করেছে আরবি হরফে বাংলা লেখার। আবার রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের প্রয়াস গ্রহণ করেছে সচেতনভাবে। অথচ এ অঞ্চলের বাঙালির রয়েছে দীর্ঘকালের নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে জোর দিয়েছিলেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির—এগুলো একে অন্যের পরিপূরক। নিম্নে চিত্র নং ১-এ সম্পর্কটি দেখানো হলো :



চিত্র নং : ১

বস্তুত রাজনীতিবিদরাই সবসময় অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আর তা তারা দেন সে অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টির ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে—এর সাথে যুক্ত থাকে ঐ অঞ্চলের সামষ্টিক চাহিদা ও সামষ্টিক সরবরাহের বিষয়টি। পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসনামলে এদেশের মানুষের ভোগ

প্রবণতা এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হ্রাস পেয়েছিল। জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। পাটকে সোনালী আঁশ বলা হলেও রপ্তানিলব্ধ আয় এদেশে না এসে পশ্চিম পাকিস্তানেই থেকে যেত। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তৎকালীন সময়ের হিসাবে এদেশ থেকে ৩১১২ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে গিয়েছিল বলে এদেশের অর্থনীতিবিদরা হিসাব কষে বের করেছিলেন।

এ জন্যেই ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের গোলাম করে রেখেছে। বঙ্গবন্ধু প্রকৃত অর্থে বাংলার জনসাধারণের সার্বিক অবস্থার বিষয়টি ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। পাকিস্তানিরা ক্রীতদাসের মত এদেশের মানুষের সাথে আচরণ করতেন। ফলে এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন, নির্যাতিত হতেন। আসলে তার সেই সাহসী বক্তব্যে ফুটে উঠেছে অধিকার বঞ্চিত বাঙালির কথা। এক্ষেত্রে ইম্যানুয়েল যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন "আনইকুয়্যাল এক্সচেঞ্জ' তার সেই তত্ত্বের পূর্ণ বাস্তবায়ন পশ্চিম পাকিস্তানিরা করেছিলেন। লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিকে ব্যবহার করে অর্জিত অর্থ এদেশে না এসে পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। পিছিয়ে পড়েছিল এদেশের উন্নয়ন কাঠামো। খাতকের হিংস্র থাবায় অর্থনীতি পাকিস্তানি চক্রের হাতে বার বার লুণ্ঠিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু সেদিনের ভাষণে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ছয় দফা আন্দোলনে ৭ জুন আমার ছেলে-মেয়েদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ছয়দফা সম্পর্কে মোবাশ্বের আলী 'বাংলাদেশের সন্ধানে' গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে, "আওয়ামী লীগের ৬ দফা বঞ্চিত বাঙালির নিকট ম্যাগনাকার্টা বা মুক্তির সনদরূপে গৃহীত হয়।" এই ছয় দফার প্রতিটি দাবি ছিল শোষিত বঞ্চিত বাঙালির মুক্তি স্বরূপ। তার মধ্যে বেশি করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ত দাবিগুলোর মধ্যে হচ্ছে; দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ব্যতীত আর সকল বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। বস্তুত একটি দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ও যদি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে সেক্ষেত্রে দেশের ঐ অঞ্চলের উন্নয়নের সদ্ব্যবহার করতে পারলে তা ঐ অঞ্চলের অগ্রযাত্রাকে সম্মুখের দিকে ধাবমান করবে। আবার আরেকটি দাবি ছিল পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে স্বতন্ত্র মুদ্রা এবং দুটি স্টেট ব্যাংক থাকবে। এই দাবিটিও ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি স্টেট ব্যাংকের অর্থ হচ্ছে এ অঞ্চলের জন্যে স্বাধীনভাবে মুদ্রানীতি পরিচালনা করার সুযোগ। যখন কোনো অঞ্চলে মুদ্রানীতি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়, তখন সেই অঞ্চলের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। কেননা মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সে অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব। আসলে সঠিক মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগ-সঞ্চয়ে একটি সরাসরি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করবে এবং মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি বা

হ্রাসের মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম হবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে বৃহত্তর পরিধি তৈরি করা সম্ভব হবে। দেশে সামষ্টিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি হলে, মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সুষম বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আবার ছয় দফার আরেকটি দাবি ছিল যে, সকল প্রকার ট্যাক্স ও কর আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের কর্তৃতাধীন। এই দাবিটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটু পূর্বেই দেখেছি যে, রাজস্বনীতি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে কিন্স্যানীয় পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় বাজেট দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। যার পূর্ব শর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয় ব্যবহার করতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হলে তা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি করবে।

আবার এদেশ থেকে বাণিজ্যের নামে অর্থ পাচার হচ্ছিল। সেটি বন্ধ রাখার জন্যে ছয় দফার আরেকটি দাবি ছিল যে, বৈদেশিক বাণিজ্য হবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পাট ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়াত্ত করে একে প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্তাধীন আনতে হবে। এই ঘোষণাটি এদেশের মানুষের জন্যে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আসলে দেশের মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সুদূরপ্রসারি নেতৃত্বগুণ ছিল সে জন্যেই ১৯৬৬ সালে ছয়দফা দাবি পেশ করেছিলেন। আর এই ছয় দফা দাবি পেশ করার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি হায়েনারা যেভাবে এদেশের মানুষের জীবনকে দুর্ভোগের শিকার করেছিল তাও বলতে বঙ্গবন্ধু দ্বিধা করেন নি। তাই তো ৭ মার্চের ভাষণেও ছয় দফা ও তার পরবর্তী সহিংসতার কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি অন্তরের গভীর থেকে বাঙালির সার্বিক উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথ-ড্রো করতে হবে। তার এই ঘোষণাটিও অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। যখনই কোনো দেশে সামরিক শাসন জারি হয়েছে তখনি সে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। এই জন্যে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি কোনো দেশে একটি সৎ অটোক্রেটিক সরকার এককালীন মেয়াদ পূর্ণ করলে যে ক্ষতি হবে, সমপরিমাণ ক্ষতি হবে ঐদেশে পরপর চারবার দুর্নীতিপরায়ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সরকারের শাসনামলে। আসলে বঙ্গবন্ধু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা ছিলেন বলেই অনেক আগেই সামরিক আইন তুলে নেয়ার কথা ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন।

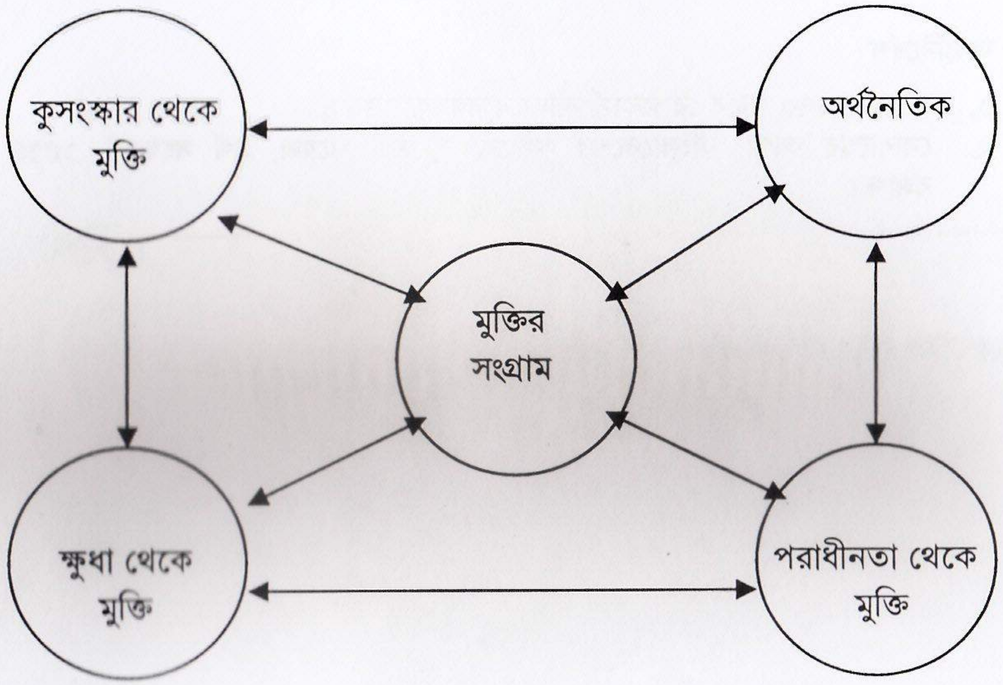
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তাঁর কাছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত এদেশের মানুষরাই

ছিলেন সবকিছুর উর্ধ্বে। তিনি বিজয়ীর বেশে কথা বলেছেন—অহিংসার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন অসাম্প্রদায়িকতার কথা। আর অসম্প্রদায়িকতা মানে কিন্তু ধর্মহীনতা নয়। বরং যার যার ধর্ম তার কাছে সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বন্ধুত্ব বজায় রাখা। আসলে বঙ্গবন্ধু খাঁটি বাঙালি জাতিয়তাবাদী ছিলেন বলেই ৭ মার্চের ভাষণে তাঁর একান্ত বিশ্বাস থেকে এবং দেশের মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা-ভাবনা করে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আর এ কারণেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আসলে একজন খাঁটি গণতন্ত্রকামী নেতা হিসাবে তাঁর এই ঘোষণাতেও সেদিন ফুটে উঠেছিল এক আর্তি। আর তা হলো দেশবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন; এজন্যে তিনি স্বীয় প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন বলে ৭ মার্চের ভাষণ থেকে প্রতীয়মান হয়। আসলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বিবেচনা করেই বঙ্গবন্ধু এ বক্তব্য রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে আরো ঘোষণা করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এক পয়সাও পশ্চিম পাকিস্তানে চালান হতে পারবে না। তাঁর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিরা এদেশ থেকে যাতে অর্থ পাচার না করতে পারে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি এদেশের অনুন্নয়নের কারণ তাঁর বক্তৃতায় নির্দেশ করেছিলেন। আসলে বঙ্গবন্ধুর এই যে বক্তব্য সেখানেও ফুটে উঠেছিল, জনগণের প্রতি তাঁর অক্লান্ত ভালোবাসার কথা। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তা শোষিত বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মনের কথা। যে কোনোভাবেই হোক, বাঙালির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যৌক্তিক। বঙ্গবন্ধু দেশকে ভালোবেসে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ৭ই মার্চে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

বাঙালির নয়নের মণি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে ফুটে উঠেছে দেশের মানুষকে সুবিধা বঞ্চিত রাখা থেকে মুক্তির উপায়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র এই ভাষণকে মোটেও ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে যে কোনোভাবে হোক বাঙালির আগ্রাধিকার ও সামাজিক কল্যাণের উপায় নির্দেশ করেছিলেন। আর তাই তিনি যখন রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ময়দানে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"—তখন তা ঐতিহাসিক রূপরেখা সৃষ্টির কর্মপন্থা বলে দিয়েছিলেন। আসলে এই মুক্তি হচ্ছে পরাধীনতা থেকে মুক্তি; নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উপায় নির্দেশ করে থাকে; ক্ষুধা থেকে মুক্তি; কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপায়—যা মানুষকে নূন্যতম চাহিদা পূরণে

সহায়তা করে আর অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি—যা মানুষকে স্বচ্ছ ও সাম্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে থাকে। নিম্নের চিত্র নং ২—তে মুক্তির বিষয়টি দেখানো হলো :



চিত্র নং : ২

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে, স্বীয় কর্তৃত্ব এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দীপ্ত অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। একই সাথে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার দিক নির্দেশ করে থাকে যা সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করে—যার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ক্ষুধা থেকে মুক্তি। আর তাই যে অধিকার পশ্চিম পাকিস্তানিরা এদেশবাসীকে বঞ্চিত করে নানা ধরনের অপতৎপরতা, ঘৃণ্য কলা-কৌশলের মাধ্যমে হরণ করেছিল, সে অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক এবং স্ট্র্যাটেজিক লিডার হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তাঁর প্রত্যাশা ছিল রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটবে। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন "জয় বাংলা" উচ্চারণের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর এই প্রত্যাশা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পালিত হবে বলে আশা করছি। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনা গ্রোথিত

হয়েছে। আমরা অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ ভাষণের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চার করতে পারি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যাবে ৭ মার্চের ভাষণ থেকে যাবে মহাকালের রথচক্রে। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এ ভাষণ আমাদের বলদৃপ্ত করবে।

তথ্যনির্দেশ

১. ৭ মার্চ ১৯৭০ সালে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা;
২. মোবাশ্বের আলী, বাংলাদেশের সন্ধানে, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

৭ মার্চের ভাষণ : প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য পর্যালোচনা

মামুন সিদ্দিকী

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বাংলার জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা জাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। বায়ান্ন থেকে সত্তর পর্যন্ত সমস্ত গণআন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মনে যে স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ ঘটে এ প্রত্যাশা তারই বহিঃপ্রকাশ। এ প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু হঠাৎ ১ মার্চ আহূত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণায় বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি মোটেও ইচ্ছুক নয়। বরং কী করে এ প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা যায়—এ বিষয়ে চলছিল দূরভিসন্ধি। এর প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে পূর্ববাংলা। ২ মার্চ দেশব্যাপী এবং ৩ মার্চ শুধু ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে হরতাল পালিত হয়। ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় তিনি পূর্ববাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ঘোষিত হয় ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথা। বস্তুত তখন বাঙালির মনে সঞ্চারিত তীব্র ক্ষোভ আরও ঘনীভূত হতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলন ছিল বিপুলভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রেহমান সোবহান এ বিষয়ে মন্তব্য করে লিখেছেন, 'আমার জানা মতে, সাম্প্রতিক ইতিহাসেও আন্দোলনকারী কোনো নেতা বঙ্গবন্ধুর মতো সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পূর্বেই দেশ ও জনগণের ওপর এমন পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আরোপ করতে সক্ষম হননি।' গান্ধী, মাও সেতুং, হোচিমিন, নক্রুমা, সুকর্নো, ক্যাস্ট্রো প্রমুখ নেতার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'এমন ঘটনার কথা আমার জানা নেই, যেখানে

বেসামরিক সরকার ও সিভিল সমাজ উভয়েই ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর থেকে তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং এমন এক ব্যক্তির ওপর আনুগত্য ন্যস্ত করেছে রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর যার কোনো আনুষ্ঠানিক কমাণ্ড নেই। এমন কোনো ঘটনার কথাও আমার জানা নেই, যেখানে ক্ষমতাসীন কিংবা দখলদার শক্তির সামরিক বাহিনীতে কর্মরত একটি জাতিগোষ্ঠীর সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ করেছে এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নেতার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে। ('জাতির পিতার স্মরণে: মার্চ ১৯৭১ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়', *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, মার্চ ২০০৭, পৃ. ১১৫)

এই আনুগত্যের পটভূমি পর্যালোচনা করলে এ সত্যোপলব্ধি হয় যে, বঙ্গবন্ধুর মাঝেই বাঙালিসমাজ বিকাশের পথ চিহ্নিত করতে পেরেছিল। বঙ্গবন্ধুর মধ্য দিয়েই যে মুক্তি সম্ভব এই আস্থা তারা লাভ করেছিল দৃঢ়ভাবে। ফলত বাঙালির জাতীয় জীবনে ৭ মার্চ ছিল মুক্তির দিশারী। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে পাকিস্তান আমলের রাজনীতির পর্যালোচনাপূর্বক বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রত্যেকটি বাঁক উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য তাঁর প্রত্যেকটি কথা বাঙালিকে স্পর্শ করেছিল দারুণভাবে। অর্থ্যাৎ জাতির জীবনে এমন একটি ক্ষণের উন্মেষ হয়েছিল, জনগণ বঙ্গবন্ধুর কাছে এ ধরনের কথা শুনতেই প্রস্তুত ছিল। বস্তুতপক্ষে, স্বাধিকার চেতনার মাধ্যমে বাঙালির মুক্তির আকাঙক্ষা হয়ে ওঠেছিল তীব্র।

এজন্য ঢাকা শহর এবং আশপাশের জেলার বহু মানুষ এসে হাজির হয়েছিলেন সেই ঐতিহাসিক জনসভায়। ৮ মার্চে দৈনিক সংবাদ-এ প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ধানের দেশ, গানের দেশ, পানির দেশ এই পূর্ব বাংলার ছাত্র, শ্রমিক-কৃষক, মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমার, কেরানী-পিয়ন, সকল স্তরের সরকারী বেসরকারী কর্মচারী মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত নারী পুরুষের সেই সমাবেশে ধন-ধান্যে পুষ্পেভরা সুজলা সুফলা পূর্ববাংলা যেন কালবৈশাখীর রুদ্ররূপে ফাটিয়া পড়ে রেসকোর্স ময়দানে। কণ্ঠে তাহাদের মুক্তির গান, বক্ষে তাহাদের স্বাধিকারের অগ্নিশপথ।' তারপর লেখা হয়েছে চৌম্বক বাক্য—'রেসকোর্সে বিক্ষুব্ধরূপে যেন গোটা পূর্ববাংলা উপস্থিত।' সত্যি তাই। নানা শ্রেণিপেশার মানুষের উপস্থিতিই তার প্রতীকী প্রমাণ।

বিদ্রোহী পূর্ববাংলার জনসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত অবয়ব ছিল ৭ মার্চের জনসভা। সভায় উপস্থিতজন ছিলেন কোনো না কোনো সমাজেরই প্রতিনিধি। আর ব্যক্তি কখনো সমাজ বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। রাষ্ট্র ও সমাজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির চিন্তার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। সেই আলোকে তৈরি হয় সমাজমানস এবং আন্দোলন-সংগ্রামের সূত্র। এজন্য ব্যক্তির দিকে তাকালে ভেসে ওঠে সমাজের পুরো অবয়ব। বাঙালি সমাজ সেদিন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ৭ মার্চের ভাষণকে তাদের আত্মার উচ্চারণ হিসেবে মনে করেছিল। নানা মানুষের স্মৃতি ও কথামালার মধ্যে

এ ভাষণ এবং সভার নানামাত্রিক রূপ যেমন ফুটে ওঠতে পারে, তেমনি এর তাৎপর্যের বৈচিত্র্যও পর্যবেক্ষণ করা যায়। সেই ঐতিহাসিক জনসভায় হাজির হয়েছিলেন শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী, কুলবধু, কবি, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক, লেখক, ছাত্র প্রমুখ। ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য এ রকম কয়েকজনের স্মৃতি ও উপলব্ধি সঙ্কলিত হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে। নানাজনের ব্যক্তিমানসে ৭ মার্চের ভাষণ ফেলেছিল অসামান্য আলো। আবার কয়েকজন তাঁদের দিনপঞ্জিতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছিলেন। অনেকে দূরে থেকেও এ ভাষণ সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও বটে। এজন্য এ নিবন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যের আলোকে ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ঐতিহাসিকতা ও অনিবার্যতা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা, অসহযোগ আন্দোলন, জনতার অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম প্রভৃতির পটভূমিতে ৭ মার্চের ভাষণ ছিলো বিশেষ গুরুত্ববহ। এর ওপর নির্ভর করছিল পরবর্তী আন্দোলনের ধারা ও কৌশল। ৭ মার্চ জনসভার জন্যে দলীয় অবস্থান বিবেচনার উদ্দেশ্যে ৬ মার্চ শেখ মুজিবের বাসভবনে আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করা হয়। কামাল হোসেন এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'সারা দেশে প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল যে ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত ছাত্র ও যুবসমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে কেবল স্বাধীনতাই একটি গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য হতে পারে। এটা পরিষ্কার ছিল যে, ছাত্রসমাজ, যুবসম্প্রদায় এবং রাজনীতিসচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়দায়িত্বের ভার ছিল শেখ মুজিব এবং দলের ওপরই ন্যস্ত। ৭ মার্চ স্বাধীনতা-ঘোষণার সম্ভাব্য সার্বিক ফলাফল তাই সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন ছিল।' (*মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, মে ১৯৯৯, পৃ. ৬১)।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন স্বাভাবিক কারণে তা ছিল প্রত্যাশিত। সাধারণ্যে বিশেষত ছাত্র-যুবাদের মধ্যে এ কাঙক্ষা ছিল তীব্র। কিন্তু বঙ্গবন্ধু গভীর প্রজ্ঞা দিয়ে অনুভব করেছিলেন বাস্তব অবস্থা। স্থিরপ্রত্যয় রাজনীতিকের মতো তিনি তাঁর লক্ষ্যে ছিলেন অবিচল। আশ্চর্য সংযম ও ভারসাম্যপূর্ণতায় মুক্তির সমুদয় পথ বাতলে দিয়েও প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

৭ মার্চের ভাষণের প্রত্যক্ষ শ্রোতা আমীর-উল ইসলাম ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরে লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে বসে রেসকোর্স ময়দানে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার বক্তব্য শুনছিলাম। সেদিন তার বক্তব্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির পথ নির্দেশ

করেন। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ, ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে তিনি একটি ইতিহাস আবৃত্তি করেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের কথা উল্লেখ করেন, বাঙ্গালী জাতিকে মরণপণ যুদ্ধের প্রস্তুতির আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণী শোনান। বক্তৃতা একদিকে ছিল যেমন আবেগময়ী অপরদিকে ছিল নির্ভুল যুক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ী।... ৭ই মার্চের বক্তৃতা এক অনন্য বক্তৃতা, যার সাথে পৃথিবীর অন্য কোন বক্তৃতার তুলনা চলে না। তাই বাঙ্গালী জাতি যতদিন বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকবে ততদিনই এই বক্তৃতার দ্বারা আলোড়িত হবে। বাঙ্গালী জাতির জীবনে এই বক্তৃতা অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে।' (*মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকা: কাগজ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৬, ৭)। এ বক্তব্যে ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতির ওপর নির্যাতন ও নিষ্পেশনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এই ক্ষোভ ছিল সামগ্রিকভাবে বাংলার জনগণের। এই বক্তৃতা যে বাঙালিকে মুক্তিপথে উদীপ্ত করবে—সে-প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

আলমগীর সাত্তারের স্মৃতিচারণে ফুটে ওঠেছে তারুণ্যের উপস্থিতি। সেদিনের পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, '৭ মার্চ সকাল থেকেই ঢাকা শহরে উত্তেজনাকর একটি পরিবেশ বিরাজ করছিল। মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনাও লক্ষ করা যাচ্ছিল। দুপুর তিনটায় রেসকোর্স ময়দানের জনসভা শুরু হবার কথা। সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে জনগণ মিছিল করে আসতে শুরু করলো। ঢাকার বাইরে থেকেও লক্ষ লক্ষ লোক এতে যোগ দিয়েছিল। মিছিলের অধিকাংশ লোকজনের হাতে ছিল লাঠিসোঁটা। বৈঠাসহ মাথায় করে নৌকাও বহন করছিল অনেকে। সেখানে আগত সবারই স্লোগান ছিল বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে।... দুপুর দুটোর দিকে ক্যাপ্টেন আলমগীর, রফি, শাহাব, আকরাম, মফিদুল, হালিমসহ আমরা সবাই দল বেঁধে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হলাম। বঙ্গবন্ধুর যে মঞ্চ থেকে ভাষণ দেয়ার কথা, সেখান থেকে অনেক দূরে আমরা বসার জায়গা পেয়েছিলাম। সেদিন এই ময়দানে কতো লোকের সমাগম হয়েছিল সঠিক করে সেটা বলা সম্ভব নয়। কেউ বলবেন দশ লক্ষ, কেউ বলবেন তারও বেশি। ৭ মার্চের রেসকোর্সের জনসভার দৃশ্য যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।' (*সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৪৮, ৪৯)। ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল, ঢাকার বাইরে থেকে লোকজনের আগমন ৭ই মার্চের ভাষণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেরই অনুপম সাক্ষ্য এ স্মৃতিভাষ্য।

পান্না কায়সার ৭ মার্চের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে। সেদিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন, 'হাজার হাজার জনতার ভিড় জমতে থাকল দুপুর থেকে। জনতার হাতে লাঠি, বল্লম, লোহার রড। ৭ই মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক ভাষণ। সেদিন ও আমাকে নিয়ে যাবার জন্য

গোঁ ধরল—'তোমার জীবদ্দশায় এমন ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হবে না। চল, কিছুক্ষণ থেকে চলে এসো। আমার ছেলে তার জন্মের আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনবে। তোমার জীবনে এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

সেদিন ওকে 'না' বলতে পারলাম না। শাশুড়ির নিষেধ সত্ত্বেও অসুস্থ শরীরে রেসকোর্স ময়দানে চলে গেলাম ওর সঙ্গে।

এক অপূর্ব দৃশ্য! আজও আমার চোখে ভাসে। উত্তাল জনসমুদ্র। আমরা কাছে ভিড়তে পারলাম না। অনেক দূরে গাড়িতে বসেই ভাষণ শুনলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বরে সেদিন আগুন ঝরল। অগ্নিকণ্ঠে দৃপ্ত প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের।... অবিরাম করতালির মধ্যে ভেসে আসছে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। জনতার শিরায় শিরায় জ্বলে উঠল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বহ্নিশিখা। মুক্তিপাগল জনতা লাঠিতে লাঠিতে আঘাত করে ঝনঝনিয়ে তাদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে যাচ্ছে।... জনতা স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বোধিত হলো। জাতীয় সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির মনে এক দীপ্ত কঠিন প্রত্যয় জন্ম নিল।' (*মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ১১৯, ১২০)। এ স্মৃতিচারণের গুরুত্ব এখানে যে, মুক্তিকামী মানুষ লাঠিতে লাঠিতে আঘাত করে ঝনঝনিয়ে তাদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করছে, যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে চেখে নিতে চাচ্ছে শক্তির বহর। ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে সেই প্রস্তুতি আরও ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠেছিল।

নির্মলেন্দু গুণ ভাষণটির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। লিখেছেন, '৭ মার্চের ভাষণটিকে কেউ কেউ আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণটি গেটিসবার্গ এ্যাড্রেসের চাইতেও এগিয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন কালজয়ী নেতা প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ শ্রবণের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখেই আমি বলি, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের চেয়ে সুভাষণ আমি শুনিনি।' (*আত্মকথা* ১৯৭১, ঢাকা: বাংলা প্রকাশ, মে ২০০৮, পৃ. ৪৮)। যে পরিস্থিতিতে, যে অবস্থায় ৭ মার্চের ভাষণ, তা বিশ্বের অন্যান্য বিখ্যাত ভাষণ থেকে পৃথক হওয়ারই কথা।

সেদিন রেসকোর্স ময়দানে জনতা সমবেত হয়েছিলেন প্রাণের তাগিদে। যেন কী জানি কী এক আকর্ষণ, কী জানি কী জাদুমন্ত্রে পেয়ে বসেছিল সবাইকে। এ থেকে বাদ পড়েননি কবি সুফিয়া কামাল। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি দিনপঞ্জিতে লিখেছেন, 'মার্চ ৭, রবিবার—রাত ৯টা: সকাল থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ময়দানে (ঘোড়দৌড় ময়দানের নাম বর্তমানে এটি) লোকজন জমা হচ্ছে। ১ টার সময় তাড়াহুড়া করে আমরাও রিকশা করে গিয়ে পৌঁছলাম। মঞ্চের সামনেই স্থান পেলাম। মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকারা বল্ল, বসুন আপনি আমাদের নিজের লোক, মনের মানুষ কাছের মানুষ। এমএনএ'রা গিয়ে দূরে চেয়ারে বসুন। অন্তরটা জুড়িয়ে গেল

শুনে। আমি দেশের মানুষের মনের মানুষ। একী কম ভাগ্যের কথা। ৩ টা ২০ মিনিটে মুজিব এলেন বিমর্ষ মলিন মুখে। সৈন্যবাহিনী সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে তিনি অধিবেশনে যোগ দিবেন না। রেডিওতে তার বক্তৃতা রিলে করে দেওয়া হলো। তিনিও অফিস আদালত স্কুল কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখতে বললেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে সভা শেষ করলেন।' (*একাত্তরের ডায়েরি*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৭, ১৮)। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের কথা, মুক্তিসংগ্রামে আহ্বানের কথা এখানে প্রত্যয়দীপ্ত হয়েছে। রেডিওতে ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সামরিক ছাউনির ইঙ্গিতে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে বেতারকর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেন। বাধ্য হয়ে পরদিন ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও কৌশল বিশ্লেষণ করেছেন। লিখেছেন, 'বাংলার নদ-নদী পদ্মা-মেঘনা-যমুনা মধুমতি যেমন চতুর্দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে ধাবমান—তেমনি ঢাকা নগরীর সকল রাস্তার জনপ্রবাহ রেসকোর্স অভিমুখী। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য—যা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সকলের মতো আমিও বন্ধুবান্ধবসহ সভায় গিয়েছিলাম। তখনকার সংবাদপত্রের ভাষ্যমতে সভার জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষের উপর। তখন ঢাকার জনসংখ্যা পনের লাখের বেশি নয়। অর্থাৎ গৃহবধূ ও শিশুরাই শুধু বাড়িতে ছিল। এছাড়া প্রায় সকলেই সভায় যোগ দিয়েছে। অবশ্য মফস্বল এলাকা থেকে বহু সংখ্যক মানুষ এবং ঢাকা শহরের বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা শ্রোতা সমাবেশে ছিলেন। এই মহাসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত সংযত অথচ ইস্পাতকঠিন বক্তব্য ছিল সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি।...তার নির্বাচিত শব্দচয়ন এবং কণ্ঠের প্রাণস্পর্শী আবেগ জনগণকে কঠিন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করল অথচ ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করার মতো হঠকারী উদ্যোগ থেকে নিবৃত্ত করল। 'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি' তা হলে কী করতে হবে—তাও তিনি বলে দিলেন। কার্যত ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার কৌশলী ঘোষণা।' (*মুক্তিসংগ্রাম ও মহানায়ক*, ঢাকা: মুক্তদেশ, আগস্ট ২০১০, পৃ. ১৪, ১৫)। এ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, রেসকোর্সকে তিনি সর্বমানবের মিলনস্থল হিসেবে নদী ও সাগরের সঙ্গে প্রতিতুলনা করেছেন। আবার জনগণকে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেও সেনানিবাস ঘেরাওয়ের হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেয়ার বিচক্ষণতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয়বহ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। আবার সমস্ত দিকনির্দেশনা তিনি প্রদান করেছেন আকারে, ইঙ্গিতে ও আভাষে।

সরদার ফজলুল করিমের কণ্ঠে ফুটে ওঠেছে আবেগঋদ্ধ বক্তব্য। ৭ মার্চের ভাষণ ভালভাবে শোনার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেছিলেন। লিখেছেন, 'সব

অফিসই হয়ে উঠেছিল আন্দোলনের কেন্দ্র। বাঙালীর সংগ্রামের আলোচনার স্থান। বঙ্গবন্ধুর মিটিং দেখতে হবে। কোন জায়গা থেকে সে দৃশ্যকে ভাল করে দেখা যাবে? সেকি বাংলা একাডেমীর ছাদে উঠে? না রেসকোর্সের ভিতরে গিয়ে। মঞ্চের কাছে যাব না একটু দূরে থাকবো? কাছে যাবোই বা কেমন করে?

আজকের কথা নয়। কিন্তু সেদিনও তো বয়স কম হয়নি। ৪৫ তো পেরিয়ে গেছে। এ বয়সে কি রেসকোর্সের মঞ্চের পশ্চিম দিকে যে গাছগুলো আছে তার ডালে চড়া যায়। তা যায় না। আর সেখানে দুপুরের মধ্যেই তো মানুষের মাথায় ভরে গেছে। বাংলা একাডেমীর ছাদে চড়ে দেখলাম পুরো দৃশ্যটা পাওয়া যায় না। ছাদ থেকে নেমে এলাম সেই জনসমুদ্রের দিকে দক্ষিণ দিকের মন্দিরের পুকুর পর্যন্ত ২টার মধ্যেই লোকে ভরে গেছে। জনসমুদ্রের মধ্যে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এগুলাম মঞ্চের দিকে। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা হতে উত্তোলিত হাতে ইশারায় মনের আনন্দ আর আবেগকে প্রকাশ করতে চাইলাম।' ('চলো '৭১এর মার্চে ফিরে যাই', মো. মাজহারুল ইসলাম মজুমদার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু মুক্তিসংগ্রাম স্বাধীনতা*, ঢাকা: বুক ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৭০, ৭১)। প্রত্যেক অফিস যে অসহযোগ আন্দোলনে প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠেছিল তাঁর বক্তব্যে খুব স্পষ্ট। গাছে চড়ে ভাষণ শুনার যে বাসনা তাতে বুঝা যায়, এ ভাষণকে নিয়ে কী বিপুল আবেগ তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিপুল জনসমুদ্রে এক বিন্দু জলের মতো তিনি মিশে গিয়েছিলেন।

৭ মার্চের ভাষণ শোনার জন্য রেসকোর্স ময়দানে গমন সাংবাদিকদের জন্য ছিল খুব স্বাভাবিক। সংবাদসংগ্রহের পাশাপাশি চলছিল গভীর পর্যবেক্ষণ। সেই পর্যবেক্ষণে ভাষণের নতুন তাৎপর্য খোঁজা যেতে পারে। সেদিনের স্মৃতিচারণ করে সাংবাদিক কামাল লোহানী লিখেছেন, 'আমি বন্ধু আতাউস সামাদ, সালিমুল্লা, মহাদেব সাহাসহ রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে হাজির হলাম। চতুর্দিক দিয়ে মিছিল করে রেসকোর্সের লোক আসছে। মিছিল আসছে ধানমণ্ডি থেকে, একটা লালবাগ থেকে আসছে, একটা নাজিম উদ্দিন রোড থেকে আসছে, একটা প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড থেকে, একটা সিদ্ধেশ্বরী থেকে আসছে। এভাবে চতুর্দিক দিয়ে লোক রেসকোর্সে মিছিল করে পায়ে হেঁটে আসছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এ গণআন্দোলনকে বেগবান করার জন্য যে যা পেরেছে হাতে নিয়ে এসেছেন। মানুষ দল বেঁধে স্লোগান দিতে দিতে রেসকোর্সে আসছেন। কেরানীগঞ্জের সাহসী মানুষ আসছিলেন লাঙ্গল কাঁধে, বুড়িগঙ্গার নৌকার মাঝি বৈঠা হাতে। শহরের ছাত্র, যুবক, শ্রমিক জনতা ছুটে আসছেন।

মনে আছে, সকাল থেকে বিকেল দুটো তিনটে পর্যন্ত লোকে লোকে রেসকোর্স ছেয়ে গেল। মঞ্চটা করা হয়েছিল এখন যেখানে শিশুপার্ক সেইখানে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে মানতে হবে ৭ই মার্চ স্মরণীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন।' (*রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলা বেতার*, ঢাকা:

ভূমিকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৭৬)। এ স্মৃতিচারণ নব তাৎপর্যে মণ্ডিত এজন্য যে, তিনি দেখেছেন, কেরানীগঞ্জের সাহসী মানুষ আসছিলেন লাঙ্গল কাঁধে, বুড়িগঙ্গার নৌকার মাঝি বৈঠা হাতে। এই দুইটি চিত্রকল্প ৭ মার্চের ভাষণের জনলগ্নতার পরিচয়বহ।

সাংবাদিক আতিকুর রহমানও বিশেষভাবে মার্চের দিনগুলি পরখ করছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রেসক্লাব থেকে রেসকোর্সের মাঠে যাই আমরা কয়েকজন এক সাথে। তার মধ্যে ছিলেন নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী (প্রয়াত), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (লণ্ডন প্রবাসী), কামাল লোহানী, মহাদেব সাহা। চারপাশ থেকে জনতার ঢল যাচ্ছিল ময়দানের দিকে। ঢাকা নগরী মুখরিত শ্লোগানে শ্লোগানে। ময়দানের পূর্ব দিকে পৌঁছে দেখি জনসমুদ্র অধীরভাবে সবাই অপেক্ষা করছে। বঙ্গবন্ধু তখনো আসেননি। কিছুক্ষণ পর তিনি এসে পৌঁছালেন—ভাষণ দিলেন। তার জীবনের সেই স্মরণীয় ভাষণ। এবং বাঙালি জীবনেরও। রেকর্ডে তাঁর সেই ভাষণ "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" শুনলে এখনো চোখে ভাসে সমস্ত মাঠের আশেপাশের দৃশ্য। নৌকা বৈঠা, পতাকা, লাঠি সবার হাতে। জনতা উত্তেজিত, কিন্তু সন্তুষ্ট তার ভাষণে যেন তাদের মনের কথাটাই তিনি বলে দিয়েছেন।' (*মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত কথা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৩৯)। আতিকুর রহমানের পর্যবেক্ষণ এই যে, মুক্তিকামী জনতা মুক্তির জন্য উদ্বেলিত। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে দিক-নির্দেশনা শুনে সন্তুষ্ট। কারণ, ভাষণে তাদের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭ মার্চের জনসভায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছিল চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ। এ পরিষদের হয়ে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সদলবলে ঐতিহাসিক সভায় যোগদান করেছিলেন। স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন, 'আমরা বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আগের দিনই সবাইকে জানিয়ে দেই ৭ই মার্চের জনসভায় দলে দলে যোগ দেয়ার জন্য।

৭ মার্চ সকাল থেকেই দেখলাম লোকজন রেসকোর্সের দিকে আসা শুরু করেছেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে জনস্রোত বইতে শুরু করলো রেসকোর্সের দিকে। আমার মনে হলো একটি মিছিলই রেসকোর্সের দিকে যাচ্ছে। যে মিছিলের কোন শেষ নেই। আসলে হয়েছিল কি, বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য মিছিল আসতে আসতে একটির পরে আরেকটি মিছিল মিলে সব মিছিল একটি মিছিলে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল।

আমি আজিমপুরে আমার বাসা থেকে শিল্পী নিতুন কুণ্ডুকে নিয়ে দুপুরে আর্ট কলেজের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম। আর্ট কলেজে সব শিল্পী সমবেত হয়ে জনসভায় যাবো। পলাশির মোড়ে এসে দেখি অসংখ্য মানুষ ধেয়ে যাচ্ছে

রেসকোর্সের দিকে। সামনেই পড়লো এসএম হল, তখন এসএম হলের সামনের দিকে লোহার রডের বেড়া ছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা রেসকোর্সের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই বেড়ার লোহার রড খুলে নেয়া শুরু করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব রড হাতে-হাতে চলে গেলো।

রেসকোর্সে এসে দেখি প্রায় সবার হাতে লাঠি, বাঁশ, লোহার রড ইত্যাদি। ভেবে পেলাম না ঢাকা শহরে এতো লোক এলো কোত্থেকে। পুরো রেসকোর্স যেন জনসমুদ্র। অথচ কোন বিশৃংখলা নেই। এমন ঐক্য জীবনে দেখিনি, সবার মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা, ক্ষোভ। সবাই হাতের লাঠি উঁচু করে ধরে রেখেছে। জনতার প্রস্তুতি দেখে মনে হলো যদি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন তবে এসব লাঠি-রড নিয়েই জনতা সরাসরি এই এই জনসভা থেকে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করবে। এসব কথা আলোচিত হচ্ছিল জনসভায়। অনেকেই ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী লোকেরা এ জন্য চাপও দিচ্ছিল। পাশাপাশি একথাও জনসভায় আলোচনা হচ্ছিল যে, যদি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ফেলেন তবে পাকবাহিনী বোমা ফেলতে পারে রেসকোর্সের জনসভায়। আর্মি সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর রটে গেল। ফলে একটু ভীতিও দেখা দিয়েছে কিছু কিছু লোকের মধ্যে।

বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং আবেগমাখা একটা বক্তৃতা দিলেন। এতদিন পর এখনও মনে হয় সে সময়ের নিরিখে এর চেয়ে সুন্দর বক্তৃতা আর হতে পারে না। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত সুচিন্তিত ছিল। একথা তো আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবো যে, আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সঠিক ছিল। অতি উৎসাহীদের কথায় সিদ্ধান্ত নিলে পরিস্থিতি এমন না হবার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সবাইকে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করলো। মানুষের উদ্দীপনা দেখে মনে হলো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এই জনতা জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।... এই ঘোষণাতেই বঙ্গবন্ধু জনতাকে বুঝিয়ে দেন আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতা।' (কাইয়ুম চৌধুরী, 'মনে হল জীবনের চূড়ান্ত সময় উপস্থিত', আনোয়ার ফরিদী (সম্পা.), *অতন্দ্র একাত্তর*, ঢাকা: মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কমাণ্ড, মার্চ ১৯৯৭) উপর্যুক্ত স্মৃতিচারণে অসহযোগ আন্দোলনে শিল্পী-সংগ্রামীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, জনতার অপ্রতিরোধ্য মনোভাব, বঙ্গবন্ধুর কৌশলী বক্তৃতার প্রশংসা করে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

৭ই মার্চের ভাষণ শোনার জন্য সেলিনা হোসেন ছিলেন উদগ্রীব। তিনি বলেছেন, '৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য রেসকোর্সে যাবো। অস্থির সময় কাটে। অপেক্ষার সময় যেন দীর্ঘ হয়ে যায়। আমার মনে আছে এলিফ্যান্ট রোড থেকে রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পর্যন্ত এমন জনস্রোত আর দেখিনি। কোনো রিক্সা তো ছিলোই না। মানুষ পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলো রেসকোর্স

ময়দানে। মেয়েদের জন্য আলাদা জায়গা ছিলো মঞ্চের কাছাকাছি। সে জায়গাটিকে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করে আলাদা করা হয়েছিলো। সেখানে অনেকের সাথে বসেছিলাম। বেগম সুফিয়া কামালও ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই উত্তাল উদ্দীপিত ভাষণ যখন চলছে—তখন মাথার ওপর পাকিস্তানি হেলিকপ্টার ঘুরছে। কেউ কেউ মনে করছিলেন এই জনসমুদ্রে পাকিস্তানি সরকার বোম্বিং করবে কি না। সেটারও একটা আশঙ্কা ছিলো। কিন্তু দেখা গেলো তারা সে সাহস করেনি। ভাষণ শেষ হবার পরে হেলিকপ্টারগুলো চলে যায়। সেদিনের কথা ভাষায় বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এত গভীর, এত প্রত্যয়দীপ্ত সময় বুঝি আমাদের ভীষণ প্রত্যাশিত ছিলো।' (সাক্ষাৎকার, সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ নারী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, মার্চ ২০০৭, পৃ. ২৪০, ২৪১)। এ স্মৃতিচারণে লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সময় পাকিস্তানি হেলিকপ্টার ঘুরছিল। বিপুল জনসমুদ্র দেখে অপশক্তি যে ঘাবড়ে দিয়েছিল, এ স্মৃতিচারণে তা স্পষ্ট। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের বহুল প্রত্যাশিত ক্ষণ ছিল ৭ মার্চ—এ সত্য এখানে উচ্চারিত হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। এ মত খণ্ডন করে নূরজাহান বোস বলেছেন, ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার ঘোষণারই নামান্তর। তিনি রেসকার্সে গিয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ স্বদেশ বোসের সমভিব্যাহারে। স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর সেদিনের বক্তৃতায় আমরা রোমাঞ্চিত। চমৎকার বক্তৃতা। তিনি বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেদিনই তো উনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তারপরও এতোদিন পরে অনেকে বলে স্বাধীনতার ঘোষণা উনি দেননি বা স্বাধীনতা উনি চাননি। এ কথা ঠিক না। একেবারেই ঠিক না। সেদিনের বক্তৃতা যারা শুনেছেন তারা জানেন প্রকৃতপক্ষে সেদিনই উনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। (সাক্ষাৎকার, সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১: নারী : প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ২০০৭, পৃ: ২২০)।

৭ মার্চের ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী জহিরুল ইসলাম স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, 'ফার্মগেট হয়ে রেসকোর্স যাবার পথে জনতার ঢল নেমেছে। জনতার স্রোত একমুখী, গন্তব্য রেসকোর্স ময়দানে। রেসকোর্স ময়দান যেন আজ তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার লোক যাচ্ছে। আজ মানুষ মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই হেঁটে চলছে। প্রায় সবারই হাতে লাঠিসোঁটা জাতীয় কিছু একটা নিয়ে যাচ্ছে। জনতা যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। অস্ত্রের মধ্যে লাঠিই প্রধান। কেউ বেত, গুলতি ইত্যাদি নিয়েও যাচ্ছে। যারা কোন কিছু নিয়ে বের হয়নি তারা রাস্তা থেকে কিছু একটা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। গাছের ডাল, বেড়ার খুঁটি ইত্যাদি সংগ্রহ করছে। কয়েকজনকে দেখলাম একটি বড় কাঠের তক্তা নিয়ে যাচ্ছে। এটি দেখে আমরা হেসে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম,

—ও ভাই এই তক্তা দিয়ে কি হবে?

ওরা একটু লজ্জা পেল। এক জন বলল,

—বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছেন। রেসকোর্স যেতে হবে। হাতিয়ার কিছু নিয়ে ঘর থেকে বের হইনি। রাস্তায় তেমন সুবিধা মতো কিছু পেলাম না। তাই কয়েকজনে এই তক্তাটাই নিয়ে যাচ্ছি। খালি হাতে যাওয়ার চেয়ে এটি ভাল হয়নি? সে আমাদের ওদিকে উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।...

সভা শুরুর বেশ কিছু সময় আগে রেসকোর্সে পৌঁছানোর ফলে আমরা মঞ্চ থেকে প্রায় ৩০০ গজ দূরে বসার জায়গা পেলাম। চারদিকে থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল যোগ দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মিছিলের ঢেউ এসে মিশে যাচ্ছে সভাস্থলের জনসমুদ্রে। চারিদিক থেকে শুধু শ্লোগান আর শ্লোগান...আনুমানিক সোয়া তিনটায় বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চে উঠলেন। চারদিক থেকে গগনবিদারী শ্লোগান উঠল- জয় বাংলা- জয় বঙ্গবন্ধু, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর। তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা। লক্ষ লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে লাঠি বৈঠা ইত্যাদি উঁচু করে তুলে ধরে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করল। বঙ্গবন্ধু হাত উঠালেন। জনতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য একদম চুপ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে তার ঐতিহাসিক ভাষণ শুরু করলেন।... বঙ্গবন্ধুর আজকের ভাষণটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে এবং তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। ভাষণ শেষ হতেই উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে তাদের হাতের লাঠি উঁচু করে ধরে গগন-বিদারী শ্লোগানে রেসকোর্স ময়দান মুখরিত করে তুলল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আমার রক্তেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।' (*একাত্তরের গেরিলা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৭-১৯)। এখানে ৭ মার্চের ভাষণের তিনটি তাৎপর্য লক্ষণীয়। প্রথমত প্রতিরোধের তীব্রতা, সবারই কিছু না কিছু নিয়ে সভায় উপস্থিতি, দ্বিতীয়ত বঙ্গবন্ধুর ডাকের অমোঘতা, তৃতীয়ত ভাষণের মধ্য দিয়ে জনতার মনে আগুন ধরার কথা। এই তাৎপর্যময় মুক্তির অনন্য সোপান।

জাহানারা ইমাম তাঁর দিনপঞ্জিতে ৭ মার্চের ভাষণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। একদিনের ঘটনার মধ্যে একই সঙ্গে অনেক বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। বিস্তৃত সত্ত্বেও এখানে পুরো বিবরণ উদ্ধৃত করা হলো :

'আজ বিকেলে রমনা রেসের মাঠে গণজমায়েত। গত ক'দিন থেকে শহরের সবখানে, সবার মধ্যে এই জনসভা নিয়ে তুমুল জল্পনা-কল্পনা, বাকবিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক। সবাই উত্তেজনায়, আগ্রহে, উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় টগবগ করছে। আমি যদিও মিটিংয়ে যাব না, বাসায় বসে রেডিওতে বক্তৃতার রিলে শুনব, তবুও আমাকেও এই উত্তেজনার জ্বরে ধরেছে।

এর মধ্যে সুবহান আমাকে জ্বালিয়ে মারল। আজ তাড়াতাড়ি রান্না সারতে বলেছিলাম। শরীফ বলেছে বারোটার মধ্যে খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবে। ঠিক দেড়টাতে রওনা দেবে, নইলে কাছাকাছি দাঁড়াবারও জায়গা পাবে না। আর সুবহান হতচ্ছাড়াটা এগারোটার সময় গোশত পুড়িয়ে ফেলল। বারেককে

দিয়েছিলাম রুমী জামীদের সার্ট ইস্ত্রি করতে। সুবহান চুলোয় গোশত রেখে বারেকের সঙ্গে ইস্ত্রি করাতে মেতেছে। তিনিও আজ শেখের বক্তৃতা শুনতে যাবেন, তাই তার নিজের প্যান্ট সার্ট ইস্ত্রি তদারকিতে যখন মগ্ন, তখন গোশত গেছে পুড়ে। কি যে করি ওকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি ডিমের অমলেট করে ডাল-ভাজিসহ ভাত দিলাম শরীফদের।

এতবড় কাণ্ড করে, এত বকা খেয়েও সুবহানের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। রান্নাঘরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে প্যান্ট-সার্ট পরে তিনি শরীফদের সঙ্গে চললেন শেখের বক্তৃতা শুনতে।

আজ বারেকও গেছে ওদের সঙ্গে। এর আগে কোনো মিটিংয়ে যেতে দিইনি ওকে। আজকে না দিলে বড় অন্যায় হবে।

কিটির ঘরে গিয়ে ওর বারো ব্যান্ডের দামী রেডিওটা চেয়ে নিয়ে উপরে গেলাম। ওকেও আসতে বললাম আমার ঘরে। বাবা দুপুরের খাওয়ার পরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন।

আমি রেডিওটা নিয়ে আয়েশ করে বিছানায় শুলাম। একটু পরে কিটিও এল। রেডিও অন করে রেখেই দু'জনে শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগলাম।

রেডিওতে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা শোনা গেল। আমরা কথা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। ওমা! তারপর আর শব্দ নেই। কি ব্যাপার? শব্দ নেই তো নেই-ই। কারেন্ট গেল? বাতির সুইচ টিপে দেখলাম কারেন্ট আছে। রেডিওটা খারাপ হল? নব ঘুরিয়ে দেখলাম অন্য স্টেশন ধরছে। তাহলে?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললাম, 'চল ছাদে যাই তো।'

দু'জনে ছাদে গেলাম। পুবদিকে সোজাসুজি মাপলে মাত্র আধ মাইল দূরে রেসের ময়দান। নানা রকম শ্লোগানের অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে। আকাশে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার কেন? কি ব্যাপার?

ব্যাপার সব জানা গেল শরীফরা মিটিং থেকে ফেরার পর।

কলিং বেলের শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই রুমী দুই হাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল। দেখি ফখরুদ্দিনও এসেছেন। ফখরুদ্দিন—সংক্ষেপে ফকির, শরীফের স্কুল জীবনের বন্ধু। তার পেশা ব্যবসা আর নেশা রাজনীতি, যদিও কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য তিনি নন। তবে রাজনৈতিক অঙ্গনের খবরাখবরে তার চেয়ে ওয়াকিবহাল আমাদের জানার মধ্যে আর নেই।

সোফায় ধপ করে বসে পড়ে ফকির বললেন, 'ভাবী, চা খাওয়ান। এক সঙ্গে তিন কাপ গলা শুকিয়ে কাঠ।'

'চেহারাও তো শুকিয়ে কাঠি। কি করে বেড়ান আজকাল? খান না নাকি?' শরীফ মুচকি হেসে বলল, 'নেতাদের লেজ ধরে দৌড়াদৌড়ির চোটে ওর নাওয়া-

খাওয়ার ফুরসত নেই।' সুযোগ পেয়েই শরীফ ফকিরের পেছনে লাগে। আমি সুবহানকে চায়ের হুকুম দিয়ে সোফায় বসলাম, 'ওসব লেগ-পুলিং এখন রাখ। মিটিংয়ের কথা বল। রেডিও বন্ধ হয়ে রয়েছে কেন? আকাশে হেলিকপ্টার দেখলাম যেন।'

রুমী বলল, 'হেলিকপ্টার তো পয়লা তারিখের পল্টন জনসভাতেও ছিল। ওরা বোধহয় গার্ড অব অনার দেওয়ার রেওয়াজ করেছে।'

সবাই হেসে উঠল। ...

রেসকোর্স মাঠের জনসভায় লোক হয়েছিল প্রায় ত্রিশ লাখের মতো। কত দূর-দূরান্তর থেকে যে লোক এসেছিল মিছিল করে, লাঠি আর রড ঘাড়ে করে—তার আর লেখাজোখা নেই। টঙ্গী, জয়দেবপুর, ডেমরা—এসব জায়গা থেকে তো বটেই, চব্বিশ ঘন্টার পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে ঘোড়াশাল থেকেও বিরাট মিছিল এসেছিল গামছায় চিড়ে-গুড় বেঁধে। অন্ধ ছেলেদের মিছিল করে মিটিংয়ে যাওয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। বহু মহিলা, ছাত্রী মিছিল করে মাঠে গিয়েছিল শেখের বক্তৃতা শুনতে।

'কিন্তু শেখ নিরাশ করেছে সবাইকে'। রুমীর একথায় সবচেয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন ফকির, 'তোমার মাথা গরম, চ্যাংড়া ছেলেরা কি যে বল না—ভেবেচিন্তে—শেখ যা করেছে, একদম ঠিক করেছেন।'

সেটি পুরনো বাকবিতণ্ডা—যা গত কয়েকদিন ধরে সর্বত্রই শুনছি। একদল চায় শেখ স্বাধীনতার ঘোষণা দিন—আরেক দল বলছে তাহলে সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হবে।

রুমী তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলাতেই দৃঢ়তা এনে প্রতিবাদ করল, 'আপনারা দেয়ালের লিখন পড়তে অপারগ। দেখেন নি আজ মিটিংয়ে কত লাখ লোক স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে এসেছিল? জনগণ এখন স্বাধীনতাই চায়, এটা তাদের প্রাণের কথা। নইলে মাত্র এই ছ'দিনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবাই সবখানে স্বাধীন বাংলার ঐ রকম ম্যাপ লাগানো পতাকা সেলাই করার মত একটা জটিল কাজ, অন্যসব কাজ ফেলে, করে সেটা আবার বাতাসে নাড়াতে নাড়াতে প্রকাশ্য দিবালোকে মিছিল করে যায়?'

তর্কের গন্ধ পেলে তর্কবাগীশ ফকির সর্বদাই চাঙ্গা, তিনি বললেন, 'তুমিও দেখছি চার খলিফার দলের।'

রুমি বলল, 'আমি কোনো দলভুক্ত নই, কোনো রাজনৈতিক দলের শ্লোগান বয়ে বেড়াই না। কিন্তু আমি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, মান-অপমান জ্ঞানসম্পন্ন একজন সচেতন মানুষ। আমার মনে হচ্ছে শেখ আজ অনায়াসে ঢাকা দখল করার মস্ত সুযোগ হারালেন।'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'এই সুদূরপ্রসারী তর্ক শুরু করার আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই ছোট্ট একটা খবর। শেখের বক্তৃতা রিলে করা হবে বলে সারা দিন রেডিওতে অ্যানাউন্স করেও শেষ পর্যন্ত রিলে করা হল না

কেন? কেনই বা রেডিও একদম ডেডস্টপ? এইটে শোনার পর আমি রান্নাঘরে চলে যাব। তখন তোমরা মনের সুখে সারারাত কচকচ কোরো।'

'শেখের বক্তৃতা রিলে করার জন্য বেতার-কর্মীরা তো তৈরিই ছিল। শেষ মুহূর্তে মার্শাল ল অথরিটি বক্তৃতা রিলে করতে দিল না। ব্যস, অমনি রেডিও স্টেশনের সমস্ত কর্মীরা হাত গুটিয়ে বসল। শেখের বক্তৃতা রিলে করতে না দিলে অন্য কোনো প্রোগ্রামই যাবে না। তাই রেডিও এরকম চুপ।'

জামী এতক্ষণ একটা কথা বলেনি, এখন হঠাৎ বলে উঠল, 'জান মা, আজ বিকেলের প্লেনে টিক্কা খান ঢাকায় এসেছে গভর্ণর হিসাবে।'

এক সপ্তাহ দুইবার গভর্নর বদল। এক তারিখে ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে বদলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে দেওয়া হয়েছিল, এখন আবার ছ'দিনের মাথায় তাকে সরিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে আনা হল। কি এর আলামত?

আজ রাতে রেডিও আর গলাই খুলল না।' (*একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, জুন ২০০৫, পৃ. ২১-২৩)

জাহানারা ইমামের ৭ মার্চের দিনপঞ্জিতে পুরো দিনের এবং সেই ভাষণ ও সভার কয়েকটি দিক বিশেষভাবে ফুটে ওঠেছে। প্রথমত ৭ মার্চের সভায় যোগদানের অপার আগ্রহ, দ্বিতীয়ত তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণের মতদ্বন্দ্ব, যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজন ছিল কী ছিল না, তৃতীয়ত ঘরে বসেও অনেকের ৭ মার্চের ভাষণ শোনার আগ্রহ। নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সার্থকতা লাভ করেছিল।

ঢাকার বাইরে থেকেও অনেকে বেতার মারফত ৭ মার্চের ভাষণ শুনতে চেয়েছিলেন, শুনেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কর্মব্যপদেশে ছিলেন চট্টগ্রামে। তাই ভাষণ তিনি শুনতে চেয়েছিলেন রেডিও মারফত। লিখেছেন, 'অধীর আগ্রহ ও গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ৭ মার্চ দুপুর থেকে রেডিও সেটের সামনে বসে রইলাম। কথা ছিল, ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বেতারে। কিন্তু তা হলো না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসে আমাদের উদবেগ আরো বাড়লো।

ঢাকার খবর জানতে মার্চের ১ ও ৩ তারিখ অধিক রাতে ফোন করেছিলাম আমার শিক্ষক মুনীর চৌধুরীকে। ৭ তারিখ গভীর রাতে আবার তাকে ফোন করলাম। টেলিফোন বাজামাত্রই তিনি ধরলেন, তাঁর কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। হ্যাঁ, উনি গিয়েছিলেন রেসকোর্সের বক্তৃতা শুনতে। সে-বক্তৃতার কথা বললেন, জনসমুদ্রের বিবরণ দিলেন, মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা জানালেন। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম যে, বিকেলের অভিজ্ঞতা তখনো তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে।...৭ মার্চের বক্তৃতা তাই আমরা শুনতে পেলাম ৮ মার্চে। কী অসাধারণ ভাষণ! সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,' তখনই মনে হলো

পৃথিবীর বুকে একটি নতুন জাতির জন্ম হলো।' (*আমার একাত্তর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ ২০০৮, পৃ. ২৪)। এ স্মৃতিচারণে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট: রেডিওতে ৭ মার্চের ভাষণ শোনার অধীর আগ্রহ, প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত না থেকেও এ ভাষণে রোমাঞ্চিত হওয়া এবং এর মধ্য দিয়ে নতুন জাতিরাষ্ট্রের উন্মেষের সম্ভাবনা। দূরবর্তী মানুষকেও কী করে এ ভাষণ প্রভাবিত করেছিল এ ভাষ্যে তা স্পষ্ট।

ঐতিহাসিক এ আর মল্লিক ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছিলেন রেডিওতে। লিখেছেন, 'আমার মনে হল, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন, আমরা জানি, ঢাকাতে বঙ্গবন্ধু এক বিরাট জনসভায় দেশবাসীকে আহ্বান জানান সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।' (*আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৬২)। ৭ মার্চকে স্মরণীয় হিসেবে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ওঠে এসেছে।

বামপন্থী নেতা মনি সিংহ তাঁর আত্মজীবনীতে ৭ মার্চের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এর মূল্যায়নের প্রয়াস নিয়েছেন। লিখেছেন, 'দুপুরের ভেতরেই লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে পূর্ণ হয়ে যায় রেসকোর্সের বিশাল ময়দান। তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। জনতার মহাসমুদ্রে পরিণত হয় এ দিন ঐ ময়দান। মানুষের হাতে হাতে গাঢ় সবুজের পটভূমিতে লাল বৃত্তের মাঝখানে সোনার বাংলার মানচিত্র আঁকা পতাকা আর ব্যানারে ব্যানারে সয়লাব জনতার সমুদ্র। উপস্থিত জনতার কারো হাতে বাঁশের লাঠি, ঢাল-সড়কি, কারো হাতে গাছের ভাঙা ডাল। 'আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম', 'আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ', 'পরিষদ না রাজপথ, রাজপথ,' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', ইত্যাকার শ্লোগানে শ্লোগানে উদ্দীপ্ত প্রকম্পিত রেসকোর্স ময়দান।... সবারই আশা, অধীর প্রতীক্ষা, তিনি আজ বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। আর এ লক্ষ্যে দেবেন পরবর্তী করণীয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশও।.. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের এই ঘোষণা ছিলো প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতারই ঘোষণা। এই ঘোষণা উপস্থিত জনতা ও দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে সীমাহীনভাবে।' (*জীবনসংগ্রাম*, ঢাকা: বর্তমান সময়, মে ২০০৩, পৃ. ২৭০, ২৭১)। একজন বামপন্থী রাজনীতিক হিসেবে ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তাঁর এ মূল্যায়ন বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। তাৎপর্যপূর্ণ যে, ৭ মার্চের ভাষণকে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণার নামান্তর মনে করেন।

এতোক্ষণ যাঁদের স্মৃতিভাষ্য ও বক্তব্য পর্যালোচনা করা হলো তাঁরা প্রত্যেকেই বাঙালি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে সম্মোহিত এবং বাঙালির মুক্তিপথের যাত্রী। শত সঙ্কট সমস্যায়ও তাঁরা ছিলেন একই লক্ষ্যের কাণ্ডারী। কিন্তু বিপরীত শক্তি কী ভাবছিলেন এ ভাষণ নিয়ে? পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে জনতা সাগরের ঢেউয়ের মতো

প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্সে ভেঙে পড়েছিল—ভাটার টান ধরা জোয়ারের মতো তারা ঘরে ফিরে চলল। তাদেরকে ধর্মীয় কোনো জনসমাবেশ তথা মসজিদ কিংবা গির্জা থেকে ফিরে আসা জনতার ঢলের মতোই দেখাচ্ছিল এবং ফিরে আসছে তারা সন্তুষ্টচিত্তে ঐশীবাণী বুকে ধরে। তাদের ভেতরকার সেই আগুন যেন থিতিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে কান্টেনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেই আগুনকে ধাবিত করা যেত। আমাদের অনেকেরই আশঙ্কা ছিল এরকমই। এই বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দফতরে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দিল।' (মুনতাসীর মামুন, *৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভাষণ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জুন ২০১১, পৃ. ১৫) পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৭ মার্চের ভাষণকে ভাল চোখে দেখেনি। তারা আশঙ্কা করছিলো বিক্ষুব্ধ জনতা সেনানিবাস আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্য দিয়ে একদিকে জনতা স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত হলো, অন্যদিকে কোনো আশঙ্কাজনক ঘটনার সুযোগও থাকলো না। সিদ্দিক সালিকের বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। কিন্তু এ ছিল আন্দোলনের কৌশল, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য—তিনি তা বুঝতে পারেননি। তাৎক্ষণিকতা বা সাময়িক কোনো উত্তেজনার বশে বড়ো লক্ষ্য ধূলিস্মাৎ হয়ে যেতে পারে না। এ কথা পাকিস্তানি শাসক চক্র সম্ভবত আঁচ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু সাবধানী নাবিকের মতো মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত করণকৌশল ব্যক্ত করলেন, দিক-নির্দেশনা দিলেন, কী করণীয় কী কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন—সবই বললেন, সবই করলেন। কিন্তু শাসকশক্তিকে কোনো ছুঁতোর সুযোগ দিলেন না।

ব্যক্তির এসব স্মৃতিচারণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষণটি যে কতজনকে কতভাবে আলোড়িত করেছিল, কতজনকে কতভাবে মুক্তির বীজমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল এসব কথামালা তার বিশেষ সাক্ষ্যবহ। বস্তুত এসব অনুভূতি বাংলার মানুষের চিন্তারই প্রকাশ। জনসভায় প্রত্যেকটি ব্যক্তি হয়তো তার মতো করে এ ভাষণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কিন্তু এ উপলব্ধির মূলে ছিল অভিন্ন চেতনাশক্তি, যা মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সংগ্রামে জুগিয়েছিল বিশেষ প্রণোদনা। অতত্রব, যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল সেদিন—তারই প্রভাব পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহে। যে অমলিন স্মৃতিকে তাঁরা ধারণ করেছিলেন তারই চেতনারশ্মি তাদেরকে দেখিয়েছে মুক্তিসংগ্রামের পথ। সেই পথ একই সঙ্গে ছিল কন্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর। সেই পথ বেয়েই অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলার। ৭ মার্চের অমলিন স্মৃতির সঙ্গে তাই অম্লান হয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ; ব্যক্তির মননে, চিন্তনে—সর্বোপরি বাঙালির জাগরণে।

পরিশিষ্ট

ক. স্বায়ত্তশাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফা দাবিনামা জুন ১৯৬৬

খ. স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, পল্টন ময়দান, ঢাকা, ৩ জুন ১৯৭১

গ. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা, ৭ মার্চ, ১৯৭১

পরিশিষ্ট-ক

স্বায়ত্তশাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফা দাবিনামা, জুন ১৯৬৬

১. দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যিকার ধারণার ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে, সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির, আর সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ হবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী;

২. ফেডারেল সরকার মাত্র দুটি বিষয় পরিচালনা করবেন। এ দুটি বিষয় হলো প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। আর অন্য সকল বিষয় ফেডারেশনের ইউনিটগুলির হাতে ন্যস্ত থাকবে;

৩. ক) দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা দুই অঞ্চলে প্রবর্তন করা যেতে পারে; অথবা

খ) গোটা দেশের জন্য একটি মুদ্রা রাখা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধে শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে। পৃথক ব্যাংকিক রিজার্ভ রাখতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে;

৪. ফেডারেশনের ইউনিটগুলির হাতে করারোপ ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। ফেডারেল কেন্দ্রের হাতে এ রকম কোনো ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেন্দ্র তার নিজ ব্যয় চাহিদা মেটানোর জন্য প্রদেশগুলির করের একটা অংশ পাবে। প্রদেশের সকল করের ওপর একটা নির্ধারিত হারে লেভি থেকে একটা সর্বমোট সুসংহত তহবিল গড়ে উঠবে;

৫. ক) দেশের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের জন্য দুইটি পৃথক বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার হিসাব থাকবে;

খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে;

গ) ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন দুই অঞ্চল কর্তৃক সমান হারে অথবা নির্ধারণযোগ্য অনুপাতে দুই অঞ্চল কর্তৃক মেটানো হবে;

ঘ) দেশজ পণ্য দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে শুল্কমুক্তভাবে অবাধে চলাচল করবে;

ঙ) শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাবলে ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলি বিদেশে বাণিজ্য মিশন খুলতে ও বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-খ

স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, পল্টন ময়দান, ঢাকা, ৩ মার্চ ১৯৭১

ঢাকায় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পল্টনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পঠিত স্বাধীন বাঙলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইশতেহারের পাঠ

জয় বাংলা

(স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে।

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন এ'কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্যে বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীর মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৭৩ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ' রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে-অঞ্চলে ও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন, সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) বাঙলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে-গ্রামে, এলাকায়-এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে এ' বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মিলিটারীদেরকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ' হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে কোনও শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমূখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি...' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি পতাকা পুড়ে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশে'র সর্বাধিনায়ক।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ' পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে—

- স্বাধীন সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' দীর্ঘজীবী হউক।
- স্বাধীন কর স্বাধীন কর—বাঙলাদেশ স্বাধীন কর।
- স্বাধীন বাঙলার মহান নেতা—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
- গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়—মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
- বীর বাঙালী অস্ত্র ধর—বাঙলাদেশ স্বাধীন কর।
- মুক্তি যদি পেতে চাও—বাঙলীরা এক হও।

বাঙলা ও বাঙালীর জয় হোক
জয় বাঙলা।
স্বাধীন বাঙলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

পরিশিষ্ট-গ

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা, ৭ মার্চ, ১৯৭১

'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

[ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, ১৯৭১ রবিবার বিকেল ৩.৩০ মিনিট,
রমনা রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান]

ভাইয়েরা আমার

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলায় অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি।

আমি শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, এ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো, এমন কি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলাম : আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল। দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী-আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলী করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর.টি.সি? কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার

পঁচিশ তারিখে এ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর.টি.সিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এ্যাসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জর্জ কোর্ট, সেমি-গভর্মেন্ট দফতরগুলো—ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলী চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে

হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে, সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলী চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর, এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি; আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হয়, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেউ দেবে না।

শোনেন—মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, নন-বেঙলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ্—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

লেখক পরিচিতি

এ.এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ [১৯২৪]
গবেষক, প্রাবন্ধিক, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক।

আবদুল ওয়াহাব [১৯৫৫]
প্রাবন্ধিক, ফোকলোর ও লালন গবেষক।

শেখ হাসিনা [১৯৪৭]
সাবেক ছাত্রনেতা, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক; সভানেত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সরদার ফজলুল করিম [১৯২৫]
গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী [১৯২৮]
গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় অধ্যাপক।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম [১৯২৭]
জাতীয় অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, গবেষক; সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলা একাডেমি ।

মযহারুল ইসলাম [১৯২৮-২০০৩]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, অনুবাদক, প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ, শিক্ষাবিদ, সাবেক মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি ও উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী [১৯৩৪]
প্রাবন্ধিক, গল্পকার, কলাম লেখক ও 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের গীতিকার।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর [১৯৩৬]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও প্রাক্তন উপ-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসনাত আবদুল হাই [১৯৩৯]
কথাসাহিত্যিক ও সাবেক সচিব।

হারুন-অর-রশিদ [১৯৫৩]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাবেক উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

আতিউর রহমান [১৯৫১]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, অর্থনীতিবিদ ও গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মনিরুল ইসলাম [১৯৪০]
সাবেক ছাত্রনেতা, রাজনীতিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, 'মার্শাল মনি' নামে সমধিক খ্যাত, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) তথা মুজিব বাহিনীর সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক।

তোফায়েল আহমেদ [১৯৪৩]
সাবেক ছাত্রনেতা, '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক পরিচালক, রাজনিতিক ও মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

এম. সাইদুর রহমান খান
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

খুরশীদা বেগম [১৯৫৪]
প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

নির্মল সেন [১৯৩০]
প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিক।

কামাল উদ্দিন হোসেন [১৯২৩-২০১৩]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সাবেক প্রধান বিচারপতি।

কামাল হোসেন [১৯৩৭]
প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক, অন্যতম সংবিধান (১৯৭২) প্রণেতা, প্রখ্যাত আইনবিদ ও সভাপতি, গণফোরাম।

এ.বি.এম. মুসা [১৯৩১]
প্রাবন্ধিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক, কলাম লেখক ও সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

কে.এম. সোবহান [১৯২৮-২০০৭
প্রাবন্ধিক ও সাবেক বিচারপতি।

এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া [১৯৪২-২০০৯]
সাবেক ছাত্রনেতা, প্রাবন্ধিক, গবেষক, বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

রবিউল হুসাইন [১৯৪৩]
প্রাবন্ধিক, কবি ও প্রখ্যাত স্থপতি ।

সন্তোষ গুপ্ত [১৯২৫-২০০৪]
প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক ও সাংবাদিক।

হাশেম খান [১৯৪২]
প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ।

নূরুল ইসলাম নাহিদ [১৯৪৫]
প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মুনতাসীর মামুন [১৯৫১]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন [১৯৪৭]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

আবুল মোমেন [১৯৪৮]
প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সাংবাদিক।

কে.বি.এম. মফিজুর রহমান খান [১৯৪৫]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও রাজনীতিক।

হারুন হাবীব [১৯৪৮]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, রণসাংবাদিক, সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যপস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ।

সৈয়দ শামসুল হক [১৯৩৫]
কবি ও সব্যসাচী লেখক।

মহাদেব সাহা [১৯৪৪]
কবি, সাংবাদিক ও সাবেক সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক।

ম. হামিদ [১৯৫০]
প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গবেষক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ [১৯৬০]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ।

আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক [১৯৫৩]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন [১৯৫০-২০১৩]
কবি, অনুবাদক, সম্পাদক একবিংশ ও সাবেক উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জালাল ফিরোজ [১৯৬৫]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও অনুবাদক।

আবদুল খালেক [১৯৩৭]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, ফোকলোরবিদ, শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; উপাচার্য, নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ও সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

শামসুজ্জামান খান [১৯৪০]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, ফোকলোরবিদ; প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় যাদুঘর ও মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি।

সেলিনা হোসেন [১৯৪৭]
কথাসাহিত্যিক, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী ও সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ।

যতীন সরকার [১৩৪৩]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাক্তন সভাপতি, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

মুহম্মদ আবদুল জলিল [১৯৪৮]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ফোকলোরবিদ।

মফিদুল হক [১৯৪৮]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, অনুবাদক ও পরিচালক, সাহিত্য প্রকাশ।

আবুল আহসান চৌধুরী [১৯৫৩]
প্রাবন্ধিক ও বিশিষ্ট লালন গবেষক।

গাজী আজিজুর রহমান [১৯৪৭]
কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

আবুল হাসান চৌধুরী [১৯৫৯]
প্রাবন্ধিক ও ফোকলোর গবেষক।

জাহারাবী রিপন [১৯৬৯]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, নাট্যকার ও নাট্যগবেষক।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম [১৯৫১]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক, অনুবাদক ও সাহিত্যিক।

সেলু বাসিত [১৯৫৯]
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানী।

এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার [১৯৫৫]
মেজর জেনারেল (অব.), নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও কলাম লেখক।

মুহম্মদ মাহবুব আলী [১৯৬৬]
প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক ও উপাচার্য, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

মামুন সিদ্দিকী [১৯৭৮]
প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

গ্রন্থপঞ্জি

১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১২
২. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, *বাংলাদেশ কোন্ পথে*, অপরাজিতা সাহিত্য ভবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১২
৩. সনৎকুমার সাহা, *এই বাঙলায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০
৪. আবদুল ওয়াহাব, *ফোকলোর, মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু*, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০
৫. যতীন সরকার, *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৭
৬. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন : আদিপর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৯২।
৭. মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ-পরিচিতি*, (দুই খণ্ড), সংকলিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৭৬
৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৩
৯. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীত : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮
১০. মনিরুল ইসলাম, *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
১১. শ্যামলী ঘোষ, *আওয়ামী লীগ* (১৯৪৯—১৯৭১), অনুবাদ-হাবীব-উল-আলম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ২০০৭
১২. তপন কুমার দে (সম্পাদনা), *৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ*, তাম্রলিপি, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৩. আসলাম সানী (সম্পাদিত) *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৪. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পাদনা), *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক সংকলিত, ডিসেম্বর ২০১১
১৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *এই দেশ এই মাটি* সম্পাদনা : আবুল মাল আদুল মুহিত, আ. আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও মো. জাহিদ হোসেন, প্রথম প্রকাশ ১৭ই মার্চ ২০০৮

১৬. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, আদিবাসী লোককথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০১
১৭. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৩।
১৮. আবু মাহমুদ, *মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা*, সম্পাদনা : ড. আবুল বারকাত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫
১৯. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬
২০. ফরহাদ খান, *প্রতীচ্য পুরাণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪
২১. সরদার ফজলুল করিম, মহাত্মা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী, 'বাংলাদেশে মাহত্মা গান্ধী, সম্পাদনা—তোফায়েল আহমেদ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২
২২. শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও উৎপল ঘোষ, মার্কসীয় সমাজত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০০
২৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি*, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন, ২০০৭
২৪. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনমুদ্রর্ণ, ১৯৯৩
২৫. মযহারুল ইসলাম, *আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২
২৬. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই ২০০২
২৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি, ২০০০
২৮. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ইউপিএল, ৪র্থ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৪
২৯. হারুন হাবীব, *মুক্তিযুদ্ধের দুই যুগ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
৩০. সিদ্দিকুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাগানিয়া ২৫ বছর*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭
৩১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *আপনভুবন*, বর্ণায়ন, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০৯
৩২. তাজুল মোহাম্মদ, *আমাদের একাত্তর*, উৎসব প্রকাশন, ঢাকা, মে ২০০৮,
৩৩. কে বি এম মফিজুর রহমান খান, *ষাট দশকের ছাত্র রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, সুনামগঞ্জ, উড়াল প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৩
৩৪. সফিকুর রাহী (সম্পা :) *মহাকালের মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৯
৩৫. হাশেম খান ও অন্যান্য (সম্পা:), *জাতির জনক তাঁর সারাজীবন*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০১১
৩৬. কে এম সোবহান, *বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ*, শিখা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৪
৩৭. শামসুজ্জামান খান, *বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও বর্তমান বাংলাদেশ*, বিজয় প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

৩৮. নীলিমা ইব্রাহীম, *বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব*, জাগৃতি প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০
৩৯. মুনতাসীর মামুন, হাশেম খান, *ঢাকা : ১৯৪৮-১৯৭১* (সংকলন ও সম্পাদনা), মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ ২০০৭
৪০. *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, সড়ক # ৩২, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ১লা আগস্ট, ১৯৮৭
৪১. আফতাব আহমদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি*, প্রকাশক : মিসেস মমতাজ আহমদ, ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৩
৪২. *ঢাকা-১৯৭১*, বাঙলা একাডেমী, ২য় প্রকাশ ১৩৯৬
৪৩. বসুধা চক্রবর্তী, *মানবতাবাদ*, দীপায়ন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭
৪৪. মোনায়েম সরকার (সম্পাঃ), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮
৪৫. *শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র* (দুই খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯
৪৬. সোলায়মান আলী সরকার, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪
৪৭. আহমদ শরীফ, *বাঙলা ও বাঙালি*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩
৪৮. মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪
৪৯. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২
৫০. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২
৫১. এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, বাংলা একাডেমী সংস্করণ, ঢাকা, জুন, ২০১২
৫২. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতে কৃষি বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা
৫৩. আবদুল খালেক, *বঙ্গবন্ধুর উদারতা এবং উত্তরাধিকার*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
৫৪. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৬৫
৫৫. *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস* (আধুনিক কাল), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৭
৫৬. মেকিয়াভেলি, *দ্যা প্রিন্স*, অনুবাদ-সুনীল বরণ বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮৬
৫৭. অনীক মাহমদ, *সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১
৫৮. আবুল কালাম, *ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮
৫৯. জে. ভি. স্তালিন, *দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২৮তম মুদ্রণ, ২০০২
৬০. শরীফ হারুণ, *ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দর্শন*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭
৬১. গোলাম ফারুক, *প্লেটোর দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬

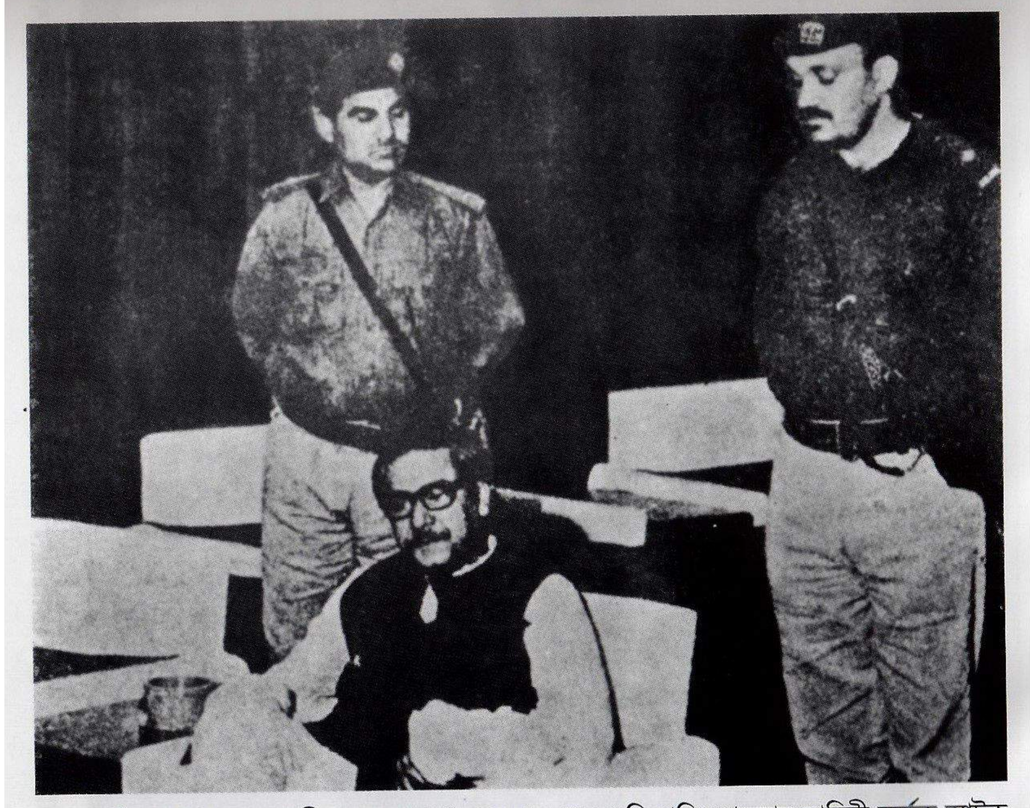
৬২. সত্যনারায়ণ মজুমদার, *মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭
৬৩. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম*, মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫
৬৪. *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১১
৬৫. আবুল কাশেম চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা, বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮২
৬৬. মুহম্মদ আফসারউদ্দীন (সম্পাদনা), এ কে নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪
৬৭. এ কে নাজমুল করিম, সমাজ-সমীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭২
৬৮. আফজালুল বাসার, *বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০০২
৬৯. অরবিন্দু পোদ্দার, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার*, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮৫
৭০. ম্যাকসিম গোর্কি, মা, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৬৫
৭১. জসীমউদ্দীন, বাঙালির হাসির গল্প, (১ম খণ্ড), ৫ম প্রকাশ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ১৯৭৩
৭২. পল্লব সেন গুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫
৭৩. আমিনুল ইসরাম ভুইয়া (অনুবাদ), প্লেটোর আইনকানুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৩
৭৪. প্রিসিলা রাজ (অনুবাদ), ক্লদ লেভি-ট্রস-এর *মিথ এন্ড মিনিং*, বাঙলায়ন, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭
৭৫. কামরুদ্দীন আহ্মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, প্রকাশক : জহীরুদ্দীন মাহমুদ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ
৭৬. খালেকুজ্জামান ইলিয়াস কর্তৃক অনূদিত, জোসেফ ক্যাম্পবেলকৃত *মিথের শক্তি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫
৭৭. হাশেম খান, *স্বাধীনতা ও জরিনারা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭
৭৮. এস. ওয়াজেদ আলি, *ভবিষ্যতের বাঙালী*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৩
৭৯. সেলিনা হোসেন, *উনসত্তরের গণআন্দোলন*, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯



৭ মার্চ, ১৯৭১ সালের জনসভায় রেসকোর্স মাঠে ঐতিহাসিক ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ট্রাইবুনালে জেলখানা থেকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার পথে, ১৯৬৯



২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী কর্তৃক আটক অবস্থায় করাচি বিমানবন্দরে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১।



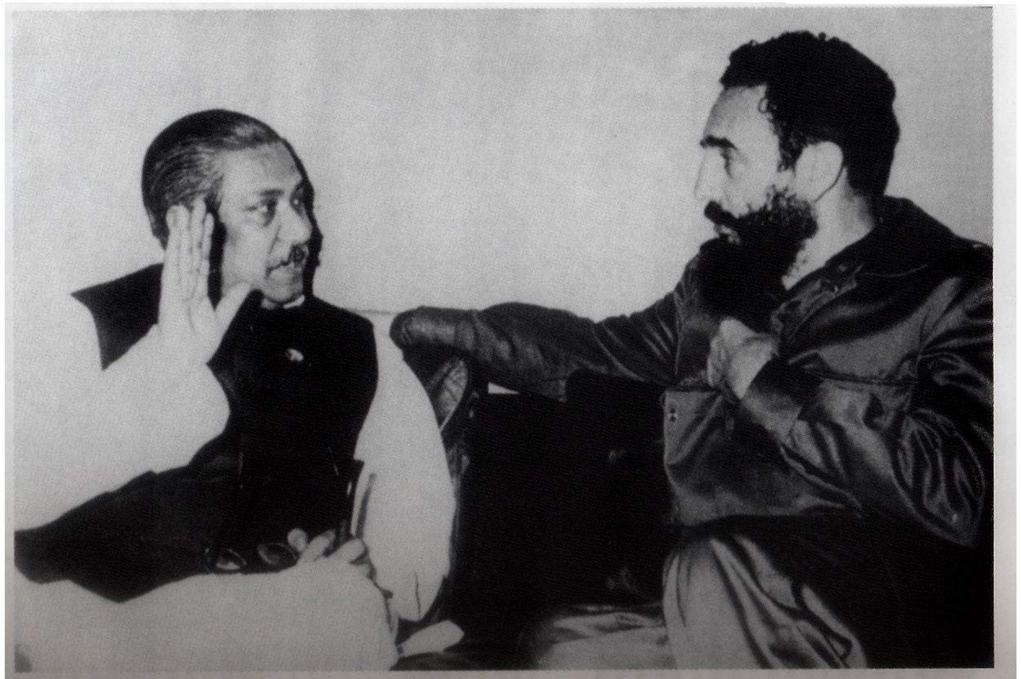
পুলিশের গুলিতে আহত একজন ছাত্রকে রিকশায় করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১১ মার্চ ১৯৪৮।



জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব মি. রমেশ চন্দ্র 'জুলিও কুরি' পদক পরিয়ে দেন, ২৩ মে ১৯৭৩।



অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা শুরুর পূর্ব মুহূর্ত : বাম দিক থেকে সৈয়দ মুর্তজা আলী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও কবীর চৌধুরী প্রমুখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।



ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু



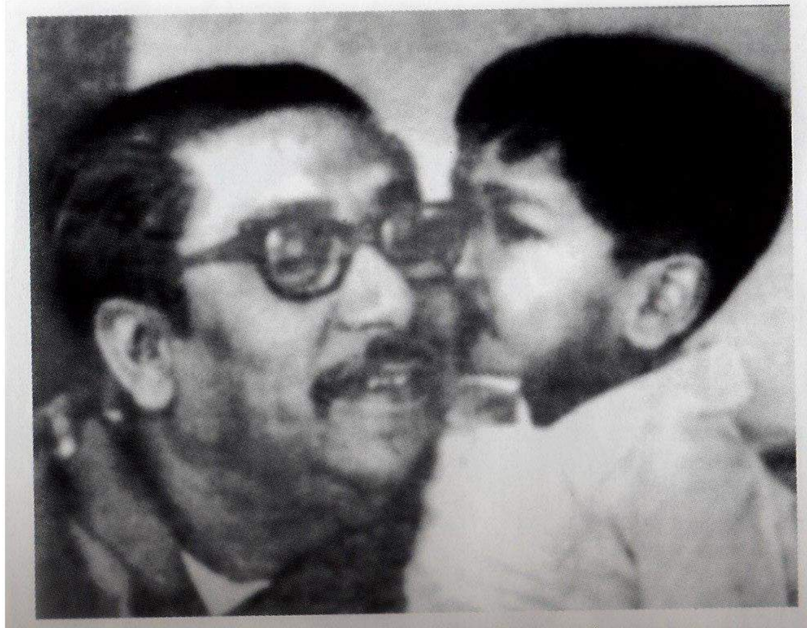
মস্কোতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সাথে বঙ্গবন্ধু



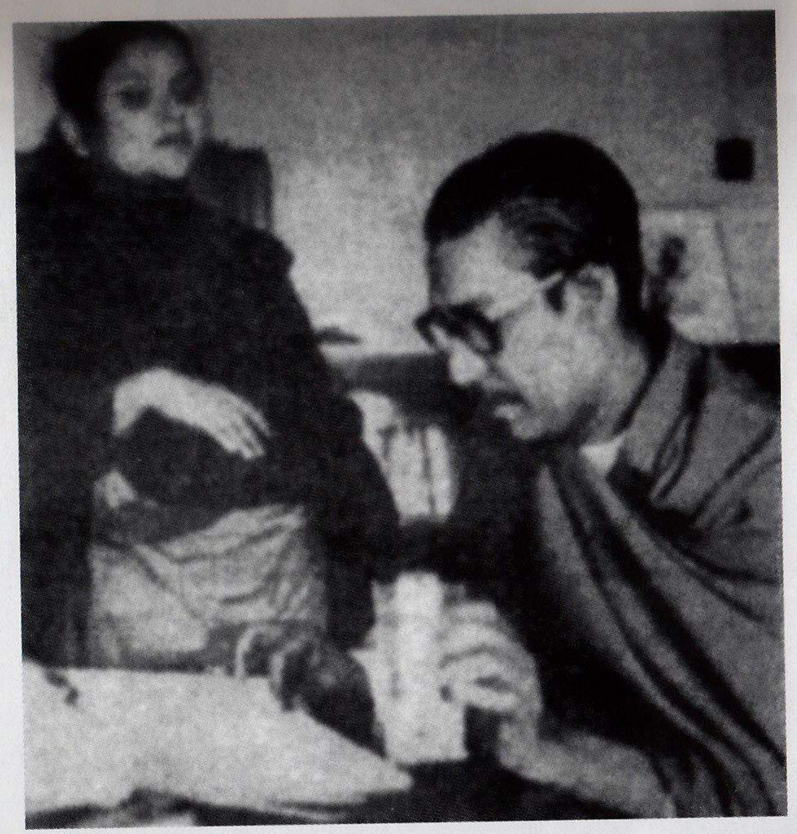
বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুন-এর সাথে বঙ্গবন্ধু



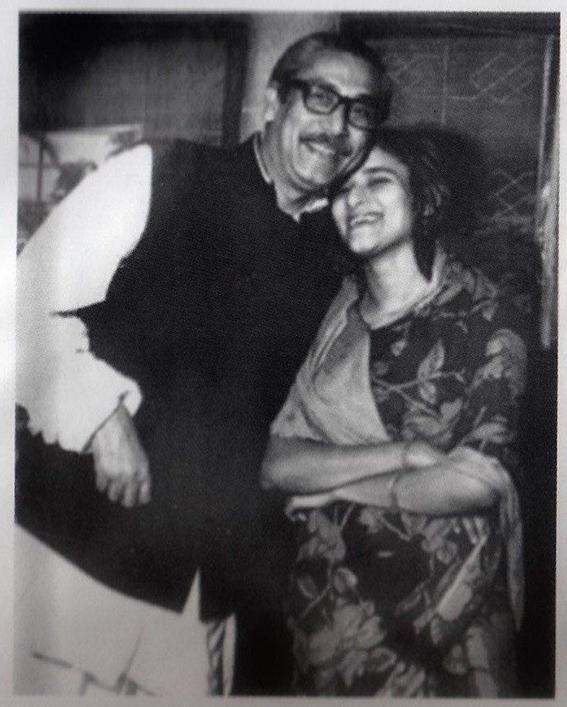
পিতা ও মাতার সাথে বঙ্গবন্ধু। পাশে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব



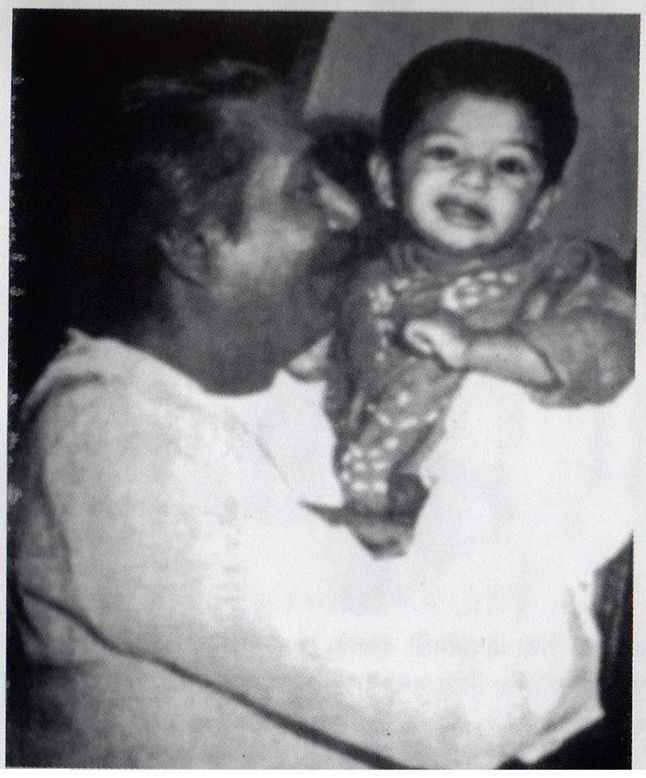
স্নেহময় পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অতি আদরের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল
১৭ মার্চ ১৯৭৫



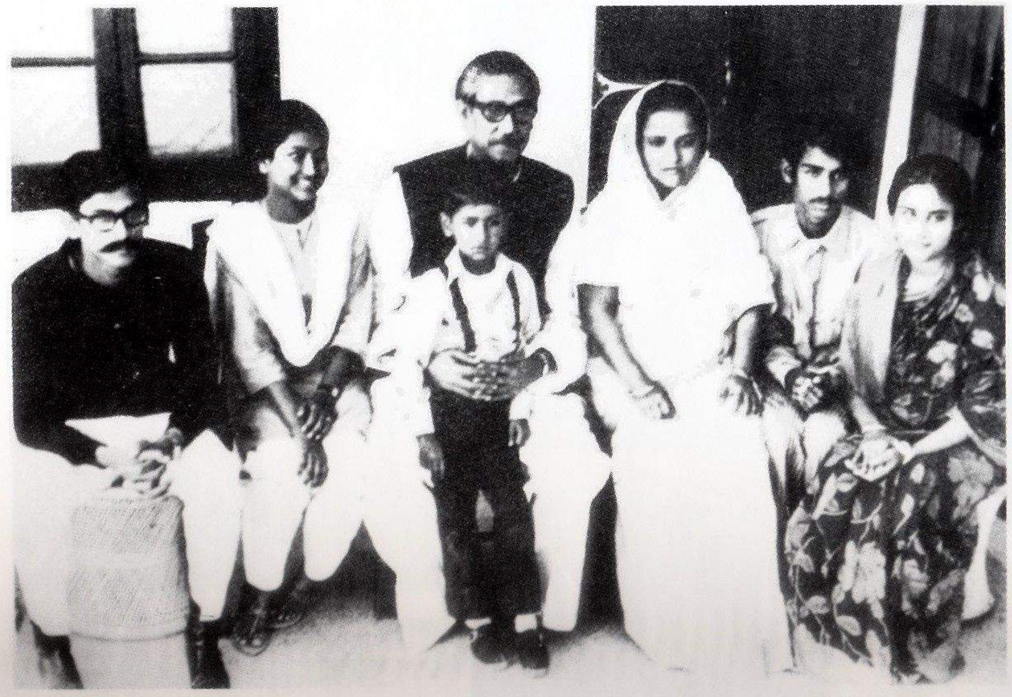
নিজ লাইব্রেরিতে গভীর মনোনিবেশ সহকারে বই পড়ছেন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে বেগম মুজিব কি যেন বলতে চাচ্ছেন সেই দিকে বঙ্গবন্ধুর কোনো খেয়ালই নেই, ১৯৭০



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কন্যা
শেখ হাসিনা



বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের
কোলে অতি
আদরের নাতি জয়
১৯৭২



সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বামে স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছা, তারপর শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা, ডানে শেখ রেহানা, শেখ কামাল এবং কোলে শেখ রাসেল, ১৯৭২।



জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে সদ্য বাংলাদেশে আগত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শুভেচ্ছা জানাতে ধানমণ্ডি কবি ভবনে যান, উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগেই বিদ্রোহী কবি বাংলাদেশে আসেন, ২৩ মে ১৯৭২।